ভ. ই. পাভলভ

ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত

আঠার শতকের শেষাশেষি থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি

জি. ই. এজেন্সি

১২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-[illegible]

1958

অনুবাদ : বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

সূচি

ভূমিকা

বিষয়বস্তু। – একটা থেকে অন্য সামাজিক-আর্থনীতিক বিন্যাসে উত্তরণের সাধারণ নিয়ম এবং মূর্ত-নির্দিষ্ট উপায়াদি-সংক্রান্ত প্রশ্নটা নিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র ইতিহাসমূলক রচনাগুলিতে গবেষণার কাজ বেড়ে চলছে। নানা সমস্যার বাস্তবিকই জটিল সমষ্টি এই বিষয়টায় আগ্রহ দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন পরিস্থিতি থেকে, সেগুলোর মধ্যে প্রধান মনে হয় দুটোকে: এক, পৃথিবীজোড়া ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটাকে সমাজতান্ত্রিক কিংবা পুঁজিতান্ত্রিক মর্মবস্তু দিয়ে ভরার সংগ্রাম, আর দুই, এই প্রসঙ্গে, বহুমুখ প্রক্রিয়া হিসেবে বিভিন্ন বিন্যাসের ধারাবাহিকতার ব্যাপক বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণের জরুরী প্রয়োজন, – গবেষণার সমস্ত আধুনিক প্রণালী প্রয়োগ না করে বোঝা যায় না এই প্রক্রিয়াটাকে।

এই বইখানা হল ভারতের আর্থনীতিক ইতিহাস নিয়ে আমার বিচার-বিশ্লেষণের অনুবৃত্তি; ভারতের শিল্পক্ষেত্রের বুর্জোয়াদের কোন কোন জাতীয় গ্রুপের বিশেষ-নির্দিষ্ট গঠন সম্বন্ধে একটা রচনা দিয়ে এই কাজ আমি শুরু করি ৩০ বছর আগে। ভারতীয় বুর্জোয়াদের সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করতে স্থির করার সময়ে আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা ছিল এই যে, এই শ্রেণীটি ক্ষমতা পেল একটা সার্বভৌম রাষ্ট্রে, তাই সেটার গড়ে-ওঠা, গঠন এবং দেশটির আর্থনীতিক আর রাজনীতিক জীবনে ভূমিকা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করাটা খুবই প্রাসঙ্গিক। ভারতে পুঁজিতন্ত্রের উৎপত্তি আর বিকাশের কোন-কোন সাধারণ দিক সম্বন্ধে – যেমন এইসব প্রক্রিয়ার পর্যায়-বিভাগ সম্বন্ধে – বিবেচনা করতেও আমি চেষ্টা করেছি।

নানাক্ষেত্রযুক্ত সমাজ সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণের কোন-কোন দিক।— সমগ্র জাতীয়-আর্থনীতিক কাঠামে এবং বিশ্ব আর্থনীতিক সম্পর্কতন্ত্রের ভিতরেও পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্রের স্থান স্থির করাটা একটা কেন্দ্রী সমস্যা। পৃথক-পৃথক দেশের বেলায় গবেষণায় সুবিন্যাসবিদ্যা মূর্ত-নির্দিষ্ট ধরনে বিস্তারিত করার সময়ে মনে রাখা দরকার যে, 'পুঁজি'-তে মার্কস বিচার-বিশ্লেষণ করেন বৃটিশ সমাজ নিয়ে, যেটা অতি অবিমিশ্র আকারের পুঁজিতান্ত্রিক রূপান্তর প্রক্রিয়া পার হয়ে এসেছিল এবং উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই নিজ নানাক্ষেত্র-সংক্রান্ত সমস্যার নিষ্পত্তি করে ফেলেছিল।

'রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ'-এ লেনিন নানাক্ষেত্র-সংক্রান্ত সাধারণ সমস্যাটার প্রত্যেকটা দিক ধরে বিবেচনা না করেই ক্ষুদ্রায়তন-পণ্য ক্ষেত্র, এবং পরস্পর-ক্রিয়ার মধ্যে পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন উপ-বিভাগ বিচার-বিশ্লেষণের একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন। এটা সহজেই বোঝা যায়, কেননা লেনিনের এই রচনাটির ছিল একটা সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং রাজনীতিক উদ্দেশ্য, সেটা হল রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের সীমাবদ্ধ বিকাশ-সংক্রান্ত নারোদনিক* বক্তব্যটাকে খণ্ডন করা। রুশ সমাজের নানাক্ষেত্রযুক্ত প্রকৃতি এবং তাতে পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্রের স্থান সম্বন্ধে নিজ ধারণার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে ভূমি-প্রশ্নে লেনিনের পরবর্তী বিচার-বিশ্লেষণগুলিতে। রুশ সমাজের নানাক্ষেত্রযুক্ত প্রকৃতি-সংক্রান্ত প্রশ্নটা নিয়ে খুবই সামান্যীকৃত বিচার-বিবেচনা আছে নয়া আর্থনীতিক কর্মনীতি সম্বন্ধে লেনিনের লেখাগুলিতে।

এই বইয়ের রুশ বয়ানে ব্যবহার করা হয়েছে প্রথমে ভ. ই. লেনিনের প্রস্তাবিত অভিধা 'উক্‌লাদ'। কোন উপযুক্ত ইংরেজী অভিধা না থাকায় আমি 'sector' [বাংলায় 'ক্ষেত্র'] ব্যবহার করেছি। এটাই উক্‌লাদ-এর সবচেয়ে কাছাকাছি বলে। তবে মনে রাখা দরকার যে, উক্‌লাদ-এর গূঢ়ার্থ অনেক বেশি বিস্তীর্ণ, কেননা আর্থনীতিক দিকটা ছাড়াও এটার আরও আছে সামাজিক-শ্রেণীগত, সামাজিক-মানসতাগত, রাজনীতিক, ভাবাদর্শগত, সাংস্কৃতিক, প্রথা-প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত এবং অন্যান্য দিক,

তাই উক্লাদ-ক্ষেত্রকে সমাজের একটা কাঠামগত উপ-বিভাগ বলে ধরা যায়। খোদ উক্লাদ অভিধাটা নিয়ে বিভিন্ন সোভিয়েত রচনায় আরও আলোচনা চলছে। ঐতিহাসিক বিবেচনাধারা অনুসারে আমি কোন উক্লাদ শনাক্ত করতে গিয়ে প্রধান মানদণ্ড হিসেবে ধরেছি সামাজিক-আর্থনীতিক বিন্যাসের কোন-কোন পর্বকে, আর বিভিন্ন মধ্যবর্তী, আন্ত-র্বিন্যাস পর্বকেও। তদনুসারে এই বইয়ে বিবেচিত বিভিন্ন উক্লাদ-ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে এইগুলি: ১) গোড়ার দিককার সামন্ততন্ত্র, ২) উন্নত সামন্ততন্ত্র, ৩) ক্ষুদ্রায়তন-পণ্য, ৪) গোড়ার দিককার বা ম্যানুফ্যাকচারের পুঁজিতন্ত্র, আর ৫) শিল্পক্ষেত্রের পুঁজিতন্ত্র (যেটা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অবধি নির্দিষ্ট আকারে গড়ে উঠেছিল শুধু বৃটেনে)। ভারতীয় সমাজ বিকাশের পরবর্তী পর্বগুলিতে এই সমাজের নানাক্ষেত্রযুক্ত গঠন সম্বন্ধে সোভিয়েত ভারতবিদ্যাবিদদের বিবেচনাধারা দেখা যাবে এই রচনায়: ভ. পাভলভ, ভ. রাস্তিন্নিকভ, গ. শিরোকভ 'ভারত: সামাজিক এবং আর্থনীতিক উন্নয়ন (১৮-২০ শতক)।'*

সমাজ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সেটাকে প্রধানত নানা-ক্ষেত্রযুক্ত কাঠাম হিসেবে ধরলে তাতে আপনাতেই প্রশ্নটার উত্তর মেলে না, তাতে প্রশ্নটা সম্বন্ধে বুঝ-সমঝের পথটাই শুধু প্রস্তুত হয়, এবং আরও বলা দরকার, সেটা হয় গবেষণার সমগ্র চৌহদ্দিটাকে সরল করে ফেলা কিংবা হ্রাস করার উপায়ে নয়, বরং সেটাকে আরও জটিল এবং প্রসারিত করার উপায়ে। কোন কর্ম-বন্দেজকে সেটার অঙ্গ-উপাদান-গুলোর পরস্পর-ক্রিয়ার মাঝে সক্রিয় সত্তা হিসেবে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেয়ে তো বটেই, সমগ্র কর্ম-বন্দেজটার সাকল্যের মাঝে সেটা সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণের চেয়েও নিশ্চয়ই সহজ হল সেটার কোন একটামাত্র অঙ্গ-উপাদান সম্বন্ধে, এমনকি একটা গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ। সর্বাগ্রে, উক্লাদ-এর যেসব সংজ্ঞার্থ আগেই জানা আছে, কিংবা যেগুলিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে, সেগুলিকে প্রয়োগের জন্যে চালু করলে এমন বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে যে, কাজ চালান হচ্ছে বিভিন্ন সুবিদিত ধারণামৌলের

সাহায্যে, তাই সংশ্লিষ্ট সামাজিক-আর্থনীতিক গঠনে বিভিন্ন উক্‌লাদ (ক্ষেত্র)-এর মধ্যে মূর্ত-নির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থির করাই কাজটা।

কিন্তু আসল কথাটা হল এই যে, কোন-একটা গঠনের বিভিন্ন বিশেষত্ব দেখা দেয় অনন্যসাধারণ আন্তঃক্ষেত্র অনুপাত থেকেই শুধু নয়, অধিকন্তু আলাদা-আলাদা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের জাতিগত মূর্ত-নির্দিষ্টতা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে সেটার প্রতিষঙ্গী মিথষ্ক্রিয়া থেকেও। কোন-কোন ঘটনা, যা সাতিশয় অনুরূপ কিন্তু ঘটেছে ভিন্ন-ভিন্ন ঐতিহাসিক পরিবেশে, সেগুলো একেবারেই পৃথক-পৃথক ফল পয়দা করতে পারে, এটা লক্ষ্য করেন মার্কস। এটা সহজেই বোঝা যায় যখন এইসব ঘটনা-ফলের প্রত্যেকটাকে আলাদা-আলাদা করে ধরে বিচার-বিশ্লেষণ করে তারপর সেগুলোর মধ্যে তুলনা করা হয়, কিন্তু কোন সাধারণ ঐতিহাসিক-দার্শনিক তত্ত্বকে সবখোল-চাবি হিসেবে ব্যবহার করে এমন বুঝ-সমঝ সম্ভব নয় কিছুতেই। জীবনের শেষের দিকে এই ধারণাটাকে সম্পূর্ণ করে তুলে এঙ্গেলস জোর দিয়ে বলেন, সমাজ বিকাশের নিয়মাবলির থাকে 'কোন বাস্তবতা শুধু সন্নিকর্ষ, প্রবণতা, গড় মান হিসেবে, কখনও **সাক্ষাৎ** বাস্তবতা হিসেবে নয়'।*

এইভাবে, ১৮-১৯ শতকের ভারতের গ্রামীণ উপর-স্তরের অর্থনীতিকে সামন্ততান্ত্রিক, কিংবা শহুরে হস্তশিল্পীদের অর্থনীতিকে ক্ষুদ্রায়তন-পণ্য কিংবা খুদে-পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি বলে অভিহিত করা হলে পৌছন হয় শুধু সেগুলির যথাথ সামাজিক-আর্থনীতিক মর্মবস্তু এবং অভ্যন্তরীণ আর্থনীতিক সম্পর্ক নিয়ে গবেষণার খুব কাছাকাছি। বাস্তবিকপক্ষে, 'ক্ষেত্র-ওয়ারি' সংজ্ঞার্থ দিলে সেটা দিয়েই বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারা যায় না। যেমন, গ্রাম-সম্প্রদায়ের কোন ছুতোর ক্ষুদ্রায়তন-পণ্য উৎপাদক হয়ে দাঁড়ায় আর সম্প্রদায়ের কোন সচ্ছল সদস্য হয়ে দাঁড়ায় খুদে জোতদার কিংবা সামন্ত ভূস্বামী যে জমি খাজনাবিলি করে – সেটা কখন্? তেমনি, ভারতের গ্রামাঞ্চলে আখজাত দ্রব্য উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট শ্রমের পরিমাণ এবং সেই শ্রমের অংশে-অংশে বিভাগ থেকেই শুধ শুরু করলে সংশ্লিষ্ট

প্রতিষ্ঠানগুলি পুঁজিতান্ত্রিক বর্গে ফেলতে হয়। কিন্তু মেহনতীদের পারিশ্রমিক এবং মনিবদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্বের একটা উপাদান সম্বন্ধে উপাত্ত থেকে মনে হয় এইসব প্রতিষ্ঠান বোধ হয় ছিল উৎপাদনের আনুষঙ্গিক দিক, যেগুলোকে চালাত গ্রামাঞ্চলের উপর-স্তরের মানুষের মধ্যে সামন্ত ধরনের গৃহস্থ মালিকেরা।

উলটে, কোন ভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক পটভূমিতে মালিকের নিজস্ব শ্রমের ভিত্তিতে চালানো প্রতিষ্ঠানকে পুঁজিতান্ত্রিক বর্গে ফেলা যেতে পারে। এইভাবে, লেনিনের দেওয়া সংজ্ঞার্থ অনুসারে, উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের অবস্থায় এমনকি সরল পণ্য-উৎপাদনও হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিতন্ত্রের রিজার্ভই শুধু নয়, অধিকন্তু পুঁজিতন্ত্রের একটা রকম-বিশেষও বটে। মজুরি-শ্রম প্রয়োগ করা হয় কিংবা না হয় সেটা নির্বিশেষে 'খুদে গ্রামীণ বুর্জোয়া বর্গের মধ্যে পড়ে এমন প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রায়তনের পণ্য-উৎপাদক যে স্বাধীনভাবে কৃষিকাজ চালিয়ে খরচ-খরচা পুষিয়ে নেয়, অবশ্য যদি অর্থনীতির সাধারণ ব্যবস্থাটার ভিত্তি হয়... পুঁজিতান্ত্রিক দ্বন্দ্ব-অসংগতি'।* আলোচ্য কালপর্যায়ের ভারতে এইরকমের পরিস্থিতি বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না, তবে লেনিন যা বলেছেন তার থেকে পাওয়া যাচ্ছে নমুনাসইকরণের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সুবিন্যাসবিদ্যাগত মানদণ্ড।

'মিশ্র' অর্থনীতিতে পৃথক-পৃথক ক্ষেত্রের স্থান। – তবে কোন একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে বলে স্থির করা গেলেও পৌঁছন গেল শুধু সেইসব নির্দেশক-সংক্রান্ত প্রশ্নে যেগুলো নির্ধারণ করে পৃথক-পৃথক ক্ষেত্রের স্থান আর ভূমিকা – বিশেষত সেগুলোর মধ্যে যেটার থাকে বিন্যাস-সংগঠক কর্ম। দুটো নির্দেশক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য: থোক জাতীয় উৎপাদে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটার হিসসা, আর সেটার হিস্সায় রোজগেরে মানুষের সংখ্যা। কিন্তু গবেষণার অভিজ্ঞতায় এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীদের বিভিন্ন তত্ত্বীয় উপস্থাপনায় দেখা যায় এই দুটো নির্দেশক পর্যাপ্ত নয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাম গড়ে ওঠার পৃথক-পৃথক পরিবেশের দরুন প্রথম নির্দেশকটা হয়ে দাঁড়ায় খুবই অযথাযথ এবং অনির্ভরযোগ্য। তবে আরও

গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হল এই যে, জাতীয় উৎপাদের যেসব পরিমাণ মূল্যের হিসাবে তুলনীয় সেগুলো খুবই পৃথক-পৃথক হতে পারে মূর্ত-নির্দিষ্ট বৈষয়িক আকারের দিক থেকে, বিশেষত পুনরুৎপাদনের বিভিন্ন বৈষয়িক উপাদান বর্তমান থাকা এবং সেগুলোর গুণাগুণের দিক। এইসব উপাদান কী পরিমাণে আবশ্যক উৎপাদ কিংবা উদ্বৃত্ত-উৎপাদের অঙ্গ, সেটাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মার্কস বলেছেন, 'উদ্বৃত্ত-মূল্য পুঁজিতে পরিণত হতে পারে তার একমাত্র কারণ এই যে, সেটা যে-উদ্বৃত্ত-উৎপাদের মূল্য সেটাতেই থাকে নতুন পুঁজির বিভিন্ন বৈষয়িক উপাদান।' *

আলোচ্য ক্ষেত্রটা যদি উদ্বৃত্ত-উৎপাদের একটা বড় হিসসা এবং পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে সমাজ-জীবনে সেটার গুরুত্ব বেড়ে যায়, এটা তো স্পষ্ট প্রতীয়মান। তবে সঞ্চয়ন তহবিল এবং উদ্বৃত্ত-উৎপাদের উৎপাদকের কিংবা উদ্বৃত্ত-উৎপাদ আত্মসাৎকারীর ব্যবহার তহবিলের মধ্যে উদ্বৃত্ত-উৎপাদের বন্টনও সমানই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের দৃষ্টান্ত থেকে চমৎকার দেখা যায় উদ্বৃত্ত-উৎপাদ যে-ক্ষেত্রে পয়দা হয় সেখানে সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের পরিসরের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয় ঐ উদ্বৃত্ত-উৎপাদের পরিমাণ। অধিকন্তু, পুনর্বণ্টন আর ব্যবহারের কোন একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত-উৎপাদের প্রধান অংশটা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এবং সমগ্র জাতীয় কাঠামে উভয়ত বদ্ধতা অবধারিত করে দিতে পারে আগে-ভাগেই, কিংবা প্রধানত ব্যয়িত হতে পারে অন্য একটা ক্ষেত্রে উৎপাদ-নের দ্রুত প্রসারের জন্যে (যেমন খুদে কৃষিকাজের ক্ষেত্র থেকে বৃহদায়ত-নের শিল্প ক্ষেত্রে তহবিলের চলন)।

কখনও-কখনও পুনর্বণ্টন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট হয় না, কিন্তু যেসব সামাজিক স্তর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত-উৎপাদ ভোগ-ব্যবহার করে তাদের সুস্থিত আধিপত্য সমাজে বজায় রাখত সহায়ক হয়। উদৃত্ত-উৎপাদের পরিমাণ আর বৈষয়িক উপাদান-গুলো যেখানে শাসক শ্রেণীর লোকসংখ্যা, জীবন-মৃত্যু পরিসংখ্যান পরিস্থিতি এবং জীবনযাত্রার মানের (চাহিদার) সঙ্গে সমান-সমান হয়ে যায় যেখানে উৎপাদন-প্রণালীতে কোন পরিবর্তন ঘটাতে ঐ শ্রেণীর বিশেষ কোন প্রবর্তনা থাকে না দীর্ঘকালের জন্যে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোন-কোন সামন্ততান্ত্রিক দেশে স্বাভাবিক পুনরুৎপাদন নিয়মনের জন্যে শাসক শ্রেণীর ছিল প্রথা আর রীত-রেওয়াজের ব্যবস্থা। পশ্চিম ইউরোপে সেটা ছিল উপর-তলার মহিলাদের ব্যস্তবাগীর জীবন, সামরিক কৃত্যক আর সম্ভ্রান্ত বংশের লোকদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ এবং যাজকদের কৌমার্য; জাপানে – সামুরাই বংশ-গুলোর মধ্যে রক্তপাত-করা শত্রুতা; আর ভারতে উঁচু জাত-বর্ণের মেয়ে-দের বিয়ের নিয়মাদি। শেষে, কোন নিচ সামাজিক বর্গের, ভিন্ন ধর্মমত, জাত-বর্ণ, বংশ, ইত্যাদির মেয়েদের বিবাহ-বহির্ভূত অবস্থায় জাত সন্তা-নের উত্তরাধিকার স্বীকৃতির উপর বাধা-নিষেধ ছিল সামন্ততান্ত্রিক ধরনের সমস্ত সমাজে। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সম্বন্ধে নিয়মন কর্ম-বন্দেজে যাবতীয় জাতিগত প্রভেদ সত্ত্বেও সেটা শাসক শ্রেণীর প্রয়োজন এবং সেগুলো মেটাবার সুযোগ-সম্ভাবনার মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক ছিল নিঃসন্দেহে, আর সেদিক থেকে সেটা ঐ শ্রেণীর রক্ষণশীল প্রকৃতিটাকে প্রবলতর করত। (ইংলণ্ডে 'সাদা গোলাপ আর লাল গোলাপের মধ্যে যুদ্ধে'র সময়ে অভিজাতকুল আত্মবিনাশে মেতে সৃষ্টি করেছিল একটাকিছু শূন্যস্থল, যেটা ভরতি হয়েছিল অন্যান্য সামাজিক অংশ দিয়ে – সেটা একেবারেই অন্য ব্যাপার।)

যেগুলিতে প্রযুক্তি চিরাগত, সেইসব বদ্ধ সমাজে শাসক অংশগুলোর আপেক্ষিক লোকসংখ্যা নির্ভর করে তাদের আত্মসাৎ-করা উদ্বৃত্ত-উৎপাদের পরিমাণের উপর, আর সেটা আবার নির্ভর করে শ্রমের স্বাভাবিক পরিবেশের উপর। মার্কস বলেছেন: 'শ্রমশক্তি যদি হয় কম, আর শ্রমের স্বাভাবিক পরিবেশ যদি হয় সামান্য, তাহলে উদ্বৃত্ত-শ্রম হয় কম, তবে এমন ক্ষেত্রে একদিকে উৎপাদকদের চাহিদা এবং অন্য দিকে উদ্বৃত্ত-শ্রম শোষকদের আপেক্ষিক সংখ্যাও হয় তাই, আর শেষে তাই হয় উদ্বৃত্ত-উৎপাদ, যেটার সাহায্যে এই যৎসামান্য উৎপাদী উদ্বৃত্ত-শ্রম আদায় হয় ঐ অল্পকিছু শোষক ভূস্বামীদের জন্যে।'* ভারতে স্পষ্টতই ছিল এমন পরিস্থিতি যাতে বিভিন্ন সামাজিক উপাদান ছিল মার্কস যেগুলি নিয়ে বিবেচনা করেছেন সেসবের বিপরীত (উৎপাদকদের ছোট-খাটো চাহিদাগুলো ছাড়া)।

দীর্ঘ ঐতিহাসিক কালপর্যায় ধরে কোন শাসক শ্রেণীর গড়ে ওঠার পরিবেশ নিয়ে বিবেচনা করতে গিয়ে ঐ শ্রেণী যে উদ্বৃত্ত-উৎপাদ আত্মসাৎ করে সেটার যে-অংশ ব্যবহার করে ফেলা হয় এবং যে-অংশ সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনে চালান করা হয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করতে গেলে এই বিভাগটা এবং খোদ ঐ শ্রেণীটার সংখ্যাবৃদ্ধির মধ্যে একটা স্পষ্ট অসংগতি দেখা দেয়: এই শ্রেণীর মানুষ নিজেরা উদ্বৃত্ত-উৎপাদের যত বড় অংশ ভোগ-ব্যবহার করে, ততই তাদের সংখ্যা বেশি হয় তখন; কিন্তু একটা আবশ্যক অংশ সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের জন্যে রেখে না দিলে শাসক শ্রেণী – একদিক থেকে – খেয়ে শেষ করে নিজ ভবিষ্যৎ-টাকে, নিজ অধস্তন অংশগুলোর মালিকানাগত অধঃপতন অবধারিত করে দেয় (যদিও চিরাগত সমাজে তার ফলে সামাজিক বিশেষাধিকার খোয়া যায় না সঙ্গে সঙ্গে)। এই কারণেই উদ্বৃত্ত-উৎপাদের সবটাকে কিংবা প্রায় সবটাকে শাসক শ্রেণী অত্যাধিক পরিমাণে অনুৎপাদীভাবে ব্যবহার করে ফেলার ফলে ঐ শ্রেণীর মধ্যে 'জনসংখ্যার' একরকমের 'অতিবৃদ্ধি' দেখা দিত (অসাধারণ সামবিক কিংবা অন্য কোন নিরোধের কথা বাদ দিলে) আর পয়দা হত মস্ত-মস্ত দলে-দলে নাস্তিমানেরা, যারা জীবনযাত্রার ভাল-ভাল জিনিসগুলো বরাবরকার মতো পরিমাণে পেতে দাবি করত আরও বেশি রক্ষণশীল হয়ে।

কোন সমাজকে নানাক্ষেত্রযুক্ত বলে চিহ্নিত করতে হলে সেটার উপরকাঠামের প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদিকে নিয়ে বিবেচনা করা আবশ্যক আরও বেশি জটিল ধরনে। স্বভাবতই, যেকোন সমাজে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-প্রণালী নিয়মনের জন্যে, সেটার সদস্যরা, বিভিন্ন সামাজিক অণু-উপাদান (পরিবার, সম্প্রদায়, জাত-বর্ণ) আর উৎপাদন-ইউনিটগুলি এবং বিভিন্ন মহা-সত্তার (রাষ্ট্র, জাতি, সমগ্রভাবে জাতীয় অর্থনীতি) মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্যে সমাজের চাই আইন আর নৈতিকতার সামাজিক নিয়ম-বিধির একটা ব্যবস্থা এবং তদনুযায়ী উপরকাঠামের প্রথা-প্রতিষ্ঠা-নাদি। বদ্ধ (বরং বলা ভাল ধীরে ক্রমবিকশিত হতে থাকা) সমাজে এই কর্ম-বন্দেজের ভাবাদর্শগত এবং প্রথা-প্রতিষ্ঠানগত দিকগুলোকে লোকে চিরস্থায়ী, সম্পূর্ণ এবং ঐশ বিচার আর আদেশ অনুসারে অলঙ্ঘনীয় বলে মনে করতে থাকে। সমাজের প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদি এবং নৈতিকতা আর আইনের নিয়ম-বিধির প্রতি সমাজের এই মনোভাবের ফলে ঐ

দুয়েতেহ বাড়াত স্বাতন্ত্র্য আরোপিত হয়, যার ফলে কোন-কোন ইতিহাস-কার প্রাচ্যের প্রথা-প্রতিষ্ঠান-আইনগত ব্যবস্থাটার স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকৃতি সম্বন্ধে জিদ ধরে বলার ভিত্তি পেয়ে যান।

সমগ্র সমাজ যে সামাজিক-আর্থনীতিক বিন্যাসের অঙ্গ সেটাকে যে-ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেয় সেই ক্ষেত্রের রাষ্ট্রিক উপরকাঠামের আধিপত্য থাকে প্রত্যেকটা সমাজে, তা তো বটেই। তবে উপরকাঠামের প্রথা-প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাটার মধ্যে – সেটার বিভিন্ন গৌণ অঙ্গ-উপাদান হিসেবে – আরও থাকে অচলিত হয়ে-পড়তে-থাকা কিংবা – উলটে – উদ্ভব হতে-থাকা বিভিন্ন ক্ষেত্রের সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদি। দীর্ঘকালের সহ-অবস্থানের ধারায় এগুলো পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে, আর সাধারণ সামাজিক বদ্ধতার অবস্থায় সেগুলির আকারগত সংগঠন আর কর্মভারের সন্নিকর্ষ ঘটতে থাকে। যেমন, ভারতের জাত-বর্ণগত প্রথা-প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থায় দেখা যায় গোষ্ঠীগত সমসংযোগ, দাসোচিত হীনানুগত্য এবং গিল্ড আর সামাজিক বর্গবিভাগ ধারায় সংগঠনের বিভিন্ন লক্ষণ। জাত-বর্ণগত সোপানতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে এইসব উপাদান ছিল ভিন্ন-ভিন্ন আ-কারে, কিংবা ছিল না একেবারেই; কিন্তু এমনকি প্রশাসনিক আর সামরিক কর্মীদের উপরতলাগুলোতেও গোষ্ঠীতন্ত্রে কিংবা দাস-মালিকানা ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের ব্যাপক চল ছিল। এদিক থেকে দেখলে, সামাজিক বর্গের দিক থেকে যা সমসত্ত্ব, শাসক শ্রেণীর এমন কোন সামন্ততান্ত্রিক সোপানতন্ত্র, যেমনটা সামন্ততান্ত্রিক পশ্চিম ইউরোপে ছিল (যদিও বিভিন্ন বিজাতীয় অংশ ব্যবস্থাটার মধ্যে ঢুকে পড়ত সে-খানেও), তা কখনও ছিল না ভারতে। স্বৈরাচারী শাসকের প্রতি দাসো-চিত আনুগত্যের শর্তে সামরিক এবং প্রশাসনিক কর্মযন্ত্রে বিজাতীয় বংশোদ্ভূত (এবং কখনও-কখনও ভিন্ন ধর্মমতের) মানুষকে ভরতি করার (অনেক সময়ে জোর করে ঢোকাবার) বহুবিস্তৃত রেওয়াজ ছিল প্রাচ্যে, – আমার মনে হয় এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরবর্তী-সামন্ততান্ত্রিক, নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী শাসনাধীন সমাজের মান অনুসারে বিচার করলে, শাসক শ্রেণী আর সেটার প্রশাসনিক এবং নিগ্রহ কর্মযন্ত্রের সামন্ত-তন্ত্রীকরণ প্রাচ্যে অসম্পূর্ণ ছিল।

প্রাক্‌ব্রিটিশ ভারতে শোষক শ্রেণীগুলির পৃথক-পৃথক গ্রুপের মধ্যে ভারসাম্যে প্রকাশ পেয়েছিল শুধু সেগুলোর সংখ্যাশক্তি কিংবা দেশের

আর্থনীতিক এবং ভাবাদর্শগত জীবনে সেগুলোর ভূমিকা, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, এইসব নির্দেশক অনুসারে দেখলে, উপর-তলার মোগলরা হিন্দু ভূস্বামী অংশগুলোর সাকল্যের সমকক্ষ ছিল না, কিন্তু দেড়-শ' বছরের বেশি কাল ধরে তারা একচ্ছত্র ছিল তাদের অধিকতর সম-সংযোগ, কেন্দ্রীকরণ এবং সামরিক-রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপের কারণে। তাই স্থানীয় হিন্দু ভূস্বামীদের স্বার্থের অনুযায়ী সামন্ততান্ত্রিক ধারাগুলো দীর্ঘকাল যাবৎ বাস্তবে রূপায়িত হয় নি, আর সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামে তদনুযায়ী বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটতে দেরি হয়।

কোন দেশের আর্থনীতিক, রাজনীতিক এবং ভাবাদর্শগত জীবনে মেহনতী শ্রেণীগুলির ভূমিকাও স্থির করা চলে না সেগুলির শুধু সাংখ্যিক অনুপাত দিয়ে। কোন উচ্চতর উৎপাদন-প্রণালীতে পুনরুৎপাদনের এবং উৎপাদকদের যেসব টেকনিকাল সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় সেগুলোর বাবত বেড়ে-চলা পরিব্যয়ের ফলে কোন সেকেলে ক্ষেত্র থেকে ইতিহাসক্রমে উন্নত ক্ষেত্রে উত্তরণের মধ্যে মনুষ্যশক্তির পরিমাণ সীমিত হয়েই পড়তে থাকে (উৎপাদী সঞ্চয়নের কোন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের অবস্থায়)। বিভিন্ন ক্ষেত্রের পৃথক-পৃথক উৎপাদকদের শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্রিয়াফলও হয় ঐ একই রকমের। কিন্তু যারা অধিকতর উৎপাদী কাজে নিযুক্ত তারা অধিকতর সমসংযোগ, উন্নততর সাংস্কৃতিক মান, অধিকতর সতেজ ক্রিয়াকলাপ এবং অন্যান্য গুণীয় শ্রেষ্ঠতার সাহায্যে পুষিয়ে নিতে পারে তাদের অপেক্ষাকৃত সংখ্যাল্পতাটাকে। এদিক থেকে দেখলে, অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধান রয়েছে আধুনিক প্রলেতারিয়ান এবং প্যাট্রিয়ার্ক'ল আপকেওয়াস্তে অর্থনীতির মেহনতীজনের মধ্যে, এই দুয়ের মধ্যবর্তী হয়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন এবং সামাজিক মানের একগুচ্ছ ধারার মেহনতী মানুষ। অভ্যন্তরীণ কাঠামে আলোচ্য ক্ষেত্রের স্থান সম্বন্ধে কোন সংজ্ঞার্থের বেলায় এই বিষয়টাও প্রাসঙ্গিক।

উৎপাদন-প্রণালী থেকে উদ্ভূত বণ্টনব্যবস্থার নির্দেশক। – অন্তঃজাত এবং আন্তর্জাতীয় শ্রমবিভাগ সম্বন্ধে এবং এই দুয়ের সাহায্যে সঞ্চয়ন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিবেচনা করতে গিয়ে আমি চলেছি এই উপস্থাপনা অনুসারে: 'তখন মানব-জীবনের পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার এবং মানুষে-মানুষে স্থাপিত সম্পর্কের ইতিহাসনির্দিষ্ট বিশেষ-বিশেষ সামাজিক আকারের অনুযায়ী হয় এবং সেগুলো থেকে উদ্ভূত

হয় যেটাকে বলা হয় বণ্টন-সম্পর্ক।'* তারপর মার্কস পুঁজিতান্ত্রিক বণ্টনটাকে স্পষ্ট করে তুলে অন্যান্য, প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক আকারের বণ্টন থেকে সেটার পার্থক্য দেখিয়েছেন, ঐ যেসব আকারের বণ্টন দূর হয়ে যায় উৎপাদনের প্রতিষঙ্গী আকারের সঙ্গেই শুধু,** অর্থাৎ বিভিন্ন উৎপাদন-প্রণালীর কোন একটা নির্দিষ্ট সাকল্য থেকে পয়দা হয় বণ্টনের বিভিন্ন আকারের তদনুযায়ী একটা সমষ্টি। এশিয়ার সমাজগুলিতে বণ্টনব্যবস্থা নানা রকমের—এটা হল ঐসব সমাজে সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামগুলির অসাধারণ জটিলতা এবং বিশেষত্বের অনুযায়ী। পুনর্বণ্টনের এই মিশ্র ব্যবস্থাটা যেটার উপরে চেপে বসে প্রভাবিত করেছিল সেটা ছিল সামাজিক শ্রমবিভাগের খাতে উৎপাদ পরিচলনের আরও জটিল ব্যবস্থা, যাতে পরস্পরবিরোধী ধরনে সংযুক্ত হয়েছিল এবং অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল অণু-অঞ্চলের (যজমানি ধরনের ইউনিট, গ্রাম-সম্প্রদায়, গ্রামীণ পাড়া) চৌহদ্দির ভিতরে উৎপাদের পরিচলন-পরিধি, গড়ে-উঠতে-থাকা দেশজোড়া বাজার, আর শেষে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব বাজার।

ভারতে কারখানা উৎপাদন দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের নানাক্ষেত্রযুক্ত গঠন এবং বিভিন্ন বণ্টন-প্রণালীর মধ্যে পরস্পর-সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল সাতিশয় অসংগতিপূর্ণ। নতুন ধরনের উৎপাদন থেকে পয়দা হয় তদনুযায়ী বণ্টন-প্রণালী, যা বলেছেন এঙ্গেলস: 'বণ্টন-প্রণালী মূলত নির্ভর করে বণ্টন করবার মতো আছে **কতটা** তার উপর, আর... এটা নিশ্চয়ই বদলায় উৎপাদন এবং সামাজিক সংগঠনের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, যাতে বদলাতে পারে বণ্টন-প্রণালীও।'*** পুঁজিতন্ত্রের গড় ধরনের উৎপাদন-ইউনিটে (কারখানা) উৎপন্ন জিনিসের পরিমাণ নিশ্চয়ই চিরাগত উৎপাদনের পরিমাণের চেয়ে হাজারগুণ বেশি। তাই ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলির রাজস্ব-ব্যবস্থার জায়গায় মোটামুটি দ্রুত বৃটিশ রাজের ট্রেজারি এসে পড়বার পাশাপাশি ক্রমে গড়ে উঠেছিল পুনর্বণ্টনের পুঁজিতান্ত্রিক কর্ম-বন্দেজ (ব্যাঙ্ক, এজেন্সি হাউস, সওদাগরী কোম্পানি, ইত্যাদি)। এইভাবে উৎপাদনের নতুন নানাক্ষেত্রযুক্ত

প্রকৃতিটা প্রকাশ পেয়েছিল এবং চালিত হয়েছিল পণ্য-অর্থ পরিচলন-ক্ষেত্রের নানাক্ষেত্রযুক্ত এবং বিশেষ-নির্দিষ্ট প্রকৃতির মাঝে (যদিও ভারতের পরিবেশে পণ্য-অর্থ পরিচলন ছিল পুনর্বণ্টনের সমগ্র ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি সংকীর্ণ)।

পণ্যসমূহের প্রধান অংশটা ছিল নানাধর্মী, সেটা জাতদ্রব্যগুলোর পরিধির দিক থেকেই শুধু নয় (তা তো অনিবার্য), অধিকন্তু তার বিভিন্ন অংশ যে-পরিবেশে উৎপন্ন সেদিক থেকেও, আর তার মানে, তুলনীয় দামের বিভিন্ন পণ্যে নিহিত লাভের পরিমাণ আর হারের দিক থেকেও এই তথ্যটা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে পরিচলন-এলাকার নানাক্ষেত্রযুক্ত গঠনের পরিণতি। তদনুসারে, উৎপত্তি আর প্রয়োগের দিক থেকে বিভিন্ন হয় ঋণের পুঁজি, আর সেটা প্রকাশ পায় সুদের হারের, ক্রেডিটের শর্তের নানাত্বে এবং যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ – কী পরিমাণে সেটা উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং নতুন প্রযুক্তি-গত ভিত্তিতে উৎপাদন পুনঃসংগঠিত করতে সক্ষম সেটাতে। এটা ঠিকই যে, পরিচলনের এলাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সীমারেখা যেন খয়ে যায়, সেটা উৎপাদনের এলাকায় যতটা তত সুস্পষ্ট নয় (যেমন, ক্ষুদ্রায়তন-পণ্য উৎপাদনের এবং গোড়ার দিককার পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে ব্যাপারিক পুঁজি আর চোটার পুঁজির ক্রিয়াকলাপ)। তবু উৎপাদনের সঙ্গে সংস্রবের আকার আর পরিবেশের মতো মানদণ্ড ব্যবহার করলে বেশ স্পষ্ট আন্তঃক্ষেত্র নির্দেশক পাওয়া যায়।

পরিচলন-এলাকায় পুঁজির সচলতা, অমুক কিংবা অমুক ক্ষেত্রের দিকে পুঁজির 'ঝোঁক', পুঁজির উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট হবার পরিসর আর পরিবেশ – এইসব দিয়ে নানাক্ষেত্রযুক্ত গঠনের বিভিন্ন অনুপাত আর গতিশীলতা আগেভাগে নির্দিষ্ট হয়ে যায় অনেকাংশে। এখানে, খোদ পরিচলন-এলাকার পুঁজি অমুক কিংবা অমুক ধরনের পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অন্য একটা গুণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে, এইভাবে রূপায়িত হয় পুনর্বণ্টনের নতুন একটা পুঁজিতান্ত্রিক নীতি। এটা তো বোঝাই যায়, কেননা – যা মার্কস লক্ষ্য করেছেন – প্রধানত উপযোগ-মূল্য পয়দা করাই ছিল প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্য, আর তার থেকে বোঝায় দুটো জিনিস: 'একদিকে এই যে, তখনও উৎপাদনের উপর পরিচলনের আয়ত্তি কায়েম হয় নি, সেটা উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন একটা নির্দিষ্ট পূর্বশর্তের সঙ্গে যেমনটা

হয়। অন্য দিকে এই যে, উৎপাদনের স্রেফ একটা পর্ব হিসেবে পরিচলন তখনও উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত হয় নি। কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে হয় দুইই।'*

মার্কস আরও বলেছেন, বিভিন্ন প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর অবস্থায় ব্যাপারিক পুঁজি আত্মসাৎ করে উদ্বৃত্ত-উৎপাদের সবচেয়ে বড় অংশটা, সেটা অংশত বিভিন্ন লোকসমাজের মধ্যে দালাল হিসেবে; যেসব লোকসমাজ তখনও উৎপাদন করত যথেষ্ট পরিমাণে উপযোগ-মূল্যের জন্যে, আর উৎপাদের যে-অংশ পরিচলনে পড়ে সেটা, কিংবা তার সঙ্গে যতখানি সংশ্লিষ্ট তাতে যেকোন পরিমাণ উৎপাদন সমমূল্যে বিক্রি করা যেগুলির আর্থনীতিক সংগঠনের পক্ষে গৌণ গুরুত্বসম্পন্ন ছিল; আর অংশত, যেহেতু গোড়ার দিককার ঐসব উৎপাদন-প্রণালীর অবস্থায় উদ্বৃত্ত-উৎপাদের যেসব প্রধান-প্রধান মালিকের সঙ্গে বণিকের কারবার চলত – যথা দাস-মালিক, সামন্ত মনিব এবং রাষ্ট্র (যেমন প্রাচ্যের স্বৈরশাসক) – তারা ছিল বণিক যেসব ব্যবহারযোগ্য সম্পদ আর বিলাস-দ্রব্য একায়ত্ত করতে চাইত সেগুলোর প্রতিনিধিস্থানীয়...'** কাজেই প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে ব্যবহার্য সম্পদ মূর্ত হয় প্রধানত সেইসব সামাজিক স্তর দিয়ে যারা উদ্বৃত্ত-উৎপাদ পয়দা করা এবং পরিচলনের প্রক্রিয়ায় একটা আবশ্যক উপাদান হিসেবে শামিল না হয়ে সেটা আদায় নেয়। এই পরিবেশে ব্যাপারিক পুঁজি দালালের কাজ করে, সেটা ততটা নয় উৎপাদনের বিভিন্ন এলাকা আর ধরনের মধ্যে, যতটা কিনা উৎপাদনের এইসব এলাকা থেকে সরিয়ে-নেওয়া উদ্বৃত্ত-উৎপাদের মস্ত-মস্ত মজুদের বিভিন্ন মালিকদের মধ্যে। এই কারণেই ব্যাপারিক পুঁজি সাধারণত বণ্টনব্যবস্থার নিম্নতর ধাপগুলোতে ঢুকে না, জড়ো হয় উচ্চতর ধাপগুলোতে। পুনরুৎপাদনের উপাদানগুলো সমেত আবশ্যক উৎপাদের (কথাটার বিস্তীর্ণ অর্থে) পুনর্বণ্টন ঘটে সরাসর জীবনীয় বস্তুর ব্যবহার, বিনিময় আর পারিতোষিকের ভিত্তিতে। ক্ষুদ্রায়তনের আপকেওয়াস্তে উৎপাদনে সুদখোরদের ঢুকে পড়ার ব্যাপারটাকে স্বভাবতই তুচ্ছ করা হল।

বিন্যাস-সংগঠক ক্ষেত্রের সামাজিক-আর্থনীতিক নির্দেশকগুলি সম্বন্ধে এই যুক্তিধারার সংক্ষিপ্তসার হিসেবে যেগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা আপাতত দেখা যাচ্ছে এই রকমের: উচ্চতর মাত্রার টেকনিকাল সরঞ্জাম, শ্রমের সংগঠন এবং তদনুযায়ী তার উৎপাদনশীলতা; উদ্বৃত্ত-উৎপাদের প্রধান অংশটার উৎপাদন (এই এলাকায়): পুনর্বণ্টনব্যবস্থার উচ্চতর কেন্দ্রীকারক ধাপগুলিতে এই উৎপাদের গরিষ্ঠ পরিমাণের চালান; সবচেয়ে নিখুঁত ধরনের বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যে, অস্ত্রশস্ত্রে এবং – যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ – উৎপাদনের উপকরণে সেটার মূর্তায়ন; সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের দেশজোড়া প্রক্রিয়াগুলোর উপর, অর্থাৎ সঞ্চয়নের উপর এই ক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত-উৎপাদের উৎপাদীভাবে ব্যবহৃত অংশের নিয়ন্ত্রক প্রভাব (শেষের নির্দেশকটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য কারখানা ক্ষেত্রের বেলায়); শাসক শ্রেণীগুলি, উপরকাঠামের প্রতিষ্ঠানাদির কর্মিদল এবং নিগ্রহ আর ভাবাদর্শগত প্রভাবের কর্মযন্ত্র চালু রাখার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উৎপাদের প্রধান ভূমিকা; যার থেকে দেখা দেয় চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ – সর্বোপরি শ্রম – প্রচেষ্টার প্রাবল্য এবং বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধায় দাবির পরিমাণ সেই চিরাগত ভাবাদর্শ আর সামাজিক নৈতিকতায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাধান্যশালী শ্রেণীর ভাবাদর্শের ভূমিকা।

নানাক্ষেত্রযুক্ত গঠনের অবস্থায় সামাজিক সত্ত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি প্রসঙ্গে। – উপরে সামাজিক-আর্থনীতিক নির্দেশকগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে সেগুলির গুণীয় দিকের উপর জোর দিয়ে। তবে মাত্রিক উপাদানগুলো নিয়েও বিচার-বিবেচনা না করলে চলে না; বিপুল জাড্যের ফলে এইসব উপাদান নতুন-নতুন ইতিহাসক্রমিক বিচলনে গতিমাত্রা আর তেজের দিক থেকে প্রতিষঙ্গী 'সংশোধনী' ঢুকিয়ে দেয়, সেটা হয় প্রধানত ব্যাঘাত এবং অনেক সময়ে পশ্চাদ্‌গতি। এইভাবে, কোন-একটা বিন্যাস-সংগঠক ক্ষেত্রের (এটা উল্লিখিত এবং অন্যান্য নির্দেশকের অনুযায়ী হলেও) পরিস্থিতি স্থির করতে সহায়ক নির্ণায়কগুলোর মধ্যে আছে এইসব: বিভিন্ন উৎপাদন-প্রণালীতে মেহনতী মানুষের বণ্টন; প্রতিষঙ্গী বিভিন্ন গ্রুপ, বিভাগ আর ব্যক্তির জীবনযাত্রার পরিবেশ; পরিবেশ সম্বন্ধে তাদের উপলব্ধি, – সেটাকে তারা মনে করতে পারে মাফিকসই, কিংবা – তার উলটোটা – বৈষয়িক আর ভাবজাগতিক সুযোগ-সুবিধার আবশ্যক সাফল্য সম্বন্ধে তাদের বদ্ধমূল ধারণার বিপরীত।

প্রধান-প্রধান ক্ষেত্রের শাসক শ্রেণীগুলি নিশ্চয় করে বলে, সামাজিক সত্ত্ব উপলব্ধি করতে এবং তার ব্যাখ্যা দিতে পারে তারাই। স্বভাবতই, নিজেদের ভাবাদর্শগত ধারণা তারা চাপিয়ে দিতে চায় 'তাদের নিজ-নিজ ক্ষেত্রের' মেহনতী জনসাধারণের উপর: দাসদের উপর দাস-মালিকেরা, ভূমিদাসদের উপর সামন্ত মনিবেরা, প্রলেতারিয়ানদের উপর বুর্জোয়ারা। তার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রক ক্ষেত্রের শাসক শ্রেণী সাধারণত নিজ ভাবাদর্শের বশীভূত করতে চায় সমগ্র সমাজকে, এই ভাবাদর্শকে তারা হাজির করে সর্বজনীন, 'সমগ্র-জাতীয়', ইত্যাদি হিসেবে। ভারতে জনসমষ্টির মেহনতী অংশগুলির মধ্যে শাসক শ্রেণীর নিজ ভাবাদর্শ গেড়ে দেবার চেষ্টার বিশেষত্ব ছিল কয়েকটা।

মধ্যযুগের শেষের দিককার ভারতের ক্ষেত্রগত গঠন সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ চলছে এখনও – ইতোমধ্যে বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে কোন-কোন অঞ্চলে যা ছিল ক্ষেত্রগত বিন্যাস সেই দাস-মালিকানার এবং গোষ্ঠীতান্ত্রিক সম্পর্কের বেশকিছু অবশেষ থেকে গিয়েছিল প্রাধান্যশালী সামন্ততান্ত্রিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি। এটাও স্পষ্ট যে, (কিছু-কিছু টুকরো-টাকরা পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্র সমেত) ক্ষুদ্রায়তন-পণ্য ক্ষেত্রের বিভিন্ন উপাদানও ছিল – প্রধানত শহরের হস্তশিল্পে। আসলে, ভারতীয় সামন্ততন্ত্র আপনিই ছিল বহুমূর্তি। ভারতের মেহনতী জনসাধারণের সামাজিক সত্ত্বের পরি-বেশে এবং তাদের বৈষয়িক আর মানস সংস্কৃতির মাত্রায় অসাধারণ নানাত্ব সৃষ্টি হয়েছিল ঐ সবকিছুর ফলে।

জীবনযাত্রার ভিন্ন-ভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন মেহনতী অংশ পাশাপাশি ছিল দীর্ঘ ঐতিহাসিক কালপর্যায়ে, হয়ত তার ফলে দেখা দিয়েছিল এমন পরিস্থিতি, যাতে সামাজিক নৈতিকতার নানাত্ব থেকে উদ্ভূত হয়েছিল হিন্দু ধর্মের জাত-বর্ণগত নিয়ম-বিধির মতো সেটার কঠোর ধর্মীয় নিশ্চলতা, যাতে অবশ্য চলত বিভিন্ন ব্যাখ্যা, সম্প্রদায়গত প্রবণতা আর দার্শনিক ধারা। সেটা যা-ই হোক, একদিকে হিন্দু ধর্ম, আর অন্য দিকে ইহুদী ধর্ম, খৃস্ট ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে দুটো সুস্পষ্ট পার্থ-ক্যের ঐতিহাসিক-সমাজবিদ্যাগত ব্যাখ্যা প্রয়োজন: সামাজিক আচরণবিধি এবং অপরিহার্য বিষয়গুলিতে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের খোলাখুলি এবং সরাসরি বিধিবদ্ধকরণ (খাবার, পোষাক-পরিচ্ছদ), আর অনুগামীদের মধ্যে ভাবাদর্শগত নানাত্ব সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা।

বৃটিশ দখলের পরে ভারতে শুরু হয় যেসব সামাজিক-আর্থনীতিক প্রক্রিয়া – বিশেষত ক্ষুদ্রায়তন-পণ্য ক্ষেত্রের প্রসার এবং পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্রের সূত্রপাত – তার ফলে সত্ত্ব আর চৈতন্যের দ্বিধাবিভক্তি ঘটে আরও বেশি পরিমাণে। প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় কৃষক কিংবা কারিগর দৈনন্দিন জীবনে সামগ্রী সংগ্রহ করত কিংবা – তার উলটোটা – হস্তান্তরিত করত সাক্ষাৎ এবং বোধগম্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের কর্ম-বন্দেজ মারফতই শুধু নয়, তাছাড়া পণ্য-বিনিময়ের উপায়েও, তাতে তার সামনে পড়ত 'পণ্যের সমগ্র রহস্য, শ্রমফল যখন পণ্যের আকার ধারণ করে তখন সেটাকে ঘিরে-থাকা যাবতীয় জাদু আর ইন্দ্রজাল'।* এদিক থেকে দেখলে, বৃটিশ শাসন ভারতীয় মেহনতীজনের সামনে হাজির করল দ্বিধাবিভক্ত দৃশ্য: ব্যক্তিগত – খুবই সুপরিচিত কর-আদায়কারী রূপে, যে তার জাতদ্রব্যের একাংশ আত্মসাৎ করে, আর রহস্যময় – অজ্ঞাত পরিবেশে অজ্ঞাত পরিব্যয়ে অজ্ঞাত মেহনতীজনের পয়দা-করা জাতদ্রব্যের বিমূর্ত মালিক হিসেবে।

ইউরোপে পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্যায়ে খৃস্ট ধর্মে সামাজিক চৈতন্যের দ্বৈত প্রকৃতিতে স্ববিরোধী হলেও কমবেশি পর্যাপ্ত ভাবাদর্শগত মর্মবস্তু জুটেছিল বুর্জোয়া রিফর্মেশনের সময়ে। কিন্তু ভারতের দুটি বিরাট ধর্মের কোনটাই বুর্জোয়া রিফর্মেশনের প্রারম্ভিক পর্বগুলির ভিতর দিয়েও চলে নি কখনও। (এটা লক্ষণীয় যে, ভারতে এমনকি খৃস্ট ধর্মেও বিভিন্ন প্রাক্‌রিফর্মেশন আকার বজায় থেকেছে।) অধিকন্তু, পূর্ণাঙ্গ সামন্ততন্ত্রের ভাবাদর্শ হিসেবে হিন্দু ধর্মের পরিপক্বতা সন্দেহাতীত নয়। জৈন ধর্ম, শিখদের ধর্মমত এবং নেস্তরিয়ান খৃস্ট ধর্ম সামাজিক এবং ভৌগোলিক দিক থেকে স্থানে-স্থানে সীমাবদ্ধ ভাবাদর্শ হয়ে থেকে গেছে; বুর্জোয়া রিফর্মেশনের জন্যে এগুলি আদৌ প্রস্তুত কিনা সেটা মোটেই প্রমাণিত হয় নি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ ভারতে এমন কোন শ্রেণী কিংবা বড় সামাজিক বর্গ ছিল না, যেটার ছিল এমন কোন উন্নত ভাবাদর্শ যাতে সমন্বিত হয় সেই শ্রেণীর কিংবা সেই বৃহত্তম সামাজিক বর্গের দাবিগুলি এবং সমগ্র-জাতীয় স্বার্থ।

কার্যত, দেশটিতে বিদ্যমান সমস্ত ভাবাদর্শ মূলত প্রতিপন্ন করেছে

উৎপাদ পুনর্বণ্টনের বিদ্যমান ব্যবস্থাটাকে, সেটাকে অদলবদল করতে চেষ্টা করেছে শুধু বিশেষ-বিশেষ পরিস্থিতিতে। সেই কারণেই বিভিন্ন সামাজিক বর্গের ভারতীয়দের ভোগ-ব্যবহারের চাহিদাগুলির এবং তার সঙ্গে জীবনযাত্রা-প্রণালীরই নিয়মন সবসময়ে ভারতের চিরাচরিত ভাবাদর্শগুলির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে, নিয়মন-ব্যবস্থার মধ্যে – তালিকার শীর্ষে – ছিল বিভিন্ন ভাবাদর্শের (হিন্দু ধর্ম, ইসলাম, ইত্যাদির) বাহক আর ধারকদের ভরণ-পোষণ বাবত দেওন; এর ফলে প্রবলতর হত তাদের সামাজিক রক্ষণশীলতা এবং চিরাচরিত প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদির প্রতি তাদের আনুগত্য।

যখন সুতীব্র সামাজিক বিরোধগুলো ইতোমধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল ঢুকতে-থাকা পুঁজিতন্ত্রের মাধ্যমে সেই নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে চিরাগত ধর্মীয় চৈতন্য হতে পেরেছে বিভিন্ন জায়মান ব্যাপার আর প্রক্রিয়ায় রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিই শুধু। তার সঙ্গে সঙ্গে, কমবেশি 'অবিমিশ্র' আকারের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সমেত কোন একটা সংকীর্ণ-শ্রেণীগত লোকায়ত ভাবাদর্শ ধর্মীয় ভাবাদর্শের স্থানাপন্ন হতে পারে নি জনসমষ্টির অধিকাংশের 'চালু' দৈনন্দিন ভাবাদর্শ হিসেবে। সারা দেশের গ্রহণযোগ্য আর স্বীকার হতে পারার দাবিদার হিসেবে গান্ধীবাদের উদ্ভব এই পরিস্থিতিতে দেখা যায় স্বাভাবিকই ছিল। এখানে এটা উল্লেখযোগ্য যে, এমন ভাবাদর্শের অপেক্ষাকৃত দুর্বল দিকগুলো – অস্পষ্টতা, সারগ্রাহিতা (একলেক্টিসিজম), শ্রেণীবিরোধ সম্বন্ধে উপেক্ষা – কিছুকালের জন্যে সেটার সবচেয়ে বলিষ্ঠ দিক বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল, তাই সেটার সামাজিক-আর্থনীতিক কর্মসূচি স্বীকৃত-গৃহীত হয়েছিল ব্যাপকভাবে – অন্তত স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের পর্বে।

প্রগতির জন্যে প্রবর্তনার সর্বাত্মক এবং আবশ্যিক প্রকৃতি। – ভাবাদর্শগত জীবনে যে-পরিস্থিতিতে প্রধান ক্ষেত্রটা কতকগুলো নির্দেশক অনুসারে বিন্যাস-সংগঠক হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু তখনও জনসমষ্টির প্রধান অংশটাকে কাজ দিতে পারে না, অর্থাৎ সামাজিক কাঠামে তখনও প্রাধান্যশালী হয়ে ওঠে নি, তখন সেই পরিস্থিতির বিষয়গতভাবে অসংগতিপূর্ণ প্রকৃতিটা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এইরকমের পরিস্থিতিতে জবরদস্তিমূলক ভাবাদর্শগত সম্প্রসারণ অনেক সময়ে এমন একটা অর্থনীতি-বহির্ভূত লগুড়ের মতো কাজ দেয় যেটা ব্যবহৃত হয় কোন

সাবেকী ক্ষেত্রের সামাজিক এলাকাটাকে দখল করার জন্যে (যেমন, সামন্ততান্ত্রিক কিংবা সামন্ততান্ত্রিক বনে-যাওয়া অভিজাতকুল কর্তৃক প্যাট্রিয়ার্কাল কৃষককুলকে খৃস্ট ধর্মে কিংবা ইসলামে ধর্মান্তরীকরণ)। এমনসব পরিস্থিতিতে সাবেকী ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ অংশগুলো প্রায়ই 'সুপ্রাচীন ধর্মমত' আর চিরাগত প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদির পতাকী হয়ে দাঁড়ায়, — সেগুলো বিনষ্ট হলে সামাজিক উৎপাদের পুনর্বণ্টন নিয়ন্ত্রণের অবস্থান থেকে তারা অপসারিত হয়, খোয়া যায় তাদের অভ্যস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠা।

সামাজিক-আর্থনীতিক গঠন এবং সেটার কার্মিক পরস্পর-সম্বন্ধ উপলব্ধির ব্যাপারে সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পূর্বনির্ধারিত হয় ঐতিহাসিক প্রগতি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত যৌগিক মার্কসবাদী বিবেচনাধারা। এই প্রসঙ্গে দেখা দেয় এমন একটা পরিস্থিতি-সংক্রান্ত প্রশ্ন যেটাকে মার্কসবাদী রচনায় বলা হয় 'বিন্যাস-লম্ফন', অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সামাজিক-আর্থনীতিক গঠনের সমস্ত মূল উপাদানের ইতিহাসক্রমে নতুন গুণীয় সত্তায় সর্বাত্মক উত্তরণ। এই উত্তরণের ব্যতিক্রমহীন দিকটার উপর জোর দেওয়াটা অবশ্যপ্রয়োজনীয়, কেননা লম্ফন সম্বন্ধে কোন-কোন বুর্জোয়া ধারণায় এটার মর্মবস্তুকে পর্যবসিত করা হয় টেকনিকাল-যুক্ত-উৎপাদন টেক-অফ্-এ (যা করেন ওয়াল্ট রস্টাও) কিংবা অন্য কোন একপেশে পরিবর্তনে।

মার্কসবাদীদের মতে, কোন বিন্যাস-লম্ফন নিয়মানুগামী হয় যখন সেটার আগে বিভিন্ন সংকটের অবস্থা জমে ওঠে প্রাধান্যশালী (বিন্যাস-সংগঠক) ক্ষেত্রের মূল উপাদানগুলিতে, অর্থাৎ উৎপাদন-শক্তি, উৎপাদন-সম্পর্ক, সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি, ভাবাদর্শগত ধারণা, সাংস্কৃতিক মূল্যবস্তু, ইত্যাদিতে। কিন্তু এমন রাশীকরণে অপরিহার্যতা থেকে এমনটা বোঝায় না যে, রূপান্তরসাধক প্রক্রিয়াটা শুরু হয় যুগপৎ, আর একই গতিমাত্রায় এবং সমান প্রগাঢ়তায় চলে সমাজ-জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে। বিন্যাস-পরিবর্তনে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার এই অসমতার ফলে দেখা দেয় কোন-কোন অসামঞ্জস্য, এমনকি বিকৃতি, যেগুলো হল ইতিহাসের 'প্রসব-বেদনা'।

প্রগতির জন্যে সাধারণ এবং অবিরাম-সক্রিয় উদ্দীপক সম্বন্ধে মার্কসবাদী বিবেচনাধারা গনার মির্ডালের পেশ করা 'মূল্যায়ন-ব্যবস্থা'

(valuations) থেকে খুবই পৃথক, তার কারণটা ঠিক এই যে, বাছা-বাছা নির্ণায়কের বদলে বিভিন্ন বিষয়গত এবং অদম্য-সক্রিয় কারক-উপাদান থেকে শুরু করে এই বিবেচনাধারা। এইসব কারক-উপাদানের বিশেষ-নির্দিষ্ট, জাতীয়-আঞ্চলিক আর সাধারণ, পৃথিবীজোড়া অভিব্যক্তির মাঝে সেগুলোর মধ্যে সম্পর্কটা প্রতিপাদন করাই আন্তর্জাতিকতামনা মার্কসবাদীদের পক্ষে প্রশ্নটার কঠিন দিকটা। এ ব্যাপারে আমরা চলি লেনিনের এই সূত্রটা অনুসারে: '...আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা সেগুলিকে বোঝা যেতে পারে শুধু যদি আমরা প্রথমত বিশ্লেষণ করি এক-যুগ থেকে যুগান্তরে উত্তরণের বিষয়-গত পরিবেশটাকে। আমাদের সামনে রয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যুগ; সেগুলির প্রত্যেকটাতে আছে এবং সর্বদা থাকবে বিভিন্ন পৃথক-পৃথক এবং আংশিক বিচলন, কখনও সামনের দিকে কখনও পিছনে, বিচলনের গড় ধরন আর মধ্যক গতিমাত্রা থেকে বিভিন্ন বিচ্যুতি আছে এবং সর্বদা থাকবে... কোন একটা যুগের মূল উপাদানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানই শুধু হতে পারে কোন-না-কোন দেশের বিশেষত্বগুলি বোঝার ভিত্তি।'*

এইভাবে, গোটা একগুচ্ছ অভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থ অপরিহার্য সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার আবশ্যকতার দরুন মার্কসবাদী ইতিহাসকারের পক্ষে প্রারম্ভিক ধারণাগত অবস্থানটা সাতিশয় জটিল এবং কঠিন হয়ে ওঠে। ভ. ই. লেনিন বলেন, 'সংশ্লিষ্ট যুগের মূল উপাদানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান' হল মূর্ত-নির্দিষ্ট ধরনে জাতীয় পরিস্থিতি বোঝার আরম্ভস্থল। আমরা মনে করি, ভারতের উন্নয়নের সামাজিক-আর্থনীতিক মাত্রা এবং সেই মাত্রার উপর ব্রিটিশ দখলের প্রভাব নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি যোগাচ্ছে এই সূত্রটি। প্রকৃতপক্ষে, আঠার আর উনিশ শতকের বাঁকে 'কোন একটা যুগের মূল উপাদানগুলি' থেকে শুরু করা হলে ঐতিহাসিক প্রগতির মানদণ্ড হিসেবে তুলে ধরা যায় শুধু শিল্প-বিপ্লব-কেই, অর্থাৎ কায়িক উৎপাদন-প্রণালী থেকে যন্ত্রযোজিত উৎপাদন-প্রণালীতে উত্তরণ। তার সঙ্গে সঙ্গে, শুধু পৃথিবীজোড়া শিল্প-বিপ্লবকেই যদি অমুক কিংবা অমুক দেশের বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক প্রক্রিয়ার

'বিশেষত্বগুলি বোঝার' ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় তাহলে, লেনিন যা বলেছেন তদনুসারে, ভারতে বৃটিশ পুঁজিতন্ত্রের ক্রিয়াফল সম্বন্ধে মূল্যায়নটা হয়ে দাঁড়াবে জটিল এবং পরোক্ষ।

নানাক্ষেত্রযুক্ত গঠনের অন্যতম উপাদান হিসেবে পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্র। — লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন, পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভব ঘটল ঠিক কোথায় এবং কিভাবে সেটা বের করাই পুঁজিতন্ত্রের উৎপত্তি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্য।* তাই ভারতের প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে ভেবে দেখা দরকার সেগুলি কী রকমের সামাজিক সম্পর্কতন্ত্র নিয়ে গঠিত।

মার্কসের বক্তব্য অনুসারে, এমনকি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়েও ভারতে এবং চীনে বৃটিশ ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষয়কর প্রভাবের প্রতিকূলতা করেছিল অভ্যন্তরীণ সুস্থিতি এবং বিভিন্ন জাতীয় উৎপাদন-প্রণালীর প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি।** ভারতে 'এশীয় ধরনের', সামন্ত-তান্ত্রিক কিংবা অন্য কোন একটামাত্র উৎপাদন-প্রণালী সম্বন্ধে মার্কসের পরম এবং অকুণ্ঠ পক্ষপাত ছিল, এই মর্মে বিভিন্ন উক্তির অসারতা সেটা থেকে সপ্রমাণ। ভারতীয় সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিজ উপলব্ধিটাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে মার্কস বলেছেন সেটা নানা-ক্ষেত্রযুক্ত, তাতে অবশ্য সেটার ভিতরে কোন একটা প্রাধান্যশালী বিন্যাস-সংগঠক গঠনের উদ্ভব-সংক্রান্ত প্রশ্নটা দূর হয়ে যায় না।

তেমনি, আধুনিক এবং সমসাময়িক কালের আর্থনীতিক বিচারে পিছিয়ে-পড়া দেশগুলি নিয়ে যাঁরা বিচার-বিশ্লেষণ করেন তাঁদের লেনিনের সুবিন্যাসবিদ্যাগত ধরন প্রয়োগ করা চাই নানাক্ষেত্রযুক্ত সমাজের একটা উপাদান হিসেবে পুঁজিতন্ত্রের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রধানত। প্রাচ্য দেশগুলির পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্রকে অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে পরস্পরক্রিয়ার পটভূমির বাইরে তদবস্থ ধরে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গেলে তার ফলে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের অতিরঞ্জন ঘটে, এটা অনিবার্য, এই সুবিন্যাসবিদ্যাগত ভ্রান্তি এড়াতে একমাত্র সহায় হল লেনিনের ঐ ধরনটা। প্রথমেই স্থির করা চাই বিভিন্ন প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্র এবং পুঁজিতন্ত্রের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন

টুকরোটাকরা থেকে শুরু করে অন্যান্য ক্ষেত্র এবং পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্রের মধ্যে পরস্পর-ক্রিয়ার প্রকৃতিটা। বিভিন্ন বিচার্য প্রশ্নের মধ্যে আছে এইগুলি: এইসব টুকরোটাকরা কি গোড়ায় দেখা দেয় সামন্ততান্ত্রিক খাজনা পুনর্বণ্টন প্রক্রিয়ার মধ্যে? এমনটা হতে পারে কি যে, যাদের জন্যে তৈরি হত বিলাসদ্রব্য আর অস্ত্রশস্ত্র সেই খাজনা-প্রাপ্তারাই ছিল জায়মান বিচ্ছিন্ন পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের টুকরোটাকরা ক্ষেত্রগুলিতে উৎপন্ন জিনিসপত্রের প্রথম-প্রথম ব্যবহারক?

বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে এড়ান যায় না এইসব প্রশ্নও: পুঁজিতান্ত্রিক প্রণালীতে উৎপন্ন পণ্য রপ্তানি হত কোথায়, আর বৈদেশিক বাজারে সেগুলোর ব্যবহারক ছিল কারা? মনে হয়, বহির্বাণিজ্যের বেলায়ও এমনসব পণ্যের প্রধান ব্যবহারক ছিল সামন্ত মনিবেরা, তারা বৈদেশিক হলেও। এটা স্থির করাও সমানই গুরুত্বসম্পন্ন: গ্রামাঞ্চলের জনসমষ্টির সঙ্গে স্বতন্ত্র পণ্য-অর্থ সম্পর্কের ভিত্তিতে সেটার জন্যে ভোগ্যপণ্যের পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন আরম্ভ হয়েছিল কখন্, যাতে খাজনা-প্রাপ্তারা আর ছিল না শহর আর গ্রামের মধ্যে মধ্যস্থ হিসেবে। ভারতে এমন সম্পর্ক পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে নি দীর্ঘকাল যাবৎ।

তারপর দেখা দেয় একদিকে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন এবং অন্য দিকে অন্যান্য ক্ষেত্রে, প্রথমত কৃষকের অর্থনীতিক্ষেত্রে পুনরুৎপাদনের মধ্যে সম্পর্কের বৃদ্ধি আর প্রসার সংক্রান্ত প্রশ্ন। যেমন, কোথায় তৈরি হত কৃষিকাজের সরঞ্জাম? এই প্রশ্নটার উত্তর না থাকলে পুঁজিতান্ত্রিক ভিত্তিতে দেশজোড়া সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন-সংক্রান্ত প্রশ্ন, বিশেষত কৃষির টেকনিকাল পুনর্গঠন-সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। পুঁজিতান্ত্রিক আর প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্কের দ্বিতীয় ধারাটা গেছে সঞ্চয়নের এলাকার ভিতর দিয়ে, এটা পুঁজিতন্ত্রের গোড়ার দিককার পর্বে দেখা দেয় জায়মান পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্রের একটা মূল সমস্যা হিসেবে। কৃষকের অর্থনীতির সঙ্গে সরাসর বিনিময়ের সাহায্যে ক্ষুদ্রায়তন-পুঁজিতান্ত্রিক এবং নির্মায়ক শিল্পে সঞ্চয়ন সম্ভব হয় শুধু সেই পর্বে যখন শিল্পে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন শ্রমের উৎপাদনশীলতার দিক থেকে কৃষির চেয়ে এগিয়ে যায়। এই পর্বেই ইতোমধ্যে দেখা দেয় অসমমূল্য বিনিময়-সংক্রান্ত সমস্যাটা; এটা শুধু বাহিঃ-আর্থনীতিক সম্পর্কেরই একটা দিক বলে প্রায়ই বিবেচিত হয়, কিন্তু এটার উদ্ভব ঘটেছিল নিশ্চয়ই

শ্রমের উৎপাদনশীলতার মাত্রা যাতে পৃথক-পৃথক এমন বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বিনিময়-সংক্রান্ত প্রশ্ন হিসেবে, একই জাতির ভিতরে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব-অসংগতি হিসেবে।

সঞ্চয়নের আর্থনীতিক এবং অর্থনীতি-বহির্ভূত প্রণালীর মধ্যে যে-সম্পর্ক পয়দা করে পুঁজিতন্ত্র সেটা আফ্রিকা আর এশিয়ার ঔপনিবেশিক এবং এখনকার দিনের দেশগুলি সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণে বিশেষভাবে আগ্রহজনক, কেননা শিল্পযোজনের পুঁজি সঞ্চয়নের জন্যে কর ছাড়া অন্য কোন, অধিকতর উন্নতিশীল এবং গণতান্ত্রিক উপায় পুঁজিতান্ত্রিক পন্থায় মিলতে পারে কিনা (যেমন, অবাধ বাণিজ্যিক পণ্য-বিনিময়) সেটা ঐসব দেশের মেহনতী জনসাধারণের পক্ষে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

এটা হল বোধ হয় পুঁজিতন্ত্রের উৎপত্তি-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির খুবই সংক্ষিপ্ত বিবরণ; এই উৎপত্তি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গেলে অতীত আর বর্তমান সমস্যাগুলোর মধ্যে সংযোগসাধন মনে হয় স্পষ্টতই আবশ্যক। গবেষণার লক্ষ্যগুলির এইরকমের সন্নিকর্ষের জন্যে চাই একপ্রস্থ সুবিন্যাসবিদ্যাগত প্রণালী, যেটার ভিত্তি হল বিভিন্ন তুলনীয় তথ্য আর উপাত্তের বিশ্লেষণ। যদিও সমসাময়িক পরিসংখ্যান উপাত্ত, নমুনা সমীক্ষা এবং নিজস্ব পর্যবেক্ষণের সাহায্যে যাঁরা কাজ করেন সেই অর্থনীতিবিদ আর সমাজবিজ্ঞানীদের হাতে যেমনটা থাকে পরিমাণ, উৎকর্ষ তার প্রামাণিকতার দিক থেকে তেমন মালমশলা অতীতের আকরগুলি থেকে পাওয়া ইতিহাসকারের পক্ষে সবসময়ে বড় একটা সম্ভব নয়।

তবু, আমি বিচার-বিশ্লেষণ করতে চাই যেসব ব্যাপার, সর্বোপরি পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের পৃথক-পৃথক বিচ্ছিন্ন ছিট-ক্ষেত্র, সেগুলি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে এই রচনায় আমি নির্ভর করেছি সামাজিক শ্রমবিভাগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যেভাবে সেগুলোর পরস্পর-ক্রিয়া ঘটে সেটার উপর প্রধানত। বহু গ্রন্থকার ইতিহাসক্রমিক প্রগতিশীলতার প্রধান নির্ণায়ক হিসেবে ধরেছেন সামাজিক শ্রমবিভাগে উৎপাদনের ভূমিকার বদলে উৎপাদনের সংগঠন আর পরিসরটাকে। এতে প্রত্যেকটা ধরনের উৎপাদনের যথাসম্ভব বেশিসংখ্যক উদাহরণ জড়ো করাটাকে আমি আমার কাজ হিসেবে নিই নি। সামাজিক শ্রমবিভাগে প্রত্যেকটা ধরনের

ভূমিকা আমি সর্বোপরি স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করেছি উৎপাদ আর পণ্য বিনিময় সম্পর্কের সাহায্যে, কেননা খোদ শিল্পোৎপাদনের কাঠামের ভিতরে এবং সমগ্র সামাজিক-আর্থনীতিক গঠনের ভিতরে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সম্বন্ধের পরিসর, পরিবেশ আর গতিশীলতা প্রকাশ করে এই সম্পর্ক। তদনুসারে আমার বিবেচনায়, ঔপনিবেশিক শোষণের, বিশেষত বৈদেশিক পুঁজির প্রতিযোগিতার পরিণতি ততটা নয় পরিচলনের এলাকায় সেগুলোর প্রভাব, যতটা কিনা পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার উপর সেগুলোর ক্রিয়াফল, যাতে বিপর্যস্ত এবং বিকৃত হয় চিরাগত সামাজিক শ্রমবিভাগ।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে ১৮৫৩ সালে মার্কস ভারতের বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্বধর্ম নির্দেশ করেছিলেন – 'যেটাকে বলা হত **গ্রাম সম্প্রদায় ব্যবস্থা,** যেটা এইসব ছোট-ছোট সংঘের প্রত্যেকটাতে এনেছিল স্বতন্ত্র সংগঠন এবং স্পষ্ট-পৃথক জীবন। ...ঐ অসংখ্য পরিশ্রমী প্যাট্রিয়ার্কাল এবং নিরীহ সামাজিক সংগঠন বিশৃঙ্খল হয়ে ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে দুর্দশার সাগরে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির পৃথক-পৃথক সদস্যের প্রাচীন আকারের সভ্যতা এবং জীবনধারণের পুরুষানুক্রমিক উপায় খোয়া যাচ্ছে দেখে সেটা মানুষের অনুভূতিতে নিশ্চয়ই পীড়াদায়ক, কিন্তু এটা ভোলা চলে না যে, এইসব 'রাখালিয়া'-সরল গ্রাম সম্প্রদায়কে দেখতে নিরীহ হলেও সেগুলো বরাবর ছিল প্রাচ্য স্বৈরাচারের পাকা-পোক্ত বনিয়াদ, সেগুলোর মানুষের মানসতাকে সম্ভাব্য সংকীর্ণতম পরিসরে গণ্ডিবদ্ধ ক'রে কুসংস্কারের নিরুপদ্রব হাতিয়ারে পরিণত করত, সেটাকে জুতে দিত চিরাচরিত নিয়ম-বিধির জোয়ালে, কেড়ে নিত সেটার সমস্ত মহিমা আর ঐতিহাসিক তেজ।'*

এইভাবে, মার্কস যা বলেছেন, চিরাগত গ্রাম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠান থেকে বিকীর্ণ হয় বিবিধ এবং ভিন্ন-ভিন্নমুখো কিন্তু সমানই সংরক্ষণ-পরায়ণ একগুচ্ছ আবেগ, তার কিছু-কিছু নিম্নাভিমুখী হয়ে গড়ে তোলে ইতিহাসনির্দিষ্ট এমন ব্যক্তি-মানুষকে, যার থাকে না সৃজনী ক্ষমতা, আর ঊর্ধ্বমুখো অন্য কিছু-কিছু হয় প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের মহা-সংস্থাটার অবলম্বন। প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের আমলে পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়ন অসম্ভব

ছিল, এই মর্মে এঙ্গেলসের কথাটা স্মরণ করলে আমাদের সামনে এসে পড়ে এশীয় সমাজে বদ্ধতা আর মন্দন সংক্রান্ত প্রশ্নে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয়ের আরম্ভস্থলের যৌগিক বিবেচনাধারা।

মার্কসের সংশ্লিষ্ট রচনাংশটি আকারে কাব্যধর্মী, মর্মবস্তুতে বৈজ্ঞানিক, সেটাকে এখনকার দিনের সমাজবিদ্যার সূত্রবদ্ধ উপস্থাপনায় রূপান্তরিত করলে পাওয়া যায় দ্বিপার্শ্ব সামাজিক-গঠনযুক্ত সংগঠনের একটা মডেল, যাতে অনুরূপ ধরনের বিভিন্ন অণু-গঠনের (গ্রাম সম্প্রদায়গুলির) সমষ্টিটা দেখা দেয় মহা-ব্যবস্থাটায় (প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রে) অবলম্বন যোগাবার বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয় হিসেবে। এই সংগঠনের কর্মবন্দেজটা চালু থাকত প্রত্যেকটা অণু-গঠনের ভিতরে সামাজিক শ্রমবিভাগের পরস্পর সংযোগসাধক ব্যবস্থার (কৃষি – বিভিন্ন হস্তশিল্প) সাহায্যে এবং মহা-গঠনের পরিসরে (খাজনা-কর তোলা এবং পুনর্বণ্টনের মারফত)। ব্যবস্থাটার আর্থনীতিক আর সামাজিক স্থিতি থেকে পয়দা হয়েছিল বদ্ধতা, আর মানবিক বিচারশক্তির উদ্যমের ইতিহাসক্রমিক ঊনতা, চিরাগতানুগতিকতা এবং কুসংস্কারের বশবর্তিতার মাঝে সেটার বিষয়ীগত প্রকাশ ঘটেছিল।

বিভিন্ন নিদর্শন এবং প্রতিপাদন গড়ে উঠছে একটা তন্ত্রের আকারে, সেটা দিয়ে সমানে যথার্থ প্রতিপন্ন হচ্ছে সেই ভারতীয় সমাজের সামাজিক-আর্থনীতিক গঠনের যৌগিক সুস্থিতি সম্বন্ধে মার্কসের সাধারণ ধারণাটি। নিঃসন্দেহে বলা যায়, জাতীয় সার্বভৌমত্ব থাকলে সমাজের যে-অংশটা বদ্ধতা থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল সেটা এই সুস্থিতি খতম করে দিত দীর্ঘকাল আগেই।

বিষয়টা সম্বন্ধে বিভিন্ন আকর এবং বিচার-বিশ্লেষণের সমীক্ষা। – এই বইয়ে নিজ অভিমত বিবৃত করতে গিয়ে এবং বিভিন্ন উপাত্তের ব্যাখ্যা দেবার সময়ে আমি বিভিন্ন আকর আর বিচার-বিশ্লেষণের বৈচারিক বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি। এই ভূমিকায় আমি শুধু একটা সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক সমীক্ষা করলাম, সেটা ছাড়িয়ে যাই নি। আকরের অভাব নিয়ে সাধারণত যে-অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় তার কোন কারণ নেই। উলটে, আকর রয়েছে বরং প্রচুর, তার ফলে বাছন এবং ধারানিবদ্ধ করাটা হয়ে উঠেছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলোকে বাছার এবং ব্যাখ্যা করার নির্দিষ্ট নকশা থাকলে আলোচ্য শতবর্ষে ভারতের

সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশ সম্বন্ধে প্রামাণিক বলে কথিত কয়েকটা বিচার-বিবরণের মোটামুটি পাকা-পোক্ত সমর্থন প্রকৃতপক্ষে যোগানো যায় নানা তথ্য-প্রমাণ দিয়ে।

সময় আর প্রশ্নের দিক থেকে প্রারম্ভিক প্রত্যেকটা আকরের খুবই সুসম্বন্ধ বিশ্লেষণ হল আকরগুলো সম্বন্ধে বদ্ধধারণামূলক ধারানিবদ্ধ-করণ এবং ব্যাখ্যা এড়াবার একটা উপায়। তাই অমুক কিংবা অমুক পৃথক উপস্থাপনা যা দিয়ে প্রতিপন্ন হচ্ছে বলে মনে হয় এমনসব আকরের বহু উল্লেখ না করতেই আমি চেষ্টা করেছি। এক-একটা কিংবা উৎপত্তিতে এবং প্রকৃতিতে অনুরূপ একাধিক আকর থেকে নির্ভরযোগ্য এবং – যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ – বহুযৌগিক এবং ধারানিবদ্ধ তথ্যাদি বেছে নিতে আমি চেষ্টা করেছি। কোন একটা নির্দিষ্ট এলাকা কিংবা কাল-পর্যায়ের সমগ্র প্রশ্নসমষ্টিকে যথাসম্ভব পুরোপুরি বিবৃত করার জন্যে আমার প্রেরণা এসেছে তারই থেকে। ঠিক বটে প্রশ্নমালার বাঞ্ছিত সাকল্য এবং তুলনীয়তা আমি কালানুক্রমে স্থির করে উঠতে পারি নি সবসময়ে, সেটা হল বিভিন্ন আকরের উৎকর্ষের বিভিন্নতার দরুন অনেকাংশে।

এই বইখানার প্রথম ভাগে আমার ভিত্তিস্বরূপ তথ্য হিসেবে নিতে হয়েছে ইউরোপীয় পর্যটকদের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ-উপাত্ত, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মালমশলা এবং এই কোম্পানির কর্মকর্তাদের মন্তব্যাদি। আকরগুলি এইভাবে বেছে নিতে আমি অনেকাংশে বাধ্য হয়েছি, সেখানে সমালোচনা-আক্রমণ আসতে পারে, কেননা এতে বোঝায় ইউরোপীয়দের দৃষ্টির সাহায্যে ভারত সম্বন্ধে উপলব্ধি, এই ইউরোপীয়রা যাঁরাই হন – মার্কসের কাছে খুবই শ্রদ্ধেয় ফ. বার্নিয়ের কিংবা জ. ট্যাভের্নিয়ের মতো ফরাসীরা, কিংবা ফ. বুকানন, ব. হেইন, জ. গ্র্যাণ্ট, উ. চ্যাপলিন আর র. ওর্ম, যাঁরা সবাই শিক্ষাদীক্ষা পান বৃটিশ অর্থশাস্ত্রের ক্ল্যাসিকাল ঐতিহ্য অনুসারে। ভারত সম্বন্ধে তাঁদের পর্যবেক্ষণ-উপাত্তগুলিকে অজানতে সামাজিক-আর্থনীতিক গঠনের ইউরোপীয় মানের উপর আরোপ করায় দোষ-গুণ দু'দিকই আছে। উপাত্ত সংগ্রহ এবং ব্যাখ্যা করায় তাঁদের ধরনটা ভারত আর পশ্চিম ইউরোপের মাত্রার মধ্যে তুলনা করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, কিন্তু তার থেকে আবার সবদিকে বিশেষভাবে নজর রেখে ভেবে দেখতে হয় ভারতীয় জীবনের যেসব ব্যাপার ইউরো-

পীয় ইতিহাসের কোন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনীয় ছিল না কোনক্রমেই সেগুলো সম্বন্ধে তাঁদের উপলব্ধিতে হয়ত কোন-কোন ফাঁক ছিল।

তাছাড়া, বৃটিশ গবেষকদের, বিশেষত যেসব বৃটিশ গবেষক প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে কম সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের বিচার-বিবেচনায় সাধারণভাবে এমন একটা ঝোঁক ছিল যেন ভারতের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় কোন মৌলিকতা এবং স্বাধীন অগ্রগতির সামর্থ্য ছিল না, আর ভারতীয় সমাজ যেন বিশ্ব ইতিহাসের এমন একটা বিষয়ী (আরও যথাযথ কথায় – বিষয়) যা এমন মন্দিত হয়ে গিয়েছিল যেখান থেকে উদ্ধার পাবার আশা ছিল না, যাতে দীর্ঘকালের বিলম্ব ঘটেছিল গোড়ার দিককার পর্বগুলিতে। এই ধারাটাকে শুরু করেন এ. ডাও (১৭৬৮) এবং জে. মিল্ (১৮১৭), আর সম্পূর্ণ না করলেও বাহ্যত বিস্তর তথ্যাদি দিয়ে এটাকে চালিয়ে যান ডাব্লিউ. এইচ. মোরল্যাণ্ড, সেটা তিনি করেন ১৯২০ থেকে ১৯২৩ সালে প্রকাশিত তিনখানা মনোগ্রাফে। অগ্রগতির নির্দেশক হিসেবে আগেভাগে ধরে নেওয়া হয়েছিল পশ্চিম-ইউরোপীয় পুঁজিতন্ত্রের একই মাত্রাটাকে, সেই কারণে ভারতে সামন্ততন্ত্র যে-মাত্রায় পৌঁছেছিল সেটার খুবই নিকৃষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছিল স্বভাবতই।

সেই কারণে বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবিকতার খাতিরে ইংরেজদের দেওয়া তথ্যাদি আর বিচার-বিশ্লেষণে যে-অভাব আছে সেটা পূরণের জন্যে জাতীয় মহাফেজখানাগুলিতে যাঁরা গবেষণা করেছেন সেইসব ভারতীয় ইতিহাসকারের বিভিন্ন রচনা থেকে তথ্যাদি তুলে ধরা খুবই দরকার। দুঃখের কথা, এই প্রচেষ্টায় সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ করা তো দূরের কথা, ভারতে জাতীয় মহাফেজখানাগুলিতে তাঁদের অধ্যয়নও এখনও রয়েছে প্রারম্ভিক পর্বে। তবে মহাফেজখানাগুলিতে তথ্যানুসন্ধানে ডি. আর. গ্যাডগিল, এইচ. সিংহ, আই. হাবিব, এন. কে. সিংহ, টি. রায়চৌধুরী, বি. চন্দ্র, এ. গুহ, আর. এন. সিংহ এবং অন্যান্য ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যত কাজ করেছেন তার সাহায্যে দেশটির সামাজিক-আর্থনীতিক অতীতের গোটা-গোটা স্তরকে একেবারেই ভিন্ন রূপে হাজির করা সম্ভব হয়েছে।

প্রথম ভাগ

মোগল স্বৈরতন্ত্রের পতনের আগে ভারতীয় হস্তশিল্প এবং বাণিজ্য

সামন্ততান্ত্রিক ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন এবং পুনর্বণ্টন

সাবেকী ভারতীয় সমাজে জাতীয় উৎপাদের সবচেয়ে বড় অংশটা ছিল ভূমিজাত দ্রব্য-সামগ্রী, সেগুলো আদায় করা এবং পুনর্বণ্টনের কর্ম-বন্দেজের নিষ্পত্তিকর প্রভাব ছিল ভারতের কৃষি আর হস্তশিল্পের মধ্যে উৎপাদ বিনিময়ের পরিসর আর পরিবেশের উপর। হস্তশিল্পের আর কৃষির মধ্যে উৎপাদের (আদি কিংবা পণ্য আকারে) সরাসর বি-নিময়, এবং বাজারের খাতে কৃষকের কাছ থেকে আদায়-করা কৃষিজাত দ্রব্যের পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে ঘটানো বিনিময়ের মধ্যে স্থিতি নির্ভর করত ঐ কর্ম-বন্দেজের বিশেষত্বগুলোর উপর। সংযোগ আর পরস্পর-ক্রিয়ার এই সাকল্যটা একটা বিশেষ আলোচনার বিষয় হতে পারে। বইয়ের এই ভাগে প্রধানত উত্তর ভারত সম্বন্ধে বিভিন্ন আকর সম্পর্কে আমার বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রশ্নটার প্রাথমিক বিবেচনায় সীমাবদ্ধ থাকতে আমি মনস্থ করেছি। সময়ের দিক থেকে এটা বৃটিশ দখলের ঠিক আগেকার দশকগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাই এটা নয় দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক শ্রমবিভাগ সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ, এটা হল উক্ত কালপর্যায় নাগাদ সেটা কোন্ মাত্রায় পৌঁছেছিল তা নির্ধারণ করার চেষ্টা।

ভূমি-মালিকানা ছিল নানা রকমের, আর সামাজিক-আর্থনীতিক মাত্রা বিভিন্ন ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে, তাই ভারতের ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করাটা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। তাই এখানে আমি শুধু সেইসব সাধারণ উপাদানের উল্লেখ করব যেগুলি নির্ধারণ করেছিল ভারতের কৃষি-উৎপাদনের সামাজিক-আর্থনীতিক গঠনের এই তিনটে মূল উপাদান: ভূমিতে এবং কোন-কোন জলসেক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রিক মালিকানা; পৃথক-

পৃথক ভূস্বামীদের সম্পত্তি, যেগুলো ছিল রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির পাশাপাশি কিংবা দেখা দিয়েছিল সেটার পৃষ্ঠপোষকতায়; আর শেষে, গ্রাম সম্প্রদায় কিংবা অন্যান্য অণু-স্থানীয় ইউনিটের ভিতরে খুবই বিবিধ আকারের ভূমি-মালিকানা আর জোতজমা।

ভূমিতে রাষ্ট্রিক মালিকানা ছিল ভারতে মোগল বাদশাহের শেষ প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের আর্থনীতিক ভিত্তি। এই মালিকানা-স্বত্বের ভিত্তিতে ভূস্বামীদের কাছ থেকে উৎপাদ আদায় করা হত খাজনা-করের আকারে। খাজনা-কর হিসেবে পাওয়া বিপুল পরিমাণ বৈষয়িক সম্পদ জমে উঠত রাষ্ট্রের হাতে, সেটা ছিল ঐ পরাক্রমশালী কেন্দ্রীকৃত স্বৈরতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রধান বৈষয়িক অবস্থা। *সুস্পষ্ট সামন্ততান্ত্রিক অঙ্গ-উপাদানগুলোর পাশাপাশি* গোষ্ঠীতান্ত্রিক এবং দাস-মালিকানার অবশেষ-গুলোকেও *স্পষ্ট* দেখাবার জন্যে, আর স্বৈরতন্ত্রের রাষ্ট্রিক এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপে সেগুলোর অনুপাত আর কার্যভার স্থির করার জন্যে এই বহুযৌগিক উপরকাঠাম সংস্থার বিন্যাসগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষ বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সারা উপমহাদেশের পরিসরে মোট উৎপাদের, সর্বপ্রথমে কৃষি-উৎপাদের উৎপাদন আর পুনর্বণ্টন সম্বন্ধে কিছু-কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই আমি এখানে সীমাবদ্ধ থাকব।

তেরো থেকে সতর শতাব্দীতে সম্ভবতই এমন কোন-কোন কাল-পর্যায় ছিল যখন রাজস্বের পরিমাণের দিক থেকে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে খুবই উঁচু স্থানে ছিল দিল্লীর সুলতান-রাজ এবং তারপর মোগল বাদশাহের রাষ্ট্র। দেখা যায়, মোগল আমলে পরিমাণটা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছিল আউরঙ্গজেবের শাসনকালে তখন ভূমি-খাজনার ঘোষিত পরিমাণটা ছিল মোটামুটি ৩৩ কোটি ২০ লক্ষ থেকে ৩৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, আর তার থেকে বস্তুত আদায় হত প্রায় ৬০ শতাংশ (২০ কোটি টাকা অবধি)।* ঐ আমলের বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জি আর ফরমান থেকে পাওয়া উপাত্ত থেকে দেখা যায় ভূমি-খাজনার পরিমাণ কমত-বাড়ত মোট ফসলের তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকের মধ্যে।**

তবে এইসব উপাত্ত সম্বন্ধে আরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। একদিকে ভূমি-খাজনার যথার্থ হিসসাটা ছিল আরও কম, কেননা যেসব ইউনিটের উপর খাজনা ধার্য হত সেগুলোর সমগ্র উৎপাদ (তার মধ্যে পশুপালনের উৎপাদ, আনুষঙ্গিক ফসল আর বুনো গাছপালা) হিসাব করা এবং সমস্ত আবাদ-করা জমি, বিশেষত সদ্য-আবাদী জমি হিসাবে ধরা কঠিন ছিল। তাছাড়া, সরকারী খাজনা-রেহাইয়ের মধ্যে ছিল যাজক, মন্দির আর মসজিদে দেওয়া বাদশাহী খয়রাত এবং এমনসব জমি যাতে খাজনা ধার্য হতে পারত কিন্তু বস্তুত সেটা মকুব করে দিত স্থানীয় মোড়লেরা। অন্য দিকে, ভূমি-খাজনা ছাড়াও রাষ্ট্র জোতজমার অধিকারীদের কাছ থেকে আরও পেত বস্তু, নগদ টাকা আর শ্রমের আকারে অন্যান্য ধরনের কর, আর তার উপর হরেক রকমের কর, বেগার, সওগাত, নজরানা এবং উদগ্রহণ, যেগুলো ছিল কর্তৃপক্ষের স্রেফ লুটতরাজেরই শামিল। সেই কারণেই কৃষকদের কাছ থেকে যা বেরিয়ে যেত সেটার মোট পরিমাণ ছিল তাদের উৎপাদের তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকের কম নয়।

এখানে বলা দরকার, শরিয়তের যে-বিধানে আছে যে, মুসলমানের জমির ফসলের দশমাংশের বেশি কর হিসেবে আদায় করা চলবে না সেটাকে হঠিয়ে ভারতে ছিল ভূমি-খাজনার চলতি হার, আর কোন-কোন ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে ছাড়া সে-বিধান লোপ করা হয়েছিল।* আফগান, তুর্কী, মোগল আর ইরানী দেশ-বিজেতাদের ঢেউ একের পর এক ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সহজেই দেশটির সম্পদ হস্তগত করতে পারার সম্ভাবনার জন্যেই শুধু নয়। তাদের উপর-তলার মহলগুলো ভারতীয় কৃষি থেকে যে-পরিমাণ উদ্বৃত্ত-উৎপাদ আত্মসাৎ করত সেটা ছিল আফগানিস্তানের উপত্যকাগুলি কিংবা মধ্য এশিয়ার মরুভূমি আর ছোট-ছোট মরূদ্যানগুলিতে তারা যত বৈষয়িক সম্পদ আবিষ্কার করতে পারত তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। ভোগ্য দ্রব্য-সামগ্রীর এই বিপুল ভাণ্ডার এবং নিজেদের স্বাভাবিক পুনরুৎপাদন বাবত ঐ বিজেতাদের যে-দাম দিতে হয়েছিল সেটা এই যে, তারা বিজিতদের জাতি আর সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেল, এটা অবশ্য একেবারে অন্য ব্যাপার।

কৃষিজাত উৎপাদ যে-হারে আদায় করা হত তার যথার্থ চিত্র পেতে হলে শুরু করা দরকার ততটা নয় করাধানের রাষ্ট্রীয় আজ্ঞপ্তিগুলো থেকে, যতটা কিনা করদাতার ফসল থেকে বাস্তবিক যা কেটে নেওয়া হত সেখান থেকে। বিভিন্ন কৃষিজাত ফসলের উৎপাদ বণ্টন সম্বন্ধে গোড়ার দিককার কিছু-কিছু তথ্য আছে উনিশ শতকের প্রথম দশকে বেঞ্জামিন হেইন দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে যে-সমীক্ষা করেছিলেন তাতে। যেমন, মৈসূরের দার্মাপুরমে যা সেচসেবিত নয় এমন জমিতে উৎপন্ন এক খাঁড়ি রেগি জোয়ার বণ্টিত হত নিম্নলিখিত লোকদের মধ্যে* (১/২০ খাঁড়ির সমান টাম হিসাবে; স্থানীয় খাঁড়ির মান স্থির করা সম্ভব হয় নি; বৃটিশ আমলে প্রমাণ বোম্বাই খাঁড়ি ছিল ২০ মনের সমান, *প্রত্যেকটা ৮০ বৃটিশ পাউণ্ড, অর্থাৎ ৩৬·২ কিলোগ্রাম* x ২০ = ৭২৪ কিলোগ্রাম):

সরকার	৭
সরকারের চৌকিদারেরা	১
স্থানীয় চৌকিদারেরা	১
খেতে লাঙল-চষা 'পারিয়া'	১ ১/৪
সরকারের গ্রাম-সেবকেরা (কারিগরেরা সমেত)	১/২
ব্রাহ্মণেরা	৩/৮
শানবোগ (হিসাবরক্ষক)	৩/৮
গাউডা (মুখ্য রায়ত, অর্থাৎ মোড়ল)	১/৮
লিঙ্গায়েত পুরোহিত	৩/১৬
মোট কেটে নেওয়া হত	১২ টাম

এইভাবে, রায়তের হাতে অবশিষ্ট থাকত ৮ টাম, কাজেই কর (সরকারের হিসসা) হিসেবে যেত ফসলের ৩৫ শতাংশ, কর্তৃপক্ষ আর রক্ষীদের হিসসা – ১২·৫ শতাংশ, পুরোহিতদের ভাগে – ২·৫ শতাংশের বেশি, কর্মচারী (খেতি না-করা) আর কারিগরদের ভাগে ২·৫ শতাংশ। সব মিলিয়ে, গ্রামের মেহনতী অংশটার (রায়ত নিজে, 'পারিয়া', গ্রাম-সেবক, কারিগর) ভাগে পড়ত উৎপাদের প্রায় অর্ধেকটা।

কালা মাটিতে, এক-খাঁড়ি রেগি এবং একটা আনুষঙ্গিক ফসল আনুটার (anuta) ৮ ½ টাম ভাগ হত নিম্নলিখিতরূপে (টাম হিসাবে) :*

সরকার	১০
'গ্রাম্য পারিয়া'	১ ১/২
গ্রাম্য কর্মচারী	১
সরকারের কর্মচারী	৩/৪
রায়ত	১৫
মোট	২৮ ১/৪

এক্ষেত্রে গ্রামীণ কর্তৃপক্ষ এবং পুরোহিতদের হিসসা দেখা যাচ্ছে না, তার কারণ মনে হয় এই যে, উৎপাদনশীলতা কম এবং ব্যবহারের পক্ষে নিরেস ছিল বলে এইসব শস্যের ভাগ চাইত না গ্রামের উপর-তলার লোকেরা। কিন্তু দিঘি থেকে জল-সেচন-করা জমিতে উৎপন্ন এক-খাঁড়ি ধান ভাগ হত নিম্নলিখিতরূপে (টাম হিসাবে) :**

সরকার	১০
'গ্রামের মোড়ল'	১/৪
শানবোগ	১/৪
চৌকিদার	১/৪
'গ্রামের পারিয়া'	১/৪
ক্ষৌরকার	১/৮
সূত্রধর	১/৮
মন্দির আর ব্রাহ্মণেরা	৩/৮
সরকারের গ্রাম-সেবক আর চৌকিদারেরা	৩/৮
রায়ত	৮
মোট	২০ টাম-১ খাঁড়ি

দেখা যাচ্ছে, জলসেক ব্যবস্থা থাকায় মাটির উর্বরতা যেখানে অপেক্ষাকৃত বেশি, আর ফসল অপেক্ষাকৃত নিবিড় (ধান), সেখানে গ্রামের মেহনতী অংশগুলির ভাগটা কমে দাঁড়ায় উৎপাদের ৪২·৫ শতাংশ,

---

* ঐ, ৬৯ পৃঃ।

** ঐ, ৭০ পৃঃ।

আর প্রশাসনিক-নিগ্রহ এবং ভাবাদর্শগত কর্মযন্ত্রের হিসসাটা বাড়ে তদনুসারে। এই ধারাটা স্পষ্ট দেখা যেত অন্যান্য এলাকায়ও, তবে এটাকে সর্বত্র চালু দেখা যায় না।

আখের (আড্ডাচু) চাষে পরিব্যয় আর কাটানের গঠন হেইন দেখিয়েছেন কিছুটা অনির্দিষ্ট আয়তনের খেতে, যাতে বোনা হয় এক টাম বীজ। খেতের কাজ আর সিদ্ধ করার জন্যে রস তৈরি করার মোট কাটান আর পরিব্যয় পড়ে ৪৩ প্যাগোডা ৭ ফানাম (১০ ফানামে ১ প্যাগোডা), তার থেকে ১০ প্যাগোডা পায় সরকার, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির জন্যে যায় ৩ প্যাগোডা, ১২ প্যাগোডা যায় বীজের জন্যে, সূত্রধর পায় ১ প্যাগোডা ৬ ফানাম, চিনি-কল আর জ্বালানির জন্যে ৩·৫ প্যাগোডা, আর বাদবাকিটা (প্রায় ১৫ প্যাগোডা) যায় চাষবাসের বিভিন্ন কাজে এবং ভারি বোঝা বওয়াবার জন্যে (সার আর আখ)। প্রস্তুত-করা উৎপাদের তিন মন পায় যে রস সিদ্ধ করে (মালিক ১/২ মন, সূত্রধর আর যে সিদ্ধ করে সে-ও পায় ততটা করে, মনিব ১/৪ মন, আর বাদবাকিটা পায় সিদ্ধ করার লোকেরা)। তবে এখানে দেখা যায় বজায় থাকে সম্প্রদায়ের ভিতরকার পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা, কেননা এত পরিমাণ – তিন মন – পায় মোড়ল, হিসাবরক্ষক, চৌকিদার, মুচি আর খেতে জলসেচন কাজের 'পারিয়ারা' (প্রত্যেকে ১/২ মন), কুম্ভকার এবং ক্ষৌরকার (প্রত্যেকে ১/৪ মন)।

উক্ত ৬ মন চিনির দাম ধরা হয় ৩ প্যাগোডা (আধা-প্যাগোডায় এক মন), আর তাতে ঐ চিনি উৎপাদনের মোট খরচ পড়ে ৫০ প্যাগোডা ৭ ফানাম। উৎপন্ন চিনির মোট পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ১০০ মন, এটা বিবেচনা করলে উৎপাদনের ফলে রায়তের লোকসানই হত যদি না থাকত এই দুটো উপাদান: এক, বীজ পুনরুৎপন্ন হয় (১২ প্যাগোডা), আর দুই, খেতির কোন-কোন কাজ করে রায়ত নিজে এবং তার পরিবারের লোকে, তাতে তারা ব্যবহার করে নিজেদের সরঞ্জাম আর ভারবাহী পশু।* তার সঙ্গে সঙ্গে, যে-পরিমাণটা পেত সরকার সেটা বাঁধা ছিল কিনা তাতে সন্দেহ আছে কিছুটা। অন্য কোন-কোন দলিল এমনটা নির্দেশ করে যে, ক্ষেত্র বদল করে অধিকতর নিবিড় কোন

ফসল ধরলে তার সঙ্গে সঙ্গে দেয় খাজনার পরিমাণ আনুষ্ঠানিকভাবে বাড়ত কিংবা ভূস্বামী আর তার কর্মচারীদের নতুন-নতুন লেভি আর ভেট দিতে হত বলে পরিমাণটা যথার্থই বাড়ত।

শেষে, চিনির অপেক্ষাকৃত নিবিড় উৎপাদনের দামের মধ্যে বিভিন্ন খরচ-খরচার হিসসাটা নিয়ে বিবেচনা করলে (যেটা হল এই যাঁচ-বিচারের প্রকৃত বিষয়বস্তু), সেগুলো মোটের উপর ছিল নিম্নলিখিত দফাগুলো: সূত্রধর – ১ প্যাগোডা $৮\frac{১}{২}$ ফানাম, কলের মালিক – ১ প্যাগোডা, বয়লারের মালিক (সে তো ঐ একই লোক) – ১ প্যাগোডা $৭\frac{১১}{১২}$ ফানাম, কুম্ভকার – $৩\frac{৩}{৪}$ ফানাম, মুচি – $২\frac{১}{৩}$ ফানাম, অর্থাৎ মোট ৫ প্যাগোডা $২\frac{১}{৪}$ ফানাম। মিস্ত্রি আর সিদ্ধকারীরা জিনিস হিসেবে যে-পারিশ্রমিক পেত (নগদ হিসাবে $৬\frac{১}{৪}$ ফানাম) সেটা যোগ করলেও উৎপাদনের মোট পরিব্যয় ৫ প্যাগোডা $২\frac{১}{৪}$ ফানামের বেশি নয়, অর্থাৎ উৎপাদের মোট মূল্যের $\frac{১}{১০}$-এর একটু বেশি, সেটার কৃষি-সংক্রান্ত অঙ্গ-উপাদানের তৃতীয়াংশ এবং ভূস্বামী পুরোহিত আর কর্মচারীদের জন্যে কাটানগুলোর $\frac{২}{৫}$। কাজেই কৃষিকাজ অধিকতর নিবিড় হবার ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন পরিব্যয়ের গঠনে, আর তাই ভারতীয় গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন চাহিদার পরিসরে (কৃষিকাজের উদ্বৃত্ত-উৎপাদে পৃথক-পৃথক বর্গের হিসসার তো কথাই ওঠে না) কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটল না।

মৈসুরে কৃষিজাত দ্রব্যের বণ্টন সম্বন্ধে নিজ পর্যবেক্ষণ-উপাত্তগুলির সংক্ষিপ্তসার করে হেইন বলেন, মোক্ষণ-দেওন প্রচলিত ছিল 'উঁচু জমিতে', আর নামালে বা ধানের জমিতে ছিল ভাগ-চাষ, তাতে ভাগটা নির্ভর করত জমি-বন্দটা জলসেকের পক্ষে কতটা উপযোগী তার উপর। মৈসুরের বেশির ভাগ এলাকায় ভাগ-চাষী উৎপাদের অর্ধেক পেত নামে-মাত্র, কিন্তু 'গ্রামে সরকারের কর্মচারীদের' কাছে বাধ্যবাধকতা মেটাবার পরে তার হাতে অবশিষ্ট থাকত তৃতীয়াংশ মাত্র। হেইন বলেন, সেই কারণে রায়ত সরকারের জমিতে চাষবাস করতে অনিচ্ছুক হত, কিন্তু ব্রাহ্মণদের নিষ্কর জমি ইনামে চাষবাস করত সাগ্রহে। এতে সে ফসলের অর্ধেকটা পেত কোন কাটান ছাড়াই। এর থেকে প্রসঙ্গত দেখা যায়, ইনাম জমি-বন্দের প্রসার ঘটলে বস্তুশোধ আর কাটানের রেওয়াজী ব্যবস্থাটা বিপর্যস্ত হবার ঝোঁক দিত।

তবে রায়তের ফসল থেকে কাটানগুলো শুধু রেওয়াজী দেওন আর পারিশ্রমিকে গণ্ডিবদ্ধ ছিল না। সরকারকে যা দিতে হত সেটা চারটে অংশ (কিস্তিতে) বিভক্ত থাকত, সেগুলোর শুধু শেষেরটা দিতে হত ফসল তোলার সময়ে নাগাদ। তাই রায়তকে সাধারণত সুদখোরের শরণাপন্ন হতে হত ধার পাবার জন্যে, তাতে সুদ দিতে হত খাজনার ১৮ শতাংশ, বা ফসলের মূল্যের গড়ে ৯ শতাংশ। এইভাবে রায়তের হাতে অবশিষ্ট থাকত তার শ্রম-ফলের সিকি ভাগ মাত্র।

গুজরাটে জমিতে প্রজাদের মধ্যে উৎপাদ-কাটানের হার ছিল সমানই মাত্রায় চড়া। গুজরাটে জেলার প্রধানের অধীন গ্রামগুলিতে কৃষিজাত দ্রব্য ভাগ-বাটোয়ারা করার ব্যবস্থাটা আঠার শতকের তৃতীয় দশকে ছিল এইরকম: ৪০ পাউণ্ডের এক-মন ধান থেকে ১ পাউণ্ড পেত প্রধান, ওজনদার পেত ১/৮, পাহারাদার – ১, হরকরা – ১/২, আর গ্রামীণ কর্মচারীরা পেত ১/২ পাউণ্ড। তার উপর, প্রত্যেকটি চাষী তার মোট ফসল থেকে ভেট দিত – মোড়লকে ৫ পাউণ্ড, মন্দিরে ২০ পাউণ্ড, মোল্লাদের ১০ পাউণ্ড, ম্যানেজারের পাচককে ১০ পাউণ্ড, আর প্রধানের রাহাখরচ বাবত দিত ৫ পাউণ্ড। এই সমস্ত দেওন মেটাবার পরে বাদবাকিটার অর্ধেক পেত প্রধান – ভূস্বামী। এইভাবে, ফসলের ৭ শতাংশ যেত বিভিন্ন সেবায়, আর ৪৮ শতাংশ পেত ভূস্বামী, ফলে জমির প্রজার হাতে থাকত ধান ফসলের ৪৫ শতাংশ।* সুদখোরকে দেয় কাটান হিসাবে ধরলে ঐ অংশটা তদনুসারে কমে যায়।

ভারতের কৃষিকাজে উদ্বৃত্ত-উৎপাদের চড়া হারের স্বাভাবিক এবং উৎপাদন ঘটিত কারণ-সংক্রান্ত প্রশ্নটা নিয়ে আবার বিবেচনা করব পরে। আপাতত আমি সীমাবদ্ধ থাকছি কোন-কোন সাধারণ উপস্থাপনায়, বিশেষত সোভিয়েত ইতিহাসবিদ ই. ম. রেইস্‌নার খুবই ফলপ্রসূ যে-ধারণাটা ব্যক্তি করেছেন তাতে: 'কৃষকের শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদন করতে, তার পরিবার আর জোতজমার জন্যে যায় যে আবশ্যক উৎপাদ, আর সামন্ত ভূস্বামীরা আদায় করে যে উদ্বৃত্ত-উৎপাদ, এই দুয়ের মধ্যে স্থিতিটা কোন নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক পরিবেশের চেয়ে

এখানে বেশি অনুকূল ছিল শোষকদের পক্ষে। এতে আদৌ কোন সন্দেহ নেই যে, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের উচ্চতর হারটা ছিল কৃষকদের (এবং গড়ে-উঠতে-থাকা বুর্জোয়া অংশগুলোর) উপর সামন্ত ভূস্বামীদের শক্তি আর ক্ষমতার একটা অতিরিক্ত উৎস, এই অবস্থাটা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ বজায় রাখায় সহায়ক হয়েছিল এবং পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পর্কতন্ত্রে উত্তরণ ব্যাহত করেছিল, যে-অবস্থাটা প্রাচ্যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজগুলিতে বদ্ধতার ধারায় বল যুগিয়েছিল।'*

রেইস্‌নারের এই ধারণাটার বিষয়ে ফিরে এলে, মনে হয়, ঐতিহাসিক বিকাশের অবলম্বনস্বরূপ একটা উপাদান হিসেবে প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক পরিবেশ সম্বন্ধে মনোভাব নির্দিষ্ট আকারে ব্যক্ত করা চাই। এই প্রশ্নটার মীমাংসা করা এখনও বাকি আছে, কেননা সেজন্যে দরকার আরও গভীরপ্রসারী গবেষণা, যাতে সংশ্লিষ্ট থাকবে অনুরূপ প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক পরিবেশে খুবই সুস্থিত বিভিন্ন বিন্যাস-সত্তা সম্বন্ধে উপাত্তগুলির মধ্যে তুলনা। ভারত সংক্রান্ত মালমশলার উপর নির্ভর করে আমি ধরে নিতে যাচ্ছি শুধু দুটো জিনিস : এক, প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক পরিবেশ ইতিহাসক্রমিক অগ্রগতিকে ত্বরিত কিংবা – তার উলটোটা – ঢিমিয়ে দিতে পারে সাধারণভাবে নয়, সেটা নির্ভর করে জনসমষ্টির বিকাশের কোন একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছবার উপর, যেটা প্রকৃতপক্ষে অমুক কিংবা অমুক ক্রিয়াফল পয়দা করে সেই পরিবেশ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে ; দুই, উৎপাদন-শক্তির কোন একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক পরিবেশে বিদ্যমান সামাজিক-আর্থনীতিক গঠনের সেটার মূল অনুপাতগুলো বজায় রাখতে পারার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে ঐ ক্রিয়াফলটা হবে গতিশীলতা, না – তার উলটোটা – বদ্ধতা। এই কারণেই কোন-কোন প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক পরিবেশে কোন-কোন স্থানীয় জনসমষ্টি ঐতিহাসিক বিকাশের কোন-কোন পর্বের ভিতর দিয়ে চলে (কিংবা সেগুলোকে এড়িয়েই চলে) অপেক্ষাকৃত দ্রুত, কিন্তু তারপর ঢিমিয়ে যেতে থাকে অন্যান্য পর্বে, যেগুলো জনসমষ্টি, সেটার পরিবেশ এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পক্ষে হয়ে ওঠে – বলা যেতে পারে – স্বাভাবিক,

---

পর্যাপ্ত। তাছাড়া, উৎপাদন আর বণ্টনের যে-প্রণালী বলবৎ থাকে সেটা সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে শাসক শ্রেণীগুলোর জন্যে যে-পরিমাণ উদ্বৃত্ত-উৎপাদ পয়দা করে সেটা গোটা গঠনের সুস্থিতির উপর বিপুল প্রভাব খাটাতে থাকে।

মোগল আমলের ভারতে উদ্বৃত্ত-উৎপাদের চড়া হারটা দেখিয়েছেন আই. হাবিব। ভারতে মাথাপিছু উৎপাদ এত কম ছিল যাতে উদ্বৃত্ত-উৎপাদ গড়ে ওঠা এবং সেটার ভিত্তিতে পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়ন সম্ভব ছিল না, এই মর্মে পশ্চিমে (বিশেষত মরিস ডি. মরিসের উক্তিগুলোতে) বহুবিস্তৃত ধারণাটার সঙ্গে তিনি তর্কে নেমেছেন। হাবিব বলেছেন, সরকারী সূত্রের তথ্য অনুসারে, সতর শতকে গঙ্গানদীর মধ্য-বিস্তারগুলির বরাবর অঞ্চলগুলিতে এবং মধ্য ভারতে আবাদ-করা জমির পরিমাণ ছিল বিশ শতকের গোড়ার দিকে যা তার অর্ধেক মাত্র। এর থেকে দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত উর্বরা এবং অপেক্ষাকৃত বেশি ফলনের জমিগুলোতে চাষ-আবাদ করা এবং বিশাল আয়তনের পতিত জমি এবং তৃণভূমি পশুচারণের জন্যে পৃথক করে রাখা সম্ভব ছিল। প্রসঙ্গত, এই কারণেই মাথাপিছু পশুপালনে-জাতদ্রব্য এবং মাথাপিছু ভারবাহী পশু ছিল বৃটিশ আমলের চেয়ে বেশি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটা এই: রায়তের জোতজমার আয়তন ছিল সর্বোপযোগী হবার কাছাকাছি, আর আবাদী জমি বেশ সরেস ছিল বলে বেশি ঘনঘন দুটো ফসল তোলা সম্ভব ছিল।

এই ভারতীয় বিজ্ঞানী মনে করেন প্রফেসর মরিস সাবেকী ভারতীয় কৃষিকাজে ফসলের নিচু মাত্রার ফলনের কথা বলেন একপেশে বিবেচনা-ধারা থেকে; আর হাবিব খুব ঠিকই বলেছেন যে, উৎপাদকদের মাথাপিছু উৎপাদের পরিমাণ চড়াই ছিল (সেটা মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় মাত্রার চেয়ে কম ছিল না); যেমন তিনি নিশ্চয় করে বলেছেন, ভারতে মোগল আমলে ফসলের প্রতি-ইউনিটে গমের বীজ যা বোনা হত সেটা ঐ কালপর্যায়ের পশ্চিম ইউরোপে যা তার চেয়ে বেশি ছিল না।*

তবে হাবিব আরও বলেছেন, উৎপাদনের মাত্রাই উদ্বৃত্ত-উৎপাদের একমাত্র নির্দেশক নয়। উদ্বৃত্ত-উৎপাদ পয়দা হবার উপর জীবনীয়

উপকরণের পরিমাণেরও প্রভাব পড়ে, – সেটা জলবায়ুর অপেক্ষাকৃত কঠোর অবস্থার দেশগুলিতে যা তার চেয়ে কম গ্রীষ্মমণ্ডলের এবং তার কাছাকাছি দেশগুলিতে।

তবে সঞ্চয়নের নিহিত ক্ষমতা থাকলে তাতেই বোঝায় না যে, সেটা ঘটেছে পুঁজিতান্ত্রিক উপায়ে। আমি মনে করি, বিন্যাস-লম্ফনের উপায়ে পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের পূর্বশর্ত ভারতীয় সমাজে পরিণত হয়ে ওঠে নি সতর শতকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ। ভারতে শাসক শ্রেণীগুলি এবং জনসমষ্টিতে তাদের পোষ্য অংশগুলো যে অপেক্ষাকৃত চড়া পরিমাণে এবং সুবিপুল পরিসরে খাজনা-কর আত্মসাৎ করত এবং ভোগ-ব্যবহার করত সেটা দেশটির সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামটাকে অচল এবং কিছুটা বদ্ধ করে রাখতে আনুকূল্য করত, যে-কাঠামটার অবলম্বন ছিল অসাধারণ রকম প্রকাণ্ড জনসমষ্টি যারা জীবনযাপন করত কৃষির উদ্বৃত্ত-উৎপাদের সাহায্যে। তার সঙ্গে সঙ্গে, আপকেওয়াস্তে অর্থনীতি প্রাধান্যশালী হয়ে বহুবিস্তৃত ছিল, আর খাজনা-কর ভোগ-ব্যবহারকারী শ্রেণী এবং সামাজিক স্তরগুলোর অবিমিশ্র আর্থনীতিক মিথস্ক্রিয়া আর সাধারণ আর্থনীতিক স্বার্থ ছিল প্রাথমিক অবস্থায়, তাই সমগ্রভাবে ভারত রাষ্ট্রের পরিসরে যা বার থেকে নিরাপত্তা এবং অভ্যন্তরীণ সুস্থিতি নিশ্চিত করতে সক্ষম এমন সামাজিক দিক থেকে সমসত্ত্ব প্রশাসনিক, ভাবাদর্শগত এবং নিগ্রহ কর্ম-যন্ত্র (অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ আর মালিকানার ব্যাপারে সেটা যতই অসমসত্ত্ব হোক) গড়ে ওঠা ব্যাহত হয়েছিল।

এখানে লক্ষ্য করা দরকার, এমন রাষ্ট্র (উপমহাদেশের একটা অংশেও) প্রতিষ্ঠা করতে হিন্দু শাসক শ্রেণীগুলি অপারক হয়েছিল। এই কাজটা করে মুসলিম বিজেতারা, তারা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল নিজেদের সামাজিক সম্বন্ধ-গ্রন্থি আর বর্গীয় স্বার্থের ব্যবস্থা। দেশজয়ের পরে গোড়ার দিকে সেটা ছিল হিন্দু ব্যবস্থার পাশাপাশি; তাতে নিশ্চিত হয়েছিল রাজনীতিক কেন্দ্রীকরণ, কিন্তু উপযুক্ত সামাজিক-আর্থনীতিক গঠন ছিল না বলে সেটা সামাজিক সম্বন্ধ-গ্রন্থির হিন্দু ব্যবস্থার আত্মভূত হয়ে গিয়েছিল ক্রমে-ক্রমে. এইসব গ্রন্থি কেন্দ্রাতিগ ছিল স্থানীয় পরিসরে, আর সমগ্র দেশের পরিসরে ছিল কেন্দ্রাভিগ। সেই কারণে দুটো ধারা ছিল মধ্যযুগীয় ভারতে; বাহ্যত পৃথক-পৃথক মনে হলেও বস্তুত পরস্পর-সংযুক্ত ছিল ধারা-দুটো: সামাজিক-আর্থনীতিক অণু-ব্যবস্থার সুস্থিতি,

আর ভারতের কেন্দ্রীকৃত সর্বে-ব্যবস্থার অস্থিতি, যাতে নতুন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠায় বিলম্ব ঘটতে থাকে।

কোন-কোন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে – প্রধানত মধ্যযুগের গোড়ার দিকে – প্রাচ্যে রাষ্ট্রিক আকারের মালিকানা ছিল আপেক্ষিক রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীকরণের আর্থনীতিক ভিত্তি, বহিরাক্রমণ, অভ্যন্তরীণ অরাজকতা আর পরস্পর-ধ্বংসকর শত্রুতা রোধ ক'রে এবং পৌরকরণে আনুকূল্য ক'রে সেটা ছিল একটা প্রগতিশীল ভূমিকায়। তার সঙ্গে সঙ্গে, ভূমিতে প্রাথমিক আকারের ব্যক্তিগত মালিকানা হল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কাঠামের ভিতরে নতুন, অপেক্ষাকৃত পরিণত সম্পর্ক উদ্ভবের পথে একটা গুরুতর প্রতিবন্ধক।

মার্কস জোর দিয়ে বলেছেন, তাঁর 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডে বিবৃত বিশেষ-নির্দিষ্ট আকারের পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের ইতিহাসনির্দিষ্ট অবশ্যম্ভাবিতা পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে গণ্ডিবদ্ধ। তাই পশ্চিম ইউরোপে যেমনটা হয়েছিল সেইভাবে এক-আকারের ব্যক্তিগত মালিকানা যেখানেই অন্য আকারে রূপান্তরিত হয় না, যেখানেই – দৃষ্টান্তস্বরূপ – কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণে সাধারণী মালিকানা প্রচলিত, সেখানে – মার্কসের মতে – সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের প্রক্রিয়াটা পশ্চিম ইউরোপে যেমনটা তার থেকে ভিন্ন হতে পারে, আর বস্তুত সেটার থাকে বিভিন্ন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিক বিকাশের দ্বান্দ্বিকতা দেখা যায় বিশেষত এই অবস্থাটার মধ্যে: ভারতে ভূমিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকার ফলে একটা পর্বে ঢিমে হয়ে যেতে থাকে সামাজিক শ্রমবিভাগ গভীরপ্রসারী হবার প্রক্রিয়াটা এবং শহরের মানুষের মধ্যে স্বাধীন কারবারী-উদ্যোগী অংশগুলোর মজবুতি, অর্থাৎ সমগ্রভাবে সমাজের আরও আর্থনীতিক অগ্রগতি।

মোগল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বেশি শ্রীবৃদ্ধির সময়ে এই পরাক্রমশালী কেন্দ্রীকৃত স্বৈরতন্ত্রের কর্তৃত্ব সবচেয়ে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছিল রাষ্ট্রীয় ভূসম্পত্তির মাঝে, যদিও বিভিন্ন ব্যক্তিগত ভূমিসম্পত্তি সেখানে ছিল তখনও। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্য ভাগ-ভাগ হয়ে যেতে শুরু করলে খুবই লাক্ষণিক পরিবর্তন ঘটেছিল ভূমি-সম্পর্ক ক্ষেত্রে। তখন অবধি যথার্থ সামাজিক সম্পর্ক মোটামুটি প্রকাশ পেত ভূমিতে আর জলভাগে রাষ্ট্রীয় মালিকানাতে, সেটা ক্রমেই বেশি-বেশি পরিমাণে হস্তান্তরিত হতে থাকল

বিভিন্ন সর্দার, জায়গিরদার আর গ্রামীণ উপর মহলের কাছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় — মোগল সাম্রাজ্যের বিকেন্দ্রীকরণ এবং ভাঙন ঘটেছিল ভারতীয় সমাজের ভিতরকার সামাজিক প্রক্রিয়াগুলোর ফলে, — রাষ্ট্রীয় আকারের ভূসম্পত্তির ভিত্তিতে এই সমাজের সামন্ততান্ত্রিক বিকাশের পারম্পর্য-সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল ইতোমধ্যে। সমগ্র দেশটির পক্ষে যা মর্মান্তিক সেটা এই যে, অনিবার্য সামন্ততান্ত্রিক খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থার সেই কালপর্যায়ে ঘটল বিভিন্ন পশ্চিম-ইউরোপীয় শক্তির জবরপ্রবেশ, সেটা দিয়ে বহুকালের জন্যে নির্ধারিত হয়ে গেল ভারতের পরবর্তী বিকাশ, তবে সেটা ঔপনিবেশিক পথে।

যেসব সামাজিক স্তর মোগল স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিল সেগুলির উপর ভারতবিদরা বেশি-বেশি করে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করছেন ইদানীং। যেমন, এম. এন. পিয়াসনের বিবরণীতে দেখা যায়, সতীশ চন্দ্র*, এ. দাসগুপ্ত**, এ. এম. শাহ***, বি. এস. কোহন**** এবং অন্যান্যেরা 'লক্ষ্য করেছেন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতে মনসবদারি (মোগল আমলের পদ-পদবি সংক্রান্ত) ব্যবস্থার বাইরের লোক রাজনীতিক রঙ্গভূমিতে নেমে সিদ্ধান্তগ্রহণে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করত, তাতে তাদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল...

যেমন, এ. এম. শাহ লক্ষ্য করেছেন গাইকোয়ারের আমলারা রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপে শামিল হত দেশাই আর কর-ইজারাদারদের সঙ্গে মিলে, আর সুরাটের রাজনীতিতে বণিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটাকে তুলে ধরা হয়েছে এ. দাসগুপ্তর প্রবন্ধটিতে।*****

---

* Satish Chandra, 'Parties and Politics at the Moghal Court', আলিগড়, ১৯৫৯।

** Ashin Das Gupta, 'The Crisis at Surat, 1730-1732'. — "Bengal Past and Present", ১৯৬৭।

*** A. M. Shah, 'Political System in Eighteenth Century Gujarat'. — "Enouiry", ১৯৪ পৃঃ।

**** B. S. Cohn, 'Political Systems in Eighteenth Century India: The Banaras Region'. — "Journal of the AOS", ৮২ খণ্ড, ৩ নং, ১৯৬২।

***** M. N Pearson 'Political Participation in Moghal India' — "IESHR", ৯ খণ্ড, ২ নং, জুন ১৯৭২।

ভারতে মোগল আমলে খাজনা-কর প্রাপ্তা শ্রেণীটাকে ভাগ করা যায় প্রধান তিনটে বর্গে: মোগল – প্রধানত মুসলিম – উপর-মহল, যাদের ছিল সবচেয়ে বড়-বড় জায়গির; বড় আর মাঝারি – প্রধানত হিন্দু – ভূস্বামীরা, তারা নিজেদের ভূমিতে পুরুষানুক্রমিক স্বত্ব বজায় রেখেছিল বহুলাংশে; আর প্রতিপত্তিশালী প্রজারা, যারা তাদের বিধিসম্মত জমি-বন্দগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছিল নানা পতিতজমি আর সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিভিন্ন আবণ্টিত অংশ। এইসব বর্গের মধ্যে এবং এইসব বর্গ আর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ছিল জটিল। ভারত সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষণা-রচনা থেকে দেখা যায় – জায়গিরের (সামন্ততান্ত্রিক প্রজাস্বত্বের প্রধান আকার) পাশাপাশি মোগল আমলের ভারতে বরাবর বজায় ছিল ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ কিনা, মোগলরা, বস্তুত, সাম্রাজ্যের সমস্ত ভূমিকে পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে পারে নি।

একদিকে ভূমিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা, আর অন্য দিকে পৃথক-পৃথক খাজনা-কর প্রাপ্তাদের জোতজমা আর খেতি-খামার, এই দুয়ের মধ্যে অসংগতিটা হল মোগল সমাজের ভাঙনের কালপর্যায়ে সেটার প্রধান অসংগতি। মোগল সাম্রাজ্য যতকাল সাফল্যমণ্ডিত যুদ্ধ চালিয়ে ভারতের ক্রমেই বেশি-বেশি এলাকায় ক্ষমতা প্রসারিত করছিল তখন সামন্ত ভূস্বামীরা মোগলদের খিদমত করে সদ্য জয়-করা অঞ্চলগুলোতে আরও বেশি-বেশি জায়গির পেত। তাদের আদায়-করা খাজনার একটা মোটা অংশ রাজকোষে দিতে হত কর হিসেবে, এই অবস্থাটার সঙ্গে তারা মোটের উপর খাপ খাইয়ে নিয়েছিল ঐ কারণেই। কিন্তু সতর শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, মোগল সাম্রাজ্য যখন দক্ষিণে ছাড়া প্রায় সর্বত্র পৌঁছে গিয়েছিল ভারতের প্রাকৃতিক সীমান্তগুলিতে, তখন মোগলরা আর সাবেকী উপায়ে – নতুন-নতুন অঞ্চল জয় করে সেগুলিকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে রাজস্ব বাড়াতে পারত না। তখন থেকে মোগল শাসকেরা রাজস্ব বাড়াতে পারত শুধু কৃষকদের উপর শোষণ তীব্রতর করে, আর রাষ্ট্র এবং পৃথক-পৃথক সামন্ত ভূস্বামীর মধ্যে খাজনা ভাগাভাগি হত যে-নিয়ম অনুসারে সেটাকে পরিবর্তিত করে।

খাজনার অনপেক্ষ পরিমাণ বাড়াবার চেষ্টার বিরোধিতা করত গ্রাম সম্প্রদায়গুলির উপর-মহল এবং তাদের সগোত্র জোতজমার মালিকেরা

(রায়ত)। সবচেয়ে প্রবল এবং সংগঠিত আন্দোলন ছিল শিখদের, পাঞ্জাবে, সেখানে শহুরে কারিগর আর ব্যাপারীদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে এই আন্দোলন খুবই সমৃদ্ধ এই প্রদেশটিতে মোগল শাসনকে প্রথমে দুর্বল করে ফেলে পরে – আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে – লোপ করেছিল। শিখ অভ্যুত্থান এবং অনুরূপ অন্যান্য আন্দোলন হল খাজনা-প্রাপ্তাদের উপর-স্তরগুলোর উদ্দেশে কঠোর হুঁশিয়ারি, – তাতে তারা কৃষকদের উপর সুতীব্র শোষণের উপরি অন্যান্য উপায়ের সন্ধান করতে বাধ্য হয় আয় বাড়াবার জন্যে। এইভাবে, সামন্ত ভূস্বামীরা – বিশেষত অপেক্ষাকৃত উপান্ত্য অঞ্চলগুলিতে – রাষ্ট্রকে দেয় খাজনা-কর কমিয়ে মোট খাজনায় নিজেদের হিসসা বাড়াতে চেষ্টা করে। খাজনার অপেক্ষাকৃত মোটা হিসসার জন্যে এই সংগ্রাম হল বিচ্ছেদকামী মোগলবিরোধী আন্দোলনগুলির পিছনে একটা চালকশক্তি, এইসব আন্দোলন পরিচালনা করত স্থানীয় সর্দারেরা। এইসব ক্রিয়াকলাপে সাধারণত নেতৃত্ব করত সম্প্রদায়ের উপর-মহল।

মোগল ভূমি-কর ব্যবস্থা যেসব নিয়ম অনুসারে বলবৎ হত তাতে, মোটের উপর, ভূমি-মালিকদের নিচের আর মাঝারি স্তরগুলিকে এবং সামরিক আর প্রশাসনিক কর্মী-কর্মচারীদের ফেলা হত কিছুটা উৎপীড়িত অবস্থায়, আর বিশেষাধিকারী অবস্থায় থাকত উপর-মহলগুলো। আই. হাবিব মোটামুটি হিসাব কষে দেখেছেন – গ্রামীণ আর স্থানীয় কর্মকর্তা, সৈনিক এবং হরেক রকমের গ্রামীণ খাজনা-প্রাপ্তাদের ('বুদ্ধিজীবীরা এবং কর্মকুণ্ড লোক' সমেত) জন্যে কাটানগুলোর পরে নীট উৎপাদের সিকি অংশ, তৃতীয়াংশ, এমনকি অর্ধেকটা পর্যন্ত বেরিয়ে যেত গ্রামাঞ্চল থেকে।*

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মকর্তা বাংলার শেষ নবাবদের আমলের অবস্থা সম্পর্কে বলেছিলেন: 'স্বৈর নিয়ম-কানুন খুবই কার্যকর হয়েছিল, কেননা গোড়ায় সেটা উদ্দিষ্ট ছিল দালালদের দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার অনাচারগুলোর প্রতিবিধানের জন্যে, – সামাজিক মর্যাদার জাতীয় স্বীকৃতির উপর যেটা নির্ভর করে না এমন যেকোন সরকার থেকে সেই ব্যবস্থাটা অবিচ্ছেদ্যই। শাসক যাতে কোন-না-কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট এমন সমস্ত আর্থিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির

বিস্তর ক্ষমতা ছিল। নিজ শাসনকালে সুবাদার (জাফর খাঁ) নিজের বিপুল ধন-দৌলত জমিয়েছিলেন, যতটা করতে পারত না অধস্তন কর্মকর্তারা।'* তবে যুদ্ধজনিত অনিশ্চয়তা, শাসকদের মর্জি-মেজাজ এবং নিজেদের অধীন লোকজনের ষড়যন্ত্রের দরুন মোগল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদেরও অবস্থান নিরাপদ ছিল না।

কতকগুলো কারক-উপাদান (তার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হল জনসমষ্টির অধিকাংশের এবং স্থানীয় উপর-মহলের ধর্মীয় আনুগত্য) অনুসারে বিচ্ছেদকামী আন্দোলনগুলির ফলে কোন-কোন অঞ্চল নামেমাত্র অধীন থেকে ক্রমে-ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল (যেমন বাংলা সুবা), কিংবা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটেছিল কোন-কোন অঞ্চলে (মহারাষ্ট্রে)। তবে উভয় ক্ষেত্রে, জায়গির হিসেবে পাওয়া ভূমিকে পুরুষানুক্রমিক মালিকানার জোতজমায় পরিণত করা হত। আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে এমনকি বাংলায়ও ভূমিতে রাষ্ট্রিক মালিকানা প্রথাটার ভাঙন এগিয়ে গিয়েছিল বহুদূর। খাজনা-কর থেকে কাটান যেত সামন্ত ভূস্বামীর আত্মসাৎ-করা খাজনা, তাতে পৃথক-পৃথক ভূমি-মালিক উদ্বৃত্ত-উৎপাদের যে-অংশটা পেত সেটা ঐ উৎপাদ থেকে কর হিসেবে রাষ্ট্রের আদায়-করা অংশের চেয়ে বেশি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল ইতোমধ্যে। এই সবকিছু থেকে এটা বোঝায় যে, পৃথক-পৃথক খাজনা-প্রাপ্তার ভূসম্পত্তি গড়ে উঠছিল বস্তুত রাষ্ট্রীয় ভূসম্পত্তির ক্ষতি করে।

সতর শতকে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বাংলায় যতটা তত পরিণত ছিল না মহারাষ্ট্রে; এখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানার ক্ষয় এবং ব্যক্তিগত মালিকানার গড়ে ওঠাটা চলেছিল কয়েকটা পর্বের ভিতর দিয়ে। শিবাজী ভোঁসলার নেতৃত্বে মারাঠাদের মুক্তি আন্দোলনের বিজয়ের ফলে ভূমিতে মোগল সাম্রাজ্যের মালিকানা লোপ পায়। তবে মোগলদের বিরুদ্ধে চলতে-থাকা প্রচণ্ড সংগ্রাম থেকে শক্তিশালী কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, আর উৎপাদনের প্রধান উপকরণে -- এক্ষেত্রে ভূমিতে – রাষ্ট্রীয়

মালিকানাই শুধু হতে পারত অমন রাষ্ট্রের বৈষয়িক ভিত্তি। তাই বহিষ্কৃত কিংবা নিহত মোগল সর্দারদের বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে বিশাল রাষ্ট্রিক ভূমি-তহবিল গড়েছিলেন শিবাজী। ক্ষমাহীন হয়ে দমন করা হয়েছিল বংশানুক্রমিক মারাঠা সর্দারদের বিচ্ছেদকামী অভ্যুত্থানগুলোকে। শিবাজী যাদের উপর নির্ভর করতেন সামন্ত মহলগুলির উপর, – যাদের ভরণ-পোষণ চলত রাজকোষ থেকে সেই সামরিক আর বেসামরিক উপর-মহল এবং জায়গিরদারদের নিয়ে ছিল ঐসব সামন্ত মহল। তবু মহারাষ্ট্রে মাঝারি আর খুদে সামন্ত ভূস্বামীরা বাড়িয়ে নিয়েছিল নিজেদের ভূসম্পত্তিগুলো। খাজনা-কর আদায়ের কাজটাকে রাষ্ট্র ইজারা দেবার ফলেও ভূমিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার উপর আঘাত পড়েছিল। প্যাটেলদের (গ্রাম সম্প্রদায়ের মোড়লদের) মধ্য থেকে খুদে ভূমি-মালিকেরা সাধারণত হত কর-ইজারাদার। এইভাবে, মহারাষ্ট্রে ভূমিতে রাষ্ট্রিক মালিকানার জায়গায় আরও এসে যাচ্ছিল ব্যক্তিগত ভূমি-মালিকানা।

ভোঁস্‌লে রাজ্যে অন্যান্য রাজস্বের মধ্যেও প্রাধান্যশালী ছিল ভূমি-কর। দুঃখের কথা, কোন সামান্যীকৃত উপাত্ত আমাদের হাতে নেই, কিন্তু বৃটিশ বিজয়ের পরে যেভাবে পুনঃসংগঠিত সেইসব পৃথক-পৃথক জেলা সম্বন্ধে যা পাওয়া যায় সেইসব উপাত্ত থেকে দেখা যায় ভূমি-কর হত সর্বমোট রাজস্বের ৮৫-৯৫ শতাংশ। এখানে উল্লেখ করা দরকার – অন্যান্য করের মধ্যে অর্ধেকের বেশি আসত শস্য, তুলো আর (গুড় সমেত) মিঠাইয়ের বাণিজ্যের কর থেকে, আর কাপড়-চোপড়ের বাণিজ্যের কর থেকে আসত অন্যান্য সমস্ত করের প্রায় দশ-ভাগের একভাগ।* ঠিক বটে, অন্যান্য কর আদায় হত নাগপুর শহরে (শহরের শুল্ক)। সেটা হত ভূমি-করের ১৫-২০ শতাংশ, তবে আমদানি, রপ্তানি (নগণ্য) আর অন্তর্বাণিজ্য শুল্ক মিলিয়ে হত তার মোটামুটি অর্ধেকটা, আর এগুলোর মধ্যে শস্য থেকে রাজস্ব হত একেবারে সর্বপ্রধান; হস্তশিল্পের দ্রব্য-সামগ্রী থেকে পাওয়া শুল্ক ছিল নগণ্য (প্রধানত রপ্তানি-করা কাপড়-চোপড় থেকে)। শহরের কাস্টমসের মধ্যে প্রধান শুল্ক ছিল কোহলঘটিত পানীয় বিক্রির উপর কর, আর তারপর মুদ্রা প্রস্তুত করার

উপর লেভি, আর এইগুলো একত্রে মিলিয়ে হত শহরের কাস্টম্‌সের দুই-তৃতীয়াংশ। সেগুলোর পরে আসত ঘর-বাড়ি, দোকান এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির উপর কর (রাজস্বের ১০-১৫ শতাংশ)।* ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে, প্রাচ্য দেশগুলিতে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্থাপিত হবার ফলে গোড়ার দিককার সামন্ততান্ত্রিক মালিকানায়, সর্বোপরি সম্প্রদায়গুলি-তে (এবং সেগুলোর আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের মারফত) উপর-মহলের মালিকানার সুপরিণত সামন্ততান্ত্রিক মালিকানায় পরিণত হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। তবে বৃটিশ হস্তক্ষেপের ছাপ পড়ে ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন জায়মান প্রক্রিয়ার উপর।

সম্প্রদায়ের ভিতরে শ্রমবিভাগের ফলে হস্তশিল্পীরা সম্প্রদায়ের সদস্য-দের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার জন্যে বিভিন্ন নির্দিষ্ট ধারায় বিশেষকৃতি আয়ত্ত করে। সেজন্যে তারা পেত সম্প্রদায়ে জমির মালিকদের ফলানো ফসলের একাংশ এবং নিষ্কর ক্ষুদ্র জমি-বন্দ, কিংবা এই দু'রকমের পারিতোষিকের একটা। এইভাবে, সম্প্রদায়ের ভিতরকার শ্রমবিভাগের ভিত্তি ছিল জীবনযাপনের উপযোগিতা, তাতে নির্ধারিত হয়ে যেত সম্প্রদা-য়ের স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা হিসেবে অস্তিত্ব, যেখানে উৎপাদন 'সেই শ্রমবিভাগের অনপেক্ষ যেটা সমগ্রভাবে ভারতীয় সমাজে ঘটেছিল পণ্য-বিনিময়ের উপায়ে'।** ভারতীয় সম্প্রদায়ের আর্থনীতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার দরুন সম্প্রদায়ের হস্তশিল্পক্ষেত্রে শ্রমবিভাগের নির্মায়ক পর্ব গড়ে উঠতে পারে নি।

শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যের বিকাশ ব্যাহত হয়েছিল গ্রাম সম্প্রদায়ের আর্থনীতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার দরুনই শুধু নয়, তার আরও কারণ এই যে, কৃষির উদ্বৃত্ত-উৎপাদের একটা মোটা অংশ জীবনীয় বস্তুর ভিত্তিতে হস্তান্তরিত এবং আদায় হত খাজনা-কর হিসেবে। শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে আর্থনীতিক সম্পর্কক্ষেত্রে প্রধান উপাদানটা ছিল শহরগুলোতে কৃষিজাতদ্রব্যের একপেশে চালান, – জমির প্রজার কাছ থেকে ঐ উৎপাদ আদায় করে নিত রাষ্ট্র, তাছাড়া পৃথক-পৃথক ভূস্বামীও। মার্কস লিখেছেন, ভারতে পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল শুধু উদ্বৃত্তটাই, আর তারও একটা অংশ সেটা রাষ্ট্রের হাতে পড়ার আগে নয় – 'স্মরণাতীত

কাল থেকে এইসব উৎপাদের কিছু পরিমাণ যার [রাষ্ট্রের] হাতে গিয়ে পড়েছে বস্তু-খাজনা আকারে'।*

সামন্ততান্ত্রিক ভারতে জাতীয় উৎপাদ পুনর্বণ্টনে খাজনা-করের ভূমিকা সম্বন্ধে একটা আগ্রহজনক অনুমান হাজির করেন আর. ওর্ম আঠার শতকের শেষে। তিনি লেখেন: 'ভূমির মালিক রাজা প্রজাদের কাছ থেকে যোগান পাবার বদলে তাদের কাছে বিক্রি করেন তাদের জীবনীয় বস্তু। এই কারণে সংগতি-সংস্থান হয় অন্যান্য সরকারগুলির যাবতীয় কর, শুল্ক আর কাস্টম্‌সের চেয়ে বেশি; কিন্তু তবু সেই সংগতি-সংস্থান ব্যবসাবাণিজ্যের সাহায্যে ছাড়া সোনা কিংবা রুপো উৎপাদন করতে অপারক।'** ওর্ম মনে করেন, এই কারণেই ভারতের শাসকেরা কিছু-কিছু ব্যক্তিগত এবং বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত [কর, এক্তিয়ার, ইত্যাদি] রেহাই দিতেন বণিকদের। তবে আমি বিশেষ করে নির্দেশ করতে চাই একটা অত্যাবশ্যক বিষয়: রাজা জীবনীয় বস্তু বিক্রি করতে পারতেন (কিংবা মাইনে হিসেবে সেটা দিতেন) তার সমস্ত প্রজার কাছে নয়, শুধু কৃষি-বহির্ভূত জনসমষ্টির কাছে, আর অন্যান্য প্রজারা – কৃষকেরা – বস্তুত ব্যাপৃত থাকত এইসব জীবনীয় বস্তু উৎপাদনের কাজে। তাছাড়া, জীবনীয় বস্তু বিক্রি করা হত, একথা বলতে ওর্ম-এর বিবেচনায় ছিল কর আদায়ের সেকেলে রেওয়াজটার কথা, কর আসত বস্তু আকারে, কিন্তু পক্ষান্তরে আঠার শতকে খুব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজকোষে সেটা কর-ইজারাদার মারফত জমা পড়ত নগদ টাকায়। তবে কর-ইজারাদারের হস্তক্ষেপের ফলে প্রক্রিয়াটা শুধু একটু বদলাত, কিন্তু জাতীয় উৎপাদ পুনর্বণ্টনে খাজনা-করের নিষ্পত্তিকর ভূমিকাটা তাতে খোয়া যেত না।

তাহলে, যেসব পণ্যের – বিশেষত ভোগ-ব্যবহারের জন্যে উদ্দিষ্ট পণ্যের – চলাচল হত ভারতের অন্তর্বাণিজ্য আর বহির্বাণিজ্যের নানা খাতে সেগুলোর প্রাচুর্য আর নানাত্ব, দেশটির বণিক আর ব্যাঙ্কারদের কাজ-কারবার আর ধনদৌলতের পরিসর, ব্যবসাবাণিজ্যে এবং তেজা-

---

রতিতেও সামন্ত ভূস্বামীদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ, এসবের সঙ্গে হস্তান্তরণের জীবনীয় বস্তুভিত্তিটা সংযুক্ত হত কিভাবে? তার ফলে স্বভাবতই স্পষ্ট করে তোলা দরকার কোথায় উৎপন্ন হত এইসব পণ্যরাশি, আর সেগুলো ভোগ-ব্যবহারের আর্থনীতিক এবং সামাজিক পরিণতি ছিল কী। অর্থাৎ কিনা, স্পষ্ট করে তোলা দরকার জাতীয় উৎপাদের গঠন, জীবনীয় আর পণ্য উপাদানের মধ্যে স্থিতি, আর জনসমষ্টির বিভিন্ন শ্রেণী এবং বর্গের মধ্যে সেগুলো পুনর্বণ্টনের জন্যে ব্যবহৃত উপায়-উপকরণ। ভারতীয় সমাজের সর্বনিম্ন স্তরগুলিতে এবং আঞ্চলিক আর সারা-দেশজোড়া পরিসরে সেই সমাজের সামাজিক গঠন আখেরে নির্ধারিত হয়েছিল ঐসব প্রতীত ব্যাপার আর প্রক্রিয়া দিয়ে।

সামন্ততান্ত্রিক প্রাক্‌বৃটিশ আমলের, এমনকি বৃটিশ আমলের গোড়ার দিককার যেসব আকর পাওয়া যায় সেগুলিতে এমন যথেষ্ট তথ্যাদি, বিশেষত পরিসংখ্যান উপাত্ত নেই যাতে উত্তরগুলো যোগানো যেতে পারে। বর্তমানে মনে হয় দেওয়া সম্ভব শুধু সেগুলি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতির রূপরেখা, আর এইসব আকরের মর্মবস্তু থেকে মনে যে-ধারণা জাগে সেটার বলা যেতে পারে – অনুমানসিদ্ধ নকশাচিত্র। সম্পূর্ণতা এবং যথাযথতা না থাকায় এবং অনেক সময়ে বদ্ধধারণা অনুসারে দৃষ্টিপাত করার ফলে গবেষণায় পয়দা হতে পারে এমনসব উপাদান যা বিচারসিদ্ধ নয়, নির্ভরযোগ্য নয়। তেমন সম্ভাবনা কমিয়ে সর্বনিম্ন মাত্রায় নামাবার জন্যে, কৃষি-উৎপাদ পুনর্বণ্টন এবং পণ্যে পরিণত করার কর্ম-বন্দেজটাকে অতি-সরল ধরনে ব্যাখ্যা করার বাসনা দমন করা চাই, আর অবিচলিত হয়ে এইসব প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করা চাই বহুযৌগিক হিসেবে, যেগুলো ঘটত বলা যেতে পারে ভারতের সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামের পৃথক-পৃথক স্তরে।

এটা অনস্বীকার্য যে, শের-শাহ এবং আকবরের সাধিত সংস্কারের পরে, ষোল শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে রাজকোষে, বিশেষত কেন্দ্রীয় রাজকোষে খাজনা-কর আদান হত প্রধানত নগদে। তবে গবেষকের পক্ষে ব্যাপারটা দুষ্কর হয়ে ওঠে সেখান থেকেই, তিনি স্পষ্ট করে তুলতে চান খাজনা-করকে বস্তুকর থেকেই নগদান-করে পরিণত করেছিল কে, কোন্ পর্বে। এই ক্রিয়াপ্রণালী হাসিল করে থাকতে পারে জমির মালিক নিজে। গ্রাম্য সুদখোর থেকে বড় ব্যাংকার অবধি

বিভিন্ন ধাপে বণিকের এবং সুদখোরের পুঁজি, খাজনা-প্রাপ্তারা এবং কর-সংক্রান্ত পরিচালন কর্মযন্ত্র (এক্ষেত্রেও সম্প্রদায়ের প্রধান থেকে শুরু করে অঞ্চল-প্রধান এবং খোদ সর্বোচ্চ শাসকেরা অবধি)। মনে হয়, বস্তু-খাজনাটাকে বাজারে নগদ টাকায় পরিণত করার কাজে কোন-না-কোন ভাবে সাধারণত অংশগ্রহণ করত জনসমষ্টির এই সমস্ত অংশই, তবে কৃষিজাত দ্রব্যের বিপণনে এইসব অংশের প্রত্যেকটার হিসসা বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন এলাকায় বদলে যেত। যেহেতু বাজারে উৎপাদের বিক্রেতা উদ্বৃত্ত-উৎপাদের অন্তত একাংশ নিজের জন্যে রেখে দিতে চাইত, তাই জাতীয় উৎপাদ ভোগ-ব্যবহারের ব্যবস্থাটার ভিতরে সংশ্লিষ্ট অংশ কিংবা বর্গের স্থান আর কৃত্য বহুলাংশে নির্ধারিত হত বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ দিয়ে। এইভাবে, গবেষক কোন একটামাত্র ধারায় এগিয়ে প্রশ্নটার সাধারণ মীমাংসা করতে পারার আশা করতে পারেন না।

উৎপাদরাশির যে-অংশটা পৌঁছত বস্তু খাজনা-কর আকারে সেটার বণ্টন আর বিপণনেব উপর রাজকোষেরই এবং বড়-বড় সামন্ত ভূস্বামীদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করাটা স্বাভাবিকই ছিল। বারানি-র তথ্য অনুসারে, আলাউদ্দীনের আমলে দোয়াবে কর (হারাজ) আদান হত শুধু শস্য আকারে, সেটা দিল্লীতে সুলতানের গোলাগুলিতে মজুদ থাকত এবং ব্যবহৃত হত দাম নামিয়ে রাখার জন্যে – বিশেষত শস্যহানির বছরে।* ইব্রাহিম শাহ লৌদীর আমলে আমির আর মালিকদের নগদান-কর আদায় করা নিষিদ্ধ ছিল, তাই তারা বাধ্য হয়ে নিজেরাই শস্য বিক্রি করত কম দামে।** কিন্তু খাজনা-কর উসুল করার এই সরাসর এবং দেখতে-সরল উপায়টা রাষ্ট্রের এবং সেটার উপর-স্তরগুলির বিস্তৃত এবং বহুযৌগিক চাহিদার, কিংবা পণ্য পরিচলনের বিদ্যমান ব্যবস্থার অনুযায়ী ছিল না আর। কর হিসেবে পাওয়া উৎপাদ বিপণনের জন্যে রাজকোষ থেকে রাষ্ট্রের কিংবা কোন বৃহৎ অঞ্চলের চৌহদ্দির ভিতরেও নিজস্ব এবং স্থায়িভাবে চালু ব্যবস্থা স্থাপন করেছিল বলে কোন সরাসর হদিস পাওয়া যায় না। এখানে এটা উল্লেখযোগ্য যে, আলাউদ্দীনকে

দালালদের করবেনিয়ানদেরী খিদমত কাজে লাগাতে হয়েছিল – শস্য রাজধানীতে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাদের কাজ। এইসব ঝঞ্ঝাট ছিল বলে রাজকোষ নগদ আদানে বেশি আগ্রহান্বিত ছিল স্বভাবতই। প্রকৃত-পক্ষে, শের-শাহ এবং আকবরের চালু-করা সংস্কারগুলি এসেছিল কর নগদে পাবার প্রয়োজন থেকে, তাতে সর্বোত্তম বিবেচিত হত যখন সেটা আসত করদাতার নিজ হাত থেকে এবং অন্তত কর যখন স্থানান্তরিত হত রাজকোষের অধস্তন স্তরগুলো থেকে কেন্দ্রীয় স্তরগুলিতে।

ভূমি-কর সরাসরি নগদে আদায় করা আরও বেশি কঠিন ছিল, তার কারণ গ্রাম্য করদাতার – কৃষক কিংবা ছোট আর মাঝারি সামন্ত-ধরনের ভূস্বামীর – অর্থনীতি ছিল আপকেওয়াস্তে, আর তাছাড়া, কোন-কোন এলাকায় খাদ্য আর কাঁচামালের জন্যে ক্রয়ক্ষম চাহিদা যথেষ্ট ছিল না। আরও উল্লেখ্য এই যে, শের-শাহ এবং আকবর নগদে কর-আদায়ের ব্যবস্থা জারি করে বহু গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে সরাসরি নগদে কর-আদায় থেকে রেহাই দিয়েছিলেন; বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জি-রচয়িতা যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে ব্যবস্থাটা ছিল প্রথামতো করদাতাদের অবস্থার আসান করার জন্যে।*

সাধারণ্যে যা প্রচলিত তাতে 'রায়ত' বলতে বোঝায় 'ভূমি-কর প্রদাতা কৃষক', সেটার বদলে আমি সযত্নে বিবেচনা করে হাজির করছি অভিধাটার আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা, তাতে 'রায়ত' বর্গের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সেইসব ভূমি-মালিক যারা প্রধানত গ্রামের নিচের স্তরগুলি থেকে চুক্তিপত্র দিয়ে আবদ্ধ মজুর দিয়ে আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ চালাত সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তিতে, কিংবা, যা-ই হোক, যারা ছিল সম্প্রদায়ের এবং সেটার কর্তৃপক্ষের উপর-স্তরগুলোর মানুষ। ভারতীয় গ্রামীণ জনসমষ্টি প্রসঙ্গে 'কৃষককুল' অভিধাটার প্রয়োগ উপযুক্ত কিনা সে-সম্বন্ধে এর থেকে কিছুটা সংশয় দেখা দিচ্ছে স্বভাবতই। এই ধারণাটার ভিত্তি যদি হয় ভূমির প্রতি শ্রমঘটিত মনোভাব, অর্থাৎ কৃষি-উৎপাদনে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ, তাহলে এই বর্গে অন্তর্ভুক্ত করতে হয় জনসমষ্টির এমন কোন-কোন অংশকে যাদের মধ্যে সামাজিক আর মালিকানা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠার দিক থেকে তুলনা চলে না: সম্প্রদায়ের গ্রাম-সেবকদের মধ্যে

অচ্ছুতরা. আর সম্প্রদায়ের কোন-কোন উপর-স্তর যারা (যেমন মহারাষ্ট্রে) চাষবাসে অংশগ্রহণ করত। কিন্তু এরা কোন দিক থেকেই একই সামাজিক শ্রেণীতে সম্মিলিত ছিল না, – শুধু ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক এবং ফসলের পরিমাণ আর তাতে দাবির কারণের ভিত্তিতেও নয়। কয়েকটা শর্তাধীনে 'কৃষককুল'-সংক্রান্ত ধারণাটার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে শুধু উপরকার জাত-বর্ণগুলোর মধ্য থেকে সেইসব ভূমিকর্ষক যাদের জমিতে ভোগস্বত্ব ছিল রায়ত হিসেবে। কিন্তু ভারতে গ্রামীণ জনসমষ্টির এই বর্গে লোকসংখ্যা ছিল ক্ষুদ্র, সেটা 'কৃষককুল'-সংক্রান্ত ইউরোপীয় ধারণার বিরুদ্ধ, এই ধারণায় 'কৃষককুল' বলতে বোঝায় গ্রামাঞ্চলে যারা চাষবাস করে সেই সংখ্যাগুরু অংশ।

মারাঠিতে রায়তের প্রতিশব্দ 'মালগুজার'-এর অর্থ হল সাধারণভাবে 'যে কর দেয়', এতে জোর পড়ে ধারণাটার অধিকতর বিস্তৃত অর্থের উপর; তাই কোন রায়ত কিংবা জনসমষ্টির তদনুরূপ কোন বর্গের নগদে কিংবা বস্তুতে কর দেবার কথা কোন আকরে উল্লেখ করা হলে – অতিরিক্ত মালমশলা ছাড়া – শুধু সেটার ভিত্তিতেই স্থির করা সম্ভব নয় অভিধাটা দিয়ে বোঝান হচ্ছে জনসমষ্টির ঠিক কোন্ নির্দিষ্ট বর্গটাকে – জমির সাধারণ ভোগস্বত্বাধিকারী, সামন্ত ধরনের ভূস্বামী, না গ্রামের মোড়ল। কর দেবার জন্যে আবশ্যক পরিমাণ অর্থ পাবার জন্যে উৎপাদ বাজারে ছাড়ত এগুলির মধ্যে কোন্টা তা নিশ্চয় করে বলার ভিত্তি আরও কম।

তাছাড়া, 'আইন-ই-আকবরী' ('আকবর-সংহিতা') থেকে যে-অংশটা প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয় কৃষক নিজে নগদান-কর দিত বলে প্রতিপন্ন করার জন্যে, সেটাকে তো মনে হয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে খুবই সংকীর্ণ অর্থে। এই রচনাংশে আছে যে, প্রত্যেক বছরের কর-আদান হত আট মাস ধরে কিস্তিতে-কিস্তিতে। কর-আদানের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় রায়তরা নিজেরাই নিয়ে যেত মোহর আর রুপেয়া, কেননা রাজকোষ আর কৃষকের মধ্যে শস্য ভাগাভাগি করার রেওয়াজ এখানে (বাংলায়) ছিল না; ফসল বরাবরই ফলত প্রচুর, একেবারে সঠিক মাপজোখের জন্যে পীড়াপীড়ি করা হত না, আর করের পরিমাণটা স্থির করা হত ফসলের মোটামুটি পরিমাণ অনুসারে। এর থেকে দেখা যায় করটা বাঁধা ছিল না, সেটা বছর-বছর স্থির করা হত ফসলের পরিমাণ অনু-

সারে। কঠোরভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি-কর যোগাবার যে দায়-দায়িত্ব ছিল প্রত্যেকটা সুবার (প্রদেশের) তার পরিপন্থী ছিল এই রেওয়াজটা। তাই টি. আর. রায়চৌধুরী ঠিকই বলেছেন যে, কর ধার্য এবং আদায় করার উক্ত রেওয়াজ প্রযোজ্য হতে পারত শুধু খালিসাদের জমিতে, তারা ছিল সরাসরি রাজকোষের নিয়ন্ত্রণাধীন (এই ভারতীয় বিজ্ঞানীর এই বিবৃতির ভিত্তি হল এই যে, রায়ত আর কর সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের মধ্যে সরাসর সম্পর্ক ছিল)।*

বাংলায় ভূমি-কর কৃষক নিজেই দিত জমিদারের খিদমত করা ছাড়াই, এমনটা ধারণা করা বাস্তবিকই কঠিন। শেষে, এক্ষেত্রে রায়তদের মধ্যে পড়তে পারত শুধু প্রধানেরা, যারা কর জমা দিত গোটা গ্রামের তরফে, কেননা পৃথক-পৃথক কৃষকের দেয় কর ছিল এক সোনার মোহরের কম। আরও পরেকার মালমশলার ভিত্তিতে, আমি দেখাতে চাই 'রায়ত'-সংক্রান্ত ধারণাটার মধ্যে পড়ত বাংলায় সম্প্রদায়ের খুবই বিভিন্ন অংশ। যা-ই হোক, ষোল শতকের শেষের দিকে বাজারের সঙ্গে এমন যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল যার ফলে ভূমির সাধারণ প্রজারা নগদান-কর দিতে পারত, এমনটা সাব্যস্ত করার মতো কোন পাকা-পোক্ত প্রমাণ কোন দিক থেকেই পাওয়া যায় না 'আইন-ই-আকবরী'র উল্লিখিত রচনাংশে। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি অনেক পরেও – দুই শতাব্দী পরে – তাদের এবং কর-সংস্থার মধ্যে বহু মধ্যস্থ গ্রন্থি দেখা যায়।

মহারাষ্ট্রে কৃষির উদ্বৃত্ত-উৎপাদ আদায় এবং ভোগ-ব্যবহার করায় বিশেষত মস্ত একটা ভূমিকা ছিল গ্রামের প্রধানদের (পেটেলদের)। ভোঁসলে রাজ্যে কর আদায় করায় পেটেল যেভাবে অংশগ্রহণ করত তাতে সে মহাজন হিসেবে রায়তকে শর্তাবদ্ধ করতে এবং তার জমি-বন্দ হস্তগত করতে পারত শুধু তাই নয়, তার অধীন রাজস্ব-সংস্থা থেকে আসা মোট ভূমি-করের চতুর্থাংশ কিংবা ষষ্ঠাংশ (কেউ-কেউ বলেন ১৫ শতাংশ) পাবার অধিকারও তার ছিল। ঠিক বটে, কোন-কোন রাজন্য-শাসিত রাজ্যে কর-সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ কোন-কোন ক্ষেত্রে পেটেলের এই অধিকার কেড়ে নিত কিংবা তার হিসসটা কমিয়ে দিত। কিন্তু রায়তের কাছ থেকে উপরি

আদায় করার ফাঁক বের করতে পারত পেটেলরা।* রাজস্ব-সংক্রান্ত এবং চোটার কাজ-কারবার থেকে পেটেলদের হস্তগত হয়েছিল বহু বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড; তাদের মধ্যে কারও-কারও ছিল ১০ থেকে ২০ প্রস্ত সরঞ্জাম (বলা হত 'লাঙল'), এর থেকে সেটা স্পষ্ট। নাগপুরে মহারাষ্ট্রের অন্যান্য এলাকার মতো নয় – পেটেলদের মধ্যে কিংবা রায়তদের মধ্যে ছিল না কোন ওয়াতানদার (অর্থাৎ নিষ্কর জমির অধিকারী)। তাই পেটেল তার জমি বাবত কর দিত সাধারণ প্রজার সমানই – প্রত্যেকটা 'লাঙলের' জন্যে ৪ থেকে ১৬·৫ রুপেয়া – সেটা নামেমাত্র।** কিন্তু পেটেলের নিজ জমিগুলো থেকে পাওয়া করের একটা নির্দিষ্ট অংশ রেখে দেবার অধিকারও ছিল।

পেটেলের সমৃদ্ধির বিভিন্ন দফা সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি আকরগুলিতে; ঐসব দফা হল – কর থেকে কাটান, নিজ খামার থেকে আয়, আর চোটার সুদ। পেটেল কখন ছিল প্রধানত কর-সংস্থার এজেণ্ট, ভূমি-মালিক, কিংবা সুদখোর, সেটা স্থির করা ঐ কারণে কঠিন। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, যার ছিল মোটামুটি বৃহদায়তনের নিজস্ব জোতজমা এমন ভূমি-মালিক হিসেবে, আর বীজ এবং গবাদি পশুর জন্যে ঋণ দিয়ে সাধারণ কর্ষকদের আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের নিয়ামক মহাজন হিসেবে, উভয়ত পেটেল ছিল সম্প্রদায়ের আর্থনীতিক জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। তাই সম্প্রদায়ের কারিগরদের অবস্থা বহুলাংশে নির্ভর করত পেটেলের উপর – সেটা সরাসরি (যখন তারা কাজ করত তার জন্যে) কিংবা পরোক্ষে (যখন তারা কাজ করত সাধারণ কর্ষকদের জন্যে)।

কৃষি-উৎপাদের বাজার-চলনের মাত্রা যা-ই হোক না কেন, প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের আমলে সমগ্রভাবে সমাজের পরিসরে ঐ উৎপাদের আখেরী বাজার-চলনের মাত্রা একদিক থেকে হতে পারত খোদ কৃষকের উৎপাদনের বাজারচলনেব ব্যস্ত-অনুপাতী, যদিও বিপুল পরিমাণ খাজনা দেবার ফলে শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে স্বাধীন বাণিজ্য-সম্পর্ক ব্যাহত হত কিছু পরিমাণে। 'উৎপাদ চালান কিংবা বিক্রি করাটা কৃষিজীবীর রাষ্ট্র কিংবা জমিদারের পাওনা মেটাতে আনুকূল্য করত, কিন্তু শহরে শিল্পের উৎপাদ উপযুক্ত পরিমাণে কেনার মতো সংগতি-সংস্থান সে তার বিনিময়ে

পেত না সাধারণত।'* এমনকি আঠার শতকে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও জমির প্রজারা সাধারণত সরাসরি কর-ইজারদারকে কর দিত বস্তুতে কিংবা মহাজনের কাছ থেকে ধার-করা নগদ টাকায়, সেই মহাজনকে তারা পরে দিত তাদের ফসলের একাংশ – এটা ছিল গুজরাটে, মৈসুরে আর রাজস্থানে, অর্থাৎ যেসব অঞ্চলে ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত পণ্য-অর্থ সম্পর্ক।** ঐ দুয়ের কোন ক্ষেত্রেই জমির প্রজার নগদান-কর দেবার জন্যে বাজারে যাবার কিংবা স্বাধীন পণ্য-উৎপাদক হবার দরকার ছিল না।

মোগল আমলের ভারতে ভূমি-কর (নগদে মেটান) এবং শহরগুলিতে মজুরদের মজুরির ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে ছিল বস্তু-কর এটাকে সমর্থন করে একটা আগ্রহজনক মন্তব্য করেছেন আই. হাবিব, তিনি নিশ্চয় করে বলেন, সতর শতকে 'দাম-বিপ্লব' ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপ থেকে (মধ্য প্রাচ্য হয়ে এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে সমুদ্রপথে) ভারতে দামী জিনিসপত্র আগমের ফলে। এমন জটিল ব্যাপার নিয়ে বিশেষ বিচার-বিশ্লেষণ আবশ্যক নিশ্চয়ই (সেটা শুরু করেছিলেন আজিজ হাসান), তবে এটা বেশ ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সতের শতকে, বিশেষত সেটার দ্বিতীয়ার্ধে দাম বেড়েছিল যুদ্ধবিগ্রহের প্রভাবেও, তাতে গুজরাট, মহারাষ্ট্র আর পাঞ্জাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সরবরাহ বানচাল হয়েছিল।

তবে বিবেচ্য বিষয়টায় ফিরে আসা যাক। সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় হল এই যে, নগদান-কর এবং মনে হয় শহরে মজুরি চালু হয়েছিল

দাম বাড়ার – সর্বোপরি খাদ্য-সামগ্রীর দাম বাড়ার – পিছনে-পিছনে। হাবিব বলেন, মোগল কর্তৃপক্ষ স্রেফ নগদান-কর বাড়ানোতে এবং সেটা বস্তুশোধের পরিমাণের হিসাব কষায় (পরে সেটাকে বাজার-দর অনুসারে নগদে পরিণত করায়) ব্যাপৃত ছিল। জন খাটানোতে মজুরির হার বেড়ে গিয়েছিল তদনুসারে (ঠিক বটে, দৃষ্টান্ত আছে মাত্র একটা: সুরাটে অদক্ষ মজুরের ১৬৯০ থেকে ১৬৯৩ সালে মাসিক পারিশ্রমিক ২·৪ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছিল ৪ টাকা)।* কর আর মজুরির সহচারী মান থেকে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে এটা মনে হয় যে, গ্রাম সম্প্রদায়ের যে উপর-স্তরগুলি আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করত তারা, কিংবা শহুরে হস্তশিল্পের উদ্যমী অংশগুলি, এরা কেউই 'দাম-বিপ্লব' থেকে বেশিকিছু লাভবান হয় নি (যেমনটা হয়েছিল পশ্চিমের হস্তশিল্পীরা)।

শেষে, মূলত পৃথক-পৃথক দুটো ধারণামৌলের মধ্যে অনেক সময়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার, ঐ দুটো হল: উৎপাদের পণ্য-প্রকৃতি (আরও যথাযথভাবে বললে – বাজার-চলন), আর উৎপাদের নিজেরই পণ্য-প্রকৃতি। ভারতীয় কৃষিতে উদ্বৃত্ত-উৎপাদের অপেক্ষাকৃত চড়া হার, আর ভূমি-কর এবং অন্যান্য দেওন বাবত সেটা আদায় হবার কথা বিবেচনায় রাখলে দেখা যায়, কৃষি উৎপাদের একটা মোটা অংশ সেটার মালিক নিজেই সেটাকে সরাসরি বাজারে না ছাড়লেও পণ্যে পরিণত হতে পারত খাজনা-প্রাপ্তা কিংবা কর-ইজারাদারের হাতে।

যেখানেই কর-ইজারাদার এবং তার গোমস্তা ভূমি-কর আদায় করত সেখানে মহাজনকে খামারীর দেওয়া সুদটা যেন হয়ে দাঁড়াত খাজনা-করের মতো, এবং একদিক থেকে সেটা ছিল যেন রূপান্তরিত খাজনা-কর (সেটা একটা স্বতন্ত্র উপাদান হয়ে দাঁড়াত, যা শেষে প্রতিপন্ন হয় ব্রিটিশ আমলে)। খাজনা আর মহাজনের সুদের মাধ্যমে কৃষিজাত দ্রব্যের পণ্যে পরিণত হওয়াটা কৃষিতে উৎপাদের পণ্যে পরিণত হওয়া ব্যাহত করত, কেননা উদ্বৃত্ত-উৎপাদের যে-অংশটাকে উৎপাদক বাজারে ছাড়ার পরে কেনা উৎপাদনের উপকরণের জন্যে বিনিময় করতে পারত এবং নিয়োগ করতে পারত সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের জন্যে সেটা থেকে সে বঞ্চিত হত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষি এবং হস্তশিল্পের মধ্যে সামাজিক শ্রমবিভাগ

গ্রাম্য হস্তশিল্প এবং কৃষির মধ্যে যোগসূত্র

তাঁত বোনা আর ঘানির কাজ সম্প্রদায়ের হস্তশিল্প ব্যবস্থার বাইরে পড়ে গিয়েছিল (অন্তত এখনও আলোচ্য কালপর্যায় নাগাদ), এই অবস্থাটার প্রভাব পড়েছিল ভারতীয় গ্রামাঞ্চলে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের পরিসরের উপর। তবে ভোগ-ব্যবহারের উপকরণ উৎপাদনের জন্যে সম্প্রদায়ের ব্যবস্থাটা থেকে ঐ দুটো পৃথক হয়ে যাবার কোন সরাসর ক্রিয়াফল ঘটে নি কৃষিক্ষেত্রে পুনরুৎপাদনের আপকেওয়াস্তে ভিত্তির উপর, অর্থাৎ কৃষিকাজ এবং তাতে সরঞ্জামের যোগানদার হস্তশিল্পের মধ্যে স্বভাবজ সম্পর্কের উপর।

বড়-বড় ভূসম্পত্তি গড়ে ওঠার ফলে, শুধু তাতেই সামাজিক শ্রম-বিভাগের বিদ্যমান ব্যবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায় নি। ভূমিতে রাষ্ট্রিক মালিকানা এবং সম্প্রদায়গত সংগঠনের প্রাধান্যের আমলে উদ্বৃত্ত-উৎপাদ পণ্যে পরিণত হত প্রধানত রাষ্ট্রের খাজনা-করের মাধ্যমে, কিন্তু ভূমিতে মালিকানা স্বত্ব মজবুত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উদ্বৃত্ত-উৎপাদের একাংশ নজরানা কিংবা ভূমি-খাজনা হিসেবে পেয়ে সেটাকে বস্তু আকারেই সরাসরি ভোগ-ব্যবহার করত বড়-বড় সামন্ত ভূস্বামীরা, আর-একটা অংশকে বিলাসদ্রব্যে এবং অন্যান্য ভোগ্য উপকরণে পরিণত করা হত তাদের জন্যে, বাদবাকিটা হত কারিগরদের পারিশ্রমিক। এইভাবে, ভূমি-খাজনার যে-অংশটা স্থানীয় ভূমি-মালিকেরা পেত সেটা বেড়ে চলার ফলে শুধু তাতেই অর্থনীতির জীবনীয় ভিত্তি অপসারিত হয় নি। সেটা বোঝাই যায়, কেননা উন্নয়ন তখনকারমতো সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর চৌহদ্দি ছাড়িয়ে যায় নি, এই প্রণালীর বিশেষক ছিল জীবনীয়ভিত্তিক অর্থনীতি। তার সঙ্গে সঙ্গে, খাজনায় স্থানীয় ভূমি-মালিকদের হিসসা বেড়ে চলার ফলে সেটার বণ্টন আর ভোগ-ব্যবহার গণ্ডিবদ্ধ

হয়ে যেত কৃষির উদ্বৃত্ত-উৎপাদ যেখানে পয়দা হত সেই এলাকায়, আর সেটা হত চারপাশের হস্তশিল্পের সঙ্গে বিনিময়ের তহবিল।

ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব পাকা-পোক্ত হয়ে উঠতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উদ্বৃত্ত-উৎপাদেরই শুধু নয়, আবশ্যক উৎপাদেরও একাংশ বণ্টনে সম্প্রদায়ের এক্তিয়ার ক্রমেই বেশি-বেশি পরিমাণে লঙ্ঘিত হতে থাকে। সম্প্রদায়মধ্যে উৎপাদ বণ্টনের কর্ম-বন্দেজের উপর জমিদারী ভূমি-মালিকানা মজবুত হয়ে ওঠার ক্রিয়াফল সম্বন্ধে আগ্রহজনক তথ্যাদি জেম্‌স ফর্বেস দিয়েছেন গুজরাটী সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁর বিবরণে। ১৬ বছর বয়সে, ১৭৬৫ সালে তিনি গিয়েছিলেন বোম্বাইয়ে, সেখানে তিনি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী হন। চার বছর ধরে তিনি গুজরাটে তসিলদারি করেন, তাছাড়া তুলোর ব্যবসায়ে জড়িত ছিলেন ব্রোচ্‌-এ। ১৭৮৪ সালে তিনি বৃটেনে ফিরে যান, সেখানে তিনি একখানা বই প্রকাশ করেন ভারত সম্বন্ধে তাঁর টুকে-রাখা তথ্যাদির ভিত্তিতে; বৈচারিক পর্যালোচনা করলে এই বই থেকে অনেক আগ্রহজনক তথ্য পাওয়া যায়।*

গ্রাম সম্প্রদায়ে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনায় তিনি বলেন, 'পাইসিটা আর ভায়িসা ভূমি নামের বিশেষ কোন-কোন মাঠ প্রত্যেকটা গ্রামে পৃথক করে রাখা হয় বারোয়ারি প্রয়োজনে...; এইসব জমির উৎপাদের বেশির ভাগ আলাদা করে রাখা হয় ব্রাহ্মণ, কাজী, রজক, কর্মকার, ক্ষৌরকার এবং খোঁড়া, অন্ধ আর নাচারদের ভরণপোষণের জন্যে, তাছাড়া অল্পকিছু ভের্টুন্নি বা অস্ত্রধারীদের প্রতিপালনের জন্যেও, এদের রাখা হয় গ্রামরক্ষার জন্যে।** ফর্বেস মনে করতেন, পাইসিটা জমির যে-ফসল পাবার কথা ছিল ব্রাহ্মণ আর কারিগরদের সেটা জমিদারেরা হস্তগত করল বলে কৃষকদের মস্ত ক্ষতি হল ঐ কারণে।***

ভূসম্পত্তি ক্ষেত্রে এবং সম্প্রদায়মধ্যে উৎপাদ ভাগাভাগি ক্ষেত্রে পরি-

---

বর্তনগুলোর মধ্যে সংযোগটা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কৃষি-কাজ আর হস্তশিল্পের মধ্যে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের পরিসর সম্বন্ধে চট্ করে কোন সিদ্ধান্ত করে ফেলা চলে না।

সম্প্রদায় থেকে তন্তুবায়দের এবং – হাবিব যোগ করেছেন – তেলি আর ধুনারিদেরও পৃথক হয়ে যাবার যে-প্রভাব নাকি পড়েছিল সম্প্রদায় 'ধ্বংস হবার' উপর সে-সম্বন্ধে ল. আলায়েভ এবং আমি আগে-কার কোন-কোন রচনায় যে-ধারণা প্রকাশ করেছি সেটার সমালোচনা করে তিনি খুব ঠিকই করেছেন। হাবিব বলেছেন, এইসব কারিগর আর গ্রামবাসীদের মধ্যে সম্পর্ক নির্দিষ্ট ছিল চিরাগত রেওয়াজ অনুসারে, এটা লক্ষ্য করলে সম্প্রদায় কিভাবে ভেঙে যেতে পারল সেটা বের করা কঠিন।* কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমার বর্তমান মতাবস্থানটা মূলনীতির দিক থেকে হাবিবের কাছাকাছি। তার সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেকটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এইসব রেওয়াজ এবং তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই।

যারা প্রধানত যোগান দিত কৃষক অর্থনীতির উৎপাদন-সংশ্লিষ্ট চাহিদা অনুসারে সেই কারিগরেরা (সূত্রধর, কর্মকার, চর্মকার, কুম্ভকার) সাধারণত সম্প্রদায়ে নিজেদের অবস্থান সমানে বজায় রেখেছিল এবং সম্প্রদায় থেকে পারিতোষিক পেত তদনুযায়ী। ব্যবহারকের ফরমাশ নিয়ে পৃথক-পৃথক লেনদেন হত জমির প্রজাস্বত্বাধিকারী এবং কারিগরের মধ্যে, তাতে পাওনা মেটান হত জিনিস দিয়ে কিংবা নগদে (এক্ষেত্রে কাজ বাবত দেওনটা সম্প্রদায়ের পারিতোষিক ব্যবস্থার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে যেত)।

শহুরে আর গ্রামীণ কর্মকাররা বিক্রির জন্যে যেসব কৃষিকাজের সরঞ্জাম, বিশেষত তার লোহার অংশগুলো তৈরি করত, সে-সম্বন্ধে যেসব তথ্য বের করা হয়েছে সেগুলি খুবই আগ্রহজনক। লোহা গ্রামে পৌঁছবার আগে সেটাকে অনেক সময়ে বিশেষ ধরনের পাতের আকার দেওয়া হত লাঙলের ফলা, নিড়ানি, হাতুড়ি এবং কাজের অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরি করার জন্যে। যেসব জায়গায় খনিজ লোহা পাওয়া যেত এবং লোহা বিগলন হত সেগুলির কাছে কাজ করত কর্মকাররা, কেননা –

বুকানান বলেন — নিরেস লোহা কখনও নেওয়া হত না দূর-দূর বাজারে।* তার সঙ্গে আরও বলা দরকার, বিগলন-করা লোহায় এতসব যৌথ পদার্থ থাকত যাতে সেটা শোধনের জন্যে বারবার বিশেষ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হত। এই কাজে ঢালাই করার বস্তুটাকে প্রাথমিক আকার দেওয়া হত। তবে সম্প্রদায়-বহির্ভূত কর্মকাররা লোহাটাকে কৃষি সরঞ্জামের বিভিন্ন অংশকে প্রাথমিক, এমনকি পরিসমাপ্ত আকার দিলেও কৃষিকাজ আর হস্তশিল্পের (এক্ষেত্রে কর্মকারের কাজ) মধ্যে সম্প্রদায়-মধ্যস্থ মূল যোগসূত্র বিপর্যস্ত হত না। প্রথমত, লোহা দিয়ে তৈরি অংশটাকে সরঞ্জামের কেঠো অঙ্গগুলোতে জোড়া দেবার কাজটা তখনও বাকি থাকে। তাছাড়া — যা ছিল আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ — ভূমিস্বত্বাধিকারী কৃষক কোন সরঞ্জামের লোহার অংশটা কিনত ১০-১২ বছরে একবার,** কিন্তু সেটা মেরামতের ব্যাপারটা (বিশেষত লোহাটা নিরেস ছিল বলে) থেকে যেত গ্রামের কর্মকারের দৈনন্দিন কাজ। অধিকন্তু, সূত্রধর আর কর্মকারকে মালমশলা কিংবা কোন আধা-তৈরি জিনিস যোগানোটা ছিল জমির প্রজার দায়িত্ব, এটা ছিল বহুবিস্তৃত রেওয়াজ, তার ফলে সম্প্রদায়-বহির্ভূত কোথায়ও এইসব কারিগরের স্বাধীন পণ্য-অর্থ সম্পর্ক স্থাপনের ঝোঁক দেখা দেবার সম্ভাবনা বড় একটা থাকত না, কারিগর আবদ্ধ থাকত সম্প্রদায়ের চৌহদ্দির ভিতরে। এর সঙ্গে আরও বলা দরকার যে, চর্মকার আর কুম্ভকারের প্রতি জমির প্রজার এমন কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না — তাদের মালমশলা নিজেদেরই সংগ্রহ করতে হত গ্রামের মধ্যেই। তার সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার, কৃষি সরঞ্জাম তৈরি করার গণ্ডিবদ্ধ সম্প্রদায়মধ্যস্থ ব্যবস্থাটা মনে হয় ছিল না সারা ভারতে সর্বত্রই। কৃষি আর হস্তশিল্পের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন অঞ্চলগত পার্থক্য স্থির করা প্রয়োজন, সেটা তো স্পষ্টই।

আঠার শতকের অষ্টম দশকে গুজরাটের গ্রামাঞ্চলে সম্প্রদায়ের কারিগরদের পারিতোষিকের যে-ব্যবস্থাটা চালু ছিল সে-সম্বন্ধে আগেকার যে-বিবরণ আমাদের জানা ছিল তার উপর ফর্বেস দিয়েছেন নিজ বিবরণ।

তিনি বলেন: 'লাঙল চষার এবং কৃষির অন্যান্য কাজের গবাদি পশু কখনও-কখনও গ্রামের বারোয়ারি সম্পত্তি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সম্পত্তি। পেটেল যোগায় বীজ আর কৃষিকাজের সরঞ্জাম...' আগে বলা হয়েছে, পাইসিটা আর ভাইসা জমি নামের বিশেষ-বিশেষ মাঠ প্রত্যেকটি গ্রামে পৃথক করে রাখা হত বারোয়ারি প্রয়োজনে লাগাবার জন্যে। এইসব জমি যেভাবে কাজে লাগানো হত তাতে বিভিন্ন এলাকার মধ্যে পার্থক্য ছিল, তবে বেশির ভাগ এলাকাতেই ব্রাহ্মণ, কাজী, রজক, ক্ষৌরকার এবং কর্মকারদের (ফর্বেস শুধু এই কারিগরের কথাই উল্লেখ করেছেন) ভরণপোষণের জন্যে। যেহেতু ক্ষৌরকারের সময় থাকে না 'কৃষিকাজ কিংবা পরিবার প্রতিপালনের জন্যে, তাই বারোয়ারি খরচে তার ভরণপোষণ হওয়াটা তো ন্যায্যই; এটা প্রযোজ্য রজক আর কর্মকারের বেলায়ও, তারা গ্রামের জন্যে কাজ করে অন্য কোন সুযোগ-সুবিধাদি ছাড়াই'।*

ফর্বেস যে-ধরনের সম্প্রদায়ের বর্ণনা করেছেন তাতে (কিংবা, অন্তত কোন একটাতে) ছিল এইসব উপাদান: গবাদি পশুর একাংশে বারোয়ারি মালিকানা; যেটার কাজ চলত নিশ্চয়ই বারোয়ারি ধরনে এমন একটা বিশেষ ভূমি তহবিল স্থাপন করে জমির প্রজাদের জন্যে সম্প্রদায় থেকে (পেটেল-মোড়ল মারফত) বীজ আর সরঞ্জাম সরবরাহ; এই জমিতে ফলানো ফসল সম্প্রদায়ের কর্মচারী, গ্রাম-সেবক আর কারিগরদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা। কারিগরদের মধ্যে বলা হয়েছে শুধু কর্মকারের কথা, যাদের পারিতোষিক দেওয়া হত কৃষি সরঞ্জাম তৈরি করার জন্যে। কিন্তু যারা পয়দা করত শুধু ভোগ-ব্যবহারের জিনিস (যেমন তন্তুবায়, তেলী), আর যারা তৈরি করত ভোগ-ব্যবহারের জিনিস এবং উৎপাদনের উপকরণ (সূত্রধর, চর্মকার, কুম্ভকার) তাদের পারিতোষিক দেওয়া হত কিভাবে সেটা বলা হয় নি ফর্বেসের বর্ণনায়। সম্প্রদায়ের সদস্যদের ফরমাশ অনুসারে জিনিস তৈরি করে দেবার জন্যে কর্মকারকে পারিতোষিক দেবার নিয়মটা ছিল কী সে-সম্বন্ধেও তিনি কোন তথ্য দেন নি।

ব্রোচ্ থেকে ১৮১৫ সালের ১০ জুন তারিখের কর-সংক্রান্ত একটা বিবরণে পাইসিটা জমি সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট বর্ণনায় সেটাকে বলা হয়েছে

প্রত্যেকটা গ্রামে, 'বিভিন্ন রকমের কারিগরদের ভরণপোষণের জন্যে' পৃথক করে রাখা জমি। যাজক, সম্প্রদায়ের চাকর-বাকর আর জেলার কর্মচারীদের জন্যেও ব্যবহৃত হত সেই জমি। কোন জেলায় এমন জমির মোট পরিমাণ ছিল ৩৬,৫৬৩ বিঘা অবধি। 'সূত্রধর, কর্মকার, কুম্ভকার, দরজি, রজক, ক্ষৌরকার, মুচি, চর্মকার, গ্রামের এইসব কারিগরের দখলে থাকত তার থেকে ৫১৯০ বিঘা মাত্র। সম্প্রদায়ের চাকর-বাকরের (ভিল, জেইর, ইত্যাদি) দখলে থাকত ঢের বেশি জমি – ১৪,৩৮০ বিঘা; আর এইরকমের জমির বাদবাকিটা থাকত সরকারী কর্মী-কর্মচারী এবং যাজক, মন্দির আর মসজিদের দখলে, অর্থাৎ বস্তুত সেটা ছিল নিষ্কর সামন্ততান্ত্রিক ভূমিসম্পত্তি।* কাজেই দেখা যাচ্ছে, ঐরকমের জোতজমাগুলোরও নগণ্য অংশমাত্র ছিল কারিগরদের।

সম্প্রদায়ে উৎপাদনের উপকরণ এবং ভোগ-ব্যবহারের জিনিস তৈরি করার কারিগরদের জন্যে ভিন্ন-ভিন্ন পারিতোষিক

সামাজিক শ্রমবিভাগ সম্বন্ধে মালমশলা রয়েছে এফ. বুকাননের যেসব রচনায় সেগুলি না থাকলে উল্লিখিত (এবং আরও কোন-কোন) বিষয় নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা আরও কঠিন হত। ১৮০১ থেকে ১৮১১ সালে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এই কর্মকর্তাটিকে বাংলা, বিহার, মৈসুর এবং কর্ণাটক সফরের কার্যভার দেওয়া হয়েছিল প্রধানত কৃষি-উৎপাদন, বাণিজ্য এবং হস্তশিল্প সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্যে। অর্থনীতি-বহির্ভূত উপায়াদি (অর্থাৎ বিভিন্ন কর এবং সামরিক খেসারত) প্রয়োগ করেই শুধু নয়, বাণিজ্য সম্প্রসারণের সাহায্যেও ভারতের জনসমষ্টির উপর শোষণের ধারা-ধরন স্থির করার জন্যে ভারতীয় অর্থনীতির এইসব শাখা সম্বন্ধে তথ্যাদি কোম্পানির পাওয়া দরকার ছিল। ভারতে দখল-করা রাজ্যক্ষেত্রগুলির এক-একটা অঞ্চল ধরে বিবরণ প্রস্তুত করার জন্যে ইংরেজ কর্মকর্তাদের প্রথম-প্রথম প্রচেষ্টাগুলির একটা হল বুকাননের।

নিজের পর্যবেক্ষণ-উপাত্ত ছাড়াও বুকানন ব্যবহার করেন বিভিন্ন স্থানীয় ইংরেজ কর্মী-কর্মচারীদের কাছ থেকে পাওয়া মালমশলা, বিশেষত কোম্পানির বাণিজ্য প্রতিনিধিদের বিভিন্ন রিপোর্ট; তাছাড়া আছে বিভিন্ন জমিদার, বনিক, কারিগর, ইত্যাদিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ। বুকাননের দৃষ্টিপাত বিস্তারিত, তথ্যাদি বিস্তীর্ণ; তিনি ছিলেন পরিশ্রমী, জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ স্পষ্টপ্রতীয়মান, আর তার উপর তাঁর মালমশলা তিনি সাজিয়েছেন প্রণালীবদ্ধ করে, তাই আঠার শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকের ভারতের অর্থনীতি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের জন্যে অসাধারণ গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর রচনাগুলি। বুকাননের বিচারধারা এবং পরিভাষা থেকে মনে হয় ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি অবগত ছিলেন।

যেসব অঞ্চলে তিনি পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন সেগুলিতে রাজনীতিক পরিস্থিতি এবং কিছু পরিমাণে আর্থনীতিক অবস্থা একই রকমের ছিল না ঐ সময়ে। ইংরেজরা বাংলা আর বিহার জয় করে প্রদেশদুটিকে সরাসরি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দখলে নিয়েছিল আঠার শতকের ষষ্ঠ আর সপ্তম দশকে, আর তারা মৈসুর জয় করেছিল অনেক পরে, ১৭৯৯ সালে, অর্থাৎ বুকাননের সফরের মাত্র দু'বছর আগে। মৈসূরের রাজ্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করে সেখানে রাজন্য-শাসিত রাজ্য বজায় রেখে সেটাকে অধীন রাজ্যে পরিণত করেছিল ইংরেজরা। উনিশ শতকের গোড়ার দিক নাগাদ ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের মারাত্মক পরিণতির দুর্ভোগে পড়েছিল মৈসুরের চেয়ে বাংলা আর বিহারই বেশি পরিমাণে; ঐ লুণ্ঠনের ফলে এইসব প্রদেশে সামাজিক-আর্থনীতিক গঠন বিকৃত হয়েছিল, শুরু হয়ে গিয়েছিল অর্থনীতির অবনতি। তাই ঐ সময়কার বাংলা সম্বন্ধে তথ্যাদি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা হবে পরে – ঔপনিবেশিক আমল-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদগুলিতে।

বুকানন বলেন, সম্প্রদায়ের কর্মচারী, কারিগর আর গ্রাম-সেবকের বস্তু-পারিতোষিক দেবার ব্যবস্থা মৈসুরে বজায় ছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। সম্প্রদায়ে জন্মানো ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশ ('আয়াম', যেটা মহারাষ্ট্রের 'খাক', গুজরাটের 'আবাদি', ইত্যাদির অনুরূপ) তাদের দেওয়া হত। আয়াগাররাও (যারা আয়াম পেত) ব্যবহার করতে পারত ক্ষুদ্র জমি-বন্দ – যখন সংশ্লিষ্ট থাকত কারিগরেরা আর

গ্রাম-সেবক – যেটা ছিল পুরোপুরি কিংবা অংশত নিষ্কর* (মহারাষ্ট্রে 'ওয়াতান' ধরনের জোত কিংবা গুজরাটে পাইসিটা)।

বুকাননের উপাত্ত থেকে এটাও প্রতিপন্ন হয় যে, কারিগরকে জমির প্রজার দেওয়া পারিতোষিক ভিন্ন-ভিন্ন হত প্রজার ফসলের রকম অনুসারে। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মৈসুরে গ্রামের কোন-কোন কারিগরদের ভরণপোষণ বাবত দেওয়া হত বস্তু। যেমন, সম্প্রদায়ের ভূমিস্বত্বাধিকারীর শস্যের প্রত্যেকটা গাদা (স্পষ্টতই পরিমাণের একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ) থেকে 'লাঙল' পিছু ২০ সের শস্য পেত কর্মকার।** একপ্রস্ত সরঞ্জাম দিয়ে যে-পরিমাণ জমিতে কাজ করা হত সেটাকে ধরা হত 'লাঙল'; সেরিঙ্গাপট্টমের কাছে একটা গরিব জোতে ছিল এক-লাঙল, মাঝারি জোতে দুই-তিন লাঙল, আর ধনী জোতে ছিল চার থেকে সাত লাঙল জমি। অন্য একটা এলাকায় (যেখানে মনে হয় জমি ছিল কিছুটা কম উবর) জোতে খামারের জমির আয়তন ছিল আরও বেশি।***

এটাও উল্লেখ্য যে, তন্তুবায়দের ভরণপোষণ বাবত বস্তু দেওয়া সম্বন্ধে বুকানন কিছুই বলেন নি। গোরক্ষপুর জেলার (এখনকার উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল) অপেক্ষাকৃত উপান্ত্য এলাকাগুলিতেও গ্রাম্য তন্তুবায়দের শস্য আর সুতো ছাড়া নগদ টাকাও দেওয়া হত। পূর্ণিয়া জেলায় গ্রাম্য তন্তুবায়রা সুতোর একটা মোটা অংশ নগদে কিনত এবং তাদের উৎপন্ন জিনিস বাজারে বিক্রি করত প্রতি সপ্তাহে।**** মৈসুরের গ্রাম্য তাঁতিদের সম্বন্ধে যেসব তথ্যাদি পাওয়া যায় সেগুলির ভিত্তিতে বলা যায় তারা ছিল এমন কারিগর যারা কোন একটা পরিমাণ অর্থ নিয়ে খদ্দেরের সুতো দিয়ে কাপড় বুনে দিত। তাঁতিরা কখনও চাষবাসও করত না, ধনী কৃষকদের জন্যে মাঝে-মাঝে কাজও করত না। 'টুগো-টারু হল একশ্রেণীর তাঁতি (সম্ভবত একটা জাত – ভ. প.) যারা লাল-

---

সময়ে কেড়ে নিত বানিয়া আর ব্রাহ্মণরা), তার আরও কারণ এই যে, সেকরা যেসব ফরমাশ পেত সেগুলো ছিল পৃথক-পৃথক নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এইভাবে, গ্র্যাণ্ট বলেন, সেকরা ধনী অধিবাসীদের জন্যে সোনা আর রুপোর গয়না তৈরি করত বলে তার আয়ের প্রধান অংশটা আসত খদ্দেরদের সঙ্গে সরাসর লেনদেন থেকে।

জমিতে প্রজাদের ভোগ-ব্যবহারের প্রয়োজন মিটত কারিগরদের সঙ্গে পৃথক-পৃথক লেনদেনের মারফত, তার কারণ হল — আমি মনে করি — ভারতে গ্রাম সম্প্রদায়ের বণ্টন সংক্রান্ত কর্ম-বন্দেজ কোন সমতা নিয়মের অনুযায়ী ছিল না। নিচু জাতগুলির অধীন অবস্থা দিয়ে সেটা বিকৃত ছিল, তারই দরুন এইসব জাতের মানুষের — বিশেষত যাদের খামার ছিল না তাদের — হস্তশিল্পজাত জিনিসে জমিওয়ালা খামারীদের মতো সমান অংশ দাবি করার হক ছিল না। মালিকানা-সংক্রান্ত এবং আর্থনীতিক স্তরবিভাগের (সর্বোপরি, সম্প্রদায়ের পূর্ণ সদস্যদের মধ্যে জোতজমার আয়তনের ক্ষেত্রে) ফলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যাতে যাদের জমি ছিল তাদের সবার ফসলের একটা নির্দিষ্ট হিসসা দিয়ে ব্যক্তি-নির্বিশেষে কারিগরকে পারিতোষিক দেওয়াটা খদ্দেরের সঙ্গে তার যথার্থ সম্পর্কের সঙ্গে বেখাপ হত, — ভোগ্য বস্তুর পরিমাণ, গুণাগুণ আর পরিসরের দিক থেকে এইসব খদ্দেরের প্রয়োজন ছিল খুবই পৃথক-পৃথক।

কৃষি সরঞ্জাম তৈরি করার বেলায় ব্যাপারটা ছিল অন্য রকমের। জোত আর রায়তিস্বত্বের আয়তনে পার্থক্যের ফলে কৃষি সরঞ্জামের জন্যে চাহিদায় কোন গুণীয় পরিবর্তন ঘটে নি, কেননা একই সরঞ্জাম ব্যবহৃত হত সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ এবং উপরতলার মানুষের জমিতে কাজের জন্যে। যে-জমিতে কাজ চলত সেটার আয়তন যত বেশি ততই বেশি ছিল সরঞ্জামের জন্যে চাহিদা, তা তো বটেই। তাই জমির প্রত্যেকটি প্রজা কারিগরদের সম-পরিমাণ পারিতোষিক দিলে সেটা সরঞ্জামের জন্যে ব্যক্তির প্রয়োজনের যথার্থ পরিমাণের অনুযায়ী থাকত না। তবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ মারাঠী সম্প্রদায়ে সরঞ্জাম তৈরি করা বাবত পারিতোষিক দেবার যে-ব্যবস্থা ছিল তাতে কারিগর কার ফরমাশ অনুসারে কাজ করে দিল — খুদে জমির প্রজার, না বড় জমির প্রজার — সেটা তার (কারিগরের) পক্ষে একরকম একই ছিল, অর্থাৎ গ্রাম সম্প্রদায়ে

জমিওয়ালা সদস্যদের মধ্যে আর্থনীতিক এবং মালিকানা-সংক্রান্ত পার্থক্যের ফলে একদিকে কৃষি এবং অন্য দিকে কাজের সরঞ্জাম নির্মাতা হস্তশিল্পের মধ্যে স্বাভাবিক যোগসূত্র নষ্ট হত না।

আহমদনগর রাজস্ব নিরীক্ষা-নির্ধার বিভাগে উপ-সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর. এন. গুড্ডিনের একটা রিপোর্ট (সেটা ১৮৪৫ সালের ১০ অক্টোবর তারিখের) থেকে এইসব যোগসূত্রের কর্ম-বন্দেজ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। তিনি বলেন, গ্রাম্য কারিগরেরা আর কর্মচারীরা পারিতোষিকের পরিমাণ অনুসারে তিন বর্গে (মুসলমানি নাম – 'ওলি' বা 'খাস') বিভক্ত ছিল। প্রথম বর্গে ছিল ছুতার, লোহার, চাম্বার আর মুহার; দ্বিতীয় বর্গে – কুম্ভকার, নারী, পুরীত আর নুহার; তৃতীয় বর্গে – ভাট, গুরু, মৌলানা আর মুহার। আবাদ-করা জমির প্রতি ইউনিট বাবত বিভিন্ন বর্গের লোকে উৎপাদের কত ইউনিট পেত সেটা এইরকম: প্রথম বর্গ – ৩০, দ্বিতীয় বর্গ – ২৫, আর তৃতীয় বর্গ – ২০। এই উৎপাদ 'পেটেল দিত খামারীর গাদা থেকে – যেকোন এক পক্ষের [অর্থাৎ কারিগর কিংবা চাকর] আবেদন অনুসারে'।*

বিভিন্ন কারিগরের কাজ এবং পারিতোষিক পাবার অধিকার সম্বন্ধে গুড্ডিনের বিবরণ এই: 'ছুতার। – কারিগরদের মধ্যে সর্বপ্রধান হল সূত্রধর, তার কাজের জন্যে তলব পড়ে সবচেয়ে বেশি: কৃষিকাজের সমস্ত কেঠো সরঞ্জাম তৈরি এবং মেরামত করে সে, সেজন্যে মালমশলা যোগায় মালিকেরা; তবে অন্য যেকোন কাজ বাবত, যেমন ঘর বাঁধা কিংবা কৃষিকাজ ছাড়া কোন প্রয়োজনের গাড়ি তৈরি করার জন্যে তাকে পয়সা দেওয়া হয়। তার পারিতোষিক হল প্রতি পাইনে গড়ে প্রায় ৬ পাইলী।

'লোহার। – সমস্ত কৃষি-সরঞ্জামের লোহা দিয়ে বানানো অংশ তৈরি এবং মেরামত করে কর্মকার, মালমশলা দেয় মালিক; তবে এইসব ছাড়া যেকোন কাজের জন্যে, যেমন কৃষিকাজ ছাড়া কোন প্রয়োজনের গাড়ি তৈরি করার জন্যে তাকে পয়সা দিতে হয়। পারিশ্রমিক হল প্রত্যেক পাইন বাবত ৫½ পাইলী।

'চাম্বার। – পশুর গলার সাজ, চাবুক, দড়ি আর পটি, যা কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় চামড়ার জিনিস সেগুলো তৈরি করে মুচি, চামড়া দেয় মালিক; কিন্তু সমস্ত মেরামতের কাজের জন্যে চামড়া যোগায় সে নিজেই। ...তাছাড়া, তাকে বছরে একজোড়া করে নতুন জুতো তৈরি করে মুফত দিতে হয় এলাকার দেশমুখ আর দেশপাণ্ডে এবং গ্রামের পেটেল আর কুলকার্ণিকে। তার পারিশ্রমিক হল গড়ে প্রতি পাইনে ৫½ পাইলী।

'উল্লিখিত হল গ্রামের প্রধান তিন রকমের কারিগর; যা অন্যান্যেরা পায় না এমন কয়েকটা উপরি পাওনা আছে এদের, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রত্যেকটি খামারীর মাঠে একফালি জমিতে রাল্লা দিয়ে বোনার বিশেষ সুবিধা, প্রত্যেকটা ফালিতে থাকে চারটে সীতা। জমিটা চাষ করে খামারী, আর এই কারিগরেরা প্রত্যেকে আনে শুধু এক-ডালা বীজ, সেটা বোনে খামারী, আর ফসল পাকলে প্রাপ্তা সেটা কেটে নিয়ে যায়।'*

উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে মারাঠা গ্রামে কারিগর, কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের চাকর-বাকরের পারিশ্রমিক ছিল কী? যে-গ্রামে ৮০ পাইন খামারের জমি ছিল তাতে পৃথক-পৃথক পারিশ্রমিক (খাক) সম্বন্ধে বৃটিশ আমলাটি নিম্নলিখিত উপাত্ত দিয়েছেন।

সাধারণভাবে হকদারদের জন্যে এবং বিশেষভাবে কারিগরদের জন্যে রায়তরা তাদের ফসলের যে-অংশটা কাটান দিত সেটার হিসাব করা যায় (অন্য যেকোন হিসাবের মতো এটাও মোটামুটি হিসাব)। ১নং সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে সমস্ত হকদার পেত বছরে ১৭·৫ টন শস্য, তার থেকে ৫·২৫ টন পড়ত চার রকমের কারিগরদের (লোহার, সূত্রধর, চাম্ভার আর কুম্ভকারদের) ভাগে। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই পরিমাণ জমিতে (৩০০ হেক্টর, তার থেকে বাদ যায় তুলো, তৈলবীজ আর তরিতরকারির খেত) ফসল ফলত গড়ে ২৫০ টন। কিন্তু বীজের জন্যে কাটানের পরে থাকত ১৯০-২০০ টন। এইভাবে, সমস্ত হকদার মিলে পেত ফসলের ৭-৮ শতাংশ, আর কৃষিকাজে উৎপাদী প্রয়োজন মিটিয়ে কারিগরেরা পেত প্রায় ৩ শতাংশ মাত্র। ভারতীয় খামারী তার কাজের সরঞ্জাম পুনরুৎপাদনে যা লাগাত সেটা এই।

— —

গ্রাম সম্প্রদায়ের মোড়ল, চাকর আর কারিগরদের বার্ষিক পারিশ্রমিকের পরিমাণ *

হকদারদের নাম	বার্ষিক পারিশ্রমিক	
	সের হিসাবে	কিলোগ্রাম হিসাবে
পাটেল (মোড়ল)	৯০০	৬৮০
কুলকার্ণি (কর্মচারী)	২৮৪০	২১৬০
ছুতার (সূত্রধর)	২০০০	১৫২০
লোহার (কর্মকার)	১৮০০	১৩৬০
চাম্বার (পশুর সাজ নির্মাতা)	১৮০০	১৩৬০
কুম্ভকার (কুমোর)	১৩৪০	১০২০
নাউয়ি (ক্ষৌরকার)	১৩৪০	১০২০
পরীত (ধোপা)	১৫০০	১১৪০
ভাট (চাকর)	৯০০	৬৮০
গুরব (মন্দিরের চাকর)	১০৪০	৭৮০
মৌলানা (শিক্ষক)	৯০০	৬৮০
সোনার (সেকরা)	৭৪০	৫৬০
ভীল (চৌকিদার)	৯০০	৬৮০
কুলি (ভিশতিওয়ালা)	১০৪০	৭৮০
মাং (চাকর)	৭৪০	৫৬০
মহার (চাকর)	৪৭০০	৩৬০০

* দ্রষ্টব্য: 'Report on the Village Communities of the Deccan, Goverment of Bombay Selections from Records,.'

তবু পারিশ্রমিকের এই ব্যবস্থায় গ্রাম্য কারিগরদের পরিমিত জীবিকানির্বাহ চলত; উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাদের অবস্থা ছিল শহুরে কারিগরদের চেয়ে নিশ্চিত-নিরাপদ। যন্ত্রে-তৈরি বৃটিশ পণ্যের প্রাদুর্ভাব থেকে গ্রাম্য কারিগরদের তখনও নিরাপদে রাখত গ্রামের উপান্ত্য এলাকাগুলি।

১৮৫২ সালে দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে কোলহাপুর রাজ্যে কৃষকদের সরঞ্জামের যে-তালিকা রচনা করেন ডি.জি.গ্রেহাম নামে ইংরেজ আমলা সেটা থেকে কৃষিক্ষেত্রে পুনরুৎপাদনের আয়তন এবং প্রধান-প্রধান বৈষয়িক উপাদানগুলো সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। তালিকা থেকে গাড়ি (এবং নিশ্চয়ই গবাদি পশু) বাদ দেওয়া হয়েছে, সেটা উল্লেখ করে তিনি দিয়েছেন নিম্নলিখিত তালিকা: একখানা লাঙল (৩ টাকা); আর সম্ভবত – যা তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নি – 'চষা জমিতে মাটি সমান করার মই' একখানা (১ টাকা); একখানা জোয়াল (৬ আনা); 'জমি সমান করতে ব্যবহৃত একটা সরঞ্জাম' (৪ টাকা ১৫ আনা); 'জমি থেকে ঘাস আর আগাছা নিড়ানোর সরঞ্জাম কোলপা' (৬ আনা); অন্ত্যখণ্ডওয়ালা একটা চোঙ – মনে হয় হাতে বীজ বোনার সরঞ্জাম (৩ আনা); বীজ বোনার পরে জমিতে ব্যবহৃত সরঞ্জাম (স্পষ্টতই মই) (৮ আনা); আর একখানা জোয়াল (৮ আনা); বীজের জন্যে ছ'টা চোঙওয়ালা বীজ ড্রিল (২ টাকা); একখানা হালকা লাঙল (১ টাকা); একখানা লাঙলের ফলা (১ টাকা ৮ আনা); আগাছা দূর করার সরঞ্জাম (১ আনা); কাটারি (৪ আনা); নিড়ানি (৮ আনা); কুচিয়ে কাটার ছুরি (৮ আনা); শাবল (১ টাকা); বড় একটা কুয়োর বালতি (৬ টাকা ৫ আনা); কুয়োর দড়া (২ টাকা ৮ আনা); আর একখানা নিড়ানি (৪ আনা); লাগাম (২ আনা); দুই-জোয়ালের চামড়ার ফালি (৫ আনা); একটা চাবুক (৪ আনা)। তালিকাবদ্ধ সরঞ্জামগুলোর মোট দাম ২৮ টাকা ১১ আনা।* তবে কৃষকের সরঞ্জামের একেবারে সবকিছুই এই তালিকায় নেই, কেননা আরও তো ছিল গাড়ি এবং জলসেক আর গুদামজাত করার কাজে ব্যবহৃত মেটে পাত্র।

শ'-খানেক পরিবারের জন্যে এই সমস্ত সরঞ্জাম তৈরি এবং মেরামত করতে পারত একজন সূত্রধর আর একজন কুম্ভকার এমনটা ঠিক মনে করা কঠিন। তাছাড়া, সরঞ্জাম আর হাতিয়ারগুলো ছিল কেঠো; তাতে সরাসরি কেজো অংশগুলো ছিল কাঁচা লোহার, কাজেই বেড়ে যেত শান দেওয়া আর মেরামতের কাজের পরিমাণ। গ্রাম্য কারিগরদের মধ্যে সবচেয়ে মানী ছিল সূত্রধর আর কর্মকাররা, সেটা বোঝা যায় সহজেই।

সূত্রধর আর কর্মকার কৃষিকাজের সরঞ্জাম তৈরি আর মেরামত করত, এই কথার সঙ্গে ডি. আর. গ্যাডগিলের বিবরণে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, গ্রামের কর্মকার ছিল সুদক্ষ এই যে-কথাটা বলা হয় প্রত্যেকটা বিবরণে সেটা ঠিক নয়, আর উন্নত ধরনের সরঞ্জাম ব্যবহার করার পথে একটা বাধা ছিল সেগুলো মেরামত করতে তাদের অক্ষমতা।*

আলোচ্য কালপর্যায়ে এবং অনেক পরেও (বিশ শতকের তৃতীয় দশক অবধি) ভারতীয় গ্রামাঞ্চলে কৃষি সরঞ্জামের জন্যে মস্ত চাহিদা ছিল না, তাই কৃষিক্ষেত্রে পুনরুৎপাদনের ভিত্তি থেকে গিয়েছিল প্রধানত সাবেকী টেকনিক, আর কৃষিকাজ এবং সেই কাজের সরঞ্জাম পয়দা করার হস্তশিল্পের মধ্যে আদিম ধরনের বিনিময়। সেটা দেখা যায় এই তথ্যটা থেকে: উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এবং পরবর্তী দশকগুলিতেও মহারাষ্ট্রের মেলা আর বাজারগুলিতে বিক্রির জন্যে হাজির-করা জিনিসপত্রের মধ্যে কৃষি সরঞ্জামের উল্লেখ দেখা যায় না (কোন-কোন দলিলে এইসব দফার বেশ বিস্তারিত তালিকা আছে)।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কার আকরগুলির কথায় আমি ফিরে আসব পরে, সেখানে গ্রামীণ কারিগরদের পারিশ্রমিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে আরও সবিস্তারে। তবে আমি মনে করি, খামারী আর কারিগরের মধ্যে কর্ম-বন্দেজটা যে-ভিত্তিতে চলত সে-সম্বন্ধে ধারণা করার জন্যে আমি যা আগেই বলেছি সেটা যথেষ্ট। এই প্রসঙ্গে মার্কস লিখেছেন: 'গোটা কর্ম-বন্দেজে প্রকাশ পায় প্রণালীবদ্ধ শ্রমবিভাগ; কিন্তু সেই রকমের শ্রমবিভাগ ম্যানুফ্যাকচারে অসম্ভব, কেননা কর্মকার, সূত্রধর, ইত্যাদি যে-বাজার পায় সেটা বদলায় না, আর গ্রামের আয়তন অনুসারে প্রত্যেকটাতে থাকে একজনের বদলে দুই কিংবা তিন জন। সম্প্রদায়মধ্যে শ্রমবিভাগ নিয়ন্ত্রণের নিয়মটা প্রাকৃতিক নিয়মের মতো কর্তৃত্বসহকারে ক্রিয়াশীল থাকে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেকটি পৃথক-পৃথক কারিগর, যেমন কর্মকার, সূত্রধর, ইত্যাদি নিজ কর্মশালায় তার হস্তশিল্পের সমস্ত ক্রিয়াপ্রণালী চালায়

চিরাগত ধরনে কিন্তু স্বাধীনভাবে, তাতে সে নিজের উপর কোন কর্তৃত্ব মানে না।'*

যেহেতু এতে সম্প্রদায়ের কারিগরদের সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, বাজার (আরও যথাযথ ভাষায় – চাহিদা) আপেক্ষিকভাবে অপরিবর্তিত থাকত শুধু পরিসমাপ্ত সরঞ্জামের বেলায়। তাই হাবিবের সঙ্গে ঠিক একমত হওয়া যায় না যখন তিনি বলেন এই কথাটা: কৃষকদের মধ্যে উৎপাদনের ব্যক্তিগত সংগঠন এবং আর্থনীতিক স্তরবিন্যাস সত্ত্বেও ভারতীয় গ্রাম সম্প্রদায়ে কোন অভ্যন্তরীণ বিকাশ থেকে অভ্যন্তরীণ গ্রাম্য বাজার কিংবা বিভিন্ন পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানের উদ্ভব ঘটতে পারল কিভাবে সেটা বের করা দুষ্কর।**

বাস্তবিকই, ভোগ্য জিনিসপত্রের চাহিদা নিশ্চয়ই গড়ে উঠেছিল খদ্দেরের বাছ-বিচার আর ক্রয়ক্ষমতার প্রভাবে। কুনবি জাতের একজন সচ্ছল মারাঠা কৃষকের গৃহস্থালির এবং কাজের সরঞ্জামের তালিকা থেকে দেখা যায় এই চাহিদার নানাত্ব (১৮১৯ সালে তালিকাটা প্রস্তুত করেছিলেন কোট্‌স নামে একজন আমলা): ১ টাকা দামের একখানা পাথুরে যাঁতা; লোহার ডগাওয়ালা দুটো হামান – ৮ আনা; বড় একটা তামার জলপাত্র – ১০ টাকা; দু'-তিনটে তামার পানপাত্র – প্রত্যেকটা ২ টাকা; খাবার জন্যে দু'-তিনটে তামার বাটি – প্রত্যেকটা ১-১½ টাকা; দুটো লোহার কড়াই – প্রত্যেকটা ¼ থেকে ১ টাকা; পাঁচটা চকচকে প্রলেপ লাগানো এবং ২০-৩০টা সাধারণ পাত্র – মোট দাম ২½ থেকে ৩ টাকা; একটা বড় কেঠো গামলা, কয়েকটা ডালা, দুটো লোহার বাতি, দু'খানা ছুরি – প্রত্যেকটা ১ টাকা; মোট মোটামুটি ৪০ টাকা।***

মহারাষ্ট্রে সরঞ্জাম ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলার চেয়ে উন্নত ধরনের এবং দামী, সেই মহারাষ্ট্রে ঐসব বাসন-কোসনের দাম ছিল একপ্রস্ত সরঞ্জামের দামের চেয়ে বেশি। তবে বাসন-কোসনের জন্যে যে সরঞ্জা-মের মতো নিয়মিত মেরামতের দরকার হয় না, তাই সেগুলো ব্যবহার

করতে কারিগরের কাজের মোট পরিমাণ ছিল কম। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, কৃষিকাজে (সবচেয়ে বিস্তৃত অর্থে – কৃষকরা সমেত) ব্যাপৃত ভূমিস্বত্বাধিকারী অংশগুলির মধ্যে উৎপাদী আর ভোগ-ব্যবহারের প্রয়োজনে তৈরি-করা হস্তশিল্পের জিনিসপত্রের জন্যে বিভিন্ন খরচের মধ্যে মূলত পৃথক অনুপাতের (মহারাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনায়) ফলে এমন অবস্থা দেখা দিতে পারত যাতে উৎপাদী চাহিদার ভিত্তিতে চারটে কারিগর জাতের জন্যে সম্প্রদায়মধ্যে যে-পারিশ্রমিক ব্যবস্থা ছিল সেটা অর্থহীন হয়ে পড়তে পারত। যেমন, এইরকমের অনুপাত গড়ে উঠতে পারত বাংলায় এবং অংশত বিহারে, যে-দুটি প্রদেশে জমির উর্বরতা অপেক্ষাকৃত বেশি, আর খেতির কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল বলে কৃষি সরঞ্জাম বাবত খরচ-খরচা কম পড়ত, আর খাজনাভোগীদেরই শুধু নয়, গ্রামীণ জনসমষ্টির খাজনা পয়দা-করা অংশেরও হাতে কৃষিজাত দ্রব্য-সামগ্রী যা যেত সেটার মোট পরিমাণ আর হিসসা বাড়ত।

বিহার সম্বন্ধে বুকাননের তথ্য এই: 'জেলাটার কোন-কোন এলাকায় (ভাগলপুর – ভ. প.) কর্মকার আর সূত্রধরের পেশা একই লোকের। অন্যান্য এলাকায় পেশা দুটো আলাদা-আলাদা লোকের, আর আমি যা উল্লেখ করেছি – উভয় শ্রেণীর লোক যারা কৃষি সরঞ্জাম তৈরি করার কাজে নিযুক্ত তারা শ্রম বাবত সাধারণত পায় শস্য, অনেক সময়ে তারা মোট ফসলের একটা কিছু অংশ পেত হকদার, তারা হল প্রত্যেকটা জমিদারিতে (estate) কর্মিসমষ্টির একটা নিয়মিত অঙ্গ। যারা শুধু নেহাইয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি দুটো শ্রেণী মৌজার (manor) কর্মিসমষ্টির মধ্যে পড়ে না; কাঁচা লোহা যেমনটা আসে বিগলনকারীদের কাছ থেকে সেটাকে বনে পেটাই করে তার একটা শ্রেণী; অন্যটা শহরে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম কাজের জিনিসপত্র তৈরি করে।'*

শেষের বর্গ-দুটো সম্বন্ধে আলোচনা পরে করাই উপযুক্ত হবে। গ্রামীণ কারিগরদের অবস্থার স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় না এই রচনাংশে। ব্যাপারটা হল এই যে, বুকানন 'estate' শব্দটা প্রয়োগ করেছেন

বিদ্যমান বৃটিশ পরিভাষা অনুসারে, তাতে বোঝায় বহু গ্রাম এবং ভূমি মিলিয়ে একটা গোটা জমিদারি। কোন-কোন গ্রাম্য কারিগরেরা জমিদারির কর্মিসমষ্টির অঙ্গ, নিছক এই কথাটায় তাদের অবস্থা সম্বন্ধে নতুন বড় একটা কিছু বোঝা যায় না, তারা পড়ে গ্রামীণ জনসমষ্টির মধ্যে এই কথাটা ছাড়া।

'Manorial' কর্মিসমষ্টির মধ্যে যেসব কারিগর ছিল তাদের অবস্থা সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেছে। অপেক্ষাকৃত অধস্তন প্রশাসনিক কর-সংস্থা মৌজাকে বুকানন 'manor' নাম দিয়েছেন, – মৌজার প্রধান ছিল মুকাদ্দাম (বিহারে সে জমিদার হতে পারত মনে হয়)।* 'মৌজা' শব্দটার প্রচলিত অর্থ 'গ্রাম', কিন্তু উনিশ শতকের গোড়ার দিককার সরকারী পরিভাষায় মৌজার অর্থ ছিল গ্রাম সম্প্রদায়, যেটার কাজ ছিল একটা অধস্তন রাজস্ব-সংক্রান্ত সংস্থা ('বিভিন্ন খামারের সমষ্টি', অর্থাৎ রায়তদের জোতজমাগুলোর সমষ্টি, যা হল একটা জমিদারি),** সেটার প্রধান ছিল মণ্ডল (মোড়ল)।

বাংলায় আর পূর্ব বিহারে (পূর্ণিয়ায় আর আগলকোটে) গ্রাম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কর্মচারীদের কিভাবে পারিশ্রমিক দেওয়া হত সে-বিষয়টাকে বুকানন বারবার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কর্মকার, সূত্রধর কিংবা চর্মকারদের কথা তিনি উল্লেখ করেন নি কখনও। গ্রাম সম্প্রদায়ের সরকারী কর্মীদের পারিতোষিক দেবার ধরন ছিল বিভিন্ন: ভূমি-রাজস্বের একটা অংশ (বস্তু কিংবা নগদ), বাঁধা মাসিক মাইনে আর চাকরান জমি।*** গোমস্তা, কেরানি (পাটোয়ারি), বেনিয়া, পরিদর্শক (দেওয়ান), কোতোওয়াল পাহারাদার (পেয়াদা), ইত্যাদি কর-আদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছোট-বড় কর্মীদের মধ্যে কুম্ভকারের কথা উল্লেখ করা হয় নি, যে কুম্ভকার পেত রাজস্বের $\frac{1}{80}$ কিংবা আরও কম।*** আদায়-করা

মোট কর থেকে যারা চিরাগত কিংবা কিছুটা পরিবর্তিত আকারে পারিতোষিক পেত তাদের মধ্যে কুম্ভকারকে ধরার কারণটা মনে হয় এই যে, পূজা-অর্চনার বাসন-কোসন, দেব-দেবীর বিগ্রহ আর মূর্তি, ইত্যাদি তৈরি করার কাজ সে করত।

তবে মোটের উপর, উনিশ শতকের আরম্ভ নাগাদ, হয়ত আরও অনেক আগেই বাংলায় – এবং অনেকাংশে বিহারেও – কৃষি আর হস্তশিল্পের মধ্যে উৎপাদ বিনিময় নিয়ন্ত্রণের কাজটা গ্রাম সম্প্রদায়ে আর ছিল না, তখন সম্প্রদায় মূলত রাজস্ব-সংক্রান্ত সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। যেসব জায়গায় এমন সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল (ফসলের একটা অংশ দিয়ে কর্মকারের পারিতোষিক) সেখানে সেটা ছিল কর্ষক এবং তার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক নির্মায়কের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং গ্রামীণ পরিচালন সংস্থা থেকে স্বাধীনভাবে। কৃষিক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রভেদনের অবস্থায় এই সম্পর্কের নিছক ব্যক্তিগত প্রকৃতির ফলে কারিগরের পারিতোষিকের সমতাসাধনের ব্যবস্থাটা বদলে গিয়েছিল, এটা ছিল অবশ্যম্ভাবী, সেটা বিভিন্ন নির্দিষ্ট ক্রিয়াপ্রণালীর ভিত্তিতে পৃথক-পৃথক ফরমাশের ব্যবস্থা চালু হবার সহায়ক হয়েছিল, তাতে পারিশ্রমিক দেওয়া হত কাজের পরিমাণ আর জটিলতা অনুসারে।

এটা খুবই সম্ভব যে, গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর-পশ্চিম ভাগে কৃষি আর হস্তশিল্পের মধ্যে চিরাগত যোগসূত্র থেকে গিয়েছিল সেটার আদি আকারে। পাটনা জেলায় কর্মকার আর সূত্রধর 'সাধারণত পড়ে মৌজার কর্মিসমষ্টির মধ্যে, আর কৃষি সরঞ্জাম বাবত পারিশ্রমিকটা আসে ফসলের একটা অংশ থেকে'।* গ্রামের কুম্ভকার আর চর্মকারের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে কোন কথা নেই। তবু – বুকানন বলেন – শাহাবাদ জেলায় (পশ্চিম বিহার) 'ফসল-কাটা মজুর, সূত্রধর, কর্মকার, মুচি (খুব সম্ভব পশুর সাজ প্রস্তুতকারক। – **ভ. প.**), গ্রাম্য ব্রাহ্মণ আর ওজনদারকে পারিতোষিক দেওয়া হয় গাদা ভাগ হবার আগে সেটা থেকে। ফসলের পরিমাণ সাব্যস্ত করা হয় মোটামুটি বিবেচনা করে, আর সেটা থেকে উল্লিখিত ভাতাগুলো কাটানের পরে ভূস্বামীর প্রাপ্য

অংশ দেওয়া হয় সাধারণত বস্তু হিসেবে, কিন্তু কখনও-কখনও তাকে দেওয়া হয় অর্থ।' এই রচনাংশের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করা যায়: সম্প্রদায়ের চিরাগত কাটানগুলোর ব্যবস্থায় জমির চাষী আর খাজনা-*প্রাপ্তা উপযুক্ত অনুপাতে ভাগাভাগি করে নিত কাটানের পরে ফসলের যা অবশিষ্ট থাকত শুধু সেই অংশটাকে, ফসলের সবটাকে নয়। 'ম্যানরের কর্মিদল' বলতে বুকানন বোঝাতে চেয়েছেন রাজস্ব-সংক্রান্ত কোন একটা নির্দিষ্ট ইউনিটের গ্রামীণ জনসমষ্টিকে, এই মর্মে আমার অনুমানটা যথার্থ প্রতিপন্ন হচ্ছে শাহাবাদ সম্বন্ধে তাঁর উপাত্ত থেকেও। এইভাবে, চর্মকারদের সম্বন্ধে তিনি বলেন তারা বেশির ভাগ ছিল 'ম্যানরের কর্মিদলের মধ্যে, তারা দড়া-দড়ি, জল বইবার থলে [ভিশতি] আর চাষীদের জুতো যোগাবার বাবত পারিশ্রমিক পায় ফসলের একটা অংশ'।**

বাংলায় সম্প্রদায়মধ্যস্থ যোগসূত্রগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, আর কৃষিক্ষেত্রে মেহনতী জনসমষ্টির অধিকাংশের ঘটে সামাজিক-আর্থনীতিক অবনতি, এইসব প্রকাশ পায় স্থানীয় কারিগরদের অবস্থার মাঝে – এরা কাজকর্ম করত ঐ জনসমষ্টির জন্যে। ঠিক বটে বুকানন নিশ্চয় করে বলেছেন বাংলায় কর্মকার, সূত্রধর, তন্তুবায় আর ক্ষৌরকাররা 'বিশুদ্ধ জাতের মানুষে যা বর্তায় সেই মর্যাদা পেয়েছিল'।*** কিন্তু পরে পৃথক-পৃথক জাতের কারিগরদের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত যাঁচ-বিচার করার সময়ে তিনিই বলেছেন, কোন-কোন শাখা-জাতের সূত্রধর আর তন্তুবায়দের, এবং কলুদেরও 'অশুচি' বলে গণ্য করা হত।**** বাস্তবিকই কর্মকারদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল পশ্চিম ভারতে যা তার চেয়ে নিচু স্তরে, যদিও এরা তৈরি করত সমস্ত রকমের কৃষি সরঞ্জাম (সূত্রধররা এই কাজ থেকে বাদ পড়েছিল, তারা করত ঘরবাঁধা আর গাড়ি তৈরি করার কাজ)।*****

কৃষি সরঞ্জামের দাম সম্বন্ধে তথ্য থেকে দেখা যায় এইসব জিনিসের কেনা-বেচা চলত ব্যাপক পরিসরে। তবে এটা জানা আছে যে, *কৃষি সরঞ্জাম কেনা-বেচা এমনকি বাংলায়ও বহুপ্রচলিত হয় নি।* যেমন, পুর্ণিয়া বিভাগের (তার মধ্যে ছিল বাংলার দিনাজপুর আর রংপুর জেলা) পরিস্থিতি সম্বন্ধে ১৮১০ সালে বুকানন লেখেন: 'কর্মকাররা কৃষির বিভিন্ন সাদাসিধে হাতিয়ার তৈরি করে এবং সেগুলোতে কেঠো কিংবা ধাতব অংশ জোড়াই তাদের প্রচলিত কাজ। সর্বত্র তারা পারিশ্রমিক হিসেবে পায় খাদ্যশস্য, তাদের পারিতোষিক দেওয়া হয় ভালই, তাদের কাজ স্থায়ী।'* এই তথ্য এতই সামান্য যাতে এর থেকে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবু সম্প্রদায়ের যেসব কারিগর বস্তুশোধ পেত তাদের অবস্থার প্রতি এতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বটে। যেসব কর্মকার তৈরি করত গৃহস্থালির জিনিস তাদের কথা বলা হয়েছে আলাদা করে: 'আনাড়ী ধরনের ছুরি, কাঁচি, খাঁড়া, বাতি, সড়কি, তালা এবং অন্যান্য ধাতব জিনিস তৈরি করে তাদের খাসা ব্যবসা চলত; এইসব জিনিসের জন্যে চাহিদা ছিল চড়া। যাকিছু বেশ সরেস হওয়া চাই সেসব জিনিস বার থেকে আনানো হত।'** তাই কৃষি সরঞ্জাম বাবত খরচ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হিসাব থেকে মোটেই প্রমাণিত হয় না যে, সেগুলো বেচা-কেনা হত বাজারে।

কৃষিকাজ আর হস্তশিল্পের মধ্যে শ্রমবিভাগ এবং এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে, খামার থেকে আর রায়তের পরিবার থেকে উৎপাদী প্রয়োজনে আর ভোগ-ব্যবহারের জন্যে যে-চাহিদা আসত সেটার পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু-কিছু উপাত্ত উপরে দেওয়া হল। কৃষি আর হস্তশিল্পের মধ্যে বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট বস্তুরাশি (পণ্য সমেত) ছিল জাতীয় উৎপাদের যে-অংশ সেটার গঠন সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করার জন্যে কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাদির সঙ্গে এইসব উপাত্ত সহায়ক।

কৃষিজাত দ্রব্যের শহুরে হস্তশিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত হওয়া প্রসঙ্গে

দেখা যাচ্ছে, সম্প্রদায় কিংবা অন্য কোন গ্রামীণ অণু-অঞ্চলের পরিসরে শ্রমবিভাগ ছিল ভারতে সামাজিক শ্রমবিভাগের ভিত্তি। তার সঙ্গে সঙ্গে, পুঁজিতন্ত্রের উৎপত্তির পূর্বশর্তগুলি বিশ্লেষণ করতে গেলে কৃষিজাত দ্রব্যের যে-অংশটা যেত শহরে সেটার বিচলন আর রূপান্তর বিশেষ আগ্রহজনক। বিষয়টা নিয়ে বিবেচনা করতে গিয়ে হাবিব এই অনুমানটা নিয়ে যাঁচ-বিচার করেন: কৃষি থেকে আদায়-করা উদ্বৃত্ত-উৎপাদের ভিতরে থাকে খাদ্যের (বিশেষত খাদ্যশস্যের) সেই একই অংশ যতটা উৎপাদ থেকে যায় গ্রামাঞ্চলে; সেক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চল আর গ্রাম-বহির্ভূত অঞ্চলের জনসমষ্টির মধ্যে অনুপাতটা হয় ভূমির জাতদ্রব্য-কে উদ্বৃত্ত (আরও যথাযথ কথা – আদায়-করা) উৎপাদ এবং গ্রামাঞ্চলে থেকে-যাওয়া উৎপাদে পুনর্বিভাগের অনুযায়ী (মোটামুটি); তাতে বোঝায় যে, শহুরে জনসমষ্টি খুবই ক্ষুদ্র, কেননা গ্রামীণ জনসমষ্টির প্রয়োজন মেটাবার জন্যে বাকি থাকে যে-পরিমাণ কাঁচামাল সেটা হয় উদ্বৃত্ত-উৎপাদ দিয়ে যাদের চলে সেই শহুরে জনসমষ্টির প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যেটা আদায় করা হয় তার প্রায় সমান; এই অনুমান অনুসারে, কৃষি-বহির্ভূত অঞ্চলের জনসমষ্টির অধিকাংশ হল অনুৎপাদী কাজে এবং ব্যক্তিগত খিদমতে নিযুক্ত মানুষ।*

কিন্তু হাবিব বিবেচনা করেছেন আর-একটা অনুমান নিয়ে, তাতে উদ্বৃত্ত-উৎপাদের বেশির ভাগটা শিল্পে-প্রয়োজনীয় ফসল, খেতের প্রতি ইউনিটে যেসব ফসলের ফলন মূল্যের হিসাবে অধিকতর। এক্ষেত্রে কৃষি-বহির্ভূত জনসমষ্টির অংশটা উদ্বৃত্ত-উৎপাদের তদনুযায়ী অংশের চেয়ে কম; অন্য দিকে, এই জনসমষ্টির মধ্যে পড়ে সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত বেশি উৎপাদী বর্গের কারিগরেরা, আর কৃষি-বহির্ভূত জনসমষ্টি মোটের উপর বেশি জড়ো হয় শহরে। হাবিবের মতে, পুঁজিতন্ত্র বিকাশের কোন-কোন পূর্বশর্ত সৃষ্টি হয় শেষোক্ত অবস্থায়, পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভব ঘটতে পারে না কৃষি-বহির্ভূত মনুষ্যশক্তির একটা ন্যূনকল্প শহরবাসী না হলে** (কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়, কেননা দেখা গেছে, গোড়ার দিকে

অনেক সময়ে গ্রামাঞ্চলই পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পোৎপাদনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী ছিল)।

হাবিবের উপাত্তের ভিত্তিতে সাদাসিধে হিসাব কষলে দেখা যায় তাঁর দৃষ্টিপাতের ধরনটা সংগতই। বাস্তবিকই, দেখা গেছে, প্রথমোক্ত অবস্থায় শহুরে লোকসংখ্যা বাড়ে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সেটার সামাজিক আর বৃত্তিগত গঠনের মানের অবনতি ঘটে; দ্বিতীয় অবস্থায় শহুরে লোকসংখ্যা মোটের উপর এবং আপেক্ষিকভাবে কমে, কিন্তু – এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ – ঐ জনসমষ্টির উৎপাদী অংশটার গুণীয় পরিবর্তন ঘটে। মোট লোকসংখ্যায় শহরবাসীদের সর্বোপযোগী অনুপাতটা বিশেষভাবে বিবেচ্য। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, ১ম পিটারের আমলে রাশিয়ায় স্বৈরতন্ত্রের সূচনাকালে শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৫,০০,০০০, অর্থাৎ মোট লোকসংখ্যার ৩·৬ শতাংশ (১৭২১)।* এই জনসমষ্টির ইতিহাসনির্দিষ্ট কাজ হাসিল করতে সেটা তো পর্যাপ্তই হয়েছিল।

তাছাড়া, হাবিব নিজেই বলেছেন, ভারতে ঐতিহাসিক বাস্তব অবস্থা ছিল এই অনুমান-দুটোর কোন্‌টা তা প্রতিপন্ন করার মতো কোন পরিসংখ্যান উপাত্ত তাঁর হাতে নেই, তাই ব্যবহারকদের মধ্যে বাড়তি উৎপাদ (ধরা যাক, খাজনা) বণ্টন বিচার-বিশ্লেষণ করে বিষয়টাকে পরোক্ষ উপায়ে যাঁচ-বিচার করার পথ তিনি বেছে নেন। তিনি এই তথ্যটা উল্লেখ করেন: (গ্রামীণ এবং স্থানীয় খাজনা-প্রাপ্তাদের জন্যে যাবতীয় কাটানের পরে) কৃষি উৎপাদের ⅓ থেকে ½ গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে যেত সংখ্যায় কম শাসক অংশগুলির মধ্যে বণ্টনের জন্যে। ১৬৪৭ সালে মোগল সাম্রাজ্যের করের ৬১·৫ শতাংশ আত্মসাৎ করেছিল ৮ হাজার মনসবদারের মধ্যে মাত্র ৪৪৫ জন – ঐ অংশটা রাজবংশের ভূমি-রাজস্বের মধ্যে যায় নি। হাবিবের মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়, প্রধান-প্রধান মনসবদারদের আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ খরচ হত সৈন্যদলের, বিশেষত ঘোড়সওয়ার সৈন্যবাহিনীর ভরণপোষণের জন্যে। তিনি মনে করেন, মোগল আমলে ভারতে সৈন্যবাহিনী বাবত খরচটা হত সৈন্যদের সঙ্গে তাদের পরিবার-পরিজন, চাকর-বাকর এবং

তাদের যোগানদার বণিক আর কারিগরদেরও (মোট ৫০ লক্ষ অবধি লোক) ভরণপোষণের জন্যে। এইভাবে, কোমরে ঝোলানো অস্ত্রশস্ত্র এবং বিশেষত আগ্নেয়াস্ত্র (অন্তত ২৫,০০০ খানা) তৈরি করার প্রয়োজনে কাজ জুটত বহু দক্ষ কারিগরের।

এই দুই-তৃতীয়াংশ ছাড়া সমস্ত রাজস্বের চতুর্থাংশ খরচ হত অভি-জাতকুলের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, আর যাজকমণ্ডলী, পণ্ডিত, চিকিৎসক, কবি, শিল্পী, গাইয়ে-বাজিয়ে আর নাচিয়েদের ভরণপোষণের জন্যে খরচ হত দশমাংশ। উপর-মহলের মোগলরা বিপুল পরিমাণ ব্যয় করত এইসব খাতে: হারেম, অসংখ্য কর্মচারী যাদের বিশেষ কোন কাজ ছিল না (এরা অনেক সময়ে খেতে পেত আধপেট), পদ-পদবি অনুসারে 'প্রতিনিধিত্ব', বাদশাহ এবং তার পরিষদবর্গের জন্যে ভেট। তবু নানা রকমের হোমরা-চোমরা ব্যক্তি মারা গেলে খাজাঞ্চীখানা যখন তাদের ধনদৌলত অধিগ্রহণ করত তাতে শুধু নগদেই থাকত নিযুত-নিযুত টাকা।

সামরিক-প্রশাসনিক কর্মিবাহিনী এবং তাদের প্রয়োজন অনুসারে যোগানদার লোকজন অতি বিবিধ ধরনের আর হরেক প্রয়োজনের জিনিসপত্রের চাহিদা সৃষ্টি করত। তাই সেই আমলের দলিলপত্রে বহু রকমের কারিগর এবং বিবিধ বিশেষকৃতির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া, মোগল আমলে ভারতে ধর্মীয় আর প্রশাসন-সংক্রান্ত ইমারত নির্মাণের এবং সামরিক প্রয়োজনে নির্মাণের কাজ চলত ব্যাপক পরিসরে, তাতে লেগে যেত বিভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন জনরাশি।*

অনুৎপাদী মনুষ্যশক্তি কিংবা হস্তশিল্পের ভরণপোষণ আর পুনরুৎ-পাদনের পিছনে যেত কী পরিমাণ রাজস্ব সে-সম্বন্ধে আলোচনার উপসং-হারে হাবিব নিজেই বলেন, কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করার মতো উপাত্ত তাঁর ছিল না। বণ্টনের উভয় ধরনই বাস্তবে চালু ছিল পাশাপাশি, এই অনুমানটা তাঁর আরম্ভস্থল। বিশেষত তিনি লক্ষ্য করেন যে, কারিগর আর অদক্ষ মজুরদের সংখ্যা ছিল অভিজাতকুলের খিদমতের জন্যে যা চাহিদা সেটা থেকে অতিরিক্ত, — হস্তশিল্পকে মেটাতে হত উৎপাদী আর অনুৎপাদী উভয়ত সমগ্র মেহনতী জনরাশির প্রয়োজন, বিশেষত

কাপড়-চোপড়ের বেলায়। তাছাড়া, তৈরি-করা জিনিসপত্রের মাথাপিছু ব্যবহার যদিও তেমন বেশি ছিল না, তেমনি কারিগরদের উৎপাদনশীলতার মাত্রাও ছিল নিচু।* তাই হাবিব ধরে নেন যে, বণ্টনের প্রথম ধরনটা ভারতীয় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলেও সেটার পাশাপাশি দ্বিতীয়টাও ছিল কিছু পরিমাণে। এই কারণে শহরের লোকসংখ্যা ছিল না মোট লোকসংখ্যার চতুর্থাংশ কিংবা তৃতীয়াংশ (যা হত আদায়-করা ও অবশিষ্ট উৎপাদের গঠন একই হলে), সেটা ছিল পঞ্চমাংশের কম।**

সাধারণভাবে বললে, কৃষিজাত উদ্বৃত্ত-উৎপাদের পুনর্বণ্টন আর গঠন সংক্রান্ত প্রশ্নে হাবিবের দৃষ্টিপাতের ধরনটা দেখা যায় খুবই ফলপ্রসূ এবং মূল নিয়মের দিক থেকে সঠিক। তবে এই উৎপাদের আদায় আর পুনর্বণ্টনের কর্ম-বন্দেজটাকে তিনি কর-সংক্রান্ত সংস্থা এবং শহুরে উৎপাদক আর ব্যবহারকদের মধ্যে এ সংস্থার যোজক খাত আর শাখা-প্রশাখায় পর্যবসিত করেন। প্রকৃতপক্ষে, আদায়-করা কৃষি উৎপাদের আবশ্যাক কাঠামটা গড়ে উঠেছিল ঢের বেশি জটিল উপায়ে, সেটা অন্তত এই কারণে যে, সেটার না-খাদ্য কাঁচামাল অংশটা পয়দা হত না ভারতের অনেক জায়গায় (যেমন, পশ্চিম মহারাষ্ট্রে আর বাংলায় তুলো উৎপাদন ছিল নগণ্য)। বাস্তবিকই, ফসল বণ্টনের যত বিবরণ জানা আছে সেগুলিতে বলা হয় খাদ্যশস্য ভাগাভাগির কথা, কোন শিল্পে-প্রয়োজনীয় ফসলের কথা নয় (এটা কৃষকদের মধ্যে একটা প্রধান এবং বছর-বছর জন্মানো ফসল হতে পারত শুধু অনুকূল পরিবেশে)।

তাই ধরে নেওয়া যায় যে, শিল্পের জন্যে কাঁচামাল এবং দুগ্ধজাত আর চিনি দিয়ে তৈরি খাদ্যসামগ্রী শহরে পৌছত বাজারের পথে। ভূমি-কর দেবার জন্যে কৃষক এই জিনিস বিক্রি করতে পারত, সেটা অন্য ব্যাপার, কিন্তু সেক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদ আদায়ে আর পুনর্বণ্টনে ব্যাপারিক পুঁজি অংশগ্রহণ করত একেবারে প্রারম্ভিক পর্বেই। শেষে, শহরের কারিগরেরা যেসব জিনিস নিয়ে কাজ করত সেগুলোর মধ্যে কৃষিজাত কাঁচামাল ছাড়াও ছিল বিভিন্ন ধাতু, রত্ন, কাঠ, রাসায়নিক দ্রব্য, মাটি

এবং কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রের অন্যান্য মালমশলা আর আধা-তৈরি দ্রব্য-সামগ্রী। এইসব দ্রব্য দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করার জায়গায় সেগুলোকে চালান করার জন্যে ব্যাপারিক পুঁজির অংশগ্রহণ আবশ্যক হত, তাই এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কৃষির উদ্বৃত্ত-উৎপাদে আরও জটিল এবং মধ্যস্থালির রূপান্তর ঘটত।

সতর আর আঠার শতকে ভারতে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে থোক উৎপাদের যথার্থ অনুপাতগুলো স্থির করতে আমরা পারি নে, সেটা তো স্বতঃপ্রতীয়মান। উদ্বৃত্ত-উৎপাদটা কোন্-কোন্ ক্ষেত্রে পয়দা হত সেটা স্থির করাও সমানই দুষ্কর, যদিও কৃষির সাধারণ প্রাধান্য তো অবধারিত। একটা মোটামুটি উদাহরণ হিসেবে এখানে দেওয়া হচ্ছে আঠার শতকের নবম দশকে বাংলায় থোক উৎপাদের গঠন সম্বন্ধে একজন ইংরেজ আমলার যাঁচ-বিচার।

আঠার শতকের শেষের দিকে
বাংলায় জাতীয় উৎপাদের স্থিতি

নিচে যে-বিবরণের উল্লেখ করা হচ্ছে সেটার মূল্যায়ন করতে গিয়ে আরম্ভ করা দরকার ইংরেজ বিশেষজ্ঞ জে. গ্র্যাণ্টের স্পষ্টতই একপেশে বিবেচনাধারা থেকেই শুধু নয়, বাংলার বিভিন্ন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থেকেও। তাছাড়া, এইসব তথ্য আর সিদ্ধান্তকে অতীত কিংবা ভবিষ্যতের মাঝে ধরে দেখতে গেলে এটা মনে রাখা দরকার: প্রদেশটি তখন বৈদেশিক জোয়ালে জোতা ছিল দুই দশকের বেশিকাল যাবৎ। এটা ঠিকই যে, ভূমিতে রাষ্ট্রের (এক্ষেত্রে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির) মালিকানা আবার কায়েম করাই ছিল ঐ কালপর্যায়ে বৃটিশ আর্থনীতিক কর্মনীতির, সর্বোপরি ভূমি-রাজস্ব কর্মনীতির লক্ষ্য, সেই কারণে তাতে সামাজিক শ্রমবিভাগে এবং সেটার উৎপাদে বিশেষ কোন নতুন পরিবর্তন ঘটানো হয় নি। আগেকার শাসকদের থেকে যা বিসদৃশ এমন একমাত্র নতুন উপাদান এই যে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ কর-তহবিল থেকে গরিষ্ঠ পরিমাণ বরাদ্দ করতে চেষ্টা করত রপ্তানির মাল কেনার জন্যে। তাই জাতীয় উৎপাদ থেকে যা রপ্তানি করা হত সেটার হিসসা বেড়েছিল, আর শাসক শ্রেণী, সেটার কর্মচারী এবং বণিক আর কারিগরদের ব্যক্তিগত ভোগ-ব্যবহারের জন্যে যেত উৎপাদের যে-হিসসা সেটা কমেছিল।

গ্র্যাণ্টের বিবরণে বলা হয় – খাজনা দেবার জন্যে কৃষকেরা 'তাদের শ্রমফল থেকে পারিবারিক ভোগ-ব্যবহারের উপরে উদ্বৃত্তটাকে দেশীয় বাজারে নিতে বাধ্য হয়, সেখানে সেটা তখন উপযুক্ত ধরনে ভাগ হয়ে যায় অন্তর্বাণিজ্যের দুটো শাখায়: তার একটা জীবনীয় বস্তু যোগায় ধনীদের, নিষ্কর্মাদের, সৈনিক, কারিগর দরবেশ, রাজপুরুষ শ্রেণীর জন্যে – যাদের রাখা হয় সরকারী চাকরিতে কিংবা হরেক রকমের বিত্তবান বেসরকারী কারবারিদের কাজে সেই সবার জন্যে; অন্যটা রেশম, তুলো এবং এইরকমের অন্যান্য পশুজাত আর উদ্ভিদজাত কাঁচা-মাল যোগায় কৃষকদের সেই অংশটার কাজে লাগাবার জন্যে যারা জার্নিম্যান উৎপাদক এবং মেহনতী খামারীও বটে, যারা সেই সব বিরল অতুলনীয় কাপড় কিংবা মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি করে যেগুলো হল বহির্বাণিজ্যের ভিত্তি।'*

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এই আমলাটির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কৃষক উৎপাদ আদায় করা এবং সেটা ব্যবহার করা কিংবা সেটা দিয়ে অন্য জিনিস তৈরি করার কর্ম-বন্দেজটার স্পষ্ট চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে এটা স্পষ্টই যে, যেসব কারিগর রপ্তানী মাল তৈরি করত তাদের সম্বন্ধে গ্র্যাণ্ট আগ্রহান্বিত ছিলেন (বাংলা বিজিত হবার পরে প্রদেশটির রপ্তানি পুরোপুরি চলে গিয়েছিল ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে)। তিনি বলেছেন, ঐ একই কারিগরেরা, বিশেষত তন্তুবায়রা জিনিসপত্র তৈরি করত ভারতীয় শাসক শ্রেণীরও প্রয়োজনমাফিক। তাই, ঐ শাসক-দের অংশত শেষ করে দেবার পরে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার হস্তশিল্পকে আরও বেশি পরিমাণে রপ্তানিমুখো করে ফেলেছিল। 'কৃষকদের যে-অংশটা' মজুরি বাবত কিংবা স্বাধীনভাবে হস্তশিল্পের কাজ করত তাদের সম্বন্ধে আগ্রহজনক কথাটা রয়েছে। বিভিন্ন হস্তশি-ল্পের রপ্তানির শাখাগুলো ছিল গ্রামাঞ্চলেও, তাতে যে-জনসমষ্টি সংশ্লিষ্ট ছিল তাদের কৃষির সঙ্গে যোগসূত্র নষ্ট হয়ে যায় নি।

তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল এই যে, উৎপাদী-প্রয়োজনে কৃষক-দের মধ্যে হস্তশিল্পজাত জিনিসপত্রের জন্যে চাহিদা সম্বন্ধে কিছুই

বলেন নি গ্র্যাণ্ট। তাদের সমস্ত প্রয়োজনকে তিনি ব্যক্তিগত ভোগ-ব্যবহারের ব্যাপারে পর্যবসিত করেছেন,* তাতে রায়তদের উৎপাদের যে-অংশটা হস্তশিল্পের উৎপাদী-প্রয়োজনের জিনিসপত্র বাবত বস্তুতে কিংবা নগদে বিনিময়ের জন্যে লাগত সেটাকেও তাদের কাছ থেকে আদায় করে নেবার সুযোগ সৃষ্টি করত।

আঠার শতকের নবম দশকে মোট যত মাল বাজারে পড়ত সে-গুলোর দাম ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের মোটামুটি হিসাব অনুসারে ছিল ৬ কোটি ৫০ লক্ষ সিক্কা-টাকা [এটা ছিল কোম্পানির চালু-করা মুদ্রা-ইউনিট], সেগুলোকে গ্র্যাণ্ট ভাগ করেছেন তিন-ভাগে। প্রথম ভাগে – মোট ২ কোটি টাকার প্রধান-প্রধান খাদ্যসামগ্রী, অর্থাৎ চাল, সিম কড়াইশুঁটি, মটরশুঁটি ইত্যাদি, গম এবং অন্যান্য খাদ্যশস্য আর ডাল; ফল, বিভিন্ন কন্দ ফসল আর তরিতরকারি; তেল, মাখন, অন্যান্য ডেয়ারিজাত দ্রব্য। এলাকার মধ্যেই ভোগ-ব্যবহার করা হত এই সমস্ত জিনিস – সেগুলোর কুড়ি-ভাগের একভাগ ছাড়া, সেটা যেত জাহাজে যোগান দেওয়ার জন্যে, কিংবা সমুদ্রপথে চালান করা হত করোম্যাণ্ডেল কোস্টে। দ্বিতীয় ভাগে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার ভোগ্য দ্রব্য-সামগ্রী – যেমন নুন, পান, শোরা, সুরা, গাঁজা-ভাঙ, মাটির পাত্র, কাঠ, শণ (সম্ভবত পাট), চামড়া, সোম, তিসি নীল, মশলা, পশমী কম্বল; এইসব জিনিস ছিল দেশের মধ্যে ব্যবহারের জন্যে – তার থেকে বাদ থাকত পঞ্চমাংশ দামের নুন, আফিম, নীল আর সোরা। তৃতীয় ভাগে ছিল বিলাসদ্রব্য, অর্থাৎ বিভিন্ন সুতী আর রেশমী জিনিস, সেগুলোর দুই-তৃতীয়াংশ রপ্তানি হত ইউরোপে এবং ভারত-মহাসাগরীয় দেশগুলিতে (২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা); দেশের মধ্যে ব্যবহৃত হত মাত্র ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার জিনিস ; এই ভাগে ছিল মোট ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার জিনিস।**

এই তিনটে ভাগে পণ্যগুলোর নাম-তালিকা আপাতত বাদ রেখে শুধু দুটো অবস্থার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে: প্রত্যেকটা পরবর্তী ভাগের মালের বাজার-চলনে বহির্বাণিজ্যের অংশটা বেড়েছে; মালগুলোর মধ্যে কৃষকের ভোগ-ব্যবহারের জিনিসপত্র কিংবা তাদের কাজের সরঞ্জাম

সম্বন্ধে সরাসরি কিছুই উল্লেখ করা হয় নি। কৃষক আর কারিগরদের মধ্যে স্থানীয় বিনিময়ের জিনিসগুলোতে দেখা যাচ্ছে কর ছিল না, তাই উৎপাদ-বিনিময়ের উপাত্তের মধ্যে সেগুলোকে ধরা হয় নি।

জেম্‌স গ্র্যাণ্ট তারপর বাংলার কৃষি উৎপাদনের হিসাব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, প্রদেশটিতে আবাদ-করা জমি ছিল মোট ৩ কোটি ৫০ বিঘা, আর মোট কৃষি উৎপাদের মূল্য ছিল সবসমেত ২১ কোটি টাকা (এতে প্রত্যেক বিঘায় উৎপাদের মূল্য ধরা হয় ৬ টাকা); (গ্রামীণ কারিগরদের সমেত) গ্রামাঞ্চলের লোকসংখ্যা ধরা হয়েছে ৮০ লক্ষ। 'যারা তুঁতপোকা পালন করত তাদের সমেত নির্মায়ক আর কারিগরদের উৎপন্ন ৩ কোটি টাকার জিনিস তার সঙ্গে ধরা হলে প্রদেশটির বার্ষিক উৎপাদের মোট মূল্য দাঁড়ায় ২৪ কোটি টাকার বেশি নয়, সেটা থেকে বাদ যাচ্ছে পশুপালনে সংশ্লিষ্ট অল্প-অল্প পরিমাণ অর্থ, যেটা বস্তুত ছিল বিভিন্ন উৎপাদী বৃত্তিতে ব্যাপৃত জনরাশির এবং তাদের পোষ্যদের (অর্থাৎ কৃষক আর কারিগরদের পরিজনের) জীবনোপায়'।*

'কৃষিতে কিংবা ম্যানুফ্যাকচারে রয়েছে অপেক্ষাকৃত বিপুল পরিমাণ শ্রম, যাতে প্রয়োজন হয় সমানুপাতিক পরিমাণ চলতি মুদ্রা কিংবা বৃহৎ পরিমাণ মূলধন, যেটা বার্ষিক উৎপাদনের জন্যে আবশ্যক এবং লাভ জমে ওঠার ফলে বিস্তর বেড়ে যেতে পারে, এই ভ্রান্ত অনুমানটা'কে খণ্ডন করার জন্যে গ্র্যাণ্ট ঐ সমস্ত হিসাব কষেছিলেন। ষোল শতকের শেষ থেকে চলতি অর্থের পরিমাণ বাড়লেও সেটা 'যেকোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রে যা প্রয়োজন হতে পারত তার সঙ্গে তুলনায় এযাবৎ বরাবরই খুবই কম, যেটা পরিবেশের দিক থেকে বাংলার অবস্থার খুবই অনুরূপ', আর, দেশের মোট বার্ষিক উৎপাদের সঙ্গে সেটার কোন তুলনা চলে না।**

পণ্য-অর্থ পরিচলনের সীমাবদ্ধতার কারণ হিসেবে গ্র্যাণ্ট দিয়েছেন এই তথ্যটা: 'এখানে মানুষের সবচেয়ে বড় অংশটা কৃষক এবং নির্মায়ক, তারা তাদের পরিবারের ভরণপোষণ কিংবা চাহিদার অনুযায়ী সংস্থান সম্ভবত পুরোপুরিই করতে পারে পরস্পর থেকে স্বাধীনভাবে; আর যেহেতু মানুষের এই দুটো মস্ত বর্গের নিজেদের মধ্যে আপন-আপন

বৃত্তির উৎপাদ বিনিময় করার কোন কারণ নেই, তাই সাধারণ পরিচলন মাধ্যমের প্রয়োজনও থাকতে পারে না এদের কারও।'* স্পষ্টতই এখানে যুক্তিটার ভিত্তি হল এই বৃটিশ বুর্জোয়া ধারণাটা: যেহেতু বাজারী সম্পর্ক নেই, কাজেই নেই উৎপাদ-বিনিময়। কিন্তু এমন বিনিময় চলছিল, তবে সেটা কৃষিজাত আর হস্তশিল্পজাত উৎপাদের মালিকদের (যারা সাধারণত ছিল উৎপাদকও) মধ্যে সরাসর, নিছক স্বাভাবিক সম্পর্কের আকারে। সংশ্লিষ্ট অর্থ পরিচলন ছিল ন্যূনকল্প, সেটা তো একেবারেই অন্য ব্যাপার। তাই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এই আমলাটি প্রকৃত অবস্থা থেকে খুব বেশি বিচ্যুত হন নি যখন তিনি নিশ্চয় করে বলেছেন যে, অর্থ পরিচলন আবশ্যক ছিল শুধু সেই বাণিজ্যের জন্যে যেটা যোগান দিত 'অন্যান্য সমস্ত অধিবাসীর সাংসারিক ভোগ-ব্যবহার কিংবা বিলাস-প্রিয় বিদেশীদের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার জন্যে। ভূমির উদ্বৃত্ত-উৎপাদ এবং দেশের ভিতরে নির্মায়কদের বছর-বছর চালানো শ্রম মিলিয়ে বাণিজ্যের পরিমাণটা', সেটা ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বেশি নয়। 'টাকার বিনিময় আর নুন বাবত রাজস্ব বাদে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি তার থেকে বার্ষিক পাওনা হয় সরকারী রাজস্ব বিভাগের।' সরকার 'এইভাবে শুষে নেয় জমি আর শ্রমের উদ্বৃত্ত-উৎপাদের ছ'-ভাগের পাঁচ-ভাগ'।**

কাজেই কাস্টম্‌স যেসব পণ্যের উপর কর ধার্য করে সেগুলোর বাবত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ঔপনিবেশিক মুনাফার কাছাকাছি। বাংলার কৃষিজাত উৎপাদের মূল্য ২১ কোটি টাকা বলে হিসাব করে গ্র্যাণ্ট মন্তব্য করেছেন, এটা হল 'সরকারের কাছে আমাদের সর্বোচ্চ পরিমাণে নির্দিষ্ট খাজনা-আয়ের চারগুণ ছাড়িয়েই',*** অর্থাৎ কিনা, ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের আদায়-করা ভূমি-রাজস্বে পরিমাণ দাঁড়াত মোটামুটি ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। খাজনা দেবার জন্যে কৃষকদের বিক্রি করতে হত কিংবা বাজারে নিতে হত তাদের উৎপাদের একাংশ, এটা বিবেচনায় থাকলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কৃষকদের উৎপাদের

কতটা যাবে বাজারে সেটা নির্ধারিত হত প্রধানত ভূমি-খাজনার পরিমাণ দিয়ে, আর বাজারে ছাড়া উৎপাদের পরিমাণটা হত ঔপনিবেশিক রাজস্ব বিভাগ ভূমি-খাজনা হিসেবে যা উসুল করত সেই পরিমাণ অর্থের সমান। কাজেই যেমন বাংলার প্রাক্‌বৃটিশ শাসকেরা তেমনি কোম্পানিও কারিগর-দের কাছে এবং কাঁচামালের উৎপাদক কৃষকদের কাছে দেওয়া ফর-মাশের ব্যবস্থাটা মারফত বাংলার বৃত্তিগত উৎপাদনের প্রধান-প্রধান শাখা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সেটার বিকাশ নির্ধারণ করতে পারত। কৃষকদের কাছ থেকে হাতে নিয়ে পণ্যে পরিণত করা এইসব উৎপাদ পরোক্ষে ছিল শহরের মানুষের জীবিকানির্বাহের উপকরণ, ঐ শহুরে জনসমষ্টি সম্ভবত ইংরেজদের কাছ থেকে কোন দাম পেত না।

তবে গ্রামাঞ্চলের উৎপাদের যে-অংশটাকে কর হিসেবে জবর-আদায় করা হত শুধু সেটাই বাণিজ্যিক বিনিময়ে যেত তা নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তার আর-একটা, কিছুটা কম অংশ পণ্যে পরিণত হত এবং সেটা পেত বেসরকারী খাজনা-প্রাপ্তারা, যাদের নির্দয়ভাবে বলা হয় 'নিষ্কর্মা' (যাদের প্রতি মনোভাব পরে মূলত বদলাত ভালোর দিকে)। কোম্পানি কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুসারে দেখা যায়, আঠার শত-কের নবম দশকের শেষাশেষি বাংলার মোট কৃষি উৎপাদের ৪৫ শতাংশ পেত কোম্পানি, আর বেসরকারী খাজনা-প্রাপ্তাদের অংশ ছিল ১৫ শতাংশ, আর মাত্র ৪০ শতাংশ ছিল কৃষকদের হিসসা।* পৃথক-পৃথক খাজ-না-প্রাপ্তাদের অংশটা স্পষ্টতই আরও বেশি ছিল প্রাক্‌বৃটিশ আমলে। কিন্তু এই মুহূর্তে আরও লক্ষণীয় হল এই তথ্যটা: কৃষিজাত উৎপাদের যে-উদ্বৃত্তটা জমিদারদের হাতে থেকে যেত এবং তাদের মারফত পুনর্ব-ণ্টিত হত সেটা পণ্যে পরিণত হয়।

আঠার শতকের নবম দশকে বাংলায় বড় আর মাঝারি জমিদার-দের খরচ-খরচার দফাওয়ারি হিসাব পাওয়া যায় এন. কে. সিনহার উদ্ধৃত উপাত্ত থেকে। ময়সাদুল জমিদারির বার্ষিক আয় ছিল ৯২ হাজার টাকা, সেখানকার জমিদার বিভিন্ন খাতে খরচ করতেন নিম্নলি-খিতরূপ: ধর্মীয় ব্যাপারে আর পরোপকারে ২৮-২৯ হাজার টাকা;

আত্মীয়-স্বজন আর 'পোষ্যদের' (অর্থাৎ যেসব পরিবারের ভরণপোষণ সরাসরি চালাত পৃষ্ঠপোষক জমিদার) জন্যে ১৫ হাজার ৫০০ টাকা; পরিচালনব্যবস্থা বাবত ৪৮০০ টাকা; চাকর-বাকরের জন্যে ২৪ হাজার টাকা; গৃহস্থালি – ২৮০০ টাকা; পোশাক-পরিচ্ছদ – ২৯০০ টাকা; ভরনের জিনিসপত্র – ১৫০০ টাকা; ঘোড়ার আস্তাবল আর উটের জন্যে ১৫০০ টাকা। স্পষ্টতই অনুৎপাদী এইসব দফায় মোট খরচ ছিল ৮২,০০০ টাকার বেশি, অর্থাৎ জমিদারটির মোট আয়ের প্রায় ৯০ শতাংশ।

উৎপাদী বলে গণ্য হতে পারে নিম্নলিখিত খরচ-খরচাগুলো: জমিদারের 'খাস খামারগুলোর' জন্যে ৩৮০০ টাকা; নৌকা মেরামতের জন্যে ১৫০০ টাকা; পুল রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ৬৯ টাকা ১০ আনা; মজুরদের জন্যে ১৫৪ টাকা ৭ আনা, অর্থাৎ মোট পরিমাণের প্রায় ৬ শতাংশ।

এইভাবে, জমিদারী আয় ছিল রাজস্ব ধরনের: ২৯,৭০০ টাকা ছিল কোম্পানির বার্ষিক স্বত্ব-নিয়োগ; ৮৫০০ টাকা – লবণ-কর; ২৫০০ টাকা – ধর্মীয় খরচ-খরচা বাবত নির্দিষ্ট ভূমি-করনির্ধার। অন্যান্য মুনাফার (প্রধানত বিভিন্ন ভেট) সঙ্গে জমিদারিতে প্রাপ্তি ছিল ৪৮,৩০০ টাকা, সেটা থেকে খামারগুলি থেকে আয় ছিল মাত্র ৩২০০ টাকা,* অর্থাৎ খাস জমিদারী সংসার থেকে লাভ হত যৎসামান্যই (লাভ থেকে কিছু পরিমাণ হয়ত বস্তু আকারে যেত কর্মচারীদের ভোগ-ব্যবহারে)।

আপসোসের কথা, আখেরী পণ্য আকারে খরচ-খরচার দফাওয়ারি হিসাব স্থির করা সবসময়ে সহজ নয়। যেমন, ধর্মকর্ম-সংক্রান্ত ব্যয় হতে পারত নানা রকমের – তীর্থযাত্রী কিংবা আগন্তুক কিংবা সন্ন্যাসী-ফকির-দরবেশের জন্যে সামান্য খাবার থেকে পুরোহিতের ভোগ-ব্যবহারের জন্যে জমি, – পুরোহিত তো সাংসারিক সুযোগ-সুবিধাদি তুচ্ছ করতে পারে না। আত্মীয়-স্বজন, 'পোষ্য' এবং অন্যান্যের ভরণপোষণের জন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছু আদায় হত প্রধানত তাদের ভোগ-ব্যবহারের জিনিসপত্র হিসেবে – যদি তাদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়ত জমি কিনতে কিংবা সুদে টাকা ধার দিতে পারত। অবস্থাটা যা-ই হোক, এটা স্পষ্ট যে, কৃষির উদ্বৃত্ত-উৎপাদ আদায় আর পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থাটার কোন মিল ছিল না খোদ বাংলার পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নের সঙ্গে।

দিনাজপুরের আরও বড় একটা জমিদারি সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক উপাত্ত থেকে এটা দেখা যাবে। এখানে বার্ষিক মোট ৫,৬৬,৭০০ টাকা ব্যয় হত নিম্নলিখিত প্রধান-প্রধান দফায়: ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এবং পুরোহিত-দের ভরণপোষণ বাবত প্রায় ২,৭৪,০০০ টাকা; গৃহস্থালির খরচ-খরচা এবং কাপড়-চোপড় বাবত যথাক্রমে ৬৮,২০০ টাকা এবং ১৭,৮০০ টাকা; চাকর-বাকরের মাইনে – ৬৮,৮০০ টাকা; নানা রকমের মেরামত বাবত ৫২০০ টাকা, মোট ২,০০,০০০ টাকা। ব্যয়ের তৃতীয় বড় দফাটা ছিল 'দুর্গারাম গ্রামের রাজস্ব' – ১,১৩,০০০ টাকা (কোন কারণে জমি-দার হয়ত এই গ্রামটাকে খাজনা রেহাই দিয়েছিলেন, সেটা তিনি দিতেন নিজেই)। কোন উৎপাদী প্রয়োজনের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট কোন দফায় উল্লেখ নেই, যদিও আয়ের খাতে জমিদারের নিজ 'খামারের' উৎপাদ বাবত বেশ মোটা পরিমাণই দেখান হয়েছে – ৪১,৫০০ টাকা।* দি-নাজপুরের জমিদার খামারটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করতেন নিশ্চয়ই, সেই কারণে নিজ জমাখরচে দফাগুলোর মধ্যে পুনরুৎপাদন বাবত খরচটা দেখাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

ছোট জমিদারদের ব্যয়ের দফাওয়ারি গঠনটা দেখা যায় মোটামুটি একই রকমের। যেমন, ফুটা সিংহের জমিদারিতে বার্ষিক ব্যয় ৬৯০০ টাকা, ব্যয়ের প্রধান-প্রধান দফাগুলো ছিল নিম্নলিখিতরূপে: ধর্ম-কর্ম বাবত ১৯০০ টাকা; জমিদারের ব্যক্তিগত এবং গৃহস্থালির প্রয়োজন বাবত ৩৫০০ টাকা; আর 'আত্মীয়-স্বজনের' জন্যে ১২৬০ টাকা।** দেখা যাচ্ছে, জমিদারির আয়তন কম হলেও ব্যয়ের প্রধান-প্রধান দফা এবং সেগুলোর মধ্যে অনুপাত মোটামুটি একই। দেখা যাচ্ছে, বৃটিশ রাজ কায়েম হবার প্রায় ২০ বছর পরে কোন বাঙালী জমিদারের জমাখরচে খরচের খাতটা হল বহু যাজক (এক্ষেত্রে হিন্দু পুরোহিত), খোদ জমিদার এবং আত্মীয়-স্বজনের (তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু-কিছু বহুদূর-সম্পর্কের মানুষ) ভরণপোষণ বাবত।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাঙালী জমিদারেরা ছিল ন্যায়-নীতির বিধি-বিধানের রক্ষকগোছের। ১৮১৫ সালের একখানা

দলিলের উল্লেখ করেছেন হাণ্টার, তাতে দেখানো হয়েছে মেদিনীপুর জেলার ময়নামুতার জমিদার – সৎকার্যের স্বীকৃতি এবং প্রায়শ্চিত্তের জন্যে দেওন হিসেবে কর আদায় করতেন প্রজাদের কাছ থেকে। যেমন, বিধবাবিবাহ, বাগদান লঙ্ঘন, অন্য একটা জমিদারির মেয়ের সঙ্গে বিয়ে, নিচু জাতের লোকের সঙ্গে ঝগড়া এবং এইরকমের অন্যান্য ব্যাপারে (মোট ২৫টা) জমিদারকে দিতে হয়েছিল প্রায় ১ টাকা করে। তাছাড়া ছিল অতি বিভিন্ন রকমের আরও ৩২টা আদায়, সেগুলোর মধ্যে জমিদারের 'স্নান অনুষ্ঠানের' জন্যে দেওন, বিশেষ ধরনের মাছধরা জাল ব্যবহার বাবত দেওন, উন্নত ধরনের ধান জন্মানো বাবত দেওন, ইত্যাদি।* শেষের আদায়গুলো থেকে দেখা যাচ্ছে উৎপাদন সরঞ্জামের উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করত জমিদারের প্রভাব।

এমনটা ধারণা করা যায় যে, আঠার শতকের নবম দশকে বাংলায় জমিদারী প্রথা যতটা ছিল বিশেষ-সুবিধাভোগী, সাধারণত হিন্দু ব্রাহ্মণদের হাতে, তাতে সেটা কৃষির উদ্বৃত্ত-উৎপাদটাকে উপর-মহলের মানুষের মধ্যে পুনর্বণ্টনের কর্ম-বন্দেজের কাজ করত। জমিদারের প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই ছিল সর্বপ্রধান, আর সবর্ণের পার্শ্বচরগণের প্রতি কর্তব্য সে পালন করত বেশ দায়িত্বসহকারে। কিছুটা মত-বিশ্বাসের দিক থেকে এবং কিছুটা পরান্নভোজী এই উপর-মহলটার ভরণপোষণ করা হত বলে গড়ে উঠতে পারে নি কোন মোটারকমের উৎপাদী সঞ্চয়ন তহবিল, সেটা সামন্ততান্ত্রিক আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের চৌহদ্দির ভিতরেও না।

এযাবৎ আলোচনা করা হল হিন্দু জমিদারদের জমাখরচ সম্বন্ধে। একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় দিক এই যে, মুসলিম জমিদারদের জমাখরচের ধরন ছিল মোটামুটি একই রকমের। যেমন, জমিদার মহম্মদ শাউহুর ৪৩,৬০০ টাকা বার্ষিক ব্যয়ের মধ্যে ১৭,৫০০ টাকা, অর্থাৎ মোট পরিমাণের ৪০ শতাংশের বেশিটা যেত ধর্ম-কর্মে আর দানধ্যানে। আপসোসের কথা, যেমন হিন্দু তেমনি মুসলিম জমিদারদের ব্যয়ের এই দফাটায় আলাদা-আলাদা করে দেখানো হয় নি কতটা যেত মুসলিম আচার-অনুষ্ঠানে আর কতটা হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানে। সেটা থাকলে বুঝতে

সুবিধে হত তখনকার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ছিল কেমন, শুধু তাই নয়, অধিকন্তু – যা এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ – বাংলার এই দুটি প্রধান ধর্মের যাজকদের ভরণপোষণের ব্যবস্থাটা কেমন ছিল। তবে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, কোন জমিদারের নিজ ধর্মমত যা-ই হোক অন্যান্য ধর্মের যাজকদের ভরণপোষণ ছিল তার খরচ-খরচার একটা দফা। যেমন, জমিদার মহম্মদ শাউহুর একটা বেশ মোটা টাকা (১৭২৭ টাকা) খরচ করতেন ব্রাহ্মণ ছেলে-মেয়েদের জন্যে। এটা ছিল ঐ জমিদার নিজ পূর্বপুরুষের ইয়াদগারির জন্যে যা খরচ করতেন (১৪১২ টাকা) তার চেয়ে বেশি।*

এইভাবে, কৃষক অর্থনীতির যে-উদ্বৃত্ত-উৎপাদ থেকে যেত জমিদার-দের হাতে সেটাকে (অল্পকিছুটা বাদ দিয়ে) ভূস্বামীদের নিজেদের, তা-দের পার্শ্বচরদের, চাকর-বাকর এবং দেশটির দুটো প্রধান ধর্মের যা-জকদের ভোগ-ব্যবহারের জিনিসপত্রে পরিণত করা হত। খাজনা-প্রাপ্তা-দের এবং তাদের মুখাপেক্ষী লোক-জনের চাহিদা, তার মানে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের গুণাগুণ উপযুক্ত ধরনে বদলান হত হস্তগত সংগতি-সংস্থা-নের পরিমাণ অনুসারে। তাই, মামুলি প্রয়োজনগুলো মেটাত স্থানীয় কারিগরেরা, আর অপেক্ষাকৃত মার্জিত রুচির জন্যে দ্রব্য-সামগ্রী আমদানি করা হত। উভয় ক্ষেত্রে চাহিদাটা ছিল প্রধানত ভোগ্য বস্তুর জন্যে, তাই উৎপাদনের সরঞ্জামে অঙ্গীভূত হত সামন্ততান্ত্রিক মুনাফার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র।

গ্র্যান্টের উপাত্ত অনুসারে দেখা যায়, জমিদারির জমাখরচে খরচের দফাগুলোর ভিত্তিতে ধরে নেওয়া চাই যে, হস্তশিল্পের বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত উৎপাদ (স্মরণ করা যেতে পারে, সেটা ছিল ৩ কোটি টাকার) ভোগ-ব্যবহার করত জমিদারেরা এবং তাদের পার্শ্বচরেরা, আর বাদবা-কিটাকে বিনিময় করা হত প্রধানত রায়তের উৎপাদ বাবত। এই বি-নিময় যতটা হত বাজার মারফত তাতে কৃষকের উৎপাদের বাড়তি বাজার-চলন ঘটত, তাই দেখা যায় রায়তের উৎপাদের তৃতীয়াংশ পণ্যে পরিণত হত, যদিও পণ্যের স্বাধীন মালিক হিসেবে তারা সেগুলো বাবদ নগদ টাকা পেতে পারত হস্তশিল্পজাত জিনিসের সঙ্গে বিনিময় ক'রে – সেটা ৩ কোটির কম টাকার চৌহদ্দির ভিতরেই শুধু, অর্থাৎ তাদের

উৎপাদের সাত-ভাগের একভাগ মাত্র। এই বিনিময়ের মধ্যে পড়ত রায়তের ভোগ্য বস্তুই শুধু, কিংবা সরঞ্জামও, সেটা প্রত্যক্ষ তথ্যের অভাবে অস্পষ্ট থেকে গেছে।

তবে কৃষিক্ষেত্রে পুনরুৎপাদনে ব্যয় সম্বন্ধে কিছু-কিছু আলোচনা আছে গ্র্যাণ্টের বিবরণে। 'কৃষিতে – কৃষিকাজের সরঞ্জাম, বীজ এবং মজুরদের মজুরির জন্যে লেগে যায় আবশ্যক উৎপাদী মূলধন।' গবাদি পশুর জন্যে খরচ বেশি ছিল না, কেননা প্রচুর ঘাসে ভরা চারণভূমিতে পশু অবাধে চরে বেড়াত সংবৎসর ধরে। '১০০ বিঘা খেতে (বাংলার ১ বিঘা = ⅓ একর, তাই এই জমি-বন্দের আয়তন প্রায় ১৩ হেক্টর। – **ভ. প.**।) সাধারণ বার্ষিক তিন-দফা চাষের জন্যে দশ জুড়ি বলদ যথেষ্ট, সেটা সাধারণত দেশের সর্বত্র কেনা যায় ৪০ টাকায়, আর লাঙলের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সমস্ত সরঞ্জাম কিনতে লাগে ঐ পরিমাণের পাঁচ-ভাগের একভাগেরও কম। ...তেমনি, বার্ষিক উৎপাদ থেকে বাঁচানো খুবই নগণ্য অংশ হল বীজ, সেটার দাম সুবাটার সমস্ত জমির জন্যে হয়ত ২০ লাখের বেশি নয়। তাহলে যদি ধরি ৩,৫০,০০০ মোকুদ্দেমান রায়ত কিংবা অধস্তন খামারীদের সর্দারেরা যেকোন বয়সের পুরুষ কিংবা মেয়েদের প্রত্যেককে ১৭ থেকে ১৮ টাকা হারে দিয়ে গোটা বছরে শ্রম বাবত মোট মজুরি দেয় ১৪ কোটি; তবু যেহেতু এই টাকাটা দেওয়া হয় খাদ্য হিসেবে দৈনিক কিংবা বার্ষিক তিন-দফায় প্রাপ্ত ফসলের অনুপাতে মাসিক কিস্তিতে, তাই আগাম আবশ্যক টাকার পরিমাণটা নগদে আর বস্তুতে মোট পরিমাণের (বার্ষিক। – **ভ. প.**) বারো-ভাগের একভাগের বেশি হতে পারে না কিছুতেই। এককথায় বলতে গেলে, আমরা নিশ্চয়ই সীমা ছাড়িয়ে যাব না যদি আমরা হিসাব করি এইভাবে: ভূমির মালিক কর্তা যে কিনা খাজনা পেতে অধিকারী সে কৃষিকাজে প্রযুক্ত কিংবা আবশ্যক সমস্ত উৎপাদী পশু বাবত খরচা যথেষ্টের চেয়ে কমে পুষিয়ে দিত বিনা-মাসুলের খোলা চারণভূমি থেকে পয়দা-হওয়া বিশেষ মুনাফার (রায়তদের। – **ভ. প.**) সাহায্যে।'*

দেখাই যাচ্ছে এই বিবরণে প্রকাশ পেয়েছে বিষয়টা সম্বন্ধে বৃটিশ বিবেচনাধারা, কাজেই এতে চাই খুবই বৈচারিক বিশ্লেষণ। সর্বপ্রথমে,

---

১৩ হেক্টর খেতে কাজে প্রয়োজনীয় দশ জুড়ি বলদের সাজ আর সরঞ্জামের দাম এতে হিসাব করা হয়েছে। এই হিসাবটা পরবর্তী উপাত্তের কাছাকাছি, তাতে বাংলায় মাফিকসই 'শ্রম আবণ্টিত অংশ' ছিল ৫ একর কিংবা ২ হেক্টর, তাতে কাজ চলত দুটো বলদ আর একপ্রস্ত সরঞ্জাম দিয়ে। এইভাবে, গ্র্যাণ্টের পর্যবেক্ষণ-উপাত্তের ভিত্তি হল মোটামুটি বড় আকারের খামার, যাতে কাজে লাগান হত পাঁচপ্রস্ত সরঞ্জাম এবং তদনুযায়ী মনুষ্যশক্তি। সাধারণভাবে বলা যায়, ইংরেজ আমলাটি এইরকমের খামারকে নমুনাসই বলে ধরে নিয়ে কাজ চালিয়েছেন (তখনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয় নি), এর থেকে পরোক্ষে সূচিত হচ্ছে যে, আঠার শতকে বাংলায় গ্রামাঞ্চলের উপর-স্তরগুলির মানুষ নিজেরাই কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করত খুবই ব্যাপক পরিসরে, হয়ত সাধারণভাবেই (আবাদ-করা জমির দিক থেকে)। একপ্রস্ত সরঞ্জামের দাম সম্বন্ধে হিসাবটাও (পশুর সাজ – ৮ টাকা, আর কৃষি সরঞ্জাম – প্রায় ২ টাকা) পরবর্তী উপাত্তের কাছাকাছি, যদিও চর্মকারের তৈরি-করা পশুর সাজের দামটাকে মনে হয় বাড়িয়ে ধরা হয়েছে। সেটা যা-ই হোক, কৃষিকাজে আবশ্যক জিনিসগুলোর মোট দামের (সরঞ্জাম আর বলদ – মাথাপিছু ৮-১০ টাকা) মধ্যে সবচেয়ে বেশি চালু উপাদানটার (কাজের সরঞ্জাম) হিসসা নগণ্য – এই সাধারণ নিয়মটাকে ঐ অনুপাতে দেখা যায় বেশ স্পষ্টই। বাংলার মোট জাতীয় উৎপাদে হস্তশিল্পের উৎপাদ আর কৃত্যকের হিসসাটার হিসাব করাও সম্ভব হয়ে ওঠে।

যা আগেই বলা হয়েছে তাতে বাংলায় কৃষি উৎপাদের দাম ধরা হয়েছিল ২১ কোটি টাকা (প্রতি বিঘায় ৬ টাকা, আবাদ-করা জমির মোট পরিমাণ ৩ কোটি ৫০ লক্ষ বিঘা), আর ১০০ বিঘা জমিতে চাষ-আবাদ করার জন্যে আবশ্যক সরঞ্জাম বাবত খরচ ৫০ টাকা, তাহলে বাংলায় এটা বাবত মোট খরচ ছিল মোটামুটি ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। গাড়ি এবং জলসেক আর কুয়োর সরঞ্জাম বাবত তার সঙ্গে যোগ করলে হস্তশিল্প কৃত্যক বাবত মোট খরচের পরিমাণটা বেড়ে দাঁড়ায় আড়াই তিন কোটি টাকা। এই পরিমাণটা, যেমন এটার পণ্য আকার হস্তশিল্প-সংক্রান্ত আগেকার বিবরণে ধরা হয় নি – ঐসব হস্তশিল্পের পণ্যের উপর কর ধার্য ছিল। তবে হস্তশিল্পজাত জিনিস বাবত প্রায় ৩ কোটি

টাকা, আর তার সঙ্গে কৃষিজাত জিনিসের দাম মিলিয়ে হত 'দেশটির বার্ষিক শ্রমকর্মের মোট মূল্য'।

এইসব পরিমাণ পুরোপুরি তুলনীয় নয়: এক, ৩ কোটি টাকার মধ্যে পড়ে কৃষকদের এবং অন্যান্য স্থানীয় ভোগ-ব্যবহারের জিনিস-পত্রেরও দাম; দুই, যেগুলোর মোট দাম হিসাব করা হয়েছে আড়াই তিন কোটি টাকা সেইসব কৃষি সরঞ্জাম তৈরি করা হত এক-বছরের বেশি বিভিন্ন কালপর্যায়ের জন্যে (লোহার অংশগুলো ১০-১২ বছরের জন্যে), তাই হস্তশিল্পের বার্ষিক উৎপাদের মূল্যের মধ্যে পড়তে পারে ঐ পরিমাণের শুধু একটা অংশ; তিন, সরঞ্জামের মেরামত দরকার হত প্রতি-বছর, সেটা বাবত খরচ ছিল বেশ মোটারকমের, কিন্তু হস্তশিল্পের বার্ষিক উৎপাদনের মধ্যে সেটাকে ধরা হয়েছে কিনা সেটা বলা হয় নি ঐ দলিলে। তাই মোটের উপর ধারণা করা যেতে পারে যে, গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্যে কারিগরেরা যেসব জিনিস আর খিদমত যোগাত সেগুলোর পরিমাণ ছিল মোটামুটি ৩ কোটি টাকা (হয়ত কিছুটা কম করে ধরা হয়েছে)।

দেখা যাচ্ছে, গ্রামাঞ্চলের উপর-মহলের খামারগুলোতে নিযুক্ত গ্রামের মানুষকে দৈনিক কিংবা মাসিক বস্তুশোধ করা হত, কিন্তু সেটা ছিল ফসলের পরিমাণ অনুসারে। এইসব মেহনতী মানুষকে কাজে লাগাবার ধরন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট নয় এইসব উপাত্ত। তবে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এরা ছিল গ্রামাঞ্চলে নিচের মহলের মানুষ, যাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হত দুই ধরনে মিলিয়ে: কর্মকাল অনুসারে এবং সম্প্রদায়ের মোট ফসল থেকে একটা অংশ কেটে নিয়ে। কোন-না-কোন আকারে খেতমজুরদের পাওনা মেটাতে যেত ১৪ কোটি টাকা, এতে স্পষ্ট বোঝায় গ্রামের উপর-মহলের খামারগুলোতে কাজের জন্যে নিযুক্ত বাড়তি মজুরদের পারিশ্রমিকই শুধু নয়, অধিকন্তু প্রজাদের নিজেদের এবং তাদের পরিবার-পরিজনের জন্যে নিযুক্ত মনুষ্যশক্তির ভরণপোষণের বাবত খরচ-খরচাও।

তাহলে, শ্রম আর উৎপাদন পরিব্যয় বাবত ১৪ কোটি টাকা (এটা থেকে একাংশ যেত গ্রামে যোগানদার কারিগরদের ভরণপোষণ বাবত), আর ভূমি-কর এবং ভূস্বামীদের পাওয়া খাজনা ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা মিলিয়ে মোট ২১ কোটি টাকা ছিল কৃষিজাত দ্রব্য-সামগ্রীর মোট

মূল্য। কৃষিজাত উৎপাদের এইরকমের দফাওয়ারি হিসাব স্পষ্টতই খুবই স্থূল ধরনের এবং আরও বেশি মাত্রায় আপেক্ষিক, কেননা যে-উৎপাদের বেশির ভাগটাকে বণ্টন এবং ভোগ-ব্যবহার করা হয়েছে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের বাইরে সেটাকে অর্থের আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে।

যেসব তথ্য রয়েছে আমাদের হাতে সেগুলি গুণাগুণের দিক থেকে খুবই বিভিন্ন রকমের, আর সেগুলোর মধ্যে তৌলনিক বিচার করা যায় না, তাই কতকগুলি দিক সম্বন্ধে শুধু অতি প্রাথমিক সিদ্ধান্তই করা সম্ভব। তবে উল্লিখিত তথ্যাদি এবং পরবর্তী মালমশলার ভিত্তিতে ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে, প্রাক্‌বৃটিশ ভারতে খুবই বহুবিস্তৃত ছিল এইধরনের গ্রাম-সম্প্রদায়, তাতে কৃষক খামারগুলোতে পুনরুৎপাদন চলত কারিগরদের সঙ্গে স্বাভাবিক সমন্বয়ের ধারায় প্রধানত (যে-কারিগবেরা তৈরি করত কৃষি সরঞ্জাম), যদিও এইসব জিনিস কেনা-বেচাও হত। তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার আর বিহারের উনিশ শতকের গোড়ার দিককার আর্থনীতিক জীবন-সংক্রান্ত উপাত্ত থেকে সংগত কারণেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, সম্প্রদায়ের ভিতরকার সম্পর্কতন্ত্রে গুরুতর ভাঙন ধরেছিল প্রাক্‌বৃটিশ আমলেও। এইসব পরিবর্তন ঘটেছিল যেমন কারিগর আর কৃষিজীবীদের মধ্যে সম্পর্কক্ষেত্রে, তেমনি কৃষিজীবীদের ভিতরে উৎপাদন যোগসত্রক্ষেত্রেও।

গ্রামীণ জনসমষ্টির বিভিন্ন অংশের অবস্থা

উল্লিখিত তথ্যাদি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে এবং পরে বিবেচিত তথ্যাদির ক্ষেত্রে আমি নিম্নলিখিত দুটোই ব্যবহার না করার চেষ্টা করব: প্রচলিত ইংরেজী পরিভাষা, আর পরে বিভিন্ন ভারতীয় বিচার-বিশ্লেষণে চালু-করা এবং ইংরেজী অভিধার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ধারণাগুলি। এইভাবে, 'মোকাদ্দমান রায়ত'কে খামারীদের মধ্যে ধরা চলে না (আবাদ-করা জমির আয়তন যা-ই হোক), তাকে বরং ধরা চাই চাষীদের নিচু অংশগুলির মধ্যে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষের সেইসব উঁচু অংশগুলোর মধ্যেও, যারা কৃষিকাজ চালাত, গ্রামের

ভূমিদাসদের কাজে লাগাতো, আবার চাষবাসের কাজে নিজেরা সরাসরি হাত লাগাতো।

বাঙালী আর বিহারী গ্রামীণ উপর-মহলগুলির আর্থনীতিক ক্রিয়া-কলাপের ধরনটা এমন ছিল যেটা নিয়ে বড়রকমের স্বতন্ত্র বিচার-বিশ্লেষণ আবশ্যক। কোন-কোন ইংরেজের বিবরণে তাদের দেখানো হয়েছে ঝুঁকিদার-কারবারি ধরনের খামারী হিসেবে (সেটা প্রকাশ পেয়েছে গ্র্যাণ্টের ব্যবহৃত পরিভাষায়), আর জমিদারদের দেখানো হয়েছে ইংরেজ ভূস্বামীদের মতো; এমনটা করার অভিপ্রায় এসেছে দুটো জিনিস থেকে: ভারতীয় গ্রামাঞ্চল সম্বন্ধে অজানিতভাবে ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন, আর বৃটিশ ভূমি-করাধান নীতির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার সচেতন চেষ্টা।

বাংলা আর বিহারের গ্রামাঞ্চলের উপর-মহলের মানুষের খামারগুলো সম্বন্ধে তথ্যাদি কিছুটা প্রণালীবদ্ধ হয়ে উঠেছে শুধু উনিশ শতকের প্রথম দশক থেকে প্রকাশিত দলিলপত্রে, সেগুলির মধ্যে পড়ে বুকানন, কোলব্রুক এবং ভার্দা-র বিচার-বিশ্লেষণগুলি। গ্রামীণ জনসমষ্টির মধ্যে আর্থনীতিক প্রভেদনের কিছু-কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় তার আগেকার কোন-কোন আকারেও। যেমন বাঙালী কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শি-বায়ন' কবিতায় (আঠার শতকের ষষ্ঠ দশক) আছে একজন গ্রাম্য ভূস্বা-মীর বর্ণনা, এই ভূস্বামীটি পশ্চিম ভারতের পক্ষে তেমন নমুনাসই নয়, – তার জমিগুলোতে যারা চাষবাস করত তাদের কাজের উপর কড়া নজর রাখাই ছিল এর কাজ। তবে এটা তো নিশ্চয়ই কোন একটা নমুনাসই সামাজিক চরিত্রের একটা আভাসমাত্র।

গ্রামাঞ্চলের উপর-মহল সম্বন্ধে আরও নির্দিষ্ট বর্ণনা আছে এন. কে. সিনহার একটা বিচার-বিশ্লেষণে, ইনি বৃটিশ সরকারী সূত্রের তথ্যাদির সাহায্যে বলেছেন আঠার শতকের নবম দশকের (অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার ঠিক আগেকার) 'উঁচু রায়তদের' বিশেষ-সুবিধাভোগী অবস্থার কথা। গ্রামের প্রধান বা মণ্ডল ('মণ্ডল' শব্দটার অর্থ 'মোকাদ্দাম'-এর খুব কাছাকাছি) তাদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হত বলে ভূমি-করের প্রধান বোঝাটাকে 'নিচু রায়তদের' ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার সুযোগ ছিল 'উঁচু রায়তদের'। আপসোসের কথা, এদের কারও আর্থনী-তিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সবিশেষ কিছুই বলেন নি সিনহা।

বাংলায় বিভিন্ন বর্গের রায়তদের জোতের আয়তন ছিল বিভিন্ন, সেটা যেমন ছিল মহারাষ্ট্রে। কোন-কোন রায়তের ছিল ২০০ বিঘা পর্যন্ত জমি (২৬ হেক্টরের বেশি) এবং তিন-চার প্রস্ত সরঞ্জাম। সিনহা বলেছেন, এইসব রায়তের জমিতে চাষবাস চালানো হত জন খাটিয়ে, এই মজুরেরা কাজ বাবত পেত একটা জমি-বন্দ – চাকরান, যেটা বাগানের অনুরূপ, অর্থাৎ কিনা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, গ্রামাঞ্চলের মানুষের এই অংশ-টার উপর চলত সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, আর গ্রামাঞ্চলে উপর-স্তরের মানুষের খামারে বেগার খেটে এরা নিঃশেষ হয়ে যেত। তবে বেশির ভাগ রায়তী জোতে মোটামুটি ১৬ বিঘা (২·১ হেক্টর) ধানী জমি ছিল। ধরে নেওয়া হত যে, এইসব রায়ত ফসলের অর্ধেকটা কর হিসেবে দিয়েও পরিবার প্রতিপালন করতে পারত।*

গ্র্যাণ্টের হিসাবে প্রতি বিঘায় উৎপাদন-পরিব্যয় ছিল ৬ টাকা, তদনুসারে দেখলে খাজনা দেবার পরে 'উঁচু রায়তের' হাতে অবশিষ্ট থেকে যেত ৬০০ টাকা অবধি, আর প্রায় ৫০ টাকা থাকত 'নিচু রায়-তের' হাতে। মোগল আমলে, এমনকি বৃটিশ বিজয়ের পরেও ('চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চালু হবার আগে অবধি) ধনী গ্রামবাসীদের খাজনা দেওয়া অনেকটা এড়াবার সুযোগ ছিল বলে তাদের মোট আয় নিশ্চয়ই ফসলের অর্ধেকের বেশি ছিল, আর তাদের খামারের জমি এবং ভিটেমাটি বা-ড়াবার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা হত। বিভিন্ন স্বাধীন উৎপাদকের মধ্যে সম্পর্ক হিসেবে বিনিময় হতে পারত না এমনসব ভূমি-মালিক এবং কারিগরদের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি। পরে দেখা যাবে – বাংলায় সম্প্রদা-য়ের চাকর-বাকরের শুধু নয়, কর্মকারদের মতো মানী কারিগরদেরও নিচু জাতগুলির মধ্যে পড়ে যাওয়াটা ছিল অবধারিত।

খাজনা দাখিল করা এবং উৎপাদন-পরিব্যয় মেটাবার পরে নিচু রায়তের আয়ের যা অবশিষ্ট থাকত তা দিয়ে সে পরিবারের জীবন-যাত্রার মান মাসে ৩-৪ টাকা হিসাবে বজায় রাখতে পারত (অবশ্য যদি থাকত কিছুটা উপরি আয়), (এটা ছিল মাঝারি গোছের বাঙালীর নমুনাসই মান), কিন্তু আরও জমি পাবার কিংবা ভিটেমাটি বাড়াবার

কোন সুযোগ থাকত না। নিজস্ব সরঞ্জাম এবং গবাদি পশু রাখা এইসব রায়তের পক্ষে দুষ্কর ছিল সেটা স্পষ্টই। তাই তারা অনেক সময়ে সেসব ভাড়া নিত উঁচু রায়তদের কাছ থেকে, – এদের ভিটেমাটিতে কাজ করে মিটিয়ে দেবার শর্ত থাকত।

বাংলায় কৃষিজীবী জনসমষ্টির প্রধান-প্রধান বর্গগুলির সম্পত্তি, জোতজমা আর খামারের আয়তনে যাবতীয় পার্থক্য যা-ই হোক সেগুলির কোনটার সরঞ্জাম বাবত ব্যয় এমন ছিল না যাতে সেটা তাদের জমাখরচের খাতায় খরচের ঘরে একটা গুরুত্বপূর্ণ দফা হয়ে উঠতে পারে। মনুষ্যশক্তি উদ্বৃত্ত হবার দরুন টেকনিককে উন্নতি ঘটাবার কোন চাড়ই ছিল না কার্যত। উৎপাদী সঞ্চয়ন ছিল নগণ্য এবং সেটা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই যেত সরল পুনরুৎপাদনে। এই সবকিছুর ফলে প্রবলতর হত কৃষিক্ষেত্রে বদ্ধতার দিকে ঝোঁক।

এই পরিচ্ছেদে জড়ো-করা মালমশলা থেকে ধারণা করা যায় শুধু অধস্তন অণু-ইউনিটে – কৃষি আর হস্তশিল্পের মধ্যে সরাসর সম্পর্কক্ষেত্রে – সামাজিক শ্রমবিভাগের পিছনকার কর্ম-বন্দেজ সম্বন্ধে। এই কর্ম-বন্দেজের আরও বিস্তৃত যোগসূত্রগুলো স্থাপিত হয়েছিল ব্যাপারিক পুঁজির মধ্যস্থতায়; সেটার ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সামন্ততান্ত্রিক ভারতে ব্যাপারিক এবং চোটার পুঁজি

ব্যাপারিক আর চোটার পুঁজির গঠন আর ক্রিয়াকর্ম নির্দিষ্ট হয়েছিল নিম্নলিখিত উপাদানগুলো দিয়ে: সামাজিক শ্রমবিভাগের পরিসর আর ধরন, উৎপাদন আর ভোগ-ব্যবহারের পৃথক-পৃথক ক্ষেত্রের মধ্যে পরস্পর-সম্পর্ক, উদ্বৃত্ত-উৎপাদ আদায় আর বণ্টনের প্রণালী, পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বিশেষত্ব। ভারতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জাত-বর্ণগত আর ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার গভীর ছাপ পড়েছিল এই পুঁজির সামাজিক সংগঠন এবং মূর্ত রূপায়ণের উপর। ব্যাপারিক পুঁজির অপেক্ষাকৃত বড়রকমের রূপান্তরসাধক ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল পশ্চিম ইউরোপে, এমনকি সেখানেও – এঙ্গেলস বলেছেন – বণিক তার জগতে 'সচেতন

বিপ্লবী' হিসেবে সক্রিয় হয় নি, উলটে, সেখানে সে সক্রিয় হল 'সেটার অস্থির অস্থি হিসেবে, মজ্জার মজ্জা হিসেবে। মধ্যযুগের বণিক ব্যষ্টি-সর্বস্ব ছিল না কোনক্রমেই, সে মূলত ছিল তার সমস্ত সমসাময়িকের মতো একজন সহযোগী'।*

বাস্তবিকই, সতর শতক থেকে উনিশ শতকের গোড়ার দিককার বিভিন্ন দলিলে বণিককে দেখানো হয়েছে ভারতের জাতিভেদপ্রথার একটা উপাদান হিসেবে। তাই ব্যাপারিক আর চোটার পুঁজির সাংগঠনিক সংস্থান সম্বন্ধে বিবেচনা দিয়ে শুরু করলেই ব্যাখ্যানটা হবে তাৎপর্য-সম্পন্ন। মধ্যযুগীয় ভারতে ব্যবসাবাণিজ্য আর চোটা অনেকাংশে ছিল বিভিন্ন বৃত্তিগত জাত আর সম্প্রদায়ের হাতে, এগুলো ছিল তাদের জাত-পেশা। ব্যাপারিক আর চোটার পুঁজি মিলিয়ে ছিল একটা পূর্ণাঙ্গ কার্মিক ব্যবস্থা, যেটার সাহায্যে বিভিন্ন পণ্য আর অর্থ মূল্যবস্তু চালান হত সামাজিক বিচারে আবশ্যক বিভিন্ন দিকে। এইভাবে, অণু-অঞ্চলের চৌহদ্দির ভিতরে উৎপাদের ঊর্ধ্বাধ পরিচলনের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু পুন-র্বণ্টন ব্যবস্থার কোন উঁচু স্তরে পৌছলে তো কথাই নেই, একটা নির্দিষ্ট মাঝারি স্তরে পৌছলে উৎপাদটা আড়-সংযোগের খাতে চলে যেত, সেটার পাল্লা হত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড প্রদেশ জুড়ে, এমনকি মোগল সাম্রাজ্যের মতো বিশাল রাষ্ট্রের রাজ্যক্ষেত্র জুড়ে। তদনুসারে, ব্যাপারিক আর চোটার পুঁজির ভিতরকার কার্মিক সংযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল – এলাকার চৌহদ্দির ভিতরে ঊর্ধ্বাধ যোগসূত্র (খুদে সুদখোর-ব্যাপারী থেকে বণিক ব্যাঙ্কার অবধি), আর মহা-অঞ্চলগুলির ভিতরে এবং সেগুলির মধ্যে মোটামুটি সমান-সমান অংশীদারদের মধ্যে আড়ভাবের যোগসূত্র।

সমগ্রভাবে ভারতীয় ব্যাপারিক পুঁজির সাংগঠনিক সংস্থানে, আর প্রধান-প্রধান জাত এবং সম্প্রদায়ের সোপানতান্ত্রিক সংগঠনে প্রকাশ পায় ব্যাপারিক আর চোটার পুঁজির কার্মিক ব্যবস্থাটা। পৃথক-পৃথক পেশায় কর্মরত পৃথক-পৃথক স্তরের কারবারিদের সমন্বয় আর পরস্পর-ক্রিয়া ছিল অণু-অঞ্চলের কর্ম-বন্দেজের ভিত্তি, সেটাকে বলবৎ করতে পারত ব্যাপারীদের একটা জাত কিংবা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। তবে ব্যাপা-রিক পুঁজির কাজ-কারবার চলত যত বেশি বিস্তৃত অঞ্চলে, সমগ্র কাজ-

কারবারে বিভিন্ন জাত আর সম্প্রদায়ের জড়িত হওয়াটা ছিল ততই বেশি অবশ্যম্ভাবী। 'ব্যাপারী-বণিক বর্গের মধ্যে বিভিন্ন জাত কোন বিশেষিত আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি। তাই বরাবরই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কেন্দ্রগুলিতে ব্যাপারী-বণিক বর্গগুলিতে থেকেছে একাধিক জাত কিংবা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ। ব্যাপারী-বণিকেরা দূর-দূর অঞ্চলে যেত প্রায়ই; বিভিন্ন বড়-বড় স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখাগুলোর মুৎসুদ্দিরা থাকত সমস্ত প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে – ফলে কেন্দ্রীয় অবস্থানগুলির বণিকবর্গ হত কিছুটা মিশ্র-জাতের। এইভাবে, বড়-বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে জড়ো-হওয়া বণিক-ব্যাপারীদের ক্ষেত্রে আর্থনীতিক প্রয়োজনের অনুযায়ী বর্গীয় সংগঠন-সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিত নিশ্চয়ই।'*

এই পরস্পরক্রিয়ায় পৃথক-পৃথক জাত আর সম্প্রদায়ের অবস্থা একই রকমের ছিল না। সেগুলোর মধ্যে কোন-কোনটা অধস্তন, স্থানীয় ক্রিয়াকর্মের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে ওঠে নি, কিন্তু উর্ধ্বাধ আর আড়ভাবের পরস্পরক্রিয়ার সমগ্র ক্ষেত্র জুড়ে কাজ-কারবার চালাত অন্য কোন-কোনটা। তাই, ভারতের প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই বণিক আর মহাজন জাত থাকলেও সেগুলি সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছিল গুজরাটে আর রাজপুতানায় (গুজরাটের বন্দরগুলি থেকে মোগল রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক কেন্দ্র অবধি বিখ্যাত বাণিজ্য-পথ গিয়েছিল রাজপুতানার ভিতর দিয়ে)। বিভিন্ন প্রভাবশালী গুজরাটী-মাড়োয়ারী জাত (রাজপুতানার উত্তর-পূর্বাঞ্চল – মাড়োয়ার বা যোধপুরের অধিবাসীদের নাম ছিল 'মাড়োয়ারী'), তাছাড়া রাজপুতানার অন্যান্য এলাকা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন বণিক আর মহাজন জাত, এবং অন্যান্য বণিক আর মহাজনদের বিভিন্ন জাত ছিল তহসিলদার (বিশেষত ভূমি-খাজনা আদায়কারী); তারা সামন্ত মনিবদের জিনিসপত্রের যোগান দিত, ক্রেডিট দিত, তাছাড়া তারা ছিল ফৌজের যোগানদার এবং পোদ্দার। অধিকন্তু, ব্যবসাবাণিজ্য আর চোটার উপায়ে তারা সরাসরি শোষণ চালাত কৃষকদের উপর।

মোগল আমলের ভারতে উদ্বৃত্ত-উৎপাদের প্রধান আকারটা ছিল সামন্ততান্ত্রিক খাজনা-কর, সেটা আদায় করায় ব্যাপারী আর মহাজন সম্প্রদায়-দুটো যে-গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিল, সর্বোপরি সেটাই ছিল শাসক শ্রেণীর সঙ্গে মাড়োয়ারী আর গুজরাটী ব্যাপারী আর মহাজনদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের কারণ। যেমন, রাজপুত রাজন্য-শাসিত রাজ্যগুলিতে কৃষকেরা খাজনা-কর দিত বস্তু আকারে, আর মাড়োয়ারী কিংবা গুজরাটী তহ-সিলদারেরা সেটাকে অর্থে পরিণত করত। যেসব বণিক আগেভাগে ধার্য-করা পরিমাণ টাকা রাজকোষে দিয়ে একটা নির্দিষ্ট এলাকায় খাজনা-কর আদায় করার ইজারা নিত, তারা কৃষিজীবী জনসমষ্টির কাছ থেকে ভাওলি আদায় করে একটা লাভ রেখে সেইসব জিনিস বিক্রি করত শহরে আর ফৌজী ছাউনিতে। খাজনা আদায় করা এবং বস্তু আকারে দেওয়া খাজনাটাকে নগদ টাকায় পরিণত করার কাজটা দৃষ্টান্তস্বরূপ যাইসলমারে ছিল পল্লিওয়ালা উপবর্ণের ব্রাহ্মণদের হাতে, এই ব্রাহ্মণেরা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্যাপারী আর মহাজনের সম্প্রদায়।*

মাড়োয়ারী মহাজনদের কর-ইজারাদারী কাজ-কারবার বিশেষ বহু-বিস্তৃত হয়ে দাঁড়িয়েছিল ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার পরে। প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলি ছিল রাজধানী থেকে বহু দূরে-দূরে; কর-আদায়ের উপর তদারকি করত জায়গিরদারেরা, এদের বদলান হত ঘন-ঘন, এসব ছিল কর-ইজারাদারি প্রথা উদ্ভবের অনুকূল উপাদান। সতর আর আঠার শতকে শুরু হয়েছিল ভূমিতে এবং কেন্দ্রীয় রাজস্ব সংস্থাগুলিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার ক্ষয়, এটা হল ভেঙে-পড়তে-থাকা মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে বড়-বড় কর-ইজা-রাদারদের কাজ-কারবার সম্প্রসারিত করার নতুন সুযোগ।** 'যুক্ত প্রদেশে আর বিহারে আগরওয়াল, অসবা, মেশরি, ইত্যাদি বেনিয়া সম্প্রদায়গুলি সবাই ব্যাপারীও ছিল। বিশেষত যুক্ত প্রদেশে আর মধ্য ভারতে এইসব সম্প্রদায় ঢুকেছিল হয়ত অনেক আগে। তবে যুক্ত প্রদেশ আর মধ্য

ভারত ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে তাদের সমাগম হয়েছিল সতর শতকের বেশি আগে নয় নিশ্চয়ই, আর কিছুটা প্রচুর পরিমাণে সেটা ঘটেছিল খুব সম্ভব সবে আঠার শতকে। এই সমাগম ঘটেছিল প্রধানত পুবে আর দক্ষিণে। উত্তরে আর পশ্চিমে এলাকাগুলি ছিল মুসলিম-প্রধান; যাদের ছিল মূলধনের সংস্থান আর উঁচু মাত্রার নৈপুণ্য এমনসব গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু ব্যাপারী সম্প্রদায় সেসব এলাকায় কাজ-কারবার চালাচ্ছিল আগে থেকেই। সুসংগঠিত বিভিন্ন কুশলী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আগে থেকেই ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমেও (গুজরাটে আর সৌরাষ্ট্রে)।'*

কর আদায়ে, রাজা-রাজড়াদের জন্যে টাকা যোগানে, ফৌজে সরবরাহে, ব্যবসাবাণিজ্যে ব্যাপারী আর মহাজন সম্প্রদায়-দুটোর যা প্রতিষ্ঠা ছিল তার ফলে, তেমনি তাদের নিজস্ব কাজ-কারবারী কর্মদক্ষতার দরুনও এই দুই সম্প্রদায়ের অনেকেই উঁচু-উঁচু সরকারী (প্রধানত রাজস্ব বিভাগের) পদে উন্নীত হতে পেরেছিল। যেমন, রাজপুতানার রাজন্য-শাসিত রাজ্যগুলিতে উঁচু-উঁচু পদে ছিল মাড়োয়ারীরা; সবচেয়ে বড় মাড়োয়ারী পুঁজিপতি গোপালদাস মোহতার পিতৃপুরুষ বিকানিরের প্রশাসন-যন্ত্রের প্রধান ছিলেন বহু বার, তাঁদের দেওয়া হত জায়গির এবং সামরিক আর প্রশাসনিক খিদমত বাবত নানা রকমের বিশেষাধিকার।**

মোগল রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্রেও উঁচু-উঁচু পদ পেতে ব্যাপারী আর মহাজন সম্প্রদায়ের অনেকের সহায়ক হয়েছিল কর-ইজারাদারি। ষোল শতকের শেষে আকবরের অর্থ বিভাগ সংগঠিত করে সেটার প্রধান হয়েছিলেন মাড়োয়ারীদের মধ্য থেকে আগরওয়ালা বর্ণের মানুষ টোডর মল। মোগলদের খাজাঞ্চী এবং সৈন্যদের মাইনে দেবার কর্তা হয়েছিলেন একজন জৈন*** – খরসুখরায়। তাঁর উত্তরাধিকারী পি. ডি. রামচন্দর ছিলেন দিল্লীতে রাজস্ব পাঠাবার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।**** আঠার শত-

কের গোড়ার দিকে গুজরাটী পোদ্দার আনন্দরায় মাশ্রাফ ছিলেন গুজরাটে শেষ মোগল সুবাদারের মন্ত্রী।*

কর-ইজারাদারদের বৃহৎ ব্যাপারিক আর চোটার পুঁজি বিশেষত প্রবল প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল আঠার শতকের গোড়ার দিকে, তখন এদের হাতে অনেকাংশে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল মোগল রাষ্ট্রের রাজস্ব-সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম। তখন জগৎ শেঠদের মস্ত ব্যাঙ্কিং কাজ-কারবারের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৃহৎ ব্যাপারিক আর চোটার পুঁজির ক্রিয়াকলাপ। জগৎ শেঠের একজন পূর্বপুরুষ হিরানন্দ সাহো সতর শতকের শেষের দিকে বিহারে গিয়ে হন ব্যাঙ্কার এবং মোগলদের সেনাপতি রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যের মহারাজ মান সিংহের যোগানদার। হিরানন্দ সাহো ছিলেন জয়পুরের রাজধানী অম্বরের একজন ব্যাঙ্কার, তিনি ছিলেন আসবাল নামে মাড়োয়ারী বণিক-মহাজন সম্প্রদায়ের মানুষ।** তাঁর ছেলে মানিক চাঁদ আঠার শতকের গোড়ার দিকে ছিলেন বাংলার কার্যত স্বাধীন নবাব মুরশিদ কুলি খানের ব্যাঙ্কার এবং বাংলা, বিহার আর ওড়িশায় নবাবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ। দিল্লীতে দরবারেও বিশেষ প্রতি-পত্তিশালী ছিলেন মানিক চাঁদ। নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি আর অর্থ প্রয়োগ করে মানিক চাঁদ মুরশিদ কুলি খানকে নবাব হিসেবে বজায় থাকতে এবং বাংলা শাসনে স্বাধীনতা নিরাপদ করতে সাহায্য করেছিলেন। এই খিদমতের প্রতিদানে মুরশিদ কুলি খান পুরোপুরি সমর্থন করে-ছিলেন মানিক চাঁদকে যখন ইনি চেষ্টা করছিলেন 'জগৎ শেঠ' (বিশ্ব ব্যাঙ্কার) খেতাব পাবার জন্যে; এই খেতাব ১৭১৫ সালে মঞ্জুর করে-ছিলেন শাহ ফাররুকশাইর।*** এটা নামই হয়ে দাঁড়িয়েছিল মানিক চাঁদের এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ফতি চাঁদ আর মহ্তব রায়ের, এঁরা আঠার শতকের প্রথমার্ধে খুবই প্রতিপত্তিশালী ছিলেন বাংলার নবাবদের দরবারে।****

বাংলা আর বিহার হয়েছিল জগৎ শেঠদের কাজ-কারবারের প্রধান ক্ষেত্র, এটা নিছক আপতিক নয়। মোগল সাম্রাজ্যের এই সমৃদ্ধ প্রদেশ-দুটি থেকে প্রতি-বছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়ে সেটা চালান যেত দিল্লীতে। বাংলা ছিল হস্তশিল্পের (বিশেষত তাঁত বোনার) এবং ব্যবসাবাণিজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলির একটা, সেটা শুধু ভারতে নয়, সারা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে। বাংলায় আদায়-করা কর দিল্লীতে পাঠান হত জগৎ শেঠদের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান মারফত, – কর আদায় করে টাকা পাঠাবার জন্যে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা আর গোমস্তা থাকত দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাবাণিজ্য কেন্দ্রে।* জনসমষ্টির কাছ থেকে তোলা ভাওলি বিক্রি করে টাকায় পরিণত করতও তারা।** পুরুষানু-ক্রমিক জমিদারদের ভূমি-কর দেবার জন্যে টাকার প্রয়োজন হলে জগৎ শেঠেরা তাদের ঋণ দিত, আর তারপর ঐ জমিদারদের দায়িতার সুযোগ নিয়ে তাদের অনেকের জমিদারি হস্তগত করত।

ডাব্লিউ. বোল্ট্স বলেন: 'যেসব জমিদার... সাধারণভাবে মোটা পরিমাণ নগদ টাকা এবং চুক্তি অনুসারে রাজস্ব দেবার জন্যে জামিনের প্রয়োজনে পড়ে তারা সাধারণত সাহায্যের জন্যে মহাজন কিংবা ব্যাঙ্কার কিংবা পোদ্দারকে ডাকতে বাধ্য হয়। নবাব জাফর খানের আমলে তন্তুবায় গোষ্ঠী বা জাতের (বোল্ট্স হয়ত ভুল করেছেন। – ভ. প.) একটি জেণ্টু [হিন্দু] পরিবারের কর্তা জগৎ শেঠ এই অবস্থাটার সদ্ব্যব-হার করেন (যেটাকে তিনি আরও বাড়াতে পারেন সাম্রাজ্যে পরবর্তী ডামাডোলের দিনকালে) দরবারে, রাজস্ব বিভাগে নতুন রীত-রেওয়াজ চালু করাবার জন্যে, নিজের এবং নিজ পরিবারের উন্নতি আর সমৃদ্ধির জন্যে।***

জগৎ শেঠেরা ফালাও বাণিজ্য চালাত (বিশেষত বাংলার কাপড়ের ব্যবসা), আর বাংলার ব্যবসাবাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে মস্ত-মস্ত আর্থিক লেন-

---

দেন চালাত এশিয়া আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বণিক-দের সঙ্গে। আঠার শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় বিভিন্ন বৃটিশ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিকে ক্রেডিট দিত জগৎ শেঠেরা।* ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে সুপরিচিত ইতিহাসকার টি. রায়চৌধুরীর একটা আগ্রহজনক অনুমান আছে, সেটা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে, তা তিনি বলেছেন জোর দিয়েই, সেটা এই যে, আঠার শতকের প্রথমার্ধে জগৎ শেঠদের মতো ধনবান ব্যাঙ্কাররা দেখা দিল, যাদের বিশেষিত বৃত্তি হল মহাজনি, এটা এই নির্দেশ করছে: সামুদ্রিক বাণিজ্য থেকে ভারতীয় বণিকদের হঠিয়ে দিয়ে ঐ ক্ষেত্রে বৃটিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-নির একচেটে কায়েম হবার ফলে ভারতীয় বণিকেরা মহাজনী কারবার ধরতে বাধ্য হয়।** ইংরেজরা না থাকলে জগৎ শেঠেরা ব্যাপৃত হত সামুদ্রিক বাণিজ্যে, যাতে তারা অনভ্যস্ত ছিল, এমনটা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। পরিবেশটা যা-ই থাকুক, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, কর-ইজারাদারি করতে তারা নারাজ হত না। তবে মোটের উপর বলা যায়, সমুদ্রপথগুলো থেকে জোর করে দূরে রেখে ইংরেজরা বাংলার বণিকদের কাজ-কারবার ডাঙায় চালাতে বাধ্য করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কারেন্সি স্পেকুলেশন ছিল জগৎ শেঠদের রাশীকৃত ধনদৌলতের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস; মুর্শিদাবাদে টাঁকশালও ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। বাংলার খাজাঞ্চিখানায় নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে তারা আগে তৈরি-করা টাকার হিসাবে সিক্কা টাকার (অর্থাৎ সর্বসাম্প্রতিক মুদ্রার) আবশ্যিক বিনিময়-হার বেঁধে দিত। বোল্‌ট্‌স বলেছেন, সিক্কার বিনিময় যাতে সংশ্লিষ্ট এমনসব লেনদেন ছিল শেঠ পরিবারের অপার 'ঐশ্বর্যের একটা উৎস'।*** 'সাইর-উল-মুতাহারিন'-এ আছে, 'জগৎ শেঠ-দের ধনদৌলত ছিল এতই বিপুল যাতে হিন্দুস্থানে কিংবা দক্ষিণাত্যে কোথাও কোন ব্যাঙ্কারের তুলনা চলত না সেটার সঙ্গে। এটা একেবা-রেই স্পষ্ট যে, ঐ সময়ে বাংলায় সমস্ত ব্যাঙ্কারই ছিল হয় জগৎ

শেঠদের সহযোগী, নইলে তাদের পরিবারের মানুষ। তাদের ধনদৌলতের পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা করা যায় এই ঘটনাটা থেকে: মুর্শিদাবাদ তখনও পাঁচিলে ঘেরা ছিল না, তখন প্রথম মারাঠা আক্রমণের সময়ে আলিবর্দি সাহায্য করতে আসতে পারার আগেই মির হাবিব তার সেরা ঘোড়সওয়ার বাহিনীর একটা ডিট্যাচমেণ্টের সাহায্যে নগরী দখল করে জগৎ শেঠদের বাড়ি থেকে শুধু আরকট টাকাই নিয়ে গিয়েছিল ২ কোটি। এমন বিরাট পরিমাণ অর্থ খোয়া গেল, তবু মনে হল শেঠদের ক্ষতিটা যেন দুই আঁটি খড়ের চেয়ে বেশি কিছু নয়। তারা সরকারের জন্যে কোটি টাকার বিভিন্ন রসিদ কাটতেই থাকল।'*

নিজেদের আর্থনীতিক বলের উপর নির্ভর করে জগৎ শেঠেরা বিস্তর রাজনীতিক প্রভাব খাটাতে পেরেছিল বাংলায়। বোল্ট্স নিশ্চয় করে বলেছেন, জগৎ শেঠেরা 'দরবারে যে-প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করেছিল সেটা স্বয়ং নবাবের চেয়ে বড় একটা কম নয়'।** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও জগৎ শেঠেরা বাংলায় একমাত্র মাড়োয়ারী ব্যাঙ্কার ছিল না। শেষ মোগল বাদশাদের আমলে কুঠিওয়ালা (টাকার চালানী কারবারি) নামে ধনী ব্যাঙ্কার মুর্শিদাবাদে ছিল সাত জন, যাদের নিজ-নিজ গো-মস্তারা ছিল গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে। তারা সবাই ছিল পশ্চিম ভারতের অসবাল সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা বাংলায় গিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করে। তারা আমদানি করত গোলমরিচ এবং অন্যান্য মশলা ছাড়াও ইউরোপীয় পশমী কাপড়-চোপড়, তুলো আর সূতী জিনিসপত্র, আর রপ্তানি করত আদা; তবে হুণ্ডি যোগানোই ছিল তাদের প্রধান কারবার। মুসলিম শাসন আমলে বিভিন্ন এলাকায় আদায়-করা কর মুর্শিদাবাদে পাঠাত এইসব ব্যাঙ্কার।*** তাদের সম্প্রদায়ের ভিতরে সাধারণত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকত বলে বাংলায় মাড়োয়ারী মহাজন আর ব্যাঙ্কাররা তাদের অব-স্থান মজবুত করতে পারত। যেমন, ১৭৪৮ সালে জগৎ শেঠেরা এমন

কিছু কর্মচারীদের বরখাস্ত করে৷ যারা তাদের সম্প্রদায়ের মানষ ছিল না।*

ভূমি-খাজনা (যা গোড়ায় ছিল ভাওলি, অর্থাৎ নগদের বদলে ফসল) আদায় করা আর চালান দেবার ব্যাপক পরিসরের ক্রিয়াপ্রণালী দিয়ে স্থির হয়ে যেত উৎপাদরাশির দফাওয়ারী গঠন। মোগল আমলের ভারতে যেসব জিনিস নিয়ে কেনাবেচা চলত সেগুলোর তালিকায় হাবিব প্রথম স্থানে দিয়েছেন শস্য, সেটাকে তিনি সংশ্লিষ্ট করেছেন এই অবস্থাটার সঙ্গে: গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে শস্য এবং অন্যান্য কৃষিজাতদ্রব্য-সামগ্রীর বিস্তৃত চালান ছিল মোগল সাম্রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে শোষণব্যবস্থার ভিত্তি। ভারতে গৃহীত ফারসী অভিধা অনুসারে বণিক-বেনিয়াকে 'বাক্কাল'ও বলা হত, কথাটার মানে হল 'শস্যের ব্যাপারী'। হাবিব বলেন, গ্রামে, সবচেয়ে কাছের মেলায় কিংবা শহুরে বাজারে, যেখানেই কৃষক তার শস্য বেচুক না-কেন, এই বেচা-কেনায় অংশভাগী হত ব্যাপারী। শস্যের ব্যবসায়ে জড়িত মূলধন ছিল মোটা টাকা, কেননা – কারিগরেরা অনেক সময়েই কাজ করত সরাসরি ফরমাশ অনুসারে, কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন নয় – কৃষক তার জাতদ্রব্যের ব্যবহারকের সঙ্গে পণ্য-সম্পর্ক স্থাপন করত ক্বচিৎ-কদাচিৎ।** এই কারণে কৃষিজাত দ্রব্য-সামগ্রীর বিপণনে শহরে মূলধনের অংশগ্রহণ ছিল বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত নির্মায়ক-করা জি-নিসপত্রের বিপণনে যা তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি মাত্রায়।

কৃষিজাত দ্রব্য-সামগ্রীর খুচরো বেচা-কেনা ছিল বহুপ্রচলিত। যেমন, সুরাট থেকে আগ্রা যাবার পথে একটা ছোট শহরে ট্যাভের্নিয়ে দেখেছি-লেন 'বেনিয়াদের পাঁচ-ছ'টা দোকান, যেখানে বিক্রি হয় ঘি, চাল, খড় আর তরিতরকারি'। সেগুলোর একটা সম্বন্ধে বর্ণনায় তিনি বলেন, 'এটার পাশে ছিল বস্তা-বস্তা চাল আর শস্যে ভরা একটা বড় গুদাম'।***

আপসোসের কথা, এইসব কৃষিজাত দ্রব্য-সামগ্রী খুচরো বাণিজ্যক্ষেত্রে পৌঁছত কিভাবে – কৃষকদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে, না, মহাজনী সুদ, খাজনা আর করের স্বাভাবিক অঙ্গ-উপাদানের আকারে – সেটা যাতে স্থির করা যায় এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় নি।

গুজরাটে গ্রাম্য মহাজন গ্রাম-সম্প্রদায়ে যথেষ্ট গুরুত্বসম্পন্ন ছিল যাতে সে সম্প্রদায়ে জোতের মালিকের ফসলের অংশ দাবি করতে পারত। মহাজনই তোলা ফসলের পরিমাণ স্থির করত, সম্প্রদায়ের কর্মী-কর্মচারী আর কারিগরদের প্রাপ্য ভাগ আলাদা করে দিত, আর বাদবাকিটাকে সমান-সমান করে ভাগ করে দিত খাজনা-প্রাপ্তা আর রায়তের মধ্যে। আনুষ্ঠানিকভাবে, ফসলের নিজ অংশটা সে পেত সেটা ভাগাভাগি করে দেবার 'কাজ' বাবত।* কিন্তু প্রাক্‌বৃটিশ কালপর্যায়ে ভারতের গ্রামাঞ্চলে মহাজনি যে-ভূমিকায় ছিল তার সঙ্গে সেটাকে সংশ্লিষ্ট করে দেখাই ঢের বেশি প্রত্যয়জনক।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জোত-মালিক সম্প্রদায়গুলির যা সংগঠন ছিল তাতে কৃষক খাতকের জমি মহাজনের কাছে হস্তান্তরিত হতে পারত না।** ইংরেজদের ভারত বিজয়ের সময়ে দেশটিতে ব্যাপারী আর মহাজন সম্প্রদায়ের লোকের রায়তীস্বত্বের জমি বড় একটা ছিল না। তবে কর আর খাজনা দেবার ব্যাপারে রায়তরা যে-মুশকিলে পড়ত সেটাকে মহাজন কাজে লাগাত তাঁদের বেঁধে ফেলার উপায় হিসেবে। যেমন, বুকানন বলেন, 'গ্রামের কর্মচারী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ খামারীরা আমাকে জানিয়েছে বাঙ্গালোরের ব্যাপারীরা তাদের খাজনা দেবার টাকা দাদন দেয় প্রায়ই, আর ঐ দাদন এবং সেটার সুদ বাবত পরে ফসলের অর্ধেকটা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়। এই দাদন কখনও-কখনও দেওয়া হয় ফসল কাটার ছ'মাস আগে।'*** প্রসঙ্গত বলি, এর থেকে দেখা যাচ্ছে, খাজনাটা

ছিল ঐ ফসলের অর্ধেকের কিছুটা কম, কিন্তু রায়তকে সুদসমেত দিতে হল তার ফসলের অর্ধেক।

পেশোয়া রাজ্যে, ঐ রাজ্যের অন্তত শেষ কালপর্যায়ে রায়তদের দেওয়া ভাওলিটাকে মহাজনেরা অনেক সময়ে নগদান-খাজনায় পরিণত করত। ইংরেজ আমলাদের বিভিন্ন বিচার-বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, মহারাষ্ট্র বিজয়ের ঠিক পরেই (১৮২১ সালে) 'নগদান-খাজনা, যখন দেওয়া হত – কথিত আছে – সেটার হিসাব হত শস্য-খাজনার ভিত্তিতে, আর সেটাকে নাকি পরিবর্তন করা হত এখনকার দিনের দামের সাত-ভাগের একভাগ হিসাবে।'* দেখা যায়, মহাজন যে-পরিমাণ পারিতোষিক পেত তাতে তার সমৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা মিলত। কিন্তু সেখানেই নিরস্ত হত না সে। কোন-না-কোন ভাবে সে সাধারণত সংশ্লিষ্ট থাকত 'এলাকার ইজারাদার (কর-ইজারাদার। – ভ. প.) বা মামলুতদারের' সঙ্গে, 'শেষোক্ত জনের দাবি মেটাবার পরে তার [মহাজনের] সবসময়েই এমন উপায়াদি থাকত যাতে সে চাষীকে সাধ্যের সর্বোচ্চ মাত্রায় দিতে বাধ্য করতে পারত। বহু ক্ষেত্রে মহাজন নগদ টাকা দিত সরাসরি মামলুতদারের হাতে, আর ৫০ থেকে ১০০ শতাংশের বন্ধকপত্র নিত চাষীর কাছ থেকে, সেটা বস্তুশোধ করতে হত ফসলতোলার সময়ে। এই উত্তমর্ণরা সাধারণত রায়তের সমস্ত আর্থিক দায়ের সুরাহা করে দিত, আর নগদ টাকা বাবত দেয় শস্যের হিসাব রাখত; অনেক সময়ে এমনটা ঘটত, যাতে রায়ত বছরের শেষে আবার পেত বা বর্ধিত দামে নিত সেই একই শস্য যা সে আগের বছরের দেনা মেটাবার জন্যে শাহুকারকে (মহাজনকে। – ভ.প.) আগে দিয়েছিল কমানো দামে।'** কর-ইজারাদার নায়েবদের জবরদস্তির ফলে মারাঠা রায়তেরা যে-নিদারুণ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ত সে-সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্যাদিও রয়েছে। চক্রবৃদ্ধি জুড়ে পুরন দেনার পরিমাণ যা দাঁড়াত তা শোধ করতে রায়ত অপারক হত।***

নিজেদের কর-উৎপীড়নটাকে ঢাকার চেষ্টায় ইংরেজ আমলারা

ঐ ব্যাপারটাকে হয়ত কিছুটা বাড়িয়ে বলে থাকতে পারেন। কিন্তু একটা জিনিস একেবারেই স্পষ্ট: মহারাষ্ট্রে নগদান-খাজনা আদায়ও হাসিল হত কৃষির স্বাভাবিক বদ্ধ পুনরুৎপাদন-চক্রে কোন ভাঙন না ঘটিয়েই,— এই কৃষিকে বাজারের সঙ্গে সরাসর এবং অবাধ সম্পর্ক স্থাপন করতে দিত না ব্যাপারিক আর চোটার পুঁজি। রায়ত সাধারণত খত দিত মহাজনকে, আর রায়তের দেয় করটা পেটেলকে (মোড়লকে) দিত মহাজন। এইসব কর এলাকার রাজস্ব দপ্তরে পাঠাবার সময়ে পেটেল নিজে খত (হাবালা) দিত আরও বড় কোন মহাজনকে, এই লোক তখন করটাকে দাখিল করত নগদে। এই 'ধরনটা ছিল সবচেয়ে প্রচলিত, সেটা এতই বেশি পরিমাণে যাতে, মোটামুটি হিসাবে, রাজস্ব সরাসরি নগদে দেওয়া হত সবেমাত্র ২৫ শতাংশ'।*

কর হিসেবে যে-শস্য পাওয়া যেত সেটাকে বিক্রি করার জন্যে ঊর্ধাধ ক্রেডিট আর বাণিজ্য ব্যবস্থা দরকার হত মহারাষ্ট্রেও। নগদান-খাজনাটাকে পাঠান হত পুনার কোন ব্যাঙ্কে এলাকাগুলি থেকে বিল্ কেটে, কিংবা নগদ টাকা দেওয়া হত, সেটা যেত ব্যাঙ্কারদের মারফত, *'আদায়টা খাজাঞ্চিখানায় পৌঁছবার আগে যারা [ব্যাঙ্কাররা] মুদ্রা-বিনিময়ের* সাহায্যে লাভ করত। কাজেই ব্যাঙ্কারদের গোমস্তা থাকত এলাকাগুলিতে আর রায়তদের, গ্রাম আর এলাকাগুলোর খাজনাদাতাদের ধার দেবার টাকার কারবারের শাখাপ্রশাখা সমস্ত মহলে ছড়িয়ে পড়ে মুদ্রার বিস্তৃত পরিচলন সৃষ্টি হত, সেই মুদ্রা প্রচুর পরিমাণ সুদ রাশীকৃত করে ফিরে যেত তাদের সিন্দুকে।'**

কাস্টম্‌স শুল্ক আদায় করার ব্যাপারেও চালু ছিল কর-ইজারাদারি। কর-ইজারার কারবারি কোন ধনী বণিক খাজাঞ্চিখানায় ৫০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ টাকা দিয়ে তারপর নিজ স্বত্বের কিছু-কিছু অংশ বেচে দিত স্থানীয় জমিদারদের কাছে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে শুল্ক আদায়ের অধিকারটাকে কর-ইজারাদার রেখে দিত নিজ হাতে, এইসব

এলাকা সে সযত্নে বেছে নিত—যাতে সেগুলো যারা ব্যবহার করে সেইসব বণিক নির্দিষ্ট কাস্টম্‌স ফাঁড়িগুলো এড়িয়ে যেতে পারে। কিছুটা কম শুল্ক দিতে হত বলে এইসব বণিকেরও লাভ হত, আর অন্যান্য বণিক-কে ঘুরপথে যেতে বাধ্য করে এইসব বণিকের মতো কর-ইজারাদারও লাভবান হত এমন শুল্ক থেকে।*

পূর্ব মহারাষ্ট্রে ভোঁস্‌লে রাজ্যে রাজস্ব দপ্তরের সঙ্গেও ব্যাপারিক আর চোটার পুঁজি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। নগদে কিংবা সাহুকারের নামে বিল্‌ কেটে পেটেল খাজনা দাখিল করত পরগনার কেন্দ্র কসবায়। মহাজনদের মধ্যে পেটেল যথেষ্ট আস্থাভাজন না হলে পরগনার মোড়ল তার জামিন হত, তখন সাহুকার টাকা দিত মোড়লের খত অনুসারে যা দেয়। সমস্ত কর কিংবা করের ঋণের অনুযায়ী অংশ আদায় করার অধিকার পেটেল সাহুকারকে দিত এটার বাবত। রায়তদের খতগুলোর নকল নেবার জন্যে, কিংবা সম্প্রদায়ের হিসাবরক্ষক পাণ্ডে করের যে-রেকর্ড রাখত সেটাকে তাদের সামনে মিলিয়ে দেখার জন্যে সাহুকার গোমস্তা পাঠাত বড়-বড় গ্রামে। যখন রায়তের নগদ টাকা থাকত না সেক্ষেত্রে সে পেটেল কিংবা সাহুকারের কাছ থেকে ধার নিত; এমন অবস্থায় সে পেটেলের জামিনে খত দিত, আর দেনাটা শোধ হওয়া অবধি সময়ের জন্যে দেনদারের সম্পত্তি আটক থাকত পেটেলের কাছে। এইসব প্রক্রিয়ার মধ্যে রায়ত সর্বস্বান্ত হত প্রায়ই সে একবার দেন-দার হলে সেটা মেটাতে পারত না কখনও।**

রায়তরা ঋণগ্রস্ত হত দুই ধরনে: একটাতে তারা না-কাটা ফসল মহাজনের কাছে বন্ধক দিত (তাতে পেটেল থাকত জামিন, যা দেখা যাবে পরে), এই বন্ধক হত যে-দামের ভিত্তিতে সেটা বাজার-দরের চেয়ে অনেক কম; ঋণ আর সেটার সুদ (মাসিক ২ শতাংশ) মেটাবে ফসল কাটা এবং বিক্রি হবার পরে, এই মর্মে রায়ত প্রতিশ্রুতি দিত অন্যটাতে (সাধারণত সাহুকারের উপস্থিতিতে)। কোন রায়ত ঋণ পরিশোধ করতে অপারক হলে তার সমস্ত সম্পত্তি হাতে নিত পেটেল (দলিলে সাহুকারের

উল্লেখ নেই), এটাকে স্বেচ্ছায় বিক্রয় বলে বিধিবদ্ধ করা হত।*

এইভাবে, সংশ্লিষ্ট দলিলে পাওয়া তথ্য থেকে নিশ্চয়ই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, খাজনা হিসেবে দেওয়া উদ্বৃত্ত-উৎপাদটাকে নগদ টাকায় পরিবর্তিত করতে পারত রায়ত, পেটেল আর সাহুকার এই তিনের যে-কেউ। দু'রকমের ঋণ ছিল, এর থেকে শস্য বেচায় পেটেল কিংবা রায়তের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা প্রতিপন্ন হয়, আর শস্যের জামানতে পেটেলদেরকে সাহুকারদের দেওয়া ক্রেডিট এবং শস্য নিয়ে সাহুকারের ফটকা (সে-সম্বন্ধে আরও বলা হবে পরে) থেকে দেখা যায় এই মুখ্য
তত দ্রব্যের প্রধান অংশটা কোন-না-কোন পর্বে গিয়ে পড়ত মহা-
হাতে। শেষে, এই ধারণা থেকে যায় যে, ঋণগ্রস্ত রায়তের জমি আর জিনিসপত্র দখল করে নিত সম্পূর্ণভাবে কিংবা প্রধানত পেটেল, সাহুকার নয়, – জোত-মালিকানার বর্ণগত নীতি এবং সেটার ভিত্তিতে চালানো আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ ব্যবস্থার দরুন সাহুকার সেটা করতে পারত না। পরে বৃটিশ আইনে এই নীতিটাকে বাতিল করা হয়েছিল, কিন্তু জমিতে মহাজন যে-অধিকার পেয়েছিল সেটার আইনগত বলবত্তার পথে তখনও বাধা হত রেওয়াজের জোর।

তার সঙ্গে সঙ্গে, যেহেতু মহাজনেরা রায়তদের দেনা উসুল করাত, তাই গ্রামের ধনী আর স্থানীয় ভূমি-মালিকদের সঙ্গে তাদের নিশ্চয়ই ঠোকাঠুকি বাধত। মহাজন যে-পরিমাণে কর-ইজারা ব্যবস্থার এজেন্ট হিসেবে কাজ করত তাতে সে রাজ্যের ভূসম্পত্তির খাজনা-দাবির প্রতিনিধিও ছিল। এই কারণে মেহনতী রায়তদের কাজ থেকে সরাসরি খাজনা-আদায়ের ব্যাপারে একটা স্থান পাবার জন্যে জমিদার, গ্রামবাসীদের উপর-মহল আর মহাজনদের মধ্যে বিরোধ খুবই প্রকোপিত হয়ে উঠত প্রায়ই।

যেমন, গুজরাটে স্থানীয় ভূমি-মালিকেরা খাজনায় নিজেদের হিসসাটাকে বাড়াবার চেষ্টায় পোদ্দারদের কর-ইজারাদারী ক্রিয়াকলাপ গণ্ডিবদ্ধ করত। তার উপর, জমিদারেরা মহাজনী কারবারে ঢুকে পড়ে সেখানে ভিড় বাড়িয়ে মহাজন আর ব্যাঙ্কারদের বের করে দিতে থাকে। ফর্বেস বলেন, আঠার শতকের অষ্টম দশকে 'জমিদার নামক অসাধু লোকেরা

পেটেল আর সরকার-মনোনীত কর-ইজারাদারের মধ্যে গিয়ে পড়ে উভয় পক্ষ থেকে সুযোগ-সুবিধা পেতে থাকে।'* জমিতে বীজ বোনার ঠিক আগে জমিদারেরা পেটেল আর কৃষকদের গবাদি পশু, বীজ, ইত্যাদি কেনার জন্যে মাসিক ৩৳ শতাংশ (বার্ষিক ৪৫ শতাংশ) হারে ধার দিত। এদের ভবিষ্য ফসল জমিদারের হাতে থাকত জামানত হিসেবে, তাই খাজনা যখন দেওয়া হয়ে যেত তখন তাদের বলা হত minutedars। 'এটা ছিল শুধু পোদ্দার আর এলাকার পয়সাওয়ালা লোকেদের হকের খেতাব, এরা চুক্তি অনুসারে এবং আদ্যোপান্ত যাঁচ-বিচারের পরে সেই পরিমাণ অর্থ দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিত যেটা ধার্য করত সরকারী তহসিলদার।'** দেখা যাচ্ছে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলাটি গুজরাটী জমিদারদের উপর অত্যন্ত খাপ্পা, তবে আমাদের আগ্রহের বিষয় অন্যকিছু, সেটা এই: কৃষকদের উপর শোষণ চালাবার ব্যাপারে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কর-ইজারাদার ব্যাঙ্কারকে হটাবার জন্যে বড় ভূমি-মালিকের স্পষ্ট উদগ্র আগ্রহ। সে সেটা সবসময়ে করে উঠতে পারে নি। যেমন, বাংলায় জমিদারেরা নিজেরাই জগৎ শেঠদের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল।

রাজস্ব ব্যবস্থার মধ্যে চোটার পুঁজির সমানে অনুপ্রবেশ স্বাভাবিকই ছিল, কেননা উদ্বৃত্ত-উৎপাদের বেশির ভাগটায় সরাসরি প্রবেশের পথ খুলে যায় তার ফলে। তবে যা বলা হয়েছে সেটা থেকে দেখা যাচ্ছে কর-ইজারাদারিই ছিল না ভারতীয় বণিক আর ব্যাঙ্কারদের একমাত্র কাজ-কারবার, যদিও কৃষিজাত দ্রব্য-সামগ্রী হস্তান্তরণের সঙ্গে আরও কোন-কোন কাজকর্মকেও মানিয়ে নেওয়া হয়েছিল কোন-না-কোন উপায়ে। তবু শহুরে বণিক আর ব্যাঙ্কারদের কোন-কোন বর্গের বহির্বাণিজ্য ক্রিয়াকলাপ (বিশেষত উপকূলবর্তী আর সীমান্ত এলাকাগুলিতে) হয়ে উঠতে পারত বেশ স্বাধীন কর্মক্ষেত্র।

কৃষির উদ্বৃত্ত-উৎপাদের মধ্যস্থতাঘটিত পুনর্বণ্টনে এবং অন্যান্য কাজ-কারবারে ব্যাপারিক পুঁজির অংশগ্রহণ

মধ্যযুগীয় ভারতে বরাবরই যুদ্ধের সঙ্গে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট থাকত কৃষির এবং অন্যান্য শাখারও উদ্বৃত্ত-উৎপাদের পুনর্বণ্টন; আর এই পুনর্বণ্টন স্বল্পমেয়াদী, না, দীর্ঘমেয়াদী হত সেটা নির্ভর করত সামরিক সাফল্য কতটা সুস্থিত হত তার উপর। প্রকৃতপক্ষে, এমন পুনর্বণ্টনে ব্যাপারিক পুঁজির অংশগ্রহণটা ছিল সামরিক-প্রশাসনিক যন্ত্রের খিদমতারই শামিল, যে-যন্ত্রটার স্বেচ্ছাচারী পদ্ধতি অবলম্বনের প্রবণতা দেখা খুবই বেশি পরিমাণে, যা যুদ্ধের সময়ে হত বরাবরই। যুদ্ধ বাধলে ব্যাপারিক পুঁজি স্বভাবতই পয়সা করত ফৌজে যোগান দিয়ে এবং সামরিক অভিযানে লুটে-আনা জিনিস বেচে। 'মোগল আমলের ভারতে ব্যাংকাররা সমৃদ্ধিশালী হত মোগল ফৌজের 'মোদী'* বা যোগানদার হিসেবে কাজ করে।'**

সৈন্যবাহিনী যেসব সড়ক ধরে চলত সেগুলোর ধারে-ধারে বিভিন্ন কেন্দ্রে থাকত ব্যাংকার-যোগানদারদের দালালেরা, – সৈন্যেরা যখন কুচ করত তখন তাদের সবকিছু যোগানোটা ছিল ঐ দালালদের কাজ। 'কৃষিজাত দ্রব্য-সামগ্রীতে সাধারণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল, তার মানে এই নয় যে, বিশেষিত ধরনের কোন উৎপাদ ছিল না এবং কখনও-কখনও সেগুলোকে নিয়ে বহু দূর-দূর পথে বেচা-কেনা চলত না। তখনকার কালে সমস্ত সামরিক চলাচলে এমনকি শস্যও প্রচুর পরিমাণে স্থলপথে বহু দূরে-দূরে বয়ে নিয়ে যাওয়াটা ছিল অত্যাবশ্যক। তার ফলে আমরা দেখি পশুর সাহায্যে মালবহনের বিশেষ ব্যবসায়ের গুরুত্ববৃদ্ধি, যারা কুচের সময়ে সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন মেটাত। সৈন্যবাহিনীর জন্যে উৎপাদ বহন করা ছাড়াও এমন কোন-কোন বিশেষ উৎপাদ ছিল যেগুলো নিয়ে দূরপাল্লার বাণিজ্য চলত।'***

সতর শতকের শেষের দিকে ট্যাভের্নিয়ে লেখেন: 'রাষ্ট্রের অর্থের একটা মস্ত অংশ সবসময়ে থাকে পোদ্দারদের হাতে, তারা সেটা থেকে বিস্তর লাভ করে। দেশটির নিয়ম অনুসারে সৈনিকদের মাইনে দেওয়া হয় মাসে-মাসে, কিন্তু বেশির ভাগ সৈনিক আর বহু ক্যাপ্টেন এবং অন্যান্য অফিসারও মাসের শেষ অবধি অপেক্ষা করে না, তারা টাকা ধার নেয় পোদ্দারদের কাছ থেকে, এরা সুদ নেয় বছরে ১৮-২০ শতাংশ।'*

কুচের সময়ে সৈন্যদের টাকা আর রসদ যোগাবার অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল মারাঠাদের। মারাঠা রাজ্যগুলোর বেলায় লুটেরা হানা ছিল আয়ের একটা প্রধান উপায়, তবে সামরিক লোক-লশকরের ভরণপোষণের জন্যে আবশ্যক টাকাকড়ি আগাম দিতে স্থানীয় ব্যাঙ্কাররা রাজি কিনা তার উপর অনেকাংশে নির্ভর করত অমন হামলার আয়োজন। ই. ম. রেইসনার লিখেছেন: 'অতিশয়োক্তি হবে না যদি বলা হয় যে, মারাঠা সামন্ত নায়কদের লুটেরা সামরিক অভিযানের জন্যে অর্থের যোগান দেওয়ায় একটা মস্ত ভূমিকা ছিল বেনিয়াদের আর মহাজনী পুঁজির, আর লুটের মালের একটা মোটা অংশ এই পুঁজির হস্তগত হত। এটা ভোলা চলে না যে, এইসব যুদ্ধ চালান হত ভাড়াটে সৈনিকদের দিয়ে, তাদের টাকার দরকার ছিল সবসময়ে, আর মারাঠা পেশোয়াদের ভাড়াটে সৈন্যদের মাইনে দেবার টাকার অনটন ছিল স্থায়ী।'**

১ম পেশোয়া বাজি রাও থেকে শুরু করে পুনা-তে সরকার স্থানীয় ব্যাঙ্কারদের কাছ থেকে ধার নিত সবসময়ে। বাজী রাও মারা গেলে তাঁর অপরিশোধিত ঋণ ছিল ১৪,৫০,০০০ টাকা। বার্ষিক ১২-৩০ শতাংশ সুদে এই ঋণ নেওয়া হয়েছিল ৩০ জন মহাজনের কাছ থেকে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়-বড় মহাজন ছিল – রঘুনাথ পাটবারিয়ান (ঋণ – ৩,০০,০০০ টাকা), গোরখ মন্দ্রবামি (১,০৫,০০০ টাকা) আর বালাঞ্জী জোশী (৩৬,০০০ টাকা)।***

১৭৩৬ সালে বাজী রাও-এর মোটা-মোটা টাকার বিভিন্ন দেনা ছিল, তিনি নতুন-নতুন ঋণ পাবার যত চেষ্টা করেছিলেন তাতে নারাজ হয়েছিল পুনার মহাজনেরা, তারা পেশোয়াকে ঋণ দেবার উপযুক্ত পাত্র বলে মনে করত না। এস. সেন বলেন, সামরিক অভিযানের টাকা অপারক হয়ে পড়েছিলেন পেশোয়া, টাকা যোগাড় করতে হত সামন্ত নিজেদেরই। দেখা যায়, ঐ প্রয়োজনে লাগাবার মতো উদ্বৃত্ত কিংবা জমানো টাকা ছিল শুধু অল্প কয়েকজন মারাঠা সর্দারের, আর এমনসব ক্ষেত্রে তারা মহাজনদের শরণ নিত। দৌলত রাও সিন্ধিয়ার আমলে গোকুল পারেখের মতো ধনী ব্যাংকাররা মুখ্যমন্ত্রীর পর্যায়ে উঠতে পারত ঐ কারণেই।*

আফগানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্যে ১৭৬০ সালে মারাঠাদের উত্তরে অভিযানের সময়ে পেশোয়া মাত্র ২,০০,০০০ টাকা নগদ দিতে পেরেছিলেন সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি সদাশিব ভাই-কে, যখন ঐ অভিযানের খরচ-খরচা ছিল মাসে ৫,০০,০০০-৬,০০,০০০ টাকার বেশি।** সামরিক অভিযানের সময়ে মারাঠা সৈনিকদের জন্যে সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত বড়-বড় মহাজন আর ব্যাংকারদের একটা প্রধান কাজ ছিল বাঞ্জারাদের টাকা আগাম দেওয়া, যে-টাকা দিয়ে শস্য কিনে তারা দিত সৈন্যদের ছাউনিগুলোতে। প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজদের বিভিন্ন বিবরণে সাবুদ হয় যে, বড়-বড় মহাজন আর বণিকেরা মারাঠা সৈনিকদের রসদাদির সরবরাহে আনুকূল্য করত।***

মারাঠা সর্দারেরা যেসব অঞ্চল দখল করত সেগুলিতে করাধানের সাহায্যে লুটতরাজের হাতিয়ার ছিল ব্যাংকাররা, তাদের পক্ষে 'লড়াই চালানো' আর 'কর আদায় করা' ছিল সমার্থক।**** তবে অল্পকালের

মধ্যে নগদান-কর আদায় করা সম্ভব হত কদাচিৎ। মারাঠারা তাই স্থানীয় ব্যাঙকারের সাহায্য নিত, এই ব্যাঙকার তাদের হুণ্ডি দিত (এটা তো স্পষ্টই যে, যে-পরিমাণ টাকার জন্যে হুণ্ডি দেওয়া হত সেটাকে সুদসমেত পরিশোধ করার দায়িত্ব নিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ)। বিজেতা ঐ হুণ্ডি ভাঙাতে পারত ভারতের যেকোন জায়গায়।* খুবই উন্নত ধরনের এই হুণ্ডি ব্যবস্থাটাকে মারাঠারা এইভাবে তাদের হামলাগুলোর সময়ে কাজে লাগাত সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব বেশি পরিমাণ নজরানা পাবার জন্যে। 'স্থানীয় কর্মচারী বা কর্মকর্তাদের দাখিল-করা টাকা নিয়ে সেটাকে সদর কার্যালয়ে পাঠাবার ক্ষমতা দেওয়া যেত ব্যা-ঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলিকে। যেখানে সেগুলোকে তত সরাসরি প্রাধিকার দেওয়া হত না সেসব ক্ষেত্রেও চালান করার প্রয়োজন থেকে দেখা দিত বিনিময়ের কারবার।'**

শেষে, বণিক আর মহাজনদের সম্প্রদায়গুলি তাদের উপর-মহল-গুলিকে সরবরাহ করত বিভিন্ন বিলাসদ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া এবং আমদানি-করা অন্যান্য জিনিস। হস্তশিল্পজাত জিনিসপত্রের বেচা-কেনা সম্বন্ধে তথ্যাদি দেওয়া হবে পরে। তার আগে এখানে শুধু এটা বলে রাখছি: ভারতীয় বণিকদের ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্ক দেশটির সীমান্ত ছাড়িয়ে অনেক দূরে-দূরে সম্প্রসারিত করতে সহায়ক হয়েছিল এইসব জিনিসের বাণিজ্য।

মাড়োয়ারী ব্যাপারীরা সমেত ভারতীয় বণিকেরা মধ্যপ্রাচ্য আর দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য করা ছাড়াও মধ্য এশিয়া, ইরান আর ট্রান্স-ককেশাসের পথে পৌঁছেছিল আস্ত্রাখানে, সেখানে তারা স্থাপন করেছিল বিভিন্ন স্থায়ী বসতি। অত আগে, ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার একজন মুসলিম বণিক রেশম-বোঝাই তিনখানা জাহাজ পাঠিয়েছিলেন রাশিয়ায়, তবে ঐসব জাহাজ ডুবে গিয়েছিল পারস্য উপসাগরে। সতর শতকে এবং আঠার শতকের গোড়ার দিকে ভলগা নদী বরাবর বাণিজ্যে সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন ভারতীয় বণিকেরা, আর নিজনি নভগরদে আর ইয়ারস্লাভ্‌লেই শুধু নয়, মস্কোয়ও তাঁদের সফর ঘটত অনেক সময়ে।

মুদ্রা-বিনিময়ের কারবারটা ছিল বণিক আর মহাজন সম্প্রদায়ের আয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় ব্যাঙ্কারের শ্রফ (shroff) নামটা আরবী 'সার্‌রাফ' (মুদ্রা-বিনিময়কারী – পোদ্দার। শব্দটার বিকৃত রূপ। দেশটিতে চালু ছিল বিভিন্ন টাঁকশালের মুদ্রা, তাই মুদ্রা বিনিময় করে এবং বিহিত অর্থের হিসাবে বিভিন্ন মুদ্রার মূল্যায়ন করে ধনবান হবার বিস্তর সুযোগ মিলত পোদ্দারদের।* ট্যাভের্নিয়ে বলেন, কিছু পরিমাণ মুদ্রার পরীক্ষা আর মূল্যায়ন ক'রে পোদ্দার সেগুলোকে থলেয় পুরে সেলাই করে মূল্য নির্দেশ করে নিজের সীলমোহরের ছাপ লাগিয়ে দিত। থলেটা হাতফের হতে থাকলে পোদ্দার সেটার ভিতরকার মুদ্রাগুলোর মূল্য নিশ্চিত করে বলত এবং সেজন্যে নির্দিষ্ট হারে বাট্টা পেত।**

মহারাষ্ট্রে পেশোয়াদের আমলে ছিল 'এত বেশিসংখ্যক সিক্কা, যে-গুলোকে বিনিময়ের জন্যে বাজারে নেওয়া হলে সেগুলোর মূল্য ছিল এতই বিভিন্ন, যাতে পোদ্দার, সাহুকার আর বণিকরা জনসাধারণকে যথেচ্ছ ঠকাত'।*** ব্যাঙ্কাররা মুদ্রার মিথ্যা মূল্যায়ন দিত, মুদ্রা জাল করত ব্যাপকভাবে। 'টঙ্কন উঁচু মাত্রায় কেন্দ্রীকৃত ছিল না, স্থানীয় টাঁকশাল ছিল বহু। এইভাবে চলতি মুদ্রা ছিল বহু রকমের। তাছাড়া, মুদ্রা খারাপ হয়ে যেতে পারত, আর এমনকি একই টাঁকশাল থেকে ছাড়া নতুন মুদ্রা সাধারণত হত অধিহারে। কাজেই বড়রকমের কাজ-কারবারে সংশ্লিষ্ট থাকত নানা রকমের মুদ্রার লেনদেন এবং সেগুলির পারস্পরিক বি-নিময় মূল্য নির্ধারণের ব্যাপার। এর ফলে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন এজেন্সি যেগুলো নানা রকমের মুদ্রা নিতে রাজি কিংবা একরকমের মুদ্রার বি-নিময়ে অন্য রকমের মুদ্রা নিতে রাজি। মুদ্রা-বিনিময়কারীরা কোন-কোন ক্ষেত্রে ঐ কাজেই বিশেষিত হত, কিন্তু মুদ্রা-বিনিময় কারবারের

সঙ্গে সাধারণত সংযুক্ত হত অন্যান্য আর্থিক কিংবা ব্যাঙ্কিং কার-বার।'*

ব্যবসাবাণিজ্য-সংক্রান্ত আর আর্থিক কাজ-কারবারের পরিমাণ আর ক্ষেত্র ছিল বিরাট, তাই ক্রেডিট আর তথ্যের যৌগিক এবং সচ্ছন্দে সক্রিয় ব্যবস্থা স্থাপনের প্রয়োজন হত ভারতীয় বণিক আর ব্যাঙ্কারদের। এই ব্যবস্থাটা সম্বন্ধে জওহরলাল নেহরু বলেন: ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা 'ছিল কার্যকর এবং সারা দেশে সুসংগঠিত; বড়-বড় ব্যবসাবাণিজ্য বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর চালু-করা হুণ্ডি বা বিল্ গ্রাহ্য হত ভারতের সর্বত্র, তাছাড়া ইরানে আর কাবুলে, হেরাটে আর তাশখন্দে এবং মধ্য এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও... এজেণ্ট, জবার, দালাল আর মিড্‌লম্যান-দের বিস্তৃত তারজালি ছিল...।'**

নেহরুর একজন বিশিষ্ট সহযোগী ডি. আর. গ্যাডগিল বলেন: 'হুণ্ডি চালু-করা আর সেটার হিসাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ-কারবার ছিল ব্যাঙ্কারদের ধন-দৌলতের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎপত্তিস্থল। ব্যাঙ্কারদের একটা 'কর্ম'... ছিল হুণ্ডি যোগানো। এগুলো সাধারণত দেখা দিত পণ্য-বাণিজ্য থেকে, আর বাণিজ্যে অর্থের যোগান হত বা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকা পাঠান হত এগুলোর সাহায্যে। সমগ্র বাণিজ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান এবং সেগুলোর নানা শাখা কিংবা প্রতিনিধি সমেত ব্যবস্থাটা থাকার উপর নির্ভর করত এইসব কাজ-কারবার। এমন ব্যবস্থা ভারতে পুরোদস্তুর চালু ছিল আঠার শতক শুরু হবার আগে। তখন পরিবহণের এবং রাজনীতিক অবস্থা যা ছিল তাতে বেশি-বেশি পরিমাণ মুদ্রা দূর-দূরান্তরে বয়ে নেওয়াটা ছিল বিপজ্জনক এবং ব্যয়সাপেক্ষ, এই বহনের প্রয়োজনটা দূর হত ঐ ব্যবস্থাটার কল্যাণে। গড়ে তোলা হয়েছিল খুবই উন্নত ধরনের হুণ্ডি, তার সঙ্গে বিস্তারিত জামিনের ব্যবস্থা, আর ভারতে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বত্র শাখা কিংবা প্রতিনিধিদের নামে দেওয়া হুণ্ডির ব্যবস্থা করতে পারত।'***

বিভিন্ন বাণিজ্য এবং মহাজনী সম্প্রদায়, তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা। অর্থের সঞ্চয়ন আর বিনিয়োগের শর্ত

সহজেই দেখা যাবে যে, বাণিজ্যিক আর মহাজনী জাত আর সম্প্রদায়গুলোর সংগঠন আর প্রসারটা একদিক থেকে দেখলে ঘটেছিল ব্যাপারিক পুঁজির কাজ-কারবার এবং কর-রাজস্ব চালানের পিঠাপিঠি। এই সাধারণ নিয়মটা মূর্ত হয়ে উঠেছিল এইভাবে: যখনই কোন অঞ্চল এসে যেত জোরদার বাণিজ্য কিংবা কর-ইজারাদারী ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে, সেখানে ঢুকে পড়ত মহাজন আর ব্যাঙ্কাররা।

এইভাবে, বাণিজ্য আর ক্রেডিটের কাজ-কারবারের দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উপান্ত্য এলাকাগুলি থেকে বণিক আর ব্যাঙ্কাররা ঢুকে যেত মহারাষ্ট্রের শহরগুলিতে। শহুরে কারিগরদের প্রধান অংশটা ছিল মারাঠা, কিন্তু বণিকদের মধ্যে অবস্থাটা ছিল অন্য রকমের। মারাঠা রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হবার সময় নাগাত গ্রাম সম্প্রদায় তখনও আর্থনীতিক বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ওঠে নি, আর শহর এবং গ্রামের মধ্যে সামাজিক শ্রমবিভাগ ছিল ভারতের উন্নত অঞ্চলগুলির শ্রমবিভাগ থেকে অনেকটা পিছনে। সেই কারণেই মহারাষ্ট্রে তেমন কোন ক্ষমতাশালী বাণিজ্যিক আর মহাজনী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে নি যেমনটা ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ গুজরাটে, রাজপুতানায় কিংবা দোয়াবে।

মারাঠা রাজ্যে বড়-বড় স্থানীয় বণিক আর কর-ইজারাদারদের বেশির ভাগ ছিল ব্রাহ্মণ বর্ণের মানুষ। জে. ম্যালকম লিখেছেন: (দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণদের। — ভ. প.) 'খুবই ক্ষুদ্রাংশ ধর্মকৃত্যে নিয়োজিত... তাদের বেশির ভাগই ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রের সেইসব কর্মশীল এবং মিতাচারী মানুষ যারা মারাঠা সরকারগুলির সমস্ত কৃত্য সম্পাদন করে; উচ্চতর আর অধস্তন উভয় শ্রেণীর এইসব বণিক আর কেরানি সবচেয়ে পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান।'*

পুনার বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরের প্রায় ১৭৫ জনের (দেখা যায় তারা সবাই কোঙ্কণের ব্রাহ্মণ) নাম আছে 'পেশোয়ার রোজনামচা

থেকে নির্বাচিত বিভিন্ন দফা'-তে ১৭৯৭-১৭৯৮ সালের একটা দফায়, এরা কোঙ্কণ থেকে চাল এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে যেত দুই ঘাটের গিরিসঙ্কটগুলি দিয়ে, তাদের এই চালানে আবকারি শুল্ক রেহাই দেওয়া হয়েছিল। 'এইসব চালানের বেশির ভাগই ছিল কোঙ্কণে পাইকারী কেনা জিনিসপত্র, তবে প্রাপ্ত খাজনাও হতে পারে অংশত। এগুলো নির্দেশ করে গুরুত্বপূর্ণ স্থানান্তরণ গতিবিধি থেকে স্থাপিত অন্তর্বাণিজ্যের ধারা।'*

তবে বড়রকমের ব্যবসাবাণিজ্য আর ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে প্রধান-প্রধান অবস্থানগুলোতে আগের মতোই থেকে গিয়েছিল গুজরাটী আর মাড়োয়ারী বানিয়ারা, তারা ঐ অঞ্চলে চলে যেতে শুরু করেছিল তখনও সেটা ছিল মোগল শাসনের অধীন।** 'পুনা-তে সবচেয়ে গোড়ার অধিবাসীরা ছিল মনে হয় গুজরাটী বানিয়া আর বোহরারা, আর এটা সম্ভব যে, উভয়েরাই পুনা-তে গিয়েছিল বারহানপুর আর ঔরঙ্গাবাদের ভিতর দিয়ে। পক্ষান্তরে, নাগপুরে অধিবাসী বণিকেরা ছিল রাজস্থানের বানিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ, এরা ছড়িয়ে পড়েছিল মধ্য আর উত্তর ভারতে। বেরার-নাগপুর অঞ্চল থেকে তুলোর চালান শুরু হলে এই ব্যবসায়ে নিয়ন্ত্রণ হস্তগত করেছিল তারাই।'***

মারাঠাদের শাসিত মধ্য-ভারতীয় রাজ্যগুলিতে গুজরাটী বংশোদ্ভূত 'রাজন্য ব্যাঙ্কারদের' সঙ্গে জে. ম্যালকমের সাক্ষাৎ হয়েছিল উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে। এগুলির কোন-কোন ব্যাঙ্কার পরিবার এই অঞ্চলে যখন স্থায়ী বসবাস স্থাপন করে তার আগে থেকেই সেখানে ছিল বিভিন্ন স্বাধীন রাজপুত রাজ্য। যেমন, গুজরাট থেকে আগত উজ্জয়িনীর 'প্রধান ব্যাঙ্কারের পূর্বপুরুষ সেখানে গিয়েছিলেন ৩০০ বছর আগে'।**** মারাঠা রাজকার্যের উঁচু-উঁচু পদে ছিলেন তাঁদের অনেকে। যেমন, সিন্ধিয়া দরবারে ইংরেজ রেসিডেণ্টদের ১৮১১ থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে লেখা সরকারী রিপোর্টগুলিতে রাজকার্যে ব্যাঙ্কার গোপাল

পারেখের বিস্তর প্রভাব সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়, ইনি ছিলেন গোয়ালিয়ার অর্থ বিভাগের প্রধান (দেওয়ান)। ব্যাঙ্কারটি কোন্ জাতির মানুষ তা বলা হয় নি, তবে তাঁর নামটা নমুনাসই গুজরাটী, আর বিশেষত তাঁর বংশনাম হল উনিশ শতকের শেষের দিককার গুজরাটের সবচেয়ে বড় মিল্-মালিকের যা সেই একই, এর থেকে নিশ্চিত হয়ে বলা যায় গোপাল পারেখ ছিলেন একজন গুজরাটী পোদ্দার। রাজকোষে একটা ঋণ দিয়ে গোপাল পারেখ উপরে উঠেছিলেন; রাজকোষ তখন দেউলিয়া হয়-হয়, কেননা কয়েক বছরের খাজনা আগাম আদায় করা হয়েছিল।* কৃতজ্ঞতাবশে রাজা পারেখের হাতে দিয়েছিলেন রাজকোষ। কিন্তু পরে নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল পারেখের অবস্থান। গুজরাটের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে বানিয়ারা স্বভাবত বরাবর ছিল তাদের স্বদেশভূমির অর্থ বিভাগের প্রধান। আঠার শতকের শেষের দিককার বিভিন্ন দলিলেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়।** ম্যালকম নিশ্চয় করে বলেছেন, উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে 'মধ্য ভারতে প্রায় সমস্ত সাহুকার আর পোদ্দার (ব্যাঙ্কার আর মুদ্রা-বিনিময়কারী) এবং বানিয়াদের (অর্থাৎ খুচরো বেপারিদের) একটা বড় অংশ গুজরাট কিংবা মাড়োয়ার থেকে আগত। আর সাধারণত তারা খুব পুরান বাসিন্দা নয়। ...গুজরাটের চেয়ে মাড়োয়ার থেকে আগত লোকের সংখ্যা বেশি, কিন্তু এটা হল মধ্য ভারতে মারাঠা শাসনের পর থেকেই শুধু।'*** ব্রিটিশ বিজয়ের সময় অবধি পশ্চিম হিন্দুস্থানে ব্যাঙ্কাররা খিদমত করত মারাঠা রাজন্যদের, – মারাঠা রাজ্যক্ষেত্রে কর-ইজারাদারি ছিল এই ব্যাঙ্কারদের প্রধান কাজ।

কর-আদায়ের ব্যাপারটা হাতে পাবার পরে মাড়োয়ারীরা রাজন্য-শাসিত রাজ্যগুলির রাজকার্যের উপর প্রভাব খাটাতে শুরু করে। ম্যালকম লিখেছেন: 'যেহেতু করদাতাদের অনেকেই কারবারের ব্যাঙ্কার, কিংবা সেই শ্রেণীর প্রতিপালিত মানুষ, তাই রাজ্যের মন্ত্রণা-সভা আর

প্রদেশগুলির স্থানীয় প্রশাসন উভয় ক্ষেত্রে তারা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হয়েছে এবং সেটা বজায় রেখেছে, এর থেকে তারা হয়েছে মস্ত ক্ষমতা-শালী, যে-ক্ষমতা তারা চালিত করে সর্বত সঞ্চয়নের উদ্দেশ্যে।* উপোসী রায়তদের উপর খাজনার গুরুভার ছিল, সেটাকে কাজে লাগিয়ে সুদ-খোর কিংবা তহসিলদার কৃষকদের বস্তু-ঋণ দিয়ে 'সাহায্য' করত, সেটার বাবত সুদ নিত বার্ষিক ৫০ শতাংশ হারে।** কাজেই কৃষকের আপকেওয়াস্তে অর্থনীতির অবস্থায় কর-ইজারাদারি ছিল রায়তকে দাস বানাবার জন্যে মহাজনী পুঁজির অবলম্বিত একটা উপায়। উনিশ শত-কের প্রথমার্ধে মাড়োয়ারী আগন্তুকেরা তাদের স্বদেশভূমি মাড়োয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত শুধু তাই নয়, তারা বৃদ্ধবয়সে সাধারণত সেখানে ফিরে গিয়ে 'ছোট-ছোট দোকানে তারা যেসব অংশের মালিক সেগুলোকে তুলে দিত নিজেদের এলাকার তরুণদের হাতে যারা প্রতি-বছর মাড়োয়ার থেকে মধ্য ভারতে কিংবা দাক্ষিণাত্যে যেত ধন-দৌলতের সন্ধানে'।***

এইভাবে, সতর-আঠার শতকের ভারতে ব্যাপারিক আর চোটার পুঁজি, রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ে অংশগ্রহণ করে এবং কারিগরদের দাস বানিয়ে বিপুল সঞ্চয়ন রাশীকৃত করেছিল। তবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পরবর্তী, ইতিহাসক্রমে উচ্চতর পর্বের দিকে বিকাশ অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছিল স্বৈরতান্ত্রিক প্রাচ্য সংস্থানের দরুন, কেননা 'প্রাচ্য শাসন ছিল প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে বেখাপ্পা। লোলুপ স্থানীয় শাসনকর্তা আর পাশাদের হাত থেকে নিরাপদ ছিল না হস্তগত উদ্বৃত্ত-মূল্য; ছিল না বুর্জোয়া লাভজনক বাণিজ্যের প্রথম মৌলিক অবস্থাটা – বণিকের নিজস্ব এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা'।****

সরাসরি অটম্যান সাম্রাজ্য প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের এই মন্তব্যটি মোগল আমলের ভারতের বণিক্‌ আর মহাজনদের অবস্থা বুঝতেও সহায়ক। গুজরাটের বণিকদের সম্বন্ধে জে. এ. ডে ম্যাণ্ডেলস্লো লিখেছেন:

'দোকানদারদের চেয়ে বণিকেরা এত বেশি সুখী যার ইয়ত্তা হয় না; কিন্তু এদের এই অসুবিধাটাও রয়েছে যে, এরা যেই কিছু ধনসম্পদ জড়ো করে অমনি এরা উঁচুদরের আমলাদের ঈর্ষাভাজন হয়ে পড়ে, এরা যেই কোনভাবে সেটা জাহির করে অমনি তারা সেটা কেড়ে নেবার উপায় বের করে। যেহেতু তা তারা ন্যায়ত করতে পারে না, তাই অনেক সময়ে তারা এমনসব ছল-ছুতো প্রয়োগ করে যাতে সেইসব লোকের প্রাণ হারাতে হয় যারা বেশি ধনদৌলত সংগ্রহ করে।'* ভারতীয় সমাজে হিন্দু আর জৈন্ সম্প্রদায়ের বণিক আর মহাজনদের নিচু সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও বলেছেন ম্যাণ্ডেলস্লো: 'এদের (বানিয়াদের। – ভ. প.) বেশ-বাস খুবই ভদ্র, কলঙ্ককর কিছু ছাড়াই এরা থাকে মুসলমানদের মধ্যে, যারা স্বেচ্ছাচারী এবং উদ্ধত বলে (এটা নিশ্চয়ই মুসলিম সর্দার-দের প্রসঙ্গে। – ভ. প.) বানিয়াদের প্রতি এমন আচরণ করে এরা যেন তাদের দাস, এদের তারা অত্যন্ত ঘৃণা করে, অনেকটা সেই রকমের যেভাবে ইহুদিদের প্রতি আচরণ করা হয় ইউরোপে যেসব জায়গায় তাদের বসবাস করতে দেওয়া হয়।'**

বণিক আর মহাজনদের স্তূপাকার করা ধনসম্পদ হস্তগত করার জন্যে শাসকেরা অতি পাশব উপায়ে জ্বালা-যন্ত্রণা দিতেও দ্বিধা করত না। সিন্ধুর মুসলিম শাসকের নৃশংসতা সম্বন্ধে বলেছেন জেম্স ফর্বেস; টাট্টায় এই শাসকের দরবারে রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত হত শুধু হিন্দুরা – বাণিজ্য আর মহাজনী সম্প্রদায়ের লোক। কাস্টম্স শুল্ক আদায়কারী একজন ধনী বানিয়াকে দু'দিন ধরে অতি পাশব ধরনে যন্ত্রণা দিয়েছিল উজির আর তার দলবল। কিন্তু তার একমাত্র ছেলেটিকে খুন করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হলে শুধু তবেই ঐ বানিয়া বাধ্য হয়ে বলে-ছিল কোথায় লুকান ছিল তার ধন-সম্পদ।*** ১৭৯৮ সালে পুনার সবচেয়ে ধনী পোদ্দারদের যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল; তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী পোদ্দারকে হত্যা করা হয়ে-

---

ছিল একটা কামানের অতি উত্তপ্ত চোঙ্গার উপর ফেলে।*

পেশোয়া রাজ্যের ঘোষণায় এমন নৃশংসতা ছিল নীতিবিরুদ্ধ। রাজকার্য পরিচালনবিদ্যা সম্বন্ধে একটি প্রাচীন মারাঠা নিবন্ধ 'আগ্নেয়পত্র' থেকে একটা অংশের (ব্যাপারী আর ব্যাঙ্কারদের সম্বন্ধে) স্বচ্ছন্দ অনুবাদ এখানে দেওয়া হল: 'সাহুকারেরা হল রাজার এবং রাজ্যের অলঙ্কারস্বরূপ। রাজ্যকে তারা সমৃদ্ধিশালী করে। রাজ্যক্ষেত্রে আসে দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্র। রাজ্য হয়ে ওঠে সমৃদ্ধিশালী। হঠাৎ প্রয়োজন হলে তারা ঋণ দেয়। বিপর্যয় ঠেকান হয় তাদের সাহায্যে। তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাটা খুবই লাভজনক। সেজন্যে তাদের পদমর্যাদা দেওয়া চাই। স্বেচ্ছাচারী আচরণ এবং অবমাননা থেকে তাদের রক্ষা করা চাই। হাতি, ঘোড়া, রেশমী কাপড়-চোপড়, জরিদার কাপড়, পশম, গয়নাগাঁটি, অস্ত্রশস্ত্র, ইত্যাদির জন্যে নগরীর বিভিন্ন মহল্লায় দোকান আর বাজার বসানো দরকার, যাতে তারা ব্যবসাবাণিজ্য চালাতে পারে। প্রধান-প্রধান বণিকেরা যাতে অভিজাত মহল্লাগুলিতে বসবাস করে সেজন্যে তাদের উৎসাহিত করতে হবে।'** প্রসঙ্গত বলি, এমনসব মূলনীতি তুলে ধরা হয়েছিল সেটা আপনাতেই তাৎপর্যসম্পন্ন, কেননা – প্রত্যেকটি ইতিহাসকার যা বোঝেন – একদিক থেকে, আইন-কানুন হল বাস্তবতার ওপিঠ।

ব্যাঙ্কারদের প্রসঙ্গে সর্বশক্তিমান ছিল না দুর্ধর্ষ মারাঠা যোদ্ধারাও। সাধারণভাবে – প্রায়ই যা ঘটত – আইন-কানুনে এবং সেগুলো বলবৎ করায় যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকত ভারতীয় সমাজে সেগুলোর স্থান পূরণ করা হত রীত-রেওয়াজ দিয়ে। ক্ষমতাশালী খাতকদের কাছ থেকে ঋণের টাকা আদায় করার জন্যে পাওনাদারেরা যেসব উপায় প্রয়োগ করত সেগুলোর একটাকে বলা হত তুক্কাজা। পেশোয়া রাজ্যে জনসমষ্টির সামরিক অংশগুলো 'দেনায় জড়িয়ে থাকত প্রায় সবসময়েই, প্রায়ই দিনপাতের জন্যে তারা নির্ভর করত সাউকার কিংবা মোদির উপর'। এই যোদ্ধাদের কাছ থেকে ঋণের টাকা আদায় করাটা নিরাপদ কিংবা সহজ

কাজ ছিল না স্বভাবতই। তাই বারবার তাগাদা নিষ্ফল হলে পাওনাদার মজুরি দিয়ে নিযুক্ত করত একজন কিংবা কয়েক জনকে, 'যাদের পেশাই ছিল তুক্কাজা'; তারা দেনদারের দরজায় গিয়ে বসত, আর 'দেশটির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অনুসারে দেনদার তাদের খাওয়াতে বাধ্য হত মান-সম্মানের ব্যাপার হিসেবে'। দেনদার যেখানেই যেত তার পিছু-পিছু যেত তারা, তাকে তারা সেলাম করত, তার পায়ে পড়ত, আর তাদের মনিবের টাকা দেবার জন্যে দাবি করত কখনও-কখনও, যখন তাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে দেনদারের গরজটা হত সবচেয়ে বেশি। ...কোন ধনী ব্যক্তি সাধারণত খুবই সাবধান থাকত যাতে তুক্কাজা না ঘটে, কেননা সেক্ষেত্রে খুবই মোটা টাকা জরিমানা আদায় করার অধিকার পেত সরকার, আর সুযোগ পেলেই সরকার সেটা বলবত করত তা দেনদারের জানা ছিল। ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে কথা বলতে দেনদার যখন রাজি হত তখন রফার শর্ত নিয়ে সেখানে হাজির হত পাওনাদার।

পাওনাদার যদি তুক্কাজার লোক নিয়োগ করার মতো যথেষ্ট পয়সা-ওয়ালা না হত তাহলে সে নিজেই গিয়ে বসত দেনদারের দরজায়। দেনদার যখন ঘুমন্ত বলে জানা ছিল তখন গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে পারত সে; পাওনাদার কখনও-কখনও গোটা নিজ সম্প্রদায়টিকে এক করে নিয়ে গিয়ে দাবি করত দেনাদারের কাছে। তুক্কাজা ছিল আরও বেশি কার্যকর, কেননা সাধারণের শান্তি লঙ্ঘন ঘটাবার জন্যে দায়ী বলে দেনদারকে মোটা টাকা জরিমানা করার অধিকার থাকত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের। কিন্তু যেক্ষেত্রে পাওনাদার হত কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিনিধি, কিংবা তেমন কোন লোকের আত্মীয়, তখন সে প্রয়োগ করত আরও কার্যকর উপায়: জেলে পোরা হত দেনদারকে।*

ধনী মুসলিম বণিকদের জন্যেও নিরাপত্তার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না। এ. হ্যামিল্টন নামে ইংরেজ বণিক ভারত এবং মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়েছিলেন ১৬৮৮ থেকে ১৭২৩ সাল অবধি, তিনি সুরাটে আব্দুল গফুর নামে একজন বণিককে চিনতেন, যিনি—

লিখেছেন — 'বাণিজ্য চালাত বৃটিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমান, কেননা আমি জানি তিনি জাহাজ সজ্জিত করতেন বছরে ২০-খানার বেশি... সেগুলোর প্রত্যেকখানায় তার নিজের মাল যা থাকত সেটা ১০ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের কম নয়, কোন-কোন জাহাজে ২৫ হাজার। ...মারা যাবার সময়ে তিনি নিজের জমিদারি রেখে যান দুটি নাতির জন্যে, তাঁর ছেলে — তাঁর একমাত্র সন্তান — মারা গিয়েছিল তাঁর আগেই। কিন্তু দরবার তাদের উপর ঘা মেরে জমিদারি থেকে নিয়ে নিয়েছিল দশ লক্ষ স্টার্লিংয়ের বেশি।'* বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক এফ. বার্নিয়ে বলেন, হিন্দু আর মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বণিকেরা 'ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় বেশি অগ্রগতি ঘটাতে ভয় পেত, কেননা তাদের আশঙ্কা ছিল লোকে তাদের ধনী মনে করে তাদের সর্বনাশ করার একটাকিছু উপায় ভেবে বের করবে'।**

মনে হয় তবু ধনী মুসলিম বণিকদের অবস্থাটা ছিল হিন্দু বণিকদের চেয়ে ভাল। যা-ই হোক, জে. ফ্রায়ের বলেন: 'তাদের (মুসলিমদের। — ভ. প.) মধ্যে কিছু মস্ত-মস্ত বণিক রয়েছে যারা চাগান পায় কুশলতার চেয়ে তাদের ধর্মীয় আর সম্প্রদায়গত কর্তৃত্বের জোরেই বেশি, আর বানিয়ারা বাধ্য হয়ে তাদের কাছে ছুটে যায় পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে।'*** মুসলিম বণিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বেশি ছিল সেটা দেখা যায় তার বাহ্য অবস্থা আর অভ্যাসাদি থেকেও: হিন্দু কিংবা জৈন বানিয়ার বেশ-বাসে ছিল কৃচ্ছ্রতা, তার বিপরীতে মুসলিম বণিকের পোশাক ছিল জাঁকাল। মোগল আমলের ভারতে মুসলিম বণিকদের কিছুটা বেশি বিশেষাধিকার ছিল, তার ফলে তাদের বৃটিশ বিজয়ীদের পক্ষে চলে যাওয়াটা ঘটেছিল কিছুটা ধীরে, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গত বলি, হিন্দু বণিক আর মহাজন সম্প্রদায় দুটোর ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবার ব্যাপারে যে-সংযম ছিল তাদের একটা বিশেষত্ব সেটা

এসেছিল হাতাতে দড় আমির আর রাজাদের নজর থেকে ধনদৌলত গোপন করার প্রয়োজন থেকে। এইভাবে, ওভিংটন বলেন, সুরাটে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যেসব দালাল ধনী বণিকরা ছিল পনর থেকে তি-রিশ লক্ষ টাকার মালিক, তারা ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবার জন্যে খরচ করত বছরে মাত্র তিন-চার হাজার টাকা — এটা ছিল বেদখল হয়ে যাবার নিরন্তর ভয়ের দরুন।*

এটা তো স্পষ্টই যে, ধন-সম্পদ নিরাপদ রাখা (বরং বলা ভাল গোপন রাখা) যায় জমি, ঘর-বাড়ি এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির চেয়ে টাকাকড়ি, হুণ্ডি আর গয়নাগাঁটি আকারেই বেশি সহজে। 'এইসব শতকে আর্থনীতিক জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকায় এল বাট আর গয়নাগাঁটি, এতে অবাক হবার কিছুই নেই। তাতে ছিল এইসব সুবিধে: সহজে গোপন করা যায় (রাজনীতিক অনিরাপত্তার দিনকালে সেটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ); মূল্য অবচয়ের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম; পরিবহণ সহজসাধ্য। উৎপাদী কিংবা উন্নয়ন ক্রিয়াকলাপে পুঁজি বিনিয়োগের উপায় না থাকায় এই আমলে সংগতি-সংস্থানের সঞ্চয়ন স্বভাবতই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাট আর গয়নাগাঁটি মজুদ করারই শামিল।'** তাই স্বৈরশাসকদের আমলা-ফয়লারা বণিকের সম্পত্তি সর্বক্ষণ বিপন্ন করত বলে পুঁজি সঞ্চয়ন ধীর হয়ে পড়েছিল শুধু তাই নয়, অধিকন্তু — যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ — পুঁজির অর্থ আকার থেকে উৎপাদী আকারে পরিবর্তন, অর্থাৎ পুঁজির উৎপাদনের উপকরণ রূপধারণ ব্যাহত হয়েছিল।

থোক-ক্রেতারা হস্তশিল্প উৎপাদনে টাকা যোগাত, এই তথ্যটার উল্লেখ করে ডি. আর. গ্যাডগিল জোর দিয়ে বলেছেন, 'তারা যোগাত ঋণ পুঁজি, ঝুঁকির পুঁজি নয়। কাজেই ব্যাপারী-বণিকদের হাতে পুঁজি সঞ্চয়নের ফলে শিল্পোৎপাদনের জন্যে বুনিয়াদী সরঞ্জামে বিনিয়োজিত সংগতি-সংস্থান বাড়ত না কোনক্রমেই। শিল্পগত কারিগরী উৎপাদনের ইউনিট ছিল পৃথক-পৃথক খুদে কর্মশালা।'*** বিদ্যমান পরিস্থিতি এতে

সঠিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এতে চূড়ান্ত পরমকরণও হয়েছে বটে, কেননা – আমি পরে দেখাব – উৎপাদনে বণিকের অংশগ্রহণের উল্লেখ রয়েছে আকরগুলিতে। অনুরূপ ত্রুটি আছে নিম্নলিখিত মূলত সঠিক সিদ্ধান্তটিতেও: 'ব্যাপারিক আর লগ্নী পুঁজি ছাড়া, বণিক-ব্যাপারীরা বিনিয়োগ করত প্রধানত ঘর-বাড়ি আর বাগিচা ইত্যাদিতে এবং শহরের চারপাশে অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি কিংবা ভূসম্পত্তিতে। এইভাবে, কৃষিতে কিংবা হস্তশিল্পে উৎপাদী ক্রিয়াকলাপ প্রভাবিত করে নি বাণিজ্যিক সঞ্চয়ন। শহরের বণিকদের বেড়ে-চলা ধনদৌলতের বাহ্য প্রদর্শন হত (এমন বাহ্য প্রদর্শন যেখানে বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হত না) বণিকের বাড়ির সম্মুখভাগে ব্যয়বহুল খোদাইয়ের কাজের মতো বিভিন্ন জিনিসে, যেমন গুজরাটের শহরগুলিতে, কিংবা তা প্রদর্শিত হত ধর্মকর্মে কিংবা দানধ্যানে – মন্দির, দিঘি, ধর্মশালা, ইত্যাদি গড়ার ভিতর দিয়ে।' *

গুজরাটের বণিকরা বস্তুত কখন জাহির করত তাদের ধন-সম্পদ সেটা নির্দিষ্ট করে বলেন নি গ্যাডগিল। যা-ই হোক, এটা ভাবা কঠিন যে, সেটা হয়েছিল সতর শতকের শেষের দিকে, যখন গুজরাট থাকত পালাক্রমে মোগল আর মারাঠাদের দখলে। সুরাটের বানিয়াদের সম্বন্ধে ওভিংটনের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ-উপাত্ত এই কালপর্যায় প্রসঙ্গে: 'তাদের ধনদৌলত হল শুধু নগদ টাকা আর গয়নাগাঁটি; ব্যক্তিগত আর স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে পার্থক্যের কথা ভারতে শোনা যায় না, তারা সম্পত্তি নিরাপদ রাখে যথাসাধ্য কাছাকাছি এবং গোপনে, পাছে তাদের সম্পত্তি চলে যায় মোগল রাজকোষে। তাই তারা খরচ-খরচায় সংযত হয়, আর অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে তারা চালায় কাজ কারবার, বিশেষত টাকা নেওয়া কিংবা দেওয়া, সেজন্যে তারা কাজে লাগায় রাতের অন্ধকার কিংবা ভোরের তমস, তখন তারা টাকা নিয়ে যায় লেনদেনের জায়গায়।'**

ব্রিটিশ বিজয়ের আগেকার ভারতের বণিকদের আইনগত এবং প্রকৃত অবস্থা চিত্রিত করতে গিয়ে একই রঙ ব্যবহার করা ঠিক নয়। একটা থেকে অন্য রাজ্যে অবস্থাটা ছিল ভিন্ন-ভিন্ন, আর একই রাজ্যের

চৌহদ্দির ভিতরে বিভিন্ন কালপর্যায়ে সেটা ভিন্ন-ভিন্ন ছিল শাসকদের প্রয়োজন আর মরজি অনুসারে। এইভাবে, পরধর্মমত-অসহিষ্ণুতার কর্মনীতি অনুসারে চলতেন ঔরঙ্গজেব, তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করতেন অনর্থক যুদ্ধবিগ্রহে, তিনি হিন্দু এবং অন্যান্য অমুসলিমদের উপর বসিয়েছিলেন একটা বিশেষ কর – জিজিয়া। এই জিজিয়া এবং অন্যান্য কর-আদায়ের ফলে স্বার্থহানি ঘটত বণিক আর কারিগরদের, যাদের বেশির ভাগই ছিল হিন্দু-জৈন্ আর শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ।

মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর দেখা দিয়েছিল শিখ আর মারাঠাদের যেসব রাজ্য সেগুলি স্বভাবতই স্থানীয় বণিক আর কারিগরদের উৎসাহ যোগাবার কর্মনীতি অনুসারে চলতে চেষ্টা করেছিল, সেটা বিশেষত এই কারণে যে, দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বহু লোক মারা গিয়েছিল পাঞ্জাব আর মহারাষ্ট্রের শহরগুলিতে, বিধ্বস্ত হয়েছিল সেগুলির বহু শহর, বিশেষত মহারাষ্ট্রে। তাই মারাঠা আর শিখদের রাজ্য-দুটিতে এবং মৈসুরেও অমুসলমান বণিকদের সেইসব বৈষম্য আর হয়রানি ভোগ করতে হয় নি যা করতে হয়েছিল মোগল সাম্রাজ্যের আমলে অমুসলমানদের। যদিও এইসব রাজ্যের শাসকদের টাকার বড় প্রয়োজন হত যখন – সেটা হত ঘনঘনই – তখন তাঁরা অনুরূপ বলপ্রয়োগের উপায় অবলম্বন করতেন, কিংবা সবচেয়ে লাভজনক জিনিসপত্রের বাণিজ্যে নিজেদের একচেটে কায়েম করতেন, যেমনটা টিপু সুলতান করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে মৈসুরের প্রচণ্ড সংগ্রামের সময়ে।* তবু করাধানের ক্ষেত্রে আসান করে দিয়ে বাণিজ্যে আর হস্তশিল্পে উৎসাহ যোগানোটা নতুন রাজ্যগুলির অপেক্ষাকৃত স্থায়ী স্বার্থে আবশ্যক ছিল। যেমন পেশোয়ার রাজ্যে মহাজনদের অনেক সময়ে মোতুর্ফা-কর থেকে রেহাই দেওয়া হত (এটা ছিল বণিক আর কারিগরদের দেয় একটা কর)। আহ্‌মদনগরে পোদ্দার আর সাহুকারদের সমেত সবার ঘর-বাড়ি সম্পত্তির উপর কর রেহাই করা হয়েছিল।**

এটা ঠিক যে, কোন-কোন শহরে তখনও বজায় রাখা হয়েছিল

শহরের পাঁচিল আর কৃত্রিম জলপ্রণালী মেরামত বাবত পুটী-কর। একজন ইংরেজ আমলা বলেন (১৮২৩), আহমদনগরে এই আদায়ের পরিমাণ ছিল এইরকম: ৭৩ জন মাড়োয়ারী – ৩০০ টাকা, ১৪২ জন বানিয়া (মনে হয় গুজরাটী) – ৫৫০ টাকা, ৬৬ জন পোদ্দার (এরা মনে হয় মারাঠা ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে) – ২০০ টাকা। যেহেতু এগুলোকে দেওয়া হয়েছে গোটা-গোটা অঙ্কে, তাই করটা নিশ্চয়ই ধার্য করা হয়েছিল সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর, তাতে মোড়লেরা মোট পরিমাণটাকে সবার মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিল মাথাপিছু ২-৩ টাকা করে। কারিগরদের কাছ থেকে আদায় করা হত অপেক্ষাকৃত চড়া হারে (আয় অনুসারে), কিন্তু তাও গুরুভার ছিল না; যেমন ৬৮ জন তেলি দিয়েছিল ১০০ টাকা, আর মাত্র ৫ টাকা দিয়েছিল ১০ জন কর্মকার। শহুরে মানুষের ৮৮টা বর্গের দেওয়া মোট পরিমাণ ছিল ৩০১২ টাকা।*

পেশোয়ার রাজ্যের অন্যান্য শহরে কাপড়-চোপড়ের সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীরা দিত বছরে ২ থেকে ৫০-৬০ টাকা করে, আর বছরে ১ থেকে ১০-১৫ টাকা করে দিত কারিগররা।** যেসব সম্পন্ন কারিগর মজুরি দিয়ে জন খাটাত তাদের উপর সবচেয়ে চড়া হারে কর ধার্য হলেও, করাধানের ক্ষেত্রে ব্যাপারিক পুঁজির এবং বিশেষত চোটার পুঁজির বিশেষ-সুবিধাভোগী অবস্থানটা স্পষ্টই।

পেশোয়ার রাজধানীতে মোতুর্ফা-কর ছিল সমানই নিচু হারে। প্রত্যেকটা সম্প্রদায় থেকে দেওয়া এই করও দাখিল করত বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোমস্তা, তাতে সর্বোচ্চ বার্ষিক দেওনগুলো ছিল এইরকম: সাহুকার – ৪০ টাকা, পোদ্দার – ৩৯ টাকা, সবচেয়ে ধনী মুদি – ৫০ টাকা, শস্যের ব্যাপারী – ৩ থেকে ৩০ টাকা। এগুলো থেকে অবস্থাটা বিসদৃশ ছিল খুদে ফেরিওয়ালার বেলায়, সে দিত দৈনিক এক পয়সা; তার যা আয় তাতে এটা দেওয়া ছিল খুবই দুঃসাধ্য।*** এই অবস্থাটা দেখা দিয়েছিল এই কারণে: যেহেতু ব্যাপারী আর মহাজনদের কাজ-

---

কারবারের একটা মোটারকমের অংশ সংশ্লিষ্ট ছিল তহসিলদারদের আর রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে যোগান দেবার সঙ্গে, তাই ব্যাপারিক আর চোটার পুঁজির উপর প্রত্যক্ষ কর ধার্য হলে সেটা বস্তুত হত শেষোক্তের উপর পরোক্ষ করের শামিল। তাছাড়া, ভারতীয় বণিক আর ব্যাঙ্কারদের ধনদৌলতে স্থাবর সম্পত্তির হিসসাটা ক্ষুদ্র ছিল বলে প্রত্যক্ষ কর ধার্য করা কঠিন ছিল।

এটা লক্ষণীয় যে, মহারাষ্ট্রে করাধানের ভিত্তি ছিল কর-ইজারাদার আর তার গোমস্তাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ উপাত্ত কিংবা প্রতিবেশীদের এজাহার। কোন-কোন বণিকদের রপ্তানি আর আমদানি লেনদেন সম্বন্ধে কাস্টম্‌সের নথিই ছিল একমাত্র বিষয়গত সূচক। আয় সম্বন্ধে কোন যথাযথ উপাত্ত এবং আয়ের উপর করাধানের কোন মূল নিয়ম ছিল না বলে কর-ইজারাদার আর কর্মচারীদের অপব্যবহার আর জবর-আদায়ের সুযোগ দেখা দিত। কোন একটা জায়গার বাসিন্দা কোন একটা সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষের উপর পাইকারী করাধানের চলিতকর্ম দিয়ে ঐরকমের ব্যাপার কিছুটা গণ্ডিবদ্ধ করা হয়েছিল বলে মনে হয়। সম্প্রদায়ের ভিতরে সেই কর ভাগ-ভাগ করে ধার্য করত মোড়লেরা।*

ভারতের কোন-কোন রাজ্যে ব্যাপারিক পুঁজি আর হস্তশিল্পের উৎপাদের উপর প্রত্যক্ষ করের বোঝাটা অপেক্ষাকৃত হালকা হলেও, ভারতীয় রাজ্যগুলির বহু সীমান্ত, কিংবা এমনকি পৃথক-পৃথক শাসকের রাজ্যক্ষেত্র পার হবার সময়ে মালের উপর অত্যন্ত চড়া হারে শুল্ক আদায়ের দরুন ঐ সুবিধাটা নাকচ হয়ে যেত।** কাস্টমসের আদায়ের বোঝাটা কিছুটা কম তীব্রভাবে মালুম হত বড়-বড় বণিকদের, যাদের ছিল উপর-তলার মানুষের জন্যে বিলাসদ্রব্যের কারবার, কিন্তু বিপুল পরিমাণে ভোগ-ব্যবহারের সস্তা জিনিসপত্রের বাণিজ্যের উপর সেটার ক্ষতিকর ক্রিয়া ঘটত।

যেমন মোগল আমলের বাংলায় ভূমি-কর ছাড়াও আরও অনেক রকমের কর আদায় হত, সেগুলোর সাধারণ নাম ছিল 'সাইর-কর'

(সায়রাত), এইসব কর যাতে ধার্য হত সেইসব বিভিন্ন দফা হল — নৌকো গড়া (এক-একখানায় ৪ আনা), বাজারে বিক্রি-করা সমস্ত জিনিস, শহরে খড়-বিক্রেতা — বছরে ২ থেকে ৬ টাকা, শহরে কাঠ বাঁশ আর ঘরের ছাউনির খড়-বিক্রেতা, চামড়া দিয়ে ঢাল এবং ঘোড়-সওয়ারী সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক কারিগর, শহরে পান আর তরিতরকারি বিক্রি (শেষোক্ত ক্ষেত্রে, বিক্রির পরিমাণ অনুসারে ১ থেকে ৫ টাকা), কাগজ-বিক্রেতা — প্রত্যেকটা স্টল বাবত বছরে ৩৬ টাকা, সমস্ত শহুরে দোকানদার — এক থেকে আড়াই টাকা, আর বিভিন্ন শহুরে কারিগর, তাদের মধ্যে যারা তৈরি করে জরি, গয়নাগাঁটি, ফুলকাটা মসলিন এবং আতশবাজি — প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এক থেকে আড়াই টাকা। বিভিন্ন শহুরে কর ছাড়াও অনুরূপ অন্যান্য কর স্থানীয় জমিদারেরা আদায় করত সমস্ত গ্রাম্য হাটখোলায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, করগুলোর পরিমাণ যা ছিল তাতে সেটা খুদে দোকানদার আর কারিগরদের পক্ষে বেশ কষ্টদায়কই ছিল। কিন্তু বড়-বড় বণিক আর ব্যাঙ্কারদের বেলায় এইসব কর ছিল নিছক আনুষ্ঠানিক। করাধানের প্রণালী আর মূল নিয়মটাকে ব্যাপারিক পুঁজির সঞ্চয়ন আর সমাহরণ এবং পরে শিল্পোৎপাদনে চালিত হবার গুরুতর প্রতিবন্ধক বলে বিবেচনা করাটা তাই বড় একটা সঠিক নয়। এমনসব প্রতিবন্ধক ছিল বরং চিরাগত সম্প্রদায়গত সীমাবদ্ধতা এবং প্রনিয়ম, আর তাছাড়া প্রাক্‌বৃটিশ ভারতে বণিকের এবং তার পুঁজির আইনগত অবস্থা।

১৯৬৮ সালে আলিগড়ে সামাজিক আর আর্থনীতিক ইতিহাস-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলি নিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের একটি সেমিনারে সতর শতকে উত্তর ভারতের জৈন, বৈশ্য আর ক্ষত্রিয় এই তিনটি প্রধান বানিয়া সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটা পেপার পেশ করেছিলেন সুরেন্দ্র গোপাল। তাদের অবস্থার পরিবর্তন এবং এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মূল্যবস্তু-সংক্রান্ত ধারণা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা, আর তাদের কেন ছিল না 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের মেজাজ' সেটা স্থির করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি বলেছিলেন, সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় অবস্থান দাবি করার হকদার কেউ হতে পারত সে ধনদৌলতের মালিক বলে শুধু তারই জোরে নয়, তেমন হকদার কেউ হত মন্দির স্থাপনে এবং ধর্মকর্মে দান ক'রে। কোন বণিক

কিংবা ব্যাঙকারের দেওয়া টাকায় মন্দির গড়া হলে সেটাই (আর তার সঙ্গে আমরা আরও বলি, উত্তরাধিকারীদের জন্যে রেখে-যাওয়া পুঁজি, যা তারা বাড়িয়ে তুলবে, সেটা নয়) কোন ব্যক্তির সমগ্র জীবনকালের প্রচেষ্টার সবচেয়ে উপযুক্ত পরাকাষ্ঠা বলে বিবেচিত হত।

সুরেন্দ্র গোপাল বলেন জৈনদের ধর্মীয় রক্ষণশীলতার কথা, তাতে তাদের ধর্মের আধিবিদ্যক নিগূঢ়তার উপলব্ধি করাতেই পর্যবসিত হত তাদের বিদ্যাশিক্ষা, তাতে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের কোন স্থান ছিল না। ইউরোপীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ, কিংবা সমাজ-জীবনে নতুন-নতুন ঘটনাধারা, কিছুরই ফলে বাস্তবতা সম্বন্ধে যুক্তিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিল না জৈনদের মধ্যে। বৈশ্যদের মধ্যেও সামাজিক ধ্যান-ধারণা ছিল মোটামুটি একই রকমের, আর তাদের ধন-সম্পদ সত্ত্বেও হিন্দুধর্মের সামাজিক-বর্ণগত সোপানতন্ত্রে তাদের স্থানটা থেকে গিয়েছিল নিচের দিকেই। বর্ণভেদপ্রথার বিরুদ্ধে আকবরের আমলে বল্লভাচার্য আন্দোলনে বৈশ্যদের সমর্থন দেবার ফলে তাদের ঐতিহ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

ক্ষত্রিয়দের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরাকাট ছিল কিছুটা কম; তারা প্রথমে ছিল পাঞ্জাবে আর সিন্ধুতে, আর তারপরে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা উত্তর ভারতে। ক্ষত্রিয়রা সবসময়ে থাকত মুসলমানদের মধ্যে, ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে তারা যেত কাছাকাছি বিভিন্ন দেশে, এমনকি সুদূর রাশিয়ায়ও। আর ওদিকে শিখদের ধর্মে ছিল না বর্ণভেদ আর ছুতমার্গের নিয়ম, তাই তারা এই ধর্ম অবলম্বন করতে রাজি ছিল। মোগল রাজকার্যে খিদমত করার মধ্যে তারা ফারসী শিখত, তার ফলেও আরও বিস্তৃত হয়েছিল তাদের সাংস্কৃতিক দিগন্ত। কিন্তু তাদের ক্রিয়াকলাপক্ষেত্র অঞ্চলগুলিতে ঘটেছিল বিভিন্ন আক্রমণ আর তালগোল পাকান অবস্থা, তাই তাদের পুঁজিতান্ত্রিক রূপান্তরের মাধ্যম হয়ে উঠবার সুযোগ-সুবিধা ব্যাহত হয়েছিল।

সুরেন্দ্র গোপালের সাধারণ সিদ্ধান্তটা এই: ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক মোক্ষলাভকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে অবলম্বন করার আদর্শটা এই তিনটি সম্প্রদায়ের মানুষের আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের সমন্বয়টাকে ব্যাহত করল। জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানির মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে তারা অপারক হল; কাজেই, শিল্প-বিপ্লবের জন্যে যা একটা অপরিহার্য

পূর্বশর্ত সেই পুঁজি সঞ্চয়নের যথোপযুক্ত সাংগঠনিক ভিত্তি সৃষ্টি হল না।

আসলে কিন্তু জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি ধরনের পরিমেল ভারতে ছিল বটে, যা দেখা যায় নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে: 'বিজয়নগর সাম্রাজ্যের (চোদ্দ-ষোল শতাব্দী) আমলে জাঁকিয়ে উঠেছিল যেসব বণিক গিল্ড সেগুলোতে কোন-না-কোন আকারে নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিল জয়েণ্ট-স্টক-সংক্রান্ত ধারণা। এই সাম্রাজ্যের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় বিনষ্ট হয়েছিল এইসব প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, অবশিষ্ট ছিল পৃথক-পৃথক বণিক পরিবার, যারা আরব, পোর্তুগীজ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির সঙ্গে কাজ-কারবার চালাত স্বাধীনভাবে। সতর শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদ্যমান পরিবেশে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো এমনসব পরিমেল গড়ে ওঠায় আনুকূল্য করাটাকে সুবিধাজনক মনে করেছিল। ...এইসব ভারতীয় জয়েণ্ট-স্টক অংশীদারি সঙ্ঘ মারফত যোগানই মাফিকসই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৭০০ সাল নাগাদ। ...অংশীদের বেছে নেওয়া হত সযত্নে, সেটা তাদের নির্ভরযোগ্যতা আর ধন-সম্পদের দিক থেকে ছাড়াও বর্ণ আর পারিবারিক সম্পর্কের দিক থেকেও, যাতে তাদের দলবদ্ধ হয়ে ফলপ্রদ কাজ করতে পারাটা নিশ্চিত হয়। সদস্যতার বর্গ ছিল দুটো – সর্দার বণিকেরা আর সাধারণ বণিকেরা। পূর্বোক্তরা যোগাত পুঁজির প্রধান অংশটা, তারা নিয়ন্ত্রণ করত কোম্পানির সংগঠন। প্রতিশ্রুত অর্থের জন্যে দায়ী ছিল একজন খাজাঞ্চী, সে হিসাব রাখত। দেশের অন্তর্বর্তী এলাকাগুলিতে তন্তুবায় আর রঙমিস্ত্রিদের গ্রামে-গ্রামে গিয়ে ফরমাশ দেওয়া এবং কর্মশালায় মাল বয়ে নেবার কায়িক কাজের বেশির ভাগটা করত সাধারণ বণিকেরা।

'...এইসব জয়েণ্ট-স্টকের জড়ো-করা পুঁজির মোট পরিমাণ বিভিন্ন – সবচেয়ে বেশি ১,৫০০,০০০ প্যাগোডা (১ প্যাগোডা=১২ শিলিং) থেকে সবচেয়ে কম প্রায় ১০,০০০ প্যাগোডার মধ্যে। এক-একটা শেয়ারের দাম ১০০ কিংবা ৫০০ কিংবা ১০০০ প্যাগোডা।

'...আঠার শতক এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় এইসব অংশীদারি সংখ্যা কমে যায় আর এগুলোর কার্যকরতা কম হয়ে পড়ে। এই ইউরোপীয় উদ্যমের ফলে অংশীদারির ধারণাটা ভারতীয় বণিকদের মধ্যে প্রসারিত হল না কেন সেটা জানতে আগ্রহ জাগে। একটা কারণ

তো মনে হয় নিশ্চয়ই এই যে, বণিক শ্রেণীটা গড়ে উঠেছিল কতকগুলো বর্ণ-বর্গের মানুষ নিয়ে। তাদের মধ্যে ছিল চেট্টিয়ার, কোমাতি, মুদালিয়ার আর ব্রাহ্মণরা...'*

মনে হয়, ভারতীয় ব্যাপারিক পুঁজির শিল্পোৎপাদনক্ষেত্রে চলন যেসব কারণে ঘটতে পারে নি সেগুলোর আর-একটাকে – কিন্তু আরও একটামাত্র – সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই সিদ্ধান্তে।

আঠার শতকের প্রথমার্ধে – মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙনের কালপর্যায়ে, 'প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যুধ্যমান ছিল যখন' – দেশটির বহু জায়গায় বণিক আর মহাজনদের অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আরও অনিশ্চিত। বণিকের জীবন আর সম্পত্তি সর্বক্ষণ বিপন্ন ছিল বহিঃশত্রুর হাতেই শুধু নয় (জে. থেবেনট বলেন, ১৬৬৬ সালে সুরাটে আক্রমণের পরে শিবাজী মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছিলেন ৩ কোটি (লীভার, মনে হয়) দামের; একজন বানিয়ার বাড়ি থেকেই তিনি নিয়েছিলেন ২২ পাউণ্ড ওজনের মুক্তা; এইসব অঙ্ক অবশ্য মোটামুটি আনুমানিক, তবে ভারতে বণিকদের বিপুল ধনদৌলত ছিল এই মর্মে তথ্যটা এগুলি থেকে আবারও সমর্থিত হয়)।** বণিককে বিপন্ন করত তার 'নিজ' শাসকও, যার টাকার অভাব ছিল সবসময়েই পরস্পর ধ্বংসকর যুদ্ধবিগ্রহের জন্যে। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যমান কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপ থেকে ধন-প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনের তাগিদেই বৃহৎ ভারতীয় বণিকদের একাংশ হাত মিলিয়েছিল ইউরোপীয় আক্রমণকারীদের সঙ্গে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতীয় সামাজিক শ্রমবিভাগের চিরাগত ব্যবস্থার ভিতরে সম্প্রদায়-বহির্ভূত হস্তশিল্প

হস্তশিল্প উৎপাদন নির্ধারের মাপকাঠি

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে হস্তশিল্পের গ্রামীণ আর শহুরে হিসেবে প্রচলিত বিভাগ ভারতের ক্ষেত্রে ঠিক খাপ খায় না। আমি আগেই দেখিয়েছি গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা কারিগরদের মূলত পৃথক-পৃথক দুই ধরনের সম্পর্ক ছিল কৃষিজীবী জনসমষ্টির সঙ্গে, প্রথমত রায়তদের সঙ্গে। সম্প্রদায়ের ভিতরকার শ্রমবিভাগ ব্যবস্থায় কারিগরের জড়িত থাকাটাকে সমগ্র সামাজিক শ্রমবিভাগের ক্ষেত্রে তার স্থান নির্ধারের মাপকাঠি হিসেবে ধরলে, যেসব গ্রামীণ কারিগর এই বিভাগ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল তারা সম্প্রদায়ের কাঠামের ভিতরে কাজ-করা প্রতিবেশীদের চেয়ে শহুরে কারিগরদেরই কাছাকাছি ছিল। তাছাড়া, শহুরে আর গ্রামীণ কারিগরদের মধ্যে ইউরোপে যেমনটা ছিল তেমন কোন সামাজিক-আইনগত কিংবা রাজনীতিক পার্থক্য ছিল না ভারতে, কেননা বিশেষাধিকার আর গিল্ডের সুযোগ-সুবিধার আকারে গ্রামীণ কারিগরের সঙ্গে তুলনায় শহুরে কারিগরের যে-স্পষ্টপ্রতীয়মান রাজনীতিক শ্রেষ্ঠত্ব, তেমনকিছু ছিল না ভারতে। তেমনি উলটে, ভারতে শহুরে কারিগরের সঙ্গে তুলনায় গ্রামীণ কারিগরের উৎপাদন-সংক্রান্ত নিয়ম-বিধি থেকে স্বাধীনতার মতো কোন লক্ষণীয় আর্থনীতিক সুবিধা ছিল না, কেননা সেগুলোর মাধ্যম বর্ণভেদপ্রথা সমানে প্রযোজ্য ছিল উভয় ক্ষেত্রে (ইউরোপে গ্রামীণ হস্তশিল্পের প্রধান অংশটা গিল্ডের নিয়ম-বিধি এড়িয়ে গিয়েছিল)।

এইসব বিচার-বিবেচনা থেকে মনে হয় ভারতের চিরাগত শিল্পকে সর্বোপরি সম্প্রদায়গত আর সম্প্রদায়-বহির্ভূত এই দুই ভাগে বিভক্ত করাই ঠিক, তবে এটাকে চূড়ান্ত কিংবা অনড় বলে ধরা চলে না। আমি যা আগেই বলেছি – কোন-কোন গ্রামীণ কারিগরি (প্রধানত চামড়া পাকা করা আর মৃৎশিল্প) ব্যবহারকারীদের সঙ্গে সেগুলোর সম্পর্কের দিক থেকে অবস্থিত ছিল ঐ দুটো উৎপাদনক্ষেত্রের সংযোগস্থলে, আর

চিরাগত সম্প্রদায়গত কারিগরিও (কর্মকার আর সূত্রধরের কাজ) ব্যষ্টিগত সম্পর্ক ছিল খদ্দেরদের সঙ্গে, বিশেষত বাংলায়।

কৃষকদের এবং গ্রাম সম্প্রদায়গুলির প্রয়োজন সরাসরি মেটাত যেসব কারিগরি সেগুলোতে পুঁজিতন্ত্রের উৎপত্তির যে-সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত ছিল সেটার কোন বিশেষ বিশ্লেষণ আই. হাবিব করেন নি তাঁর খুবই আগ্রহজনক সমীক্ষায়, এটা আপসোসের কথা। তাঁর মতে – যেক্ষেত্রে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক জন্মায় সেখান থেকে এগুলিকে বাদ দেওয়া যায়, কেননা এসব শিল্পে কোন সত্যিকারের পণ্য-উৎপাদন ছিল না: কারিগরের পারিতোষিক ছিল হয় বাঁধা পারিশ্রমিক, নইলে গ্রামে-গ্রামে ঘুরবার মধ্যে সে মালমশলা কিনত এবং নিজের জিনিস বেচত সম্ভবত বস্তু হিসাবে বাঁধা দামে।*

তাঁতে বোনা, তেলের ঘানি চালান, চিনি তৈরি করা, ইত্যাদিকে, এমনকি সম্প্রদায়মধ্যস্থ চিরাগত কারিগরিগুলিকেও পণ্য-উৎপাদন থেকে (তার মানে সম্ভাব্য পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন থেকেও) এইভাবে পৃথক করে ফেলাটাকে মেনে নেওয়া কঠিন, কেননা শহুরে ব্যবহারকদের সঙ্গে পণ্য-অর্থ সম্পর্কে উত্তরণের প্রারম্ভিক অবস্থার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল সেগুলোতেও। আসল কথাটা এই যে, আঞ্চলিক এবং দেশজোড়া পরিসরে সামাজিক শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের উদ্ভবের পরে বিকাশের পাকা-পোক্ত ঐতিহাসিক সম্ভাবনা বিভিন্ন কারিগরিতে সৃষ্টি করেছিল কৃষির সঙ্গে এবং কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত জনসমষ্টির সঙ্গে অমন সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলেই শুধু।

বিভিন্ন কারিগরির সম্প্রদায়মধ্যস্থ বদ্ধ প্রকৃতিটা যে-পরিমাণে খয়ে যাচ্ছিল সেটা দিয়ে নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল সামাজিক শ্রমবিভাগের গভীর-তাবৃদ্ধি এবং শিল্পে নতুন-নতুন আকারের উৎপাদন-সম্পর্কের উদ্ভব। গ্রাম সম্প্রদায়ের কাঠামের ভিতরে কারিগরিগুলোর অবস্থা যা ছিল তাতে ঐ কাঠামের ভিতরে নতুন-নতুন সম্পর্ক উদ্ভবের সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়; সুস্থিত ক্ষুদ্রায়তনের পণ্য-সম্পর্ক এবং তারপর গোড়ার দিককার পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের উদ্ভব ঘটাবার সামর্থ্য সমেত স্পষ্ট-নির্দিষ্ট ঐতি-হাসিক ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন কারিগরিতে ঘটে ঐ কাঠামটা থেকে ভেঙে বেরিয়ে এসেই শুধু।

সম্প্রদায়ের কারিগরদের বিভিন্ন বর্গের সামাজিক আর আর্থনীতিক প্রতিষ্ঠা স্থির হত — যা আমি আগেই বলেছি — সম্প্রদায়মধ্যস্থ শ্রমবিভাগ আর পুনরুৎপাদন ক্ষেত্রে তাদের স্থান আর গুরুত্ব দিয়ে। তেমনি, স্থানীয়, আঞ্চলিক, কিংবা এমনকি সর্বভারতীয় সামাজিক শ্রমবিভাগে এবং জাতীয় উৎপাদের পুনর্বণ্টনক্ষেত্রে সম্প্রদায়-বহির্ভূত কারিগরদের উৎপাদন আর উৎপাদের স্থান আর গুরুত্ব দিয়ে স্থির হত তাদের প্রতিষ্ঠা। তবে সর্বভারতীয় পরিসরে কোন সামাজিক শ্রমবিভাগ কার্যত ছিল না, আর আলাদা-আলাদা অঞ্চলের চৌহদ্দির ভিতরে এই শ্রমবিভাগ ছিল অপরিণত — তার কারণ এই যে, কৃষিক্ষেত্রে পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্প্রদায়-বহির্ভূত কারিগরিগুলোর (সম্ভবত ধাতু-উৎপাদন ছাড়া) সংযোগ ছিল ক্ষীণ। সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে যায় নি যেসব কারিগর (কুম্ভকার, চর্মকার, সেকরা) তারা মেটাত গ্রামাঞ্চলের ব্যবহারকদের চাহিদার একাংশ। তন্তুবায়রা ছিল সম্প্রদায়-বহির্ভূত কারিগরদের মধ্যে একমাত্র বড়রকমের বর্গ যাদের উপর সম্প্রদায়ের জনসমষ্টির নির্ভরশীলতা ছিল লক্ষণীয় (তাদের অপেক্ষাকৃত বিশেষ-সুবিধাজনক অবস্থাটা এসেছিল অনেকাংশ এর থেকেই)।

তন্তুবায়রা এবং আরও কোন-কোন কারিগরেরা তাদের কাজের কোন-কোন সরঞ্জাম নিজেরাই তৈরি করত বলে সম্প্রদায়ের ভিতরকার যেসব কারিগর অমনসব সরঞ্জাম তৈরি করতে পারত তারা গ্রামীণ শিল্পেরই শুধু নয়, শহুরে শিল্পেরও পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারত খুবই সীমাবদ্ধ পরিসরেই শুধু। তদনুসারে, খোদ শিল্পোৎপাদনের ভিতরেই বিভিন্ন শাখার মধ্যে শ্রমবিভাগ কমে গিয়েছিল। উৎপাদনের প্রয়োজনে, বরং বলা ভাল পরিবহণের জন্যে সম্প্রদায়-বহির্ভূত কারিগরেরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা তৈরি করত তা হল নৌকা আর গাড়ি।

হস্তশিল্পে প্রযুক্তি এবং উৎপাদন-দক্ষতা

আলোচ্য কালপর্যায়ে হস্তশিল্পে উৎপাদন-শক্তির অবস্থার বিশেষক ছিল যেমন সাদাসিধে, এমনকি আদিম ধরনের হাতিয়ার, তেমনি আবার আলাদা-আলাদা উৎপাদকদের মধ্যে বেশ উঁচু মাত্রার উৎপাদী অভিজ্ঞতা

আর কারিগরী দক্ষতা এবং সুদীর্ঘকালের উৎপাদন-সংক্রান্ত গুপ্ত তথ্যের সুবিধা। ভারতীয় তন্তুবায়দের সম্বন্ধে মার্কস লিখেছেন: 'পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত এবং বাপ থেকে ছেলের কাছে হস্তান্তরিত যে-দক্ষতা শুধু সেটাই হিন্দুদের দেয়... এই নৈপুণ্য'।*

আঠার শতকে বাঙালী রেশমী-সুতো কাটনিদের দক্ষতা দেখার পরে একজন প্রত্যক্ষদর্শী যে সোৎসাহ বিবরণ দেন সেটার উল্লেখ করা যেতে পারে ঐ নৈপুণ্যের একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে। কত মিহি তদনুসারে সুতো-টাকে ২০টা রকমে ভাগ করা হত, আর এই সুতো মেয়ে-কাটনীদের আঙুল চলত এত দ্রুত যাতে সেটা চোখে পড়তে পেত না – তবু এই কাটনীদের স্পর্শানুভব ছিল এতই নিখুঁত-সূক্ষ্ম যাতে তারা সুতোটাকে ছিঁড়তে পারত 'ঠিক যখন রকমটা বদলে যেত'।** গুজরাটী কারিগরদের অতি সাদাসিধে হাতিয়ারের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ফর্বেস বলেন, শুধু একটা লোহার পেরেক ছাড়া কিছুই ব্যবহার না করেই সেকরারা প্রস্তুত করত অতি আশ্চর্য সুন্দর-সুন্দর জিনিস।*** উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতে গিয়েছিলেন ফ্রান্সের জে. দুবইস, তিনি বলেন, সূত্রধরের হাতিয়ার শুধু দু'-একখানা কুড়ুল, অল্প কয়েকখানা করাত আর রাঁদা, 'এগুলো সবই এতই আনাড়ী ধরনে তৈরি-করা যাতে কোন ইউরোপীয় কারিগর কিছুই করতে পারত না সেগুলো দিয়ে'।****

অন্যান্য ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকদের মতো আর. ওর্ম ভারতীয় তন্তুবায় আর কাটনিদের অসাধারণ দক্ষতা সম্বন্ধে সপ্রশংস – এদের ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলি ইউরোপীয় মাপকাঠিতে যারপরনেই সাদাসিধে। 'একখানা কেম্ব্রিক তৈরি করতে একজন ভারতীয় মোট যা হাতিয়ার প্রয়োগ করে সেটা দিয়ে একখানা ক্যাম্বিস তৈরি করাও কোন ইউরোপী-য়ের আড়ষ্ট আনাড়ী আঙুলের পক্ষে কঠিন।' কোন নির্দিষ্ট এলাকায়

তন্তুবায়দের পুরুষানুক্রমিক বিশেষীকরণ সম্বন্ধে খুবই মূল্যবান একটা মন্তব্য করেছেন ওর্ম: 'আরও লক্ষণীয় এই যে, প্রত্যেকটা বিশিষ্ট রকমের কাপড় হল কোন একটা বিশেষ এলাকার উৎপাদ, সেই এলাকায় বুননিটা বাপ থেকে ছেলের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে হয়ত শত-শত বছর ধরে — এই রেওয়াজটা উৎপাদকের নিখুঁত হয়ে ওঠায় সহায়ক হয়েছে নিশ্চয়ই।' চাহিদার বৈচিত্র্য-প্রভেদনের সঙ্গে উৎপাদনের এই স্থানীয় বিশেষীকরণের সংযোগের ফলে ভোগ্য দ্রব্য-সামগ্রীর বাণিজ্য হয়ে উঠেছিল খুবই বিস্তৃত। 'হিন্দুস্থানে উৎপাদ বহু রকমের, আর সেটার বিভিন্ন জায়গায় চাহিদা পৃথক-পৃথক, তাতে দেশটির ভিতরেই বিস্তৃত বাণিজ্যের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়'।*

ভারতে হস্তশিল্প সরঞ্জামের উন্নতি কেন অপেক্ষাকৃত ধীর হল তার কারণগুলো নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে হাবিব সাহস করে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, আনাড়ী সরঞ্জামের সাহায্যে একই জিনিসপত্র পয়দা করা হয়েছে সস্তা হলেও দক্ষ শ্রমশক্তি দিয়ে, তাই ঘটেছে এমনটা। তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অতিসরলীকরণ বলে নাকচ করে দিয়েছেন এই ধারণাটাকে: হস্তশিল্প সরঞ্জামের উন্নতি ঘটাবার প্রয়োজন ছিল না ভারতে, যে-দেশে — হাবিব বলেন — বৃত্তিগত দক্ষতা ছিল উৎপাদনের একমাত্র উন্নতিমূলক উপাদান, আর বলা হয় সেটাই টেকনিকাল সরঞ্জামের বদ্ধতাটাকে পুষিয়ে দিচ্ছিল পুরোপুরি। ভিন্ন-ভিন্ন সমাজে আর ভিন্ন-ভিন্ন পরিস্থিতিতে উৎপাদনের অগ্রগতির ব্যাপারে বৃত্তিগত অভিজ্ঞতা আর কাজের সরঞ্জামের ভূমিকা বিভিন্ন হতে পারে, এটা মেনে নিয়ে হাবিব এই মত প্রকাশ করেছেন যে, দক্ষতা যতই থাকুক, সেটা কোন-কোন নির্দিষ্ট জিনিস তৈরি করায় কোন-কোন নির্দিষ্ট সরঞ্জামের বদলী হতে পারে না।**

এই চিন্তাধারা অনুসারে চললে এটা মানতেই হয় যে, ভারতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি নিশ্চয়ই গণ্ডিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল দেশটির কারিগরদের, বিশেষত উঁচু মাত্রায় দক্ষতাসম্পন্ন কারিগরদের স্বল্প পারিশ্রমিকের দরুন (শেষোক্তদের আর সাধারণ কারিগরদের আয়ের মধ্যে পার্থক্য

ছিল সামান্যই), কেননা তার ফলে কিছুটা সূক্ষ্ম-জটিল এবং দামী সরঞ্জাম বাবত খরচ হতে পারত কম। অন্য দিকে, কারিগরের শ্রমশক্তি সস্তা হওয়াটা আগেভাগে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল দুটো কারণে তাদের ভোগ-ব্যবহার করা জিনিসপত্রের (কৃষিক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উঁচু মাত্রায় উৎপাদনশীলতার ফলে বিশেষত খাদ্য-সামগ্রীর) দাম ছিল কম; আর কাপড়-চোপড় এবং বাসস্থান যা অবশ্যপ্রয়োজনীয় সেটার পরিমাণ ছিল কম (এটা ঘটেছিল প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং ইতিহাসক্রমে বদ্ধমূল নীতি-বিধির ফলে)।

ভারতীয় আর ইউরোপীয় উৎপাদকের শ্রমের উৎপাদনশীলতার মধ্যে সরাসরি তুলনা করা কঠিন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জিনিসপত্রের রকমভেদ, আর চিরাগত কারুকার্য এবং পরিসমাপন-রীতি ছিল খুবই পৃথক, তাই একই প্রয়োজন অনুসারে তৈরি-করা জিনিসে নিয়োজিত শ্রমের পরিমাণের মধ্যে তুলনা করা অসম্ভব। তবে নিঃসংশয়ে বলা যায়, আঠার শতকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ ইউরোপীয় শিল্পে, অন্তত বৃটিশ শিল্পে উৎপাদনশীলতার মাত্রা ছিল ভারতীয় শিল্পের চেয়ে উঁচু। বৃটিশ শিল্পের প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব আর বিস্তারিত শ্রমবিভাগ ছাড়াও তার কারণ এই যে, ইংরেজদের শরীর অপেক্ষাকৃত পাকা-পোক্ত, তাদের খাড়াই বেশি, তাই কায়িক শক্তি বেশি, আর তদনুসারে তাদের শ্রমের পরিমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল, বিশেষত কষ্টসাধ্য কাজকর্মে।

আঠার শতকের অষ্টম দশকে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ফৌজের ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগে লোক নেবার ব্যাপারে একজন ইংরেজ ফৌজী-ইঞ্জিনিয়রের বিচার-বিবেচনা এই প্রসঙ্গে কিছুটা আগ্রহজনক। তিনি বলেন, ইংরেজ সূত্রধরের (স্বভাবতই সে ব্যবহার করত অন্য রকমের হাতিয়ার) উৎপাদনশীলতা ছিল ভারতীয় সূত্রধরের চেয়ে তিনগুণ বেশি। তাছাড়া, ভারতীয় সূত্রধরের থাকত একজন সহকারী, বেগারী [যোগাড়ে], যে কাঠখানা আনত, আর কাজ চলবার সময়ে সেটাকে ধরে থাকত এবং উলটে-পালটে দিত। ঐ ইংরেজ ইঞ্জিনিয়র ধরে নেন যে, কুচের সময়ে একজন ইংরেজ সূত্রধরের যোগ্যতা ছিল ছ'জন ভারতীয় সূত্রধরের সমান। তিনি আরও বলেন, ভারতীয় কর্মকারের হাতুড়ি ছিল অপেক্ষাকৃত হালকা, তাই যা নিয়ে সে কাজ কর সেই ধাতুটাকে তার

উত্তপ্ত করতে হত অনেক বেশি ঘনঘন, কাজেই তার ধাতু আর কয়লা খরচ হত অপেক্ষাকৃত বেশি।*

আমি মনে করি, কাজের সরঞ্জাম আর প্রণালীতে পরিবর্তন ধীর হবার আরও ব্যাপক কারণ হল এই যে, উৎপাদনের কোন-কোন শাখায় – যেমন কৃষিতে – সেগুলো ছিল গোটা-গোটা প্রস্তে। এই প্রস্তের কোন একখানা হাতিয়ারের উৎকর্ষ হলে তার ফলে ঘটত অসামঞ্জস্য, বিপর্যস্ত হত গোটা প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়াটা, আর সেটার ক্রিয়া ঘটত উৎপাদের গুণাগুণের উপর। লোহা-বিগলনে, চামড়া পাকা করায় আর রঞ্জক প্রস্তুত করায় এবং রঞ্জনের কাজে ঘটত তেমনটা; এটাও স্পষ্ট যে, প্রক্রিয়াটায় বিভিন্ন অংশ আর অঙ্গ-উপাদানের অনুক্রম আর গুরুত্ব সম্বন্ধে নিছক প্রয়োগজ ধারণার ফলে ব্যাপক সর্বোপযোগী রূপান্তর ঘটতে পারত, সেটা যতই ধীর-ক্রমিক হোক। কিন্তু ভারতীয় কারিগরদের পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত দক্ষতার সচেতন পরীক্ষামূলক উৎকর্ষের চেষ্টা বড় একটা হয় নি (কোন যৌগিক প্রণালীবদ্ধ পরিবর্তন-সাধনের তো কথাই ওঠে না)। তাই যে-প্রযুক্তি একবার গড়ে উঠেছিল এবং পরীক্ষিত হয়েছিল যুগযুগান্তরের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সেটা সাধারণত উৎপাদন আচার-অনুষ্ঠান গোছের একটাকিছুতে পরিণত হয়েছিল, যা অলঙ্ঘনীয় ছিল প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি অবধি।

এইভাবে, সুতো রঞ্জনের প্রযুক্তি গড়ে উঠেছিল শত-শত বছর ধরে। এই প্রক্রিয়াটার খুবই সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন হেইন, যদিও কোন-কোন গুপ্ত তথ্য কারিগরেরা তাঁর কাছ থেকে গোপন রেখে থাকতে পারে (উৎপাদন-সংক্রান্ত গুপ্ত তথ্য তারা বিদেশীদের জানাতে অনিচ্ছুক বলে হেইন অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন)। সবচেয়ে সাদাসিধে ধরনের রঞ্জনেও লাগত চব্বিশ দিন, তার প্রত্যেকটা দিনে সারা হত একটা কিংবা কয়েকটা প্রক্রিয়া। আবশ্যক উপকরণগুলি ব্যবহার করা হত খুবই সযত্নে সবদিকে নজর রেখে। অনেককিছু নির্ভর করত 'এই প্রক্রিয়ায় যা জড়িত সেই সুতোটার গুণাগুণের উপর। তবে যেসব পদার্থ লাগানো হয় সেগুলোর অনুপাত উপযুক্ত ধরনে নিয়ন্ত্রিত করা এবং প্রত্যেকটা

বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্যে সুতোটাকে কত সময় ধরে ক্রিয়াধীন করা হয়, প্রধানত সেটার উপর নির্ভর করে রঞ্জকের সার্থক পরিণতি।'*

ভারতীয় ধাতুবিদ্যার প্রযুক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন ইংরেজ গ্রন্থকারের বিবরণে যেমনটা সেইভাবে হেইন ভারতের সুতো রঞ্জন প্রণালী নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন সেটাকে কাজে লাগাবার স্পষ্ট-নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুসারে। তিনি বলেন, 'ভারতীয় রঞ্জনকর্মীদের প্রণালী অত্যন্ত ক্লান্তি-বিরক্তিকর এবং জটিল হলেও, তাদের প্রক্রিয়াগুলোর মূলনীতির ব্যাখ্যা দিতে তারা একেবারেই অপারক হলেও, তাদের রঙগুলোর মাধুর্যের তারিফ না করে পারা যায় না, আর সেটা আমাদের এই মতে প্রবৃত্ত করায় যে, তাদের প্রণালী জানা থাকলে সেটার সাহায্যে ইউরোপীয় রঞ্জনকর্মীদের প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ ঘটানো যেতে পারে, আর এরা কোন-কোন সুবিধাজনক পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হতে পারে' নিজেদের রঞ্জন-বিদ্যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে, 'শিক্ষিত শিল্পী যাতে সমস্ত অনাবশ্যক ধরন-ধারন বাতিল করে দিতে পারে সেজন্যে ভারতীয় প্রক্রিয়ার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে রসায়নের জ্ঞান প্রয়োগ করলে এই চমৎকার বিদ্যার উৎকর্ষসা-ধনে সেটা যা সহায়ক হতে পারে সেটা অতি বড় প্রত্যয়ীও বর্তমানে যা ধারণা করতে পারে তার চেয়ে বেশি'।** এখানে এটা লক্ষণীয় যে, কথাটা বলেছেন এমন একব্যক্তি যিনি হলেন এমন সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় যেখানে বিভিন্ন উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং সেগুলোর পরস্পর-সংযোগ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধির ভিত্তিতে শিল্প-বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল আগেই।

ভারতে শিল্পোৎপাদনের আরও কোন-কোন শাখায়ও খুবই যৌগিক ধরনের এবং যুগযুগান্তরে পরীক্ষিত প্রযুক্তি ছিল। সেগুলিতেও বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের এবং সেগুলোকে প্রক্রিয়ার মধ্যে চালু করার সময় সম্বন্ধে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রচলিত ছিল। ভারতীয় কারিগরদের সরঞ্জাম সাদাসিধে এবং আদিম ধরনের হওয়া সত্ত্বেও তারা অনেক সময়ে এমন ফল পেত যা ইউরোপীয় শিল্পের অনুরূপ সাধনসাফল্য-কে ছাড়িয়ে যেত ঐ কারণেই।

রঞ্জকগুলো কিভাবে প্রস্তুত করা হত সে-সম্বন্ধে, আর মৈসুরের

শাসক হায়দার আলী এবং টিপু সুলতানের প্রাসাদগুলোর দেয়ালে ঐসব রঞ্জক লেপন করার প্রণালী সম্বন্ধে আগ্রহজনক বিবরণ দেন হেইন। খুবই উপযুক্ত উপায়ে রঞ্জক প্রস্তুত করা হত – সর্বোপরি তারই ফলে 'রঙের অমন দীপ্তি' ঘটত। প্রথমে উপযুক্ত অনুপাতে ওজনের পাঁচ রকম উপকরণ মিশিয়ে গোলাটা তৈরি করা হত। তারপর গোলাটাকে গরম করতে-করতে তাতে মেশান হত আরও দুটো উপকরণ এবং তারপর আরও একটা (ফুটন্ত তিলের তেল); এইভাবে তৈরি করা গোলাটাকে দু'ঘণ্টা ধরে জ্বাল দেওয়া হত ঢিমে আগুনে; রঞ্জকে প্রয়োজন-মতো রঙ ফোটাবার জন্যে মেশানো হত অন্যান্য উপকরণ, ইত্যাদি। শেষে, রঙ করার আগে দেয়ালে লেপে দেওয়া হত একটা বিশেষ ধরনের পদার্থ; দেয়ালটা একেবারে সম্পূর্ণভাবে পুটিংয়ে এঁটে যাবার পরে রঙ করা হত।

মারিহারের (মৈসুর) কাছে একটা গ্রামে অনুরূপ জটিল প্রক্রিয়ায় ছাগলের চামড়া পাকা করে 'খুবই সুন্দর একরকম লাল মরক্কো চামড়া' প্রস্তুত করা হত। চামড়া রোদে শুকানো হত একদিন ধরে, তারপর দু'দিন সেটাকে ভিজিয়ে রাখা হত নদীর জলে, আর তারপর চার দিন ধরে সেটাকে রাখা হত একটা চৌবাচ্চায়, তাতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের সঙ্গে মেশান হত তার অর্ধেক পরিমাণ 'বুনো কাপাসবীজের রস' আর একমুঠো নুন; আরও চার দিন জলে ভিজিয়ে রাখার পরে চামড়া থেকে লোম ছাড়িয়ে ফেলা হত। তার পরবর্তী দু'-তিন দিন ধরে চামড়া শুকানো হত শীতল জায়গায়, বিশেষ ধরনের কাদা-মাটি দিয়ে সেটাকে স্যাদা করা হত, আবার দু'বার ভেজান হত কোন-কোন দ্রবে, আর রঞ্জনের প্রক্রিয়ায় সেটাকে ফেলা হত শুধু এই সবকিছুর পরে। যথাযথ অনুপাতে তিনটে উপাদান মিশিয়ে উপযুক্ত মাত্রায় তাপ দিয়ে এই প্রয়োজনে রঞ্জক প্রস্তুত করা হত। এই রঞ্জকটাকে ঘষে-ঘষে চামড়ায় বসিয়ে সেটাকে আর-একটা দ্রবের মধ্যে রাখা হত চার-পাঁচ দিন ধরে, তখন চামড়াটাকে প্রতি-দিন সকালে চৌবাচ্চা থেকে বের করে নিয়ে খুব ভালভাবে ধোয়া হত। কিছুকাল শুকোবার পরে চামড়াটার প্রস্তুত-করণ প্রক্রিয়া শেষ হত, তখন সেটা নরম, আর রঙটা ঘোর লাল।*

দেখা যাচ্ছে, এই প্রক্রিয়ার ফলে পাওয়া যেত খুবই সরেস জিনিস। কিন্তু যেহেতু প্রয়োগজ ক্রিয়াপ্রণালীগুলো সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা ছিল না, তাই এইসব প্রক্রিয়াকে ত্বরিত করে তোলা সম্ভব ছিল না, এই যেসব প্রক্রিয়া গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন দীর্ঘ কালপর্যায়ে, আর তাতে নিশ্চয়ই মনুষ্য-শক্তির প্রয়োগে বিভিন্ন দীর্ঘ বিরতি ঘটত, তেমনি বৃথা কালক্ষেপও ছিল অপরিহার্য। এই সবকিছুর ফলে অবশ্যম্ভাবী ছিল শ্রমের উৎপাদনশীলতার উপর নেতিবাচক ক্রিয়া, উৎপাদ-পরিব্যয়ের বৃদ্ধি, আর বিপরীতক্রমে উৎপাদকের আয়হ্রাস।

উৎপাদন-প্রক্রিয়ারই ভিতরে বিস্তারিত শ্রমবিভাগ সাধারণত ছিল খুবই সীমাবদ্ধ, যেটা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক যার থেকে বোঝা যায় মধ্যযুগীয় ভারতের হস্তশিল্পে উৎপাদন-শক্তি উন্নয়নের মান ছিল সাধারণভাবে নিচু স্তরে। উৎপাদক অনেক সময়েই শুরু থেকে শেষ অবধি গোটা উৎপাদন-প্রক্রিয়াটাকে সমাধা করত কারও কোন সাহায্য ছাড়াই। বুকানন বলেন, 'শ্রমেব উপবিভাগ ভারতে ছিল খুবই বেরেও-য়াজী ব্যাপার।'* আঠার শতকের শেষে ভারতে হস্তশিল্প-উৎপাদনের কাঠাম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়েছেন এইচ. কোলব্রুক: 'ম্যা-নুফ্যাকচারে আর কৃষিতে পুঁজির অভাবটা শ্রমবিভাগ ঘটতে দেয় না। প্রত্যেকটি নির্মায়ক, নিজের জন্যে কর্মরত প্রত্যেকটি কারিগর হা-তিয়ার গড়া থেকে শুরু করে জাতদ্রব্য বিক্রি করা অবধি নিজ বিদ্যার সমগ্র প্রক্রিয়াটা চালায় নিজেই।'** ওর্ম বলেন, কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালী আচরণের ফলে কয়েকজন কারিগর একই কর্মশালায় জড়ো হতে পারত না, তাই ইউরোপীয় ধারায় বিস্তারিত শ্রমবিভাগ অসম্ভব ছিল। তিনি আরও বলেন, তাঁত-বোনা একটা ব্যতিক্রম, এতে তন্তুবায় তার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াপ্রণালীতে জড়িয়ে নিয়ে শ্রম-বিভাগ বলবৎ করত।***

উল্লিখিত তথ্যাদি বড় বেশি চূড়ান্ত ধরনের। সতর আর আঠার

শতকে বিস্তারিত শ্রমবিভাগের কোন-কোন লক্ষণ দেখা দিয়েছিল ভারতের কিছু-কিছু হস্তশিল্পে, আর সেটা তাঁত বোনাতেই শুধু নয়, এর থেকে দেখা যায় কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছিল উৎপাদন-শক্তি উন্নয়নে। লেনিন বলেছেন, 'হাতে উৎপাদনের ভিত্তিতে প্রযুক্তিক্ষেত্রে আর কোন অগ্রগতি সম্ভব ছিল না শ্রমবিভাগের সাহায্যে ছাড়া।'*

সতর শতকের চতুর্থ দশকে অবধি ম্যাণ্ডেলস্লো লক্ষ্য করেছিলেন, 'যেকোন একটা কাজ তিন-চার হাত ঘুরে গিয়ে তবে শেষ হতে পারে'।** যদিও ম্যাণ্ডেলস্লো লেখেন সাধারণভাবে সুরাটের হস্তশিল্প সম্বন্ধে, আর কোন বিস্তারিত বিবরণ তিনি দেন নি, তবু অনেকটা নিশ্চিত হয়েই ধরে নেওয়া যেতে পারে তাঁর মনে ছিল বিভিন্ন বিশেষ-নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের কথা, যা তিনি দেখেছিলেন নিজেই। পরে বহু ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাব ভারতে কর্মশালার চৌহদ্দির ভিতরে ছিল বিস্তারিত শ্রমবিভাগ।

কৃষিতে আর হস্তশিল্পে শ্রমের উৎপাদনশীলতা। এই দুয়ের মধ্যে বিনিময় সম্পর্ক

আমরা দেখছি ভারতীয় হস্তশিল্পের নিচু উৎপাদনশীলতা-সংক্রান্ত বক্তব্য বেশকিছু সংশয় আর সংশোধনী ছাড়া মেনে নেওয়া যায় না। তবু কর্ষক আর সম্প্রদায়-বহির্ভূত কারিগরদের মধ্যে বাজার মারফত ব্যাপক পণ্য-বিনিময়ের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রমবিভাগের প্রসার যাতে ব্যাহত হয় সেইসব কারণ নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে শ্রমের উৎপাদনশীলতায় কৃষির চেয়ে হস্তশিল্পের পিছিয়ে-পড়া অবস্থাটার দিকে মনোযোগ করা দরকার। এদিক থেকে ভারত কোন ব্যতিক্রম নয়, কেননা সাধারণভাবেই প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ম্যানুফ্যাকচারের চেয়ে কৃষিতেই চড়া।

এই প্রসঙ্গে মার্কস লিখেছেন: 'মোটের উপর ধরে নেওয়া যেতে পারে অপেক্ষাকৃত আনাড়ী ধরনের, প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর অব-

---

তিক শক্তির জায়গায় প্রায় পুরোপুরিই এসে গেছে মানুষের ক্রিয়াকরণ (কারিগরী ধরনের শিল্প ইত্যাদিতে যেমনটা)। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রচণ্ড প্রসারের কালপর্যায়ে কৃষির সঙ্গে তুলনায় শিল্পে উৎপাদনশীলতা বাড়ে দ্রুত, যদিও এটার উন্নয়ন বলতে **বোঝায়** যে, বদ্ধ আর চলতি পুঁজির মধ্যে বেশকিছুটা পরিবর্তন আগেই **ঘটে গেছে** কৃষিক্ষেত্রে, অর্থাৎ বহুসংখ্যক মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে ভূমি থেকে।'* মার্কসের এই উপস্থাপনার দ্বিতীয় অংশটা ভারতের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই প্রযোজ্য নয় – আলোচ্য কালপর্যায়েও না, পরবর্তী বৃটিশ আমলেও না, কেননা বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় অবধি সেখানে না ছিল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রচণ্ড প্রসারের লক্ষণ, আর না ছিল কৃষিক্ষেত্রে চলতি আর বদ্ধ পুঁজির অনুপাতে বিশেষ কোন পরিবর্তন। শ্রমের উৎপাদনশীলতায় শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব ঘটেছিল অন্য উপায়ে – সেটা হল বার থেকে এনে যন্ত্রপাতি চালু করা।

তার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় প্রাক্‌বৃটিশ ভারতে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার আপেক্ষিক আধিক্য [শিল্পের সঙ্গে তুলনায়] ছিল সেটা মধ্যযুগীয় ইউরোপে যা তার চেয়ে বেশি। ভারতের কৃষি সরঞ্জামের প্রস্তগুলোর বর্ণনার প্রসঙ্গটা আমি তুলতে চাই বারবার, – মাটির রকম, জন্মানো ফসল, জলসেক ব্যবস্থা, ইত্যাদি অনুসারে সেগুলো খুবই বিভিন্ন ছিল বিভিন্ন এলাকায়।

এইসব সরঞ্জাম সম্বন্ধে প্রথম-প্রথম বিবরণগুলোর একটা রয়েছে হইন-এর বইয়ে (উনিশ শতকের গোড়ার দিক)। বিবরণটার সঙ্গে তিনি আরও দিয়েছেন নিম্নলিখিত জিনিসপত্রের রেখাচিত্র: তিন রকমের লাঙল (দুটো সারির মধ্যে চাষের লাঙল দু'রকম), দুটো বলদে টানা ভারী মই, দু'রকমের বীজ ছড়াবার সরঞ্জাম (তার একটাতে অন্য একটা ফসল বোনার জন্যে সংযোজিত অংশ), বীজ বোনার আগে আর পরে মাটি সমান করে দেবার জন্যে দু'রকমের সরঞ্জাম। এখানে বলা দরকার, দু'রকমের লাঙল, একরকমের বীজ ছড়াবার সরঞ্জাম এবং মাটি সমান করার একরকমের সরঞ্জামের কাটিয়ে অংশগুলো পুরোপুরি

লোহা দিয়ে তৈরি।* কাস্তে, নিড়ানি, ইত্যাদি হাতে চালাবার সরঞ্জাম নেই এই তালিকায়।

কৃষিকাজে যেমন ছিল প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি আবার কৃষি উৎপাদন ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি কেন্দ্রীভূত। গ্রামের উপর-তলার মানুষের ভূসম্পত্তিতে ব্যবহার করা হত কয়েকখানা 'লাঙল' (একপ্রস্ত সরঞ্জামকে বলা হত 'এক লাঙল'), আর তদনুযায়ী সংখ্যায় 'বাইরের' জন খাটান হত, এটা স্পষ্টতত ছিল শিল্পোৎপাদনক্ষেত্রের মজুরি দিয়ে খাটানো লোকেদের সাদাসিধে সহযোগের চেয়ে বেশি প্রচলিত। যা-ই হোক, কৃষির সঙ্গে, বিশেষত কৃষির যে-ক্ষেত্রটা চালাত গ্রামের উপর-স্তরের মানুষ সেটার সঙ্গে যেসব শিল্পের উৎপাদ-বিনিময় বা পণ্য-বিনিময় সম্পর্ক ছিল সেগুলো সম্বন্ধে এটা বলা যায় বেশ নিশ্চয় করেই। তাই এটা ধরে নিতে হয় যে, শ্রমের উৎপাদনশীলতার দিক থেকে সেই ক্ষেত্রটা ছাড়িয়ে গিয়েছিল হস্তশিল্পকে, যদিও এটা এখানে-ওখানে গোড়ার দিককার পুঁজিতান্ত্রিক আকারের সংগঠন ধরেছিল তা সত্ত্বেও।

এর সঙ্গে আরও বলা দরকার যে, ভারতের প্রধান-প্রধান কৃষি এলাকাগুলিতে জলবায়ুর অবস্থা ছিল খুবই অনুকূল, আর বছরে দু' তিনটে ফসল তোলা সম্ভব ছিল, তাতে ছিল ইউরোপের চেয়ে বেশি শ্রমবহুল এবং বর্ধিত ফলনপ্রদ বিভিন্ন ফসল (ধান, আখ, চীনাবাদাম, তুলো), তাতে বেশি কৃষক কাজ পেত, আর উৎপাদনশীলতা বাড়ত বার্ষিক পরিমাণের দিক থেকে। ভারতে হস্তশিল্পের উপর কৃষির শ্রেষ্ঠত্ব আরও স্পষ্টপ্রতীয়মান হয়ে ওঠে যখন উল্লিখিত উপাদানগুলির সঙ্গে যোগ করা হয় জলসেকের কথাটা, যাতে মানুষের শ্রমের সঙ্গে 'একটা যন্ত্র এবং অঙ্গীর মতো' সাক্ষাৎ অংশগ্রহণ করে প্রকৃতি। এমন অবস্থায়, কৃষি আর হস্তশিল্পে যথাক্রমে যে-যে পরিমাণ শ্রমব্যয় হত তদনুসারে এই দুয়ের মধ্যে সরাসরি বিনিময় হলে কৃষিকে জাতদ্রব্যের একাংশ ছেড়ে দিতে হত সেটার সমতুল কিছু না পেয়েই।

বহিস্থ কোন নিয়ন্ত্রকের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এমন সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হলে উন্নয়নের একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় এমন পরিস্থিতি দেখা দিতে পারত যাতে কৃষিতে উদ্ভব ঘটত পুঁজিতন্ত্রের, যাতে সঞ্চয়নের জন্যে ভারতে

পরিবেশ ছিল অধিকতর অনুকূল। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের শেষের দিককার পর্বগুলোতে – যখন উৎপাদনশীলতায় শ্রেষ্ঠত্ব ছিল হস্তশিল্পের – এইসব অনুকূল পরিবেশ ছিল এই শিল্পেরই পক্ষে (গ্রামাঞ্চলের উপর শহরের শোষণ)। অন্য একটা পরিস্থিতিও সম্ভব ছিল: উৎপাদনশীলতার মাত্রা মোটামুটি অনুরূপ হলে তার ফলে সমান-সমান কালপর্যায়ে উৎপন্ন সমান-সমান মূল্যবস্তুর মধ্যে বিনিময় ঘটত। এঙ্গেলস বলেছেন, মধ্যযুগীয় কৃষক বিনিময় করতে গিয়ে গ্রামের কর্মকার, গাড়ি-নির্মাতা, মুচি কিংবা দরজির কাছ থেকে যেসব জিনিস পেত সেগুলো তৈরি করতে আবশ্যক শ্রম-কালের পরিমাণ সম্বন্ধে বেশ যথাযথ ধারণাই তার ছিল। তাই এইসব উৎপাদকের তৈরি-করা জিনিস বিনিময় করা হত শ্রমব্যয়ের অনুপাতে, সেগুলোতে অঙ্গীভূত শ্রমের পরিমাণ অনুসারে। কিন্তু অর্থ ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাজনী পুঁজি আর রাজস্ব ব্যবস্থার হস্তক্ষেপের ফলে মূল্য নিয়মের অনুযায়িতার ধারাটা ভেঙে পড়েছিল।*

ভাঙন ঘটাবার এই অবস্থাটা অত্যাবশ্যক ভারতীয় রকমফেরটার জন্যে, যেটা নিয়ে আমরা বিচার-বিবেচনা করছি। মহাজনী পুঁজি সমানই চাপ খাটাতে পারত চাষী আর কারিগরের উপর, সেই পুঁজির বিষয়টাকে সরিয়ে রেখে বিবেচনা করা যাক ভারতীয় রাজস্ব ব্যবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে, এই ব্যবস্থায় অগ্রাধিকার পেত কৃষি সেটা স্পষ্টই। ধরা যাক, কৃষিকাজে ব্যাপৃত একজন দিনে ১০ কিলোগ্রাম শস্য পয়দা করে, আর ঐ একই সময়ে এক মিটার কাপড় তৈরি করে একজন তন্তুবায় – এই দৃষ্টান্ত নিয়ে বিবেচনা করে দেখা যাক। চাষীর উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ ধরে নিলে তার জাতদ্রব্যে অঙ্গীভূত হয় কারিগরের জিনিসটায় যা তার দ্বিগুণ শ্রম, কাজেই প্রযুক্ত শ্রম অনুসারে তাদের মধ্যে সরাসরি বিনিময় হলে তন্তুবায় যে-সময়ে কাপড়খানা তৈরি করেছে তার সমান সময়ে পয়দা-করা কৃষিজাতদ্রব্যের সবটা আত্মসাৎ করে সে মূল্যের দিক থেকে দ্বিগুণ লাভবান হয়। তবে চাষীর কাছ থেকে তার উৎপাদের ধরা যাক অর্ধেকটা যে আদায় করে নেয় সেই রাজকোষের (কিংবা অন্য কোন খাজনা-প্রাপ্তার) হস্তক্ষেপের ফলে চাষীর হাতে থেকে যায়

* দ্রষ্টব্য: F. Engels, 'Supplement to Vol. III of Marx' "Capital"', ৮৯৭ পৃঃ।

তার উৎপাদের শুধু একাংশ (আমাদের দৃষ্টান্তে – ৫ কিলোগ্রাম), যা কিনা কৃষিজাতদ্রব্যের সবটা (খাজনা-প্রাপ্তার আদায় করে নেওয়া অংশটা সমেত) যে-সময়ে পয়দা হয়েছে তার সমান সময়ে তৈরি-করা হস্তশিল্পজাত জিনিসটার (আমাদের দৃষ্টান্তে – এক মিটার কাপড়) সঙ্গে মূল্যের দিক থেকে তুলনীয়। এইভাবে, কৃষিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা যাতে অপেক্ষাকৃত বেশি এমন পরিবেশে কৃষিজীবী আর কারিগরের মধ্যে বিনিময়ে মূল্য নিয়মের সঙ্গে অনুযায়িতার প্রবণতাটাকে একদিক থেকে পুনঃস্থাপন করে খাজনা আদায়।

মনে হয়, সম্প্রদায়ের কারিগরদের পারিশ্রমিক এবং শহুরে কারিগরদেরকে সামন্ত ভূস্বামীদের পাওনা মেটান (সরাসরি কিংবা থোক-ক্রেতা মারফত), যা বরাবর নিয়ন্ত্রিত ছিল, তার ফলে কৃষক অর্থনীতিতে পয়দা-করা মূল্যের একাংশ পুনর্বণ্টিত হত, যাতে হস্তশিল্পজাত জিনিসের (উৎপাদকের শ্রম দিয়ে যা পয়দা হত আর পুনর্বণ্টনের মধ্যে যা যুক্ত হত উভয়ই) মোট মূল্য যা হত তাতে নিশ্চিত হত কারিগর আর তার পরিবারের একজন সাধারণ রায়তের মানমাফিক ভরণপোষণ এবং পুনরুৎপাদনও, সেটা প্রাথমিক আকারে হলেও। হস্তশিল্প শ্রমের অপেক্ষাকৃত নিচু মাত্রার উৎপাদনশীলতার দরুন উদ্ভূত এই অবস্থায় শিল্পে পুনরুৎপাদন চিরাগত ব্যবস্থার পুনর্বণ্টনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, আর তাতে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিতন্ত্রের যথেষ্ট বিস্তৃত পরিসরে উৎপত্তির প্রক্রিয়াটা, যেজন্যে প্রয়োজন হয় – মার্কস বলেছেন – কৃষির সঙ্গে তুলনায় শিল্পে উৎপাদনশীলতার দ্রুত প্রসার।* প্রকৃতপক্ষে, কৃষির চেয়ে শিল্পে শ্রমের উৎপাদনশীলতায় বেশকিছুটা শ্রেষ্ঠত্ব না থাকায় কৃষির সঙ্গে সরাসর বস্তু-বিনিময়ের মধ্যে শিল্পে পুঁজির এমন সঞ্চয়ন ঘটতে পারে নি যেটা উন্নত ধরনের প্রযুক্তি আর পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের জন্যে আবশ্যক।

যেসব তন্তুবায় কৃষকদের সঙ্গে সরাসর বিনিময় চালাত, কিংবা ব্যাপারিক পুঁজির আনুকূল্য কাজে লাগাত, তাদের অবস্থানটা ছিল বিশেষ ধরনের, তাতে ব্যাপারিক পুঁজি যে-পরিমাণে এমন বিনিময়ে অংশগ্রহণ করত সেইভাবে সেটা কাপড়ের দাম থেকে লাভ উসুল করত।

প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত কাপড়ের দাম গড়ে ওঠার বিষয়টা নিয়ে বিশেষ বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন নিশ্চয়ই। এখানে উল্লেখ করছি শুধু এই বিশেষত্বটা: কাপড়ের মূল্যের প্রধান অংশটা পয়দা করত কৃষিজীবী জনসমষ্টি (তুলো পয়দা করত কৃষক, সুতো কাটত কৃষকের ঘরের মেয়েরা)। কাপড় তৈরি করায় সবচেয়ে শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়াটা নয়, শুধু চূড়ান্ত পর্বটা সমাধা হত তন্তুবায়ের হাতে। ফলে – বুকানন বলেন – সস্তা কাপড় উৎপাদনের পরিব্যয়ে ৩০ শতাংশের কম (১২ টাকার মধ্যে ৩½ টাকা) ছিল তন্তুবায়ের শ্রম বাবত পারিশ্রমিক। এখানে লক্ষণীয় এই যে, হস্তশিল্পের যেসব জিনিস কৃষকেরা ব্যবহার করত সেগুলোর মধ্যে আর কোনটাতে তাদের নিজেদের শ্রম এতটা অঙ্গীভূত থাকত না যতটা কিনা সস্তা কাপড়ে। এটার সঙ্গে আরও যোগ করা যেতে পারে আখ থেকে তৈরি জিনিস আর উদ্ভিজ্জ তেল (সংশ্লিষ্ট হিসাব দেওয়া হবে পরে), কিন্তু তাতে অনুমানটা বাতিল হয়ে যায় না, কেননা কৃষকের পয়দা-করা মূল্যের হিসসাটা খুবই বড় এইসব জিনিসেও।

একটা আগ্রহজনক তথ্য এই যে, সমাজের উপর-স্তরের মানুষের ব্যবহৃত ব্যয়বহুল কাপড়ের দামের গঠন কম দামের কাপড়ের দামের গঠন থেকে খুবই পৃথক ছিল। আমি আগেই যার উল্লেখ করেছি সেই গ্র্যাণ্টের উপাত্ত অনুসারে প্রধানত শুধু শহুরে মেয়ে কাটনীদের শ্রমে কাঁচামালের (যে-তুলো থেকে সুতো কাটা হত) দাম বেড়ে যেত ষোলগুণ, আর তন্তুবায় তাতে যোগ করত অন্তত আরও অর্ধেকটা। (শুধু দেশীয় ব্যবহারকদের কথা ধরলে) একমাত্র জমিদারই কাপড় প্রস্তুত করার এমন বিপুল পরিব্যয় মেটাতে পারত কৃষিক্ষেত্র থেকে আদায়-করা খাজনা দিয়ে।

আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় কাটনি আর তন্তুবায়দের উৎপাদনশীলতা আর পারিশ্রমিক সম্বন্ধে, তেমনি সুতো আর কাপড়ের দামের গঠন সম্বন্ধেও মোটামুটি সম্পূর্ণ উপাত্ত আছে এন. কে. সিন্‌হার বিবরণে। এইসব উপাত্ত বৃটিশ আমল আরম্ভের সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও ভারতীয় হস্তশিল্পে দাম গড়ে ওঠার বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ চালিয়ে যাবার জন্যে সেগুলো সহায়ক। এইভাবে, শান্তিপুরে কোম্পানির একজন রেসিডেণ্ট বলেন, বিভিন্ন দক্ষতার কাটনীদের মাসিক উৎপাদের মূল্যের

অঙ্গ-উপাদানগুলো (টাকা, আনা, পাই হিসাবে) ছিল নিম্নলিখিতরূপ:

সুতোর রকম	পরিসমাপ্ত জিনিসের পরিব্যয়	ব্যবহৃত তুলোর দাম	কাটনীদের আয়
অতি মিহি	১-৮-০	০-১-৮	১-৬-৪
মিহি	১-৬-০	০-২-০	১-৪-০
মাঝারি	১-২-৩	০-২-০	১-০-৩
সাধারণ	১-৩-০	০-২-৩	১-০-৯

এইভাবে, মূল্যের হিসাবে, কৃষিজাত উপাদানটা ছিল সবচেয়ে সরেস জিনিসের দামের প্রায় ৭ শতাংশ, আর মূল্যের বাদবাকিটা পয়দা করত পেশাদার শহুরে কাটনীরা। তার চেয়ে কম সরেস বিভিন্ন সুতোয় দামের ১৪ শতাংশের বেশি ছিল তুলো বাবত; এইসব সুতো কাটত সাধারণত কৃষক পরিবারের মেয়েরা, এই কথাটা বিবেচনা করলে নিচু মানের সুতো স্পষ্টতই ছিল কৃষকের পয়দা-করা জিনিস। কম সরেস সুতো-কাটা অনিবার্যভাবেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা আনুষঙ্গিক বৃত্তি, তার আরও কারণ এই যে, এতে পারিশ্রমিক যা ছিল তা দিয়ে কাটনির খাইখরচ পোষাত কোনমতে।

প্রসঙ্গত বলি, ১৮০০ সালে নিচু মানের সুতোর কাটনীদের গড় মাসিক আয় দাঁড়িয়েছিল ১২-১৪ আনা, যখন মাঝারি আর উঁচু মানের সুতোর কাটনীদের আয় ছিল যথাক্রমে মাসিক ২ আর ৩ টাকা, অর্থাৎ পরিবারের প্রতিপালনকর্তা কারিগরদের আয়ের কাছাকাছি। প্রাপ্তিতে এইসব পার্থক্যের সামাজিক ভিত্তিও ছিল: নিচু মানের সুতো কাটত সাধারণ রায়তদের বাড়ির মেয়েরা, কিন্তু উঁচু মানের সুতো কাটত প্রায়ই বিভিন্ন উঁচু বর্ণের বিধবারা, কেননা যারা কখনও কোন রুক্ষ কাজ করে নি শুধু সেইসব নারীর আঙুলেই দক্ষতা আর ধৈর্যের অমন বিস্ময়কর সৃষ্টি হতে পারত। এটা তো একেবারেই স্পষ্ট যে, কাটনিদের

কোন বর্গ থেকেই কোন স্বাধীন কারবারি দেখা দিতে পারে নি।

সুতোর মূল্যে মস্ত-মস্ত পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন মানের কাপড়ের দামের মধ্যে পার্থক্য আগেভাগেই নির্দিষ্ট হয়ে যেত। তাছাড়া, তন্তুবায়ের উৎপাদনশীলতা আর পারিশ্রমিক অনুসারে কাপড়ের দাম গড়ে উঠত দৈর্ঘ্যের মাপ হিসাবে, উৎপাদনে ব্যয়িত সময়ের পরিমাপ হিসাবে নয়। একজন অভিজ্ঞ তন্তুবায় বছরে ৬০খানা নিচু মানের কাপড় বুনতে পারত, কিন্তু উঁচু মানের কাপড়ের বেলায় সেটা কমে দাঁড়াত ৬-১২খানা। কাপড় যত বেশি সরেস, সেটা বোনার কাজ যত বেশি জটিল, উৎপাদন ততই কম হবার সাধারণ ধারাটাই শুধু প্রকাশ পায় এইসব অঙ্কে। কোন যথাযথ হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা এক-একখানা কাপড় হত অল্প কয়েক মিটার থেকে ১৫ মিটার অবধি, সেটা স্থির হত দালাল আর তন্তুবায়ের মধ্যে চুক্তিতে।

তাঁত বোনার বিভিন্ন কেন্দ্রের এক-একখানা কাপড়ের গড় দাম সম্বন্ধে তথ্যাদি পেলে কোন্ রকমের জিনিসে কোন কেন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব সেটা সম্বন্ধে ধারণা করতে সুবিধে হয়। যেমন, ১৭৮৩ সালে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঢাকায় ৪০,৫০০খানা কাপড় কিনেছিল ৮,২৯,২০০ টাকায়, অর্থাৎ ২০½ টাকা দামে এক-একখানা; আর পাটনায় তারা ৯৬,৮০০খানা কাপড় কিনেছিল ৪,১৪,২০০ টাকায়, অর্থাৎ এক-একখানা ৪ ¼ টাকা দামে; পূর্ব ভারতের অন্যান্য বয়নকেন্দ্রে দাম ছিল এই দুয়ের মধ্যে কম-বেশি বিভিন্ন রকমের। এখানে বলা দরকার – এইসব কাপড় কিনেছিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, যেটা কখনও মোটা কিংবা সস্তা কাপড় কিনত না। প্রকৃতপক্ষে, এক-একখানা মোটা কাপড় ১-২ টাকা থেকে এক-একখানা সুশোভন মসলিন ২০০ টাকা, এমনকি ৪৫০ টাকা অবধি পাল্লায় দাম কম-বেশি হত।* তবে বিভিন্ন দক্ষতা আর বিশেষকৃতির তন্তুবায়দের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য অমন বিস্তর ছিল না। অধিকন্তু সুতো কিনতে মোটা টাকা খরচ ছিল, আর এক-একটা জিনিসের উৎপাদন কালচক্র ছিল দীর্ঘ, তাই বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন কারিগরেরা থোক-ক্রেতার ক্রেডিটের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ত, এই ক্রেতাদের লাভ হত পাইকারী দামের চতুর্থাংশ।

পুনরুৎপাদন আর বণ্টন প্রক্রিয়ায় সম্প্রদায়-বহির্ভূত পৃথক-পৃথক হস্তশিল্পের স্থান সম্বন্ধে এই সাধারণ বিচার-বিবেচনা থেকে সেগুলিকে দুটো উপ-বর্গে আরও বিভক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়: যেসব হস্ত-শিল্প বিনিময় চালাত গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে (যেমন, কোন-কোন তন্তুবায়রা, ধাতুর কারিগর), আর যেগুলোর অমন বিনিময় ছিল না কিংবা ছিল সামান্যই। অর্থাৎ কিনা, একদিকে ছিল সম্প্রদায়ের চৌহদ্দির ভিতরে স্বাভাবিক সম্পর্কের গণ্ডিবদ্ধ কৃষিকাজ আর হস্তশিল্প, আর বিপরীত প্রান্তে ছিল গ্রাম এলাকাগুলি এবং সেখানকার জনসমষ্টির আর্থনীতিক আর ভোগ-ব্যবহারের প্রয়োজন থেকে অর্থনীতিগতভাবে পুরোপুরি কিংবা অংশত বিচ্ছিন্ন কোন-কোন সম্প্রদায়-বহির্ভূত, বিশেষত শহুরে হস্তশিল্প।

কৃষির উদ্বৃত্ত-উৎপাদের হস্তশিল্পজাত বস্তুতে রূপান্তর। উৎপাদকের সামাজিক প্রতিষ্ঠা

দেখা দেয় এই প্রশ্নটা: হস্তশিল্পজাত জিনিস বাবত তুল্যবিনিময় হত শেষে গিয়ে কোন্ উৎপাদ দিয়ে? কৃষি থেকে হস্তান্তরিত (প্রধানত উদ্বৃত্ত) উৎপাদ যেভাবে খাজনাভোগীদের যোগানদার শাখাগুলোর জন্যে জিনিসে রূপান্তরিত হত তার অর্থশাস্ত্রীয় মডেল দিয়েছেন মার্কস। তিনি বলেছেন, বড়-বড় খাজনা-প্রাপ্তা আর কারিগরদের মধ্যে সেকেলে ধরনের সম্পর্ক বৃটিশ-শাসিত ভারতের অনগ্রসর প্রদেশগুলিতে বজায় ছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় অবধিও। 'কৃষি-বহির্ভূত মজুরদের সরাসরি নিয়োগ করে ধনপতিরা, যাদের হাতে কৃষির উদ্বৃত্ত-উৎপাদের একাংশ তুলে দেওয়া হয় নজরানা বা খাজনা আকারে।' মার্কস বলেন, 'এই উদ্বৃত্ত-উৎপাদের একাংশ ধনপতিরা ভোগ-ব্যবহার করত বস্তু আকারে, আর-একটা অংশকে মজুরেরা বিলাসদ্রব্য এবং অন্যান্য ভোগ্য বস্তুতে পরিণত করত ধনপতিদের জন্যে, আর বাদবাকিটা হত ঐ মজুরদের মজুরি যারা ছিল তাদের কাজের সরঞ্জামের মালিক।'*

প্রকৃতপক্ষে, উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে অবধিও ভারতের মধ্য অঞ্চলগুলিতে কারিগরেরা সরাসরি সামন্ত শাসকদের মুখাপেক্ষী ছিল।

বুন্দেলখণ্ডে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের একজন আমলা যে-স্থানীয় মুসলিম তন্তুবায়-রা বিখ্যাত চান্দেরি কাপড় (সংশ্লিষ্ট এলাকার নামানুসারে) বুনত তাদের অবস্থার বিবরণ দেন ১৮৪১ সালে। একই ওজনের রুপোর সমান দামী এই অতি মিহি সুতোয় যাতে ধুলো না লাগে সেজন্যে তারা কাজ করত মাটির অনেকটা তলে আবছা আলোর সেঁতসেঁতে ঘরে। এই তন্তু-বায়দের নিয়োগ করা হত স্থায়িভাবে, এরা জিনিস তৈরি করতে পারত না খোলা বাজারের জন্যে, কেননা গোয়ালিয়র আর ইন্দোরের রাজদরবার এবং স্থানীয় সর্দারেরাও সেখানে গোমস্তা (কোঠি) রাখত, তারা দাদন দিত তন্তুবায়দের। মোটা কাপড় বিক্রি হত বাজারে, আর সবচেয়ে সরেস কাপড়ে ছিল শাসকদের একাধিকার। কাপড়ের প্রত্যেকটা গাঁটের উপর শুল্ক ধার্য করত গোয়ালিয়রের কর্তৃপক্ষ।* উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এমন সম্পর্ক নিশ্চয়ই ছিল পুরান আমল থেকে একটা অবশেষ।

যাতে খাজনাভোগীরা ছিল শহুরে হস্তশিল্পজাত জিনিসের প্রধান খদ্দের এবং ব্যবহারক, আর ব্যাপারিক পুঁজির কর্ম ছিল তাদের এজে-ণ্টের মতো, এমন কর্ম-বন্দেজের সামাজিক-আর্থনীতিক মর্মটা ছিল ভারতীয় শহরগুলির উপর সামন্ত শাসকদের শুধু রাজনীতিক নয়, আর্থনীতিক আধিপত্যও বটে। তার উপর ছিল এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা: ভারতে ভূমিতে রাষ্ট্রীয় সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা ছিল শহরের ভূমিতেও। বণিক, কারিগর এবং অন্যান্যের ঘর-বাড়ি কিংবা কর্মশালা থাকত যেসব জমিতে সেগুলো বাবত তারা খাজনা দিত জমিদারদের। তাই ভারতীয় শহরের মাটি কিংবা হাওয়া কোনটাই বাসিন্দাদের নিষ্কৃতি দিত না সামন্ত জমিদারদের স্বেচ্ছাচার থেকে, যে-নিষ্কৃতি পেত পশ্চিম-ইউরোপীয় শহরবাসীরা।

স্বভাবতই, বণিক আর কারিগরদের স্থানীয় সম্প্রদায়ের মোড়লকে প্রায়ই নিয়োগ করত সংশ্লিষ্ট শহরের শাসক সামন্ত নায়ক। 'আইন-ই-আকবরি'র একটা আগ্রহজনক অংশে দেখা যায় -- কারিগর সম্প্রদায়ের মোড়লকে আর যারা কারিগরদের ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করত এবং সমস্ত লেনদেন সম্বন্ধে শহর কর্তৃপক্ষের কাছে দৈনিক রিপোর্ট দাখিল করত তাদের নিয়োগ করার ক্ষমতা ছিল শহরের মোগল

শাসকের।* কারিগরদের কাজ-কারবারের উপর এমন নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা থাকাতেই দেখা যায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দয়ার প্রতি কারিগরদের আর্থনীতিক মুখাপেক্ষিতা ছিল কত প্রবল। এমন নিয়ন্ত্রণ স্বভাবতই অসম্ভব ছিল ইউরোপীয় গিল্ডের বেলায়, এই গিল্ডের মজবুত বাজারী সংযোগ ছিল শহরবাসী আর সাধারণ কৃষক খদ্দেরদের সঙ্গে, আর সেটার শোষণ চলত গ্রামাঞ্চলে।

গুজরাটে স্থানীয় কারিগর সম্প্রদায়গুলির মোড়লেরা কারিগরদের কাছ থেকে কর আদায় ক'রে সেটা রাজকোষে দাখিল করত নিজেরাই কিংবা বণিকদের মোড়লদের মারফত, – শহরের সমস্ত বণিক আর কারিগরদের কর দাখিল করার ভার থাকত এই মোড়লদের উপর। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিপত্তিশালী কর্মকর্তার নিজের ব্যবহারের জন্যে কোন-না-কোন জিনিস কারিগর সম্প্রদায়ের খরচে তৈরি করে দেবার জন্যে ঐ সম্প্রদায়ের মোড়লকে হুকুম করার ক্ষমতা ছিল ঐ কর্মকর্তার। তার প্রতিদানে কর্মকর্তাটি ঐ সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করত। অর্থাৎ কিনা, নিজেদেরই শহরে নিজেদের রাজনীতিক অক্ষমতা বাবত দাম দিতে হত কারিগরদের।

তবে বণিক আর কারিগরদের সম্প্রদায়গুলির নিজেদেরই একাধিকার থাকত সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য কিংবা কারিগরি ক্ষেত্রে। সেগুলোতে ঢুকতে পারত শুধু কোন নির্দিষ্ট বর্ণের মানুষ, আর শহরে নবাগত প্রত্যেককে ভরতি ফী দিতে হত মোটা টাকা (আহমদাবাদে – ২০ থেকে ৫০০ টাকা)। কোন বৃত্তিতে নিযুক্ত করার ব্যাপারে বর্ণগত একাধিকার থাকার ফলে শিক্ষানবিস ঢোকানোটা অনাবশ্যক হয়ে পড়ে, যে-শিক্ষানবিসি প্রচলিত ছিল পশ্চিম ইউরোপে। তরুণ কারিগর তালিম পেত বাপের কর্মশালায়, তালিম-কাল শেষ হলে সে সম্প্রদায়ের লোকদের জন্যে ভোজ দিত। কাজের চিরাগত প্রণালী আর উৎপাদের মান যাতে বজায় থাকে সেদিকে নজর রাখত মোড়ল।** এইভাবে, বণিক আর কারিগরদের সংগঠনগুলিতে পশ্চিম-ইউরোপীয় গিল্ডের মূল রক্ষণশীল উপাদানগুলো ছিল, কিন্তু ছিল না তার এই প্রধান প্রগতিশীল উপাদানটা:

সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে দাঁড়াবার ক্ষমতা। তবে শাসকদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বকর আচরণের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালাত কোন-কোন সম্প্রদায়। ভারতীয় মনীষী ঈশ্বর প্রকাশ দিয়েছেন তার একটা দৃষ্টান্ত: বরোদার শাসকের কথামতো কাপড়ের দাম কমাতে গররাজি হয়েছিল তন্তুবায়রা, তাদের জেলে পোরা হয়েছিল। পরে তারা শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল আহমদাবাদে। ঐ শাসককে প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে হয়েছিল, তিনি ফিরে যেতে বলেছিলেন তন্তুবায়দের। *

কতকগুলো বৃত্তি এবং স্থানীয় বাজারের চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ, আর শহুরে ব্যবস্থার সঙ্গে হস্তশিল্প সম্প্রদায়গুলির সংযোগ পর্যাপ্ত. ছিল না, সেটা তাদের স্থানপরিবর্তনের সহায়ক হয়েছিল। স্থানীয় শাসকদের নিদারুণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং জরুরী সামরিক পরিস্থিতিতে সেটা হয়েছিল তাদের আত্মরক্ষার একটা উপায়ের মতো। আঠার শতকের গোড়ার দিকে গুজরাটে যে-পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল সে-সম্বন্ধে কে. এন. রায়চৌধুরী এই বিবরণ দেন: 'ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যে যে রাজনীতিক অনিরাপত্তা বেড়ে চলছিল শতাব্দীর গোড়ার দিককার বছরগুলো থেকে সেটা সহসা অত্যন্ত সঙ্গিন হয়ে ওঠার ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। যেমন, অত আগে, সেই ১৭১২ সালে গুজরাটে কোম্পানির দালাল অভিযোগ করছিল যে, মারাঠা দঙ্গলগুলো ঘুরে-ঘুরে লুটতরাজ চালিয়ে ব্রোচের নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে ছিটকাপড় ছাপার কারিগরদের অস্থির করে তুলছিল অন 'রত। ১৭২৫ সালে এই কাপড়-ছাপা কারিগরেরা আক্রমণকারী সৈন্যদের এড়াবার জন্যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পালিয়ে বেড়াত; তারা সঙ্গে নিত অসম্পূর্ণ কাপড়গুলো। ১৭৩৪ সাল নাগাত সুরাটের দরবার লক্ষ্য করেছিল দলে-দলে তন্তুবায়রা আহমদাবাদ থেকে যাচ্ছিল সুরাটের দিকে, আর তিন বছর পরে কোম্পানি ৪৮টা পরিবার সংগ্রহ করতে পেরেছিল বোম্বাইয়ের জন্যে। সতর শতকে সুরাটের নিজস্ব তাঁত-বোনা শিল্প ছিল সামান্যই, কিন্তু আলোচ্য কালপর্যায়ের শেষের দিকে সুরাটে ছিল বেশকিছু ম্যানুফ্যাকচারিং উৎপাদন। এটা স্পষ্ট যে, ভারতীয় শ্রমিকেরা ভিটামাটির সঙ্গে বাঁধা বলে

যে-কথা বলা হয় সেটা শুধু বাড়-বাড়ন্তের সময় প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য।'*

মোগল আমলের ভারতে বর্ণভেদ আর সেটার নিয়ম-বিধি আর্থনীতিক অগ্রগতির পথে অনতিক্রম্য বাধা ছিল, এই মর্মে প্রচলিত পশ্চিমী ধারণার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে আই. হাবিব তুলে ধরেছেন নিম্নলিখিত তথ্যগুলি: এক, অন্যান্য বৃত্তির বর্ণ থেকে (এক্ষেত্রে কৃষক এবং সম্প্রদায়ের চাকর-বাকরদের মধ্য থেকে) মেহনতীজন সংগ্রহ করা হত অন্যান্য বৃত্তিতে কাজের জন্যে, যেমন, কর্ণাটকে হীরকের খনির কাজে; দুই, বর্ণগুলো তাদের বিশেষ ধরনের কাজ বদলাতে পারত (আঠার শতকে মহারাষ্ট্রে দরজিরা ধরেছিল কাপড় ছোপানোর কাজ); তিন, কোন নির্দিষ্ট বৃত্তি ধরে কাজ চালাবার উপর বাধা-নিষেধ অনেক সময়ে নিষিদ্ধ করত মোগল কর্তৃপক্ষ (যে-কেউ তাঁত-বোনা, কশিদা কিংবা বোনার কাজ করতে চাইলে তাকে সেটা করতে দেবার জন্যে আহমদাবাদের কর্তৃপক্ষকে হুকুম করেছিলেন আউরঙ্গজেব)।

শেষের দৃষ্টান্তটার ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে উলটো দিক থেকেও: সেটা ছিল হিন্দুদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্যে মুসলিম শাসকের চেষ্টা; তেমনি হাবিবের এই বক্তব্যটাও অনস্বীকার্য: উৎপাদনের কোন শাখায় মনুষ্য-শক্তির ঘাটতি ছিল বলে কোন উদাহরণ জানা নেই, উলটে সর্বত্র হস্তশিল্পের মনুষ্য-শক্তির প্রাচুর্য ছিল বলেই প্রতিপন্ন হয় আকরগুলি থেকে, এটা হল এই মনুষ্য-শক্তির যথেষ্ট সচলতারই নির্দেশক। হাবিব বলেন, অভিজাতকুলের জবর-আদায় এবং কমিয়ে দাম ধার্য করাই ছিল হস্তশিল্পে অবাধে শ্রম সরবরাহের পথে একমাত্র বাধা।**

১৮৯২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পুনা-তে দ্বিতীয় শিল্প সম্মেলনে বক্তৃতা করেছিলেন বাল গঙ্গধের তিলক, – ইউরোপীয় গিল্ডের সেটার সদস্যদের নিরাপত্তাবিধানের এই ক্ষমতার কথাটাই নিশ্চয়ই তাঁর মনে ছিল যখন তিনি বলেছিলেন: 'প্রাচীন ইউরোপীয় গিল্ডগুলির ইতিহাস থেকে আরও দেখা যায় যে, যদিও গিল্ড আর বর্ণের উদ্ভবস্থল একই বলে প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য করা যায় না, তবু এই দু'রকমের প্রথা-প্রতিষ্ঠানে

বহু উপাদান অভিন্ন।' তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, ইউরোপীয় প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদির বিকাশ স্পষ্ট নির্দেশ করছে 'কোন্ ধারায় আমাদের সংস্কৃত এবং পরিবর্তিত করতে হবে আমাদের বর্ণভেদ ব্যবস্থাটাকে — যদি আমরা দেশের মেহনতী শ্রেণীগুলির অবস্থার উন্নতি ঘটাতে চাই বাস্তবিকই'।*

সামন্ততান্ত্রিক ভারতে কারিগরদের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে সবচেয়ে আগ্রহজনক বিবরণগুলোর একটা পাওয়া যায় আর. ওর্ম-এর 'Historical Fragments of the Moghul Empire'-এ। ওর্ম-এর জন্ম হয় ভারতে, সেখানেই কাটে তাঁর জীবনের বেশির ভাগটা, তাই আঠার শতকের শেষের দিককার ভারত সম্বন্ধে তাঁর বিবরণ নিশ্চয়ই খুবই নির্ভরযোগ্য, কিন্তু তাঁর রচনায় আর্থনীতিক অংশগুলি বিভিন্ন অঞ্চল কিংবা শহরগুলিতে কারিগরদের ক্রিয়াকলাপের মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিস্থিতি থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। প্রথমত, ওর্ম বলেন, কারিগর ব্যক্তি হিসেবে স্বাধীন ছিল না বলে তার পুঁজি সঞ্চয়ন আর উৎপাদন সম্প্রসারণের সুযোগ ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। তিনি নিশ্চয় করে বলেন: 'মিস্ত্রি বা কারিগর কাজ করবে জীবনযাত্রার জন্যে যা অত্যাবশ্যক শুধু সেই পরিমাণে। বিশিষ্ট হয়ে ওঠায় তার মহা আতঙ্ক। সে নিজ বৃত্তিতে অন্যান্যের চেয়ে একটু বেশি টাকা করেছে বলে বেশি নাম হলে ঐ টাকা কেড়ে নেওয়া হবে। কারিগরিতে উৎকর্ষের জন্যে সে বিশিষ্ট হলে কর্তৃপক্ষের কেউ তাকে ধরে নিয়ে দিন-রাত কাজ করতে বাধ্য করবে, তাতে কাজের শর্তগুলো সে স্বাধীনভাবে কাজ করলে সাধারণত যা তার চেয়ে অনেক বেশি কঠোর। এইভাবে নষ্ট হয় পাল্লা দেবার সমস্ত আগ্রহ; সর্বত্র বিদ্যমান যে ভয়, যেটা ছাড়া স্বৈরশক্তির শাসন আর বজায় থাকে না, সেটার মনোবল-ভাঙা ক্রিয়াফলটাকে এশীয় সাম্রাজ্যটার যাবতীয় বিলাসব্যসন নিবারণ করতে পারে নি জাঁকজমক আর আড়ম্বরের প্রতি সেটার আসক্তি দিয়ে। অল্প কয়েক বছরের কিছুটা অনুগ্র শাসনের ফলে কোন উন্নতি হলে তারপর প্রচলিত শাসন-প্রণালী এসে সবকিছু একেবারে লোপ করে দেয়।'**

বিভিন্ন শহরের হস্তশিল্পের মধ্যে কারবারী সংযোগ-সংক্রান্ত উপাত্ত থেকে মনে হয় আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পর্যন্ত কারিগরেরা কাজ করে চলছিল রাজদরবার, ফৌজ আর অভিজাতদের জন্যে, আর বাইরের বাজারের জন্যেও (প্রধানত বড়রকমের সামরিক-প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলোতে)। বাজার সম্বন্ধে এইরকমের দিকস্থিতি ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙ্গালোরের, সেখানে তন্তুবায়রা মৈসুরের সুলতানের রাজদরবারের ফরমাশ থেকে বঞ্চিত হবার পরে শুধু বাইরের বাজারের জন্যে উৎপাদন করে জীবনধারণ করতে পেরেছিল। বুকানন বলেন, মাল চালান করার জন্যে বাইরের কোন বাজার পাওয়া না গেলে বাঙ্গালোরে উৎপন্ন জিনিসের উৎকর্ষ হায়দারের আমলে যেমন হয়েছিল তেমনটা হবার আশা বড় একটা ছিল না।*

সতর আর আঠার শতকে মহারাষ্ট্রে, বিশেষত সেটার রাজধানী পুনা-তে হস্তশিল্পের উন্নয়ন এবং বহুমুখ করাটা হল রাজদরবার, আমলাবর্গ আর ফৌজের প্রয়োজন অনুসারে যোগানদার শহুরে অর্থনীতি গড়ে ওঠার একটা উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। মারাঠা জঙ্গী সর্দারেরা বিজিত অঞ্চলগুলোতে যে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ লুটে নিয়েছিল সেটা আর স্থানীয় কৃষকদের উপর প্রবলতর শোষণ স্থানীয় নায়ক আর সরকারের কাছ থেকে আসা ফরমাশের প্রসার ঘটাতে সহায়ক হয়েছিল, তারা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করত সৈনিক, আমলা আর রাজসভাসদ্দের ভরণপোষণ বাবত। আঠার শতকে সবকারের এবং মারাঠা সামন্ত সর্দারদের নিজেদেরও বেড়ে-চলা ফরমাশের কল্যাণে মহারাষ্ট্রে শহুরে হস্তশিল্পের বাড়-বাড়ন্ত হয়েছিল। সরকারের ফরমাশ দেবার একটা বিশেষ প্রণালী ছিল, আর কোন-কোন জিনিস তৈরি করার একাধিকার সরকার দিত বিভিন্ন ব্যক্তিকে, এইভাবে উৎপাদনে যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল বিশেষত তাতে প্রকাশ পায় সরকারের প্রতি হস্তশিল্পগুলোর মুখাপেক্ষিতা। এইভাবে, আঠার শতকের গোড়ার দিকে রাধো নায়েক ইয়েওলা-তে রেশম উৎপাদনের একাধিকার দিয়েছিলেন শ্যামদাস বালজি নামে একজন গুজরাটী বানিয়াকে।**

বেড়ে-চলা শহরগুলোর সমস্ত প্রয়োজন পুরোপুরি মেটাতে পারত না স্থানীয় কারিগরেরা; বিহার আর অন্ধ্রদেশ থেকে ওস্তাদ তন্তুবায়রা এবং অন্যান্য কারিগরেরা মহারাষ্ট্রে, বিশেষত পুনা-তে গিয়ে বসতি করেছিল। বহিরাগত কারিগরেরা তাদের ধর্মীয়, সম্প্রদায়গত এবং বর্ণগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখত – মহারাষ্ট্রের কারিগরদের মধ্যে পৃথক-পৃথক বর্গ গড়ে তারা বসবাস করত। মারাঠা আর নবাগত উভয় কারিগরদের শহুরে সম্প্রদায়গুলি ছিল একরকমের গিল্ড সংগঠন।

আঠার শতকে পুনার শিল্পগুলিতে ক্ষেত্রগত বিশেষীকরণের কোন লক্ষণ ছিল না, কিন্তু শহরটিতে শিল্পগুলো ছিল এতই বহুলীকৃত যাতে সামরিক-প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে এই শহরের প্রয়োজন যেসব শিল্প মেটাতে পারত – এটাকে জোর দিয়ে দেখাবার জন্যে ডি. আর. গ্যাডগিল পেশোয়াদের দফতর থেকে উপাত্ত হাজির করেছেন তাঁর একটি রচনায়। * 'আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মহারাষ্ট্রের বাইরেকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পুনা-তে গিয়ে বসবাস করেছিল মুচি, কুম্ভকার, সূত্রধর, ইত্যাদি বহু কারিগর। ঐসব বৃত্তির স্থানীয় কারিগরেরাও চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের কাজ। নবাগতেরা গিয়ে স্থায়িভাবে বাস করছিল তার প্রধান কারণ এই যে, হয় যা স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির কারিগরেরা সাধারণত তৈরি করত না এমন কোন-কোন জিনিস উৎপাদনে তাদের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল, কিংবা তাদের ছিল অধিকতর দক্ষতা। একই কারিগরি ক্ষেত্রে কর্মরত সম্প্রদায়-দুটো একই কারিগরী কিংবা বৃত্তিগত পারিমেলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এমনটা নির্দেশ করার মতো তখনকার কিংবা পরবর্তী কোন তথ্য নেই।'**

বাংলার হস্তশিল্পের একটা প্রধান কেন্দ্র ঢাকায় ছিল অনেক রকমের কারিগরি, সেগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল প্রসিদ্ধ ঢাকাই মসলিন, সেটা বিক্রি হত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র। ১৭৫৩ সালে ঢাকা থেকে কাপড় রপ্তানি হয়েছিল ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার থেকে ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার আরকট (পিতলে) টাকার (তখন ছিল ৮ আরকট টাকা = ১ পাউণ্ড স্টার্লিং)।

বৃটিশ, ফরাসী আর ওলন্দাজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিগুলো এবং পৃথক-পৃথক ইউরোপীয় বণিকেরা ঢাকা থেকে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার কাপড় নিয়েছিল। ইরান এবং আরব দেশগুলির জন্যে ৫ লক্ষ টাকার জিনিস কিনেছিল আর্মেনীয় বণিকেরা, আর ইরানীরা ১ লক্ষ টাকার। উত্তর ভারতের বিভিন্ন বাজারে কারবার-করা বণিকেরা ঐ বছর ঢাকাই কাপড় কিনেছিল ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার। তাছাড়া, মোগল বাদশাহের রাজধানী দিল্লী এবং বাংলার নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদের জন্যে আলাদা করে রাখা কাপড়ের দাম ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ এবং ৩ লক্ষ টাকা; বাংলায় কারবার-করা ভারতীয় বণিকেরা ২-৩ লক্ষ টাকার কাপড় কিনেছিল, আর দেড় লাখ টাকার কাপড়ের জন্যে ফরমাশ দিয়েছিল জগৎ শেঠেরা। *

কর্তৃপক্ষের ফরমাশের প্রতি কারিগরদের সবচেয়ে দক্ষ কারিগরদেরও (হয়ত বিশেষত এদের) মুখাপেক্ষিতার আরও একটা সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হল ঢাকার তন্তুবায়দের অবস্থাটা। 'দিল্লীতে বাদশাহী তোশাখানার জন্যে আর সুবেদারদের দরবারের জন্যে বছর-বছর বিনিযুক্ত অর্থ সবচেয়ে মিহি মসলিনের সবটাকে একায়ত্ত করে ফেলত। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি দামের কাপড় দেশী কিংবা বিদেশী বণিকদের কাছে উৎপাদকদের বিক্রি করতে দেওয়া হত না, আর এইসব সরকারী বিনিয়োগের ব্যবস্থাদির তত্ত্বাবধান করার জন্যে সেখানে থাকত একজন বিশেষ এজেণ্ট, সে আঞ্চলিক শাসক এবং সরকারী কর্মকর্তাদের থেকে স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব খাটাত ঐ কারবারে সংশ্লিষ্ট সমস্ত দালাল, তন্তুবায় আর কশিদাকারদের উপর।'** দিল্লী থেকে গিয়ে একজন আমলা তন্তুবায়দের একত্র করত একটা প্রতিষ্ঠানে, যেটার মিল ছিল মোগল কারখানার সঙ্গে, সেখানে তারা কাজ করত পাহারাদারদের তত্ত্বাবধানে।***.

কর-রাজস্বের একটা মোটা অংশ আসত তাঁত শিল্প থেকে, এটার

প্রতি কর্তৃপক্ষের আচরণ ছিল বিশেষ ধরনের, কর্তৃপক্ষের জবর-আদায় থেকে এটা রেহাই পেত সাধারণত – যা বলেছেন ওর্ম – কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্যমান ছিল উল্লিখিত অবস্থাটা। এই পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও শুধু রাজকোষের জন্যে কাজেই গণ্ডিবদ্ধ থাকতে হত সবচেয়ে দক্ষ তন্তুবায়-দের। তাই সবচেয়ে সেরা-সেরা যেসব কাপড় বাজারে পৌঁছত সেগুলোর চেয়ে দশগুন বেশি দাম পড়ত রাজদরবার আর হারেমের জন্যে ঢাকায় কেনা অতি জমকদার কাপড়গুলোর।* তাই, স্থানীয় আর উচ্চতর স্বৈর-শাসকদের দরবারে জাতদ্রব্য যোগান দেবার মস্ত বিশেষ সুবিধা পাবার জন্যে স্বাধীন বাজারী সংযোগ খোয়াবার দাম দিতে হত তন্তুবায়কে।

অবাধ বাজারী সম্পর্ক ছিল না বলে, আর কর্তৃপক্ষের কঠোর তত্ত্বাবধানের দরুন ঢাকায় তন্তুবায়দের কারবারী উদ্যমের প্রসার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে দক্ষ কারিগরকেও খুবই পরিমিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হত। ঢাকায় কোম্পানির বাণিজ্য প্রতিনিধি জন টেলার ১৮০০ সালের জন্যে তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন, মোগল দরবারের জন্যে ২৫০ টাকা দামের একখানা সবচেয়ে সরেস মসলিন তৈরি করতে দু'জন সহকারী নিয়ে একজন তন্তুবায়কে কাজ করতে হত এক বছর ধরে। সুতোর দাম ছিল ১০০ টাকা। এইভাবে, তন্তুবায়দের ঠকানো না হলে তাদের রোজগার হত বছরে ১৫০ টাকা, তাতে ওস্তাদ তন্তুবায় পেত মাসে ৮ টাকা, আর তার সহকারী দু'জন মাসে ২ টাকা করে।** তবে এতে বিবেচনায় থাকে নি এই তথ্যটা: তন্তুবায়দের সুতো কেনা আর দিন গুজরান করা নিশ্চয়ই সম্ভব হত না ধার-দেনা ছাড়া। ঋণ বাবত সুদ আর ঋণ মেটাবার সময়কার কদাচারের কথা (তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে) বিবেচনায় থাকলে দেখা যায় তন্তুবায়দের, বিশেষত ওস্তাদ তন্তুবায়ের রোজগার ছিল আরও অনেক কম। ওদিকে, আঠার শতকে ঢাকায় চাল ছিল টাকায় তিন মন। একজন সমসাময়িক গবেষক এই সিদ্ধান্ত করেছেন: মাসে ২ টাকা রোজগারের মেহনতীজনের পাঁচ-জনের পরিবারের খোরাক জোটানো কঠিন ছিল।*** বাস্তবিকই, কারবারী

———————

উদ্যোগের উপযোগী সঞ্চয়নের ভিত্তি হতে পারত না ওস্তাদ তন্তুবায়ের রোজগার।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ধাতু দিয়ে জিনিস তৈরি করার ফলে বিখ্যাত মুঙ্গেরে লোহা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা হত ফৌজ আর ধনী খাজনা-প্রাপ্তাদের জন্যেও। এইসব জিনিস সম্বন্ধে বুকাননের তালিকায় আছে: 'দোনলা বন্দুক, রাইফেল, একনলা পিস্তল, ছর্‌রা বন্দুক, গাদা বন্দুক আর ব্লাণ্ডারবাস বন্দুক, মামুলি আর খোদাই-করা ম্যাচলক বন্দুক, পিস্তল, তরোয়াল, বর্শা আর গাদন-কাঠি।' তারপর আছে সচ্ছল পরিবারের জন্যে গৃহস্থালির জিনিসপত্র: কড়াই, চাটু, ভাজনাখোলা, চুল্লির ঝাঁঝরি, তোলা উনুন, নানা রকমের তালা, হাতা, চিমটা, সাঁড়াশি, ছুরি আর কাঁটা, কাঁচি, ইত্যাদি। তারপর আছে ঘোড়ার সাজের বিভিন্ন জিনিস: নাল, রেকাব, ঘোড়সওয়ারের জুতোর কাঁটা, খর্‌রা, ইত্যাদি, তাছাড়া পালকি অবধি। এইসব সরঞ্জাম ব্যবহার করত অভিজাতেরা কিংবা বিশেষ-সুবিধাভোগী ঘোড়সওয়ার সৈনিকেরা। কৃষি সরঞ্জামের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে শুধু এইগুলো: 'দাঁত-ছাড়া কাস্তে', খুনচি আর ঘাস-কাটা বড় কাস্তে। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে আছে – খুর, মাচির কাঁটা সমেত হরেক রকমের পেরেক, ছুঁচ আর বোনার কাঁটা।*

এইসব জিনিসের দামও বুকানন দিয়েছেন। আগ্নেয়াস্ত্র – ১০ থেকে ৫১ টাকা, তরোয়াল – ১ থেকে ৩ টাকা, রান্নাঘরের বিশেষ ধরনের চুল্লি – ১৫ টাকা, ঘর-তাপনের চুল্লি – ১২৫ টাকা, এক ডজন খাবার ছুরি-কাঁটা – ৪ থেকে ৬ টাকা। কৃষকের কাস্তের দাম অনেক কম – ১ থেকে ৪ আনা, ১০০টা পেরেক – ৩ আনা, ইত্যাদি। এইভাবে, মুঙ্গেরে উৎপন্ন জিনিসগুলোর মধ্যে রকম আর দামের দিক থেকে প্রধান ছিল অস্ত্রশস্ত্র আর ধনীদের গৃহস্থালির জিনিস। এটা নিশ্চয়ই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বিভিন্ন জিনিসের তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে উল্লিখিত বিবরণে অস্ত্রশস্ত্র আর সুশোভন জিনিসপত্রই বেছে নেওয়া হয়েছে, কেননা উঁচু মানের কারিগরী দক্ষতার জন্যে সেগুলো বিদেশীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। তবে এইরকমের জিনিসের জন্যে চাহিদা কমে যাবার পরে মুঙ্গেরের অবনতি ঘটার ব্যাপারটা থেকে সপ্রমাণ হয় যে, সেখানে মোট

উৎপাদনে সেগুলোই ছিল প্রধান। অভিজাতদের ভোগ-ব্যবহারের কমতিটাকে পূরণ করতে পারে নি সাধারণ মানুষ কৃষক আর কারিগরদের চাহিদামতো তৈরি-করা জিনিসপত্র। বুকানন স্পষ্টই বলেছেন, 'প্রধান-প্রধান জিনিস হল নানা রকমের আগ্নেয়াস্ত্র, যার বেশির ভাগ বিক্রি হয় পর্যটকদের কাছে, যারা সেগুলোকে নিয়ে যায় পশ্চিমে, আর তাছাড়া চায়ের কেটলি আর রসুই-চাটু, যেগুলোকে চালান দেওয়া হয় কলকাতায়।'*

মুঙ্গেরে উৎপাদনের সংগঠন আর পরিসর সম্বন্ধে ধারণা করা যায় নিম্নলিখিত উপাত্তের সাহায্যে। কামারশালা ছিল ৪০টা, প্রত্যেকটায় কাজ করত দু'-তিন জন, এরা সাধারণত ছিল অংশীদার কিংবা একই পরিবারের মানুষ। কেউ কোন মস্ত ফরমাশ পেলে সে সেটা ভাগাভাগি করে নিত প্রতিবেশীদের সঙ্গে। দক্ষতা অনুসারে এক-একজন মেহনতী পেত দিনে ২-৩ আনা, অর্থাৎ মাসে ৩-৪ টাকা (যদি সে পুরো কাজ পেত সারা মাস ধরে, সেটা হত কিনা তাতে সন্দেহ আছে)। দেখা যায়, সুবিদিত এই ধাতব জিনিস উৎপাদনের কেন্দ্রে থেকে গিয়েছিল এক-শ'র সামান্য বেশি কারিগর, তাদের জীবনযাত্রা ছিল খুবই সাদাসিধে, তাতে সঞ্চয়নের কোন সম্ভাবনা ছিল না আদৌ। কারিগরদের সংখ্যাটা ছিল হয়ত আরও কিছুটা বেশি, কেননা ধাতু নিয়ে কাজ করত কর্মকাররা ছাড়াও টিন-মিস্ত্রি, সেকরা, খোদকার এবং অন্যান্যেরা। কিন্তু সেটা যা-ই হোক, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মুঙ্গের অনুরূপ ইউরোপীয় কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে আর পাল্লা দিতে পারছিল না – মেহনতীজনের সংখ্যার দিক থেকেও না, আর প্রযুক্তি সরঞ্জাম এবং উৎপাদনের পরিমাণের তো কথাই ওঠে না।

ক্ষুদ্রায়তনে পণ্য-উৎপাদন এবং হস্তশিল্পে বিভিন্ন টুকরো-টাকরা ক্ষেত্র

সরাসরি কিংবা পরোক্ষে যেসব কারিগর জীবিকানির্বাহ করত রূপান্তরিত খাজনা দিয়ে তারা ছাড়াও ছিল সম্প্রদায়-বহির্ভূত কারিগরেরা, যারা উৎপাদ-বিনিময় কিংবা পণ্য-বিনিময়ের ভিত্তিতে কাজ করত স্বাধীনভাবে। এরা সাধারণত বর্গবদ্ধ হত বৃত্তি আর সম্প্রদায় অনুসারে।

কিন্তু মনে হয় এই নিয়মের ব্যতিক্রমও ছিল। যেমন, কোঠার নামে একটি আগ্রহজনক পার্বত্য কারিগর সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন জে. হাউ।* যা জানা আছে তার মধ্যে একমাত্র এই সম্প্রদায়টিই কাজ করত কয়েকটা শাখায়: লোহা আর ইস্পাত উৎপাদন এবং তা দিয়ে জিনিস তৈরি করা; সোনা, রুপো আর কাঠের জিনিসপত্র তৈরি করা; মৃৎশিল্প আর চামড়া পাকা করা। এরা কৃষিকাজও করত। তাদের স্থানীয় আকরিক থেকে লোহা উৎপাদনের প্রণালী বিচার-বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিল একজন জেলা-কলেক্টর, কিন্তু সেটা বাতিল করে দিয়ে কোঠার মোড়লেরা আপত্তির কারণ হিসেবে বলেছিল, 'যারা পাহাড়ে থেকেছে এত স্বল্প সময় এমনসব বিদেশীর পক্ষে তাদের (কোঠারদের। – ভ. প.) কাছ থেকে এমন জিনিস পাওয়া অসম্ভব যা তারা কিংবা তাদের পূর্বপুরুষেরা কেউই আবিষ্কার করতে পারে নি কখনও'।** এইরকমের কারিগর গোষ্ঠী তো নিশ্চয়ই অতীত থেকে একটা অবশেষ।

আঠার শতকে কোন-কোন শহরে কিছু-কিছু কারুশিল্প ছিল যেগুলো নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত জিনিসের যোগান দিত। শহুরে কারিগরেরা বাংলায় আর বিহারে মোটা কাপড়ের বেশ তেজী কারবার চালাত, সে-সম্বন্ধে তথ্য আছে। আঠার শতকে ঢাকা অঞ্চলে বিভিন্ন শহরে আর কারিগর বসতিতে কাপড় তৈরি করা হত বহু রকমের – স্থানীয় প্রধানদের জানানার (অন্তঃপুরের) মেয়েদের ব্যবহৃত সবচেয়ে মিহি মসলিন থেকে গরিব রায়তদের পরনের মোটা কাপড় অবধি।*** সস্তা মোটা কাপড় তৈরি করার জন্যে বিদিত পাঁচটা পূর্ববঙ্গীয় শহরের নাম দিয়েছেন টেলার। ১৬৭৫ থেকে ১৬৮০ সাল অবধি ভারতে ছিলেন ওলন্দাজ বণিক এস. মাস্টের, তিনি বলেন, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটা বিভাগ মালদা থেকে ঢাকায় পাঠিয়েছিল ৩ লক্ষ টাকার

কাপড় – তার মধ্যে রঙীন রেশমী কাপড় ছাড়াও ছিল অপেক্ষাকৃত মোটা রকমের কাপড়ও। মোটামুটি অত টাকার কাপড় কিনেছিল রাজমহল, মুর্শিদাবাদ এবং গঙ্গানদী বরাবর অন্যান্য জায়গার, অর্থাৎ খাস বাংলার খুদে ব্যাপারীরা।* বিহারে সবচেয়ে বড় কারিগরি কেন্দ্র পাটনা সুবিদিত ছিল পশমী কম্বল তৈরি করার জন্যে: বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত এই কম্বলের চাহিদা ছিল বাংলায়। তবে পাটনা থেকে কম্বলের চালান অনেকটা কমে গিয়েছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে।

মৈসূরে কিছুটা বড় শহর বেল্লারিতে প্রধান হস্তশিল্প ছিল সুতী কাপড় বোনার, সেখানে তন্তুবায়রা স্থানীয় প্রয়োজন মেটাত, আর কাপড় চালানও দিত। সাপ্তাহিক হাটে মোটা কাপড় বিক্রি হত। বেল্লারি এবং কাছাকাছি অঞ্চলগুলোর মধ্যে মজবুত বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল, সেটা খুবই স্পষ্ট দেখা যায় এই ঘটনাটা থেকে: ইঙ্গো-মৈসূর যুদ্ধের সময়ে মৈসূরের শাসক টিপু সুলতান ইংরেজদের দখল-করা দক্ষিণ কর্ণাটকের সঙ্গে বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে দিলে বেল্লারি থেকে সেখানে সস্তা কাপড় যেত চোরাই চালানে।** সর্বসাধারণের ব্যবহৃত কাপড় তৈরি হত মৈসূরের অন্যান্য শহরেও, যেমন হস্তশিল্পের ছোট শহর সিঙ্গাপুরে, সেখানে বোনা হত দামী আর সস্তা দু'রকমেরই কাপড়, তার একাংশ চালান দেওয়া হত বাঙ্গালোরে।

দক্ষিণ ভারতে বহু দূর-দূর অঞ্চলগুলোর মধ্যেও কী পরিমাণ বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল সেটা দেখা যায় এই তথ্যটা থেকে: বাঙ্গালোর শহর থেকে শত-শত কিলোমিটার দূরবর্তী বেল্লারি, আডোনি, হুবলি, গুটি এবং অন্যান্য জায়গার বণিকদের স্থায়ী এজেণ্ট থাকত ঐ শহরে। এই এজেণ্টরা যেসব জিনিস বিক্রি করত সেগুলোর মধ্যে থাকত তুলো, মোটা সুতো, কম্বল, গম। তার বিনিময়ে বাঙ্গালোর দিত ছোপানো সুতী কাপড়। প্রতি-বছর বাঙ্গালোরে যেত মোট ১৫০০ গাড়িবোঝাই তুলো, ৫০ গাড়ি তুলোর সুতো আর ২৩০ গাড়ি কাঁচা রেশম।*** শহর আর

গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হতে থাকা এবং এই দুয়ের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার সম্বন্ধে কিছু-কিছু উপাত্ত রয়েছে বাংলা আর বিহার সম্পর্কেও।

এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভোগ্য দ্রব্য-সামগ্রীর ছোট-ছোট স্থানীয় বাজার মিলে-মিশে কোন বৃহৎ অঞ্চলের (যেমন বাংলার কিংবা মৈসুরের) সাধারণ বাজারে পরিণত হবার বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিয়েছিল আঠার শতকে। যদিও আঠার শতকে ভারতে বাণিজ্যে প্রধানত খাজনা-ভোগীদের এবং তাদের যোগানদারদের প্রয়োজন মেটানোতেই গণ্ডিবদ্ধ ছিল, তবু সর্বসাধারণের ব্যবহৃত কোন-কোন জিনিসের বিভিন্ন বাজার গড়ে ওঠাতে প্রকাশ পায় শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শ্রমবিভাগের মাত্রাটা।

পাইকারী বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যরাশির বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে যা বলা হল সেটা এবং পরবর্তী উপাত্ত থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কোন বিস্তৃত পরিসরে পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভবের জন্যে ঐ মাত্রাটা পর্যাপ্ত নয়। চাহিদা নিয়মিত ছিল না বলে কারিগরদের প্রায়ই কাজ না করে বসে থাকতে হত অনেক সময় ধরে। কোল্‌ব্রুক তাঁর 'Remarks on the Husbandry and Internal Commerce of Bengal'-এ বলেছেন, আঠার শতকের শেষের দিকে ভারতীয় কারিগরেরা 'বাজারের জন্যে কিংবা বাজারের চাহিদার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে না পেরে চালাতে পারত শুধু তার নিয়মিত কাজ যতটা তখনকার মতো দরকার তার প্রতিবেশীদের প্রয়োজন অনুসারে। বিরতিগুলোতে তাকে লাগতে হয় অন্য কোন কাজে, যা তখন মেলে'।*

শহরে হস্তশিল্পের আর্থনীতিক সংগঠনের বিশেষত্বগুলো বুঝতে হলে উৎপাদনে বণিকের পুঁজির ভূমিকা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং শিল্পগত পুঁজি গড়ে ওঠার প্রারম্ভিক লক্ষণগুলোকে নির্দেশ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মোগল আমলে ভারতে ছিল কৃষি-বহির্ভূত বিভিন্ন উৎপাদের বড়-বড় শহুরে বাজার, বৃত্তিগত বিশেষীকরণের ভিত্তিতে শ্রমবিভাগ এবং দক্ষ লোকবলের কমি নয় বরং প্রাচুর্য – এইসব ব্যাপার লক্ষ্য করে আই. হাবিব স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন এই পরিস্থিতিতে উৎপাদনের

সংগঠন কতটা এগিয়েছিল পুঁজিতান্ত্রিক কিংবা আধা-পুঁজিতান্ত্রিক ধরন উদ্ভবের দিকে। আমি যা আগেই বলেছি – আপসোসের কথা, গ্রামাঞ্চল আর কৃষিকাজের জন্যে সরবরাহ করত উৎপাদনের যেসব শাখা সে-গুলোকে তিনি বিবেচনায় ধরেন নি।

শহুরে কারিগরদের হাবিব ভাগ করেছেন দুটো বর্গে: যেসব কারিগর তাদের উৎপাদ বাজারে বিক্রি হওয়া অবধি সেটার মালিক তারা প্রথম বর্গে; আর দ্বিতীয় বর্গে সেইসব কারিগর যারা উৎপাদন চালাত বণিক-দের কাছ থেকে দাদন নিয়ে, বিশেষত যেক্ষেত্রে তাদের জিনিস বিক্রি হত দূরবর্তী এলাকায়। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল দামী হলে বণিক দিত জিনিসটাই, আর সস্তা কাঁচামাল কেনার জন্যে দাদন দিত নগদ টাকা।

বণ্টন-ব্যবস্থার অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের উৎপাদন-সংগঠন ছাড়াও ছিল কারখানায় উৎপাদনের সঙ্গে মানানসই কোন-কোন আকার, – হাবিব এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন বৃহদায়তনের নির্মাণকাজ, জাহাজ-নির্মাণ, হীরক খনির কাজ আর পটাশ উৎপাদন। তবে তিনি আরও বলেছেন, এগুলোকে ঠিক-ঠিক পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সংস্থা হিসেবে ধরা যায় না, কেননা বণিকেরা বড়রকমের উদ্যোগ-সংগঠক হলেও উৎপাদ-নের এইসব শাখায় ছিল না কোন বিশেষিত বৃত্তি কিংবা সরঞ্জাম-সাকল্য।

দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কারখানাগুলো প্রসঙ্গে হাবিব অনুমান করেন সেগুলোতে কারিগরেরা মজুরি-শ্রমিক হিসেবে কাজ করলেও তারাই থেকে গিয়েছিল হাতিয়ারের মালিক; তাছাড়া, কারখানার ভিতরে বিস্তারিত শ্রমবিভাগ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট-নির্দিষ্ট তথ্য নেই, কেননা উৎপন্ন জিনিস (বিলাসদ্রব্য) বাজারে না গিয়ে সরাসরি যেত বাদশাহ এবং তাঁর পার্শ্বচরদের ব্যবহারের জন্যে। হাবিব ধরে নিয়েছেন তার ফলে ঐ কারখানার আর্থনীতিক গুরুত্ব কমে যায় স্বভাবতই, আর তার সঙ্গে আমি বলি, তার ফলে এগুলোকে পুঁজিতান্ত্রিক সংস্থা হিসেবে গণ্য করা যায় না।

আলাদা-আলাদা বণিকদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা বড় একটা বলা হয় নি আকরগুলিতে, এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় সেগুলো ছিল ছোট-ছোট। মজুরি-শ্রম খাটানো ছোট-ছোট প্রতিষ্ঠান থাকলেও হাবিব

মনে করেন, মেহনতীদের মধ্যে কাঁচামাল বণ্টনের ব্যবস্থাটা ছিল মোগল আমলের ভারতে হস্তশিল্প পণ্য-উৎপাদনের বিশেষক আকার, কেননা তাতে সুবিধে ছিল এই যে, কারিগরকেই শুধু নয়, তার পরিবারের লোকদেরও শোষণের আওতায় নেওয়া সম্ভব হত। যেখানে মালমশলা এত বেশি দামী ছিল যাতে তা কারিগরদের মধ্যে বণ্টন করা যেত না, কিংবা যেখানে উৎপাদন-প্রক্রিয়াটা ছিল স্বল্পকালের, শুধু সেইসব ক্ষেত্রেই কারখানা বসানো ছিল সুবিধাজনক।*

এইসব সাধারণ বিচার-বিবেচনার সঙ্গে অন্যান্য সূত্রে পাওয়া তথ্য সংযোজিত করা যেতে পারে। আঠার শতকের সপ্তম দশকে বাংলায় ছিলেন ওলন্দাজ বণিক ডাব্লিউ. বোল্‌ট্‌স; তিনি লিখেছেন, 'মোগল শাসনের আমলে, এমনকি নবাব আলিবর্দি খানের (১৭৪০-১৭৫৬ সালে বাংলার নবাব। – ভ. প.) আমলেও তাঁতিরা জিনিস তৈরি করত অবাধে, কোন উৎপীড়ন ছাড়াই; Tanty বা তন্তুবায় সম্প্রদায়ের সুনামওয়ালা পরিবারগুলি জিনিস তৈরি করতে নিয়োগ করত নিজেদের পুঁজি, সেই জিনিস তারা অবাধে বিক্রি করত নিজেদের জন্যে – এটা তখন প্রচলিত ছিল সাধারণভাবে।' এর পরে বোল্‌ট্‌স এই দৃষ্টান্তটার উল্লেখ করেছেন: নবাবের রাজত্বকালে জনৈক ইংরেজ বণিক ঢাকায় তার বাড়ির দরজায় ৮০০খানা মসলিন কিনেছিল তন্তুবায়দের কাছ থেকে, তারা সেই কাপড় নিয়ে গিয়েছিল ঐ বাড়িতে।**

এর পাশাপাশি রয়েছে কতকগুলো তথ্য যার থেকে দেখা যায় শিল্পে ব্যাপারিক পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল প্রচুর পরিমাণেই। ক্ষুদ্রায়তনে স্বাধীন পণ্য-উৎপাদকের কাছ থেকে বণিকের জিনিসপত্র কেনার সবচেয়ে সহজ-সরল প্রাথমিক আকারে বণিকের পুঁজি প্রকাশ পেত ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে – এটা বহুবিস্তৃত ছিল ঢাকার মতো প্রকাণ্ড শিল্পকেন্দ্রের তাঁত-বোনার ক্ষেত্রে। ঢাকায় কোম্পানির কাপড় সংগ্রহ করার প্রণালীর বিবরণ দেন এস. মাস্টের, তিনি অনেক আগে, সতর শতকের অষ্টম দশকে বলেন, কাপড়ের ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কিছুটা বড়-বড় বণিক-দালালেরা কোম্পানির কাছ থেকে টাকা ধার করে সেটা

বাঁটোয়ারা করত তাদের পাইকারদের মধ্যে, এরা শহরে-শহরে গিয়ে দাদন দিত তন্তুবায়দের। পরে দেখান হবে অনুরূপ প্রথা বোম্বাইয়ে দেখা দিয়েছিল আঠার শতকের গোড়ার দিকে। উনিশ শতকের প্রথম দশকে সালেমে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন প্রতিনিধি কোয়েম্বাটুরের তন্তুবায়দের কাছে কাপড়ের ফরমাশ দিয়ে তাদেরকে টাকা দাদন দিত, তারা সেটা নিত সাগ্রহে, যদিও হিসাবনিকাশের সময়ে তাদের ঠকান হত প্রায়ই।*

ভারতে কারিগরদেরকে থোক-ক্রেতাদের দাদন দেবার রেওয়াজ না থাকলে বিভিন্ন ইউরোপীয় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কারখানাগুলো উল্লিখিত উপায়ে কাপড় পেতে পারত বলে বড় একটা মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আর্থনীতিক গঠন সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কতকগুলো ক্ষেত্রে কারিগরেরা দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ থাকত স্থানীয় ব্যাপারিক পুঁজির কাছে। কারিগরদের দাস বানাবার জন্যে মহাজনেরা যেসব প্রণালী অনুসারে কাজ চালাত সে-সম্বন্ধে খুবই বিস্তারিত তথ্যাদি রয়েছে মৈসূরের অর্থনীতি সম্পর্কে বুকাননের বিচার-বিশ্লেষণে।

একই কালপর্যায়-সংক্রান্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় থোক-ক্রেতা কাঁচামাল দাদন করত অন্যান্য হস্তশিল্পেও। বুকাননের সংগ্রহ-করা তথ্যাদির ভিত্তিতে নিশ্চয় করে বলা যায় — মুচি, সেকরা, কর্মকার, তেলি, ইত্যাদি কোন-কোন কারিগরদেরকে কাঁচামাল দেবার রেওয়াজ বাংলায় আর বিহারে বহুবিস্তৃত ছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। এগুলো এবং অন্যান্য তথ্য থেকে দেখা যায় আঠার শতকের শেষের দিকে আর উনিশ শতকের গোড়ায় ভারতের ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে ছিল প্রায় সমস্ত প্রধান আকারের ব্যাপারিক পুঁজি, যেটা হল সামন্ততন্ত্রের উন্নত পর্বগুলোতে হস্তশিল্পের একটা বিশেষত্ব। ভারতের হস্তশিল্পগুলিতে বিদ্যমান আর্থনীতিক সম্পর্কতন্ত্র বিচার-বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্ত আসে যে, বাংলা বিহার আর মৈসুরের হস্তশিল্পগুলিতে ব্যাপারিক পুঁজির বিদ্যমান আকারটা এমন ছিল যাতে চোটার পুঁজির সঙ্গে সমন্বয়টা ছিল নমুনাসই। দামী কাপড় তৈরি করতে গিয়ে কারিগরেরা অনেক

সময়ে কাঁচামাল কিনত ব্যাপারীর দাদন-দেওয়া টাকা দিয়েই শুধু। হস্তশিল্পে ব্যাপারিক পুঁজির এই আকারটা সর্বোচ্চ মাত্রার কাছাকাছি পৌঁছত যখন কারিগরকে কাঁচামাল দেওয়া হত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বাবত সেটা দিয়ে জিনিস তৈরি করার জন্যে।

এই সবকিছু সত্ত্বেও ব্যাপারিক পুঁজি লক্ষণীয় পরিমাণে সংশ্লিষ্ট ছিল না হস্তশিল্প উৎপাদনের সঙ্গে। ব্যাপারিক পুঁজি উৎপাদী আকার ধারণ না করেই কাজ চালাত হস্তশিল্প উৎপাদনের বাইরে, আর কারিগরদের উপর শোষণ চালাত পরিচলন ক্ষেত্রের মাধ্যমে। তাছাড়া, মজুরি দিয়ে জন খাটানোর রেওয়াজটা হস্তশিল্পে ছিল কৃষির চেয়েও কম, – কৃষিতে উৎপাদন মরসুমী বলে সময়ে-সময়ে অতিরিক্ত লোক লাগাতে হত। গ্র্যাণ্ট বলেন, আঠার শতকের শেষের দিকে বাংলায় 'পনর লক্ষ লোক খাটাতে কৃষির চেয়ে শিল্পে কম পুঁজি দরকার হত'।* এটা থেকে তো মনে হয় বার থেকে নিয়ে মনুষ্য-শক্তি নিয়োগের আপেক্ষিক পরিমাণ কৃষির চেয়ে কম ছিল স্থানীয় শিল্পে।

কাঁচা রেশম কেনাটাকে উল্লেখ করা হয়েছে পুঁজি কম লাগার একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে। 'দেশটিতে উৎপন্ন (এবং প্রধানত বিদেশে রপ্তানির জন্যে) সমস্ত কাঁচা রেশমের মূল্য মুখ্য খরচ হিসেবে ধরা যেতে পারে ৫০ লাখ; তবে রেশম-গুটি বা আদি বিক্রয়যোগ্য অবস্থায় কাঁচা মালমশলা কিনতে খরচ করা যেতে পারে ঐ টাকার বড়জোর তিরিশ ভাগের একভাগ।' তার কারণ এই যে, রেশম-গুটি সংগ্রহ করা হত বছরে তিন থেকে ছ'বার, আর প্রত্যেকবার টাকা যোগানো হত আলাদা-আলাদা করে, তাতে ব্যাপারী সম্ভবত এই চালানটা বেচে দিত আর-একবার রেশম-গুটি সংগ্রহের জন্যে আবার পুঁজি নিয়োগ করার আগে, এতে নতুন পুঁজির প্রয়োজন দূর হয়। সারা বাংলায় সরঞ্জাম আর কর্মশালার মোট মূল্য (ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশম-পাকান কর্মশালা বাদে) ১ লক্ষ টাকার বেশি ছিল না। 'কাজেই, সম্ভবত, এইরকমের উৎপাদনের সবটাতে সর্বদা নিয়োজিত বাণিজ্যের মাল মস্ত বিদেশী রপ্তানিকারীর হাতে পড়ার আগে... মোটামুটি ১ লাখ টাকার কম, এটা যুক্তিসম্মত

হিসাব।'* দেখা যাচ্ছে – কাঁচা রেশম কেনায় ব্যাপারিক পুঁজির পরিমাণ-টাকে গ্র্যাণ্ট প্রথমে স্পষ্টতই খাটো করে দেখান (সেটাকে তিনি ধরেন উৎপাদের মূল্যের তিরিশ ভাগের একভাগ), আর পরে টাকার পরিমাণটা দেন ১০ লাখ, অর্থাৎ মূল্যের পঞ্চমাংশ, যেটা নিশ্চয়ই পুঁজির প্রকৃত পরিমাণের আরও কাছাকাছি।

ব্যাপারিক পুঁজি ঐ একইভাবে তুলো শিল্পেও লাগানো হত জিনিস-টার উৎপাদন সংগঠিত করার বদলে সেটা কেনার জন্যে। আঠার শতকের শেষের দিকে বাংলায় তুলো তোলা হত বছরে ৪ লক্ষ মন; বিচি পরিষ্কার করার পরে থাকত ১২ লক্ষ টাকার ১ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার মন। (শিল্পে-ব্যবহৃত প্রধান ফসলটা থেকে পয়দা হত মোট কৃষি উৎপাদের মূল্যের ০·৫ শতাংশ মাত্র, এটা লক্ষণীয়।) আর ৬ লাখ টাকার তুলো আনা হত সুদূর সুরাট আর মির্জাপুর থেকে। এই সমস্ত তুলো কাটনিদের মধ্যে এমন ভাগে বণ্টন করা হত যা নিয়ে তারা কাজ করতে পারত এক মাস ধরে। 'যেমন শ্রমসাধ্য তেমনি সস্তা' তাদের কাজের ফলে কাঁচামালটার মূল্য বেড়ে যেত প্রায় ষোল গুণ। কিন্তু তাদের রোজগার-করা মজুরির পরিমাণ ছিল মাসে বড়জোর ৯ আনা (১৮ পেনি)।

ভারতীয় কাটনিদের অনন্য দক্ষতা সম্বন্ধে মন্তব্য করে গ্র্যাণ্ট বলেন: 'এই তথ্যটা একেবারেই আশ্চর্য মনে হতে পারত যদি তার সঙ্গে সঙ্গে এটা লক্ষ্য করা না হত যে, এই লোকসমষ্টির বেশির ভাগ হল নারী, যারা কৃষক কিংবা হস্তশিল্পীদের পরিবারের মানুষ, যারা অন্য কিছুতে আরও প্রয়োজনীয়ভাবে নিয়োজিত হতে পারত না অন্তত বছরের গরম আর বর্ষা কালে।' 'ওস্তাদ আর জার্নিম্যান' মিলিয়ে ৩ লাখ তন্তুবায় বছরে ৩০ লক্ষখানা কাপড় বুনত, সেগুলোর দাম ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে ১৫ লাখ টাকার রেশমী কাপড়; সুতো যা লাগত সেটার দাম থানগুলোর দামের অর্ধেকের বেশি হত না, আর বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ হওয়া দরকার ছিল দু'মাসের কাজের জন্যে যথেষ্ট কাঁচামাল যোগাবার উপযোগী মাত্র। তদনুসারে গ্র্যাণ্টের সিদ্ধান্ত: 'আমরা যার এত তারিফ করি সেই সমস্ত সুন্দর-সুন্দর কাপড়

তৈরি করে ফেলতে যেকোন একটা সময়ে আবশ্যক কিংবা প্রকৃতপক্ষে কাজে-লাগানো মোট উৎপাদী তহবিল (প্রত্যেকটি নারীর জন্যে ৬ টাকা দামের একটা তাঁত ২০ বছরে একবার নবীকরণের প্রয়োজন ধরে নিলে) ২৫ লাখ টাকার বেশি হয় না, যেটা কিনা দেশীয় কিংবা বৈদেশিক মস্ত বণিকের দাদন-দেওয়া সমস্ত টাকার এগারো ভাগের একভাগেরও কম।'* অর্থাৎ কিনা, গ্র্যাণ্টের মতে, কারবার চালাবার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ এবং নতুন-নতুন তাঁত বাবত বার্ষিক খরচের পরিমাণ দাঁড়াত বছর-বছর উৎপন্ন কাপড়ের মোট দামের এগারো ভাগের একভাগের কম। পরিচলনে থাকা অর্থের আবশ্যক পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁর অন্যান্য হিসাবের মতো – এই অঙ্কটাও হয়ত অনেকটা কম করে ধরা হয়েছে, তবু আঠার শতকের ভারতে হস্তশিল্পের কোন-কোন বিশেষত্ব এতে সূচিত হয়েছে নিশ্চয়ই: উৎপাদনের প্রত্যেকটা শাখাকে সমগ্রভাবে ধরলে – তাজা শ্রম বাবত আপেক্ষিক বিচারে খুবই বেশি পরিমাণ ব্যয়, খুবই দক্ষ কারিগরদের অত্যন্ত কম মজুরি, কারিগরদের হাতিয়ার বাবত যৎসামান্য খরচ, ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদনক্ষেত্রে খাটানো ব্যাপারিক পুঁজির দ্রুত উঠে-আসা।

এইভাবে, ভারতে সামাজিক শ্রমবিভাগের বিশেষত্বগুলো দিয়ে নির্ধারিত হত ব্যাপারীর ক্রিয়াকলাপের পরিমাণ আর ক্ষেত্র। সম্প্রদায়ের চৌহদ্দির ভিতরে কৃষি আর হস্তশিল্পের মধ্যে সরাসর স্বাভাবিক বাঁধনটাকে ভাঙার পক্ষে তাদের পুঁজি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না স্বভাবতই। তন্তুবায়, তেলি এবং সম্প্রদায়-বহির্ভূত অন্যান্য কারিগর আর কৃষিজীবীদের মধ্যে উৎপাদ-বিনিময়ে ব্যাপারিক পুঁজির মধ্যস্থতা ছিল সীমাবদ্ধ, কেননা একদিকে কাঁচামাল আর আধা-পরিসমাপ্ত জিনিসের উৎপাদকের সঙ্গে, আর অন্য দিকে পরিসমাপ্ত জিনিসের স্থানীয় ব্যবহারকদের সঙ্গে কারিগরের মোটামুটি বিস্তৃত সরাসর সংযোগ ছিল এই বিনিময়ের বহির্ভূত। কেবল উপর-তলার মানুষ, তাদের পরিচারকবর্গ, সৈন্যরা আর দূরবর্তী বাজারগুলোর জন্যে উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যাপারীদের আধিপত্য ছিল নিরঙ্কুশ।

প্রসঙ্গত বলি, ক্যাম্বে-তে (গুজরাট) অকীক কেনা-বেচা করত যেসব

সেকরা কারিগর আর বণিক তাদের স্বশাসন সংস্থাগুলো (পঞ্চায়ত) সম্বন্ধে একটা বিবরণ থেকে দেখা যাবে এমনসব শিল্পে ব্যাপারীদের আধিপত্য। অকীক নিয়ে কাজের প্রত্যেকটা ক্রিয়াপ্রণালী চালাত এক-একটা কারিগর পঞ্চায়েতের লোকেরা, কিন্তু অমার্জিত পাথর কিনত এবং পরিসমাপ্ত জিনিস বিক্রি করত শুধু ব্যাপারীদের পঞ্চায়ত।* এইভাবে, কারিগরদের সম্প্রদায়গত স্বশাসন নিয়ন্ত্রণ করত স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষই শুধু নয়, তাছাড়া ব্যাপারিক পুঁজিও। এই দুয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ ছিল, কেননা যেসব শিল্পে অকীক নিয়ে কাজ চলত তাতে তৈরি জিনিস বিক্রি করতে গিয়ে ব্যাপারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহ করত। তাই শিল্পে ব্যাপারীর নিয়ন্ত্রণটা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতীয় শহুরে জীবনে স্বৈরশাসনের সাধারণ আধিপত্যের পরিচায়ক। এই তথ্যটা ছাড়াও আরও একটা কারণে এই বিবরণ আগ্রহজনক: এর থেকে দেখা যায় অদ্ভুত রকমে ছড়ানো-বিক্ষিপ্ত এই উৎপাদনে ছিল একদিকে থোকক্রেতাদের একটা সাকল্য গোছের, আর কারিগরদের সাকল্য অন্য দিকে, প্রত্যেকটার প্রতিনিধি ছিল সেটার নিজ সম্প্রদায়গত পঞ্চায়ত। কাজেই দেখা যাচ্ছে, জায়মান পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক তখন অবধি এঁটে জড়ানো ছিল সম্প্রদায়গত আবরণে।

যে-উপায়ে 'বণিক উৎপাদনে কর্তৃত্ব কায়েম করল', একটা উত্তরণকালীন পর্ব হিসেবে সেটার ঐতিহাসিক গুরুত্ব মার্কস দেখিয়েছেন সামন্ততান্ত্রিক থেকে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীতে উত্তরণের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে। তবে মার্কস আরও বলেছেন, সেটা 'নিজে পুরান উৎপাদন-প্রণালী উচ্ছেদের কাজে শরিক হতে পারে না, সেটা বরং এটাকে নিরাপদে টিকিয়ে রাখতে ঝোঁকে নিজের পূর্বশর্ত হিসেবে। ...'এই ব্যবস্থাটা আসল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর পথে সর্বত্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, আর খতম হয় সেটার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে'।** ব্যাপারিক পুঁজি নিজ ক্রিয়াকলাপের জন্যে আবশ্যক পূর্বশর্ত হিসেবে বজায় রাখতে চাইত পুরান উৎপাদন-প্রণালীটাকে, এই উপস্থাপনাটি ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগে

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা আলোচ্য কালপর্যায়ে কিংবা পরে, ঔপনিবেশিক পুঁজিতন্ত্র বিকাশের যুগে, কোন সময়েই সাবেকী সম্পর্কতন্ত্র খতম হয়ে যায় নি কোন দিক থেকেই।

প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক 'উৎপাদক' কাজ করত শুধু বাজারের জন্যে, বেচা-কেনা ছাড়া সে টিকতে পারত না, এই বলে মার্কসের উক্তি 'অস্বীকার করার' একটা গতানুগতিক চেষ্টার বিরোধিতা করেছেন* ভারতীয় কারিগরী শিল্প সম্বন্ধে অন্যতম বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত কে. এন. চৌধুরী:

'কারিগরকে একটা বিশেষ ধরনের ব্যাপারী বলাতে চেষ্টা করলে সমস্ত ঐতিহাসিক বাস্তবতা অগ্রাহ্য করা হয়। যে অবস্থায় কারিগর বিক্রি করে সরাসরি ব্যবহারকের কাছে সেটা হতে পারে খুবই বিরল ধরনের সীমাবদ্ধ ব্যাপার।

'এমনকি বিশ শতকের ভারতে তাঁত-শিল্প সম্বন্ধে একটা সমীক্ষায় প্রকাশ পায় যে, যেখানে তন্তুবায়রা সংবৎসরের জীবিকানির্বাহের জন্যে তাদের কারিগরির উপর নির্ভর করত পুরোপুরি এমন প্রায় প্রত্যেকটা বড়রকমের তাঁতকেন্দ্রে কাপড় উৎপন্ন হত বেশি যা সংশ্লিষ্ট এলাকার মধ্যে বিক্রি হতে পারত না, তখন তন্তুবায়দের সামনে গতি থাকত হয় অসুবিধাজনক দামে গ্রাম্য ব্যাপারীর কাছে জিনিস বিক্রি করা, নইলে কিছুটা সুবিধের শর্ত পাবার চেষ্টায় মাল নিয়ে একটা থেকে আর-একটা স্থানীয় বাজারে কষ্টকর হাঁটাহাঁটি করে বিস্তর সময় আর প্রচেষ্টার অপচয়। ব্যবসাবাণিজ্য আর শিল্পোন্নয়নের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরস্পর-সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়টা প্রাক্‌আধুনিক ইউরোপে আর এশিয়ায় এত ভালভাবে লিপিবদ্ধ আছে যাতে সেটার উপর বেশি জোর দেবার প্রয়োজন নেই। প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে – যা মার্কস বেশ জোর দিয়ে বলেছেন – শিল্পে ব্যবসাবাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ থাকে, যেটা হল আধুনিক সমাজে যা তার উলটো।'**

ইউরোপে ষোল আর সতর শতকে, অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রের উৎপত্তির সময়ে, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন উদ্ভবের দুটো পন্থা সম্বন্ধে মার্কসের ধারণা

মেনে নিয়ে কে. এন. চৌধুরী আরও বলেছেন যে, ঐ একই সময়ে ভারতীয় প্রণালীতে টেক্সটাইল উৎপাদন খুবই বেশি পরিমাণে নির্ভর করত ব্যাপারিক দাদন ব্যবস্থাটার উপর। এটা 'সুদে খাটাবার' মতো একই ব্যবস্থা নয়। চিরাগত চুক্তি-সম্পর্ক অনুসারে বণিকেরা প্রায় সব-সময়েই দাদন দিত নগদ টাকা, কাঁচামাল নয়। আমরা দেখতে পাব, সতর শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কোন-কোন জায়গায় ঐরকমের একটা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু সেটা ঘটেছিল শুধু ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাবে। এটা লক্ষণীয় যে, মার্কসের নির্দেশ-করা প্রথম পন্থা-টা সম্বন্ধে এবং উৎপাদনের ভারতীয় প্রণালী আর তাদের স্বদেশে প্রচলিত প্রণালীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল বাণিজ্য কোম্পানিগুলোর বোদ্ধা ইউরোপীয় কর্মচারীরা। যেমন, দাদন প্রথাটাকে প্রবলভাবে সমর্থন করে সার উইলিয়ম ল্যাংহর্ন ১৬৭৬ সালে লিখেছি-লেন: 'ইউরোপে শিল্প আনুকূল্য পায়, সমৃদ্ধি নিশ্চিত, আর বিশেষত আমাদের কাপড়-প্রস্তুতকারক এবং ইতালির কাপড়-বোনা কারিগরদের মতো হরেক রকমের তন্তুবায়রা মস্ত-মস্ত ভূসম্পত্তির মালিক হয়; কিন্তু এখানে... তারা মজুতদারি করতে কিংবা ভূসম্পত্তির আয়তন বেশি বাড়াতে সাহস করে না। যারা অতি লোভী তাদের বেলায় খাদ্য-সামগ্রী। যেসব বণিক কোন উপায়ে রোজগার করে তারা সেটা ব্যয় করে নানা সৎকর্মে, আর প্রাচুর্যপূর্ণ জীবনযাত্রায় যেক্ষেত্রে সাহস করে; জমিয়ে রাখে শুধু ক্রেডিট আর কোনমতে ব্যবসাবাণিজ্য চালাবার জন্যে প্রয়োজনীয় তহবিল ছাড়া বড় একটা কিছু নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণভোজনের স্বভাবজ প্রথা আর আভালদারদের জবর-আদায়ের মধ্যে পড়ে থাকে যে গরিব তন্তুবায়রা তাদের দিন চলে অতি কষ্টেসৃষ্টে... তারা আগেভাগে টাকা না পেয়ে তাঁতে কাপড় ধরাতে পারে কৃচিৎ-কদাচিৎ।'*

আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে যাতে সমর্থিত হয় ল্যাংহর্নের বিবরণ, এতে ভারতীয় টেক্সটাইল উৎপাদনের ধরনধারন সম্বন্ধে কতকগুলো তাৎপর্যসম্পন্ন দিক গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। এটা তো একেবারেই অকাট্য যে, কাচাঁমাল আর কাপড় বোনা চলতে থাকার সময়ে অন্নসংস্থানের জন্যে তন্তুবায়দের কাজ চালিয়ে যাবার মতো পুঁজি

দরকার হত। তবে যথেষ্ট বেশি পরিমাণে কাপড়-উৎপাদনের জন্যে দাদন প্রথার অপরিহার্য ভূমিকাটা ছিল আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা ছিল একটা চুক্তি, যাতে উভয় পক্ষে বর্তাতো বিভিন্ন স্পষ্ট-নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা। বণিক সরবরাহটা যথাসময়ে পাবে বলে মোটামুটি যেমন নিশ্চয়তা থাকত, ঠিক তেমনি তন্তুবায় দাদনটাকে দেখত ফরমাশ বাবত অগ্রিম জমা হিসেবে।

ভারতে তাঁত বোনা সমেত উৎপাদনের বিভিন্ন মূল শাখায় ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পে সর্বোচ্চ আকারের ব্যাপারিক পুঁজি সাধারণত পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠত না, আর কারিগরদের উপর শোষণ অত্যধিক গুরুভার হয়ে দাঁড়াত মহাজনের কাছে দায়বদ্ধতার দরুন। 'পুঁজি সঞ্চয়ন, নবপ্রবর্তন, ইত্যাদি অনেক বেশি সম্ভব ছিল এবং মনে হয় ঘটেছিলও বটে বণিক আর অর্থপতিদের মধ্যে, কিন্তু নানা প্রথা আর রেওয়াজে আবদ্ধ খুদে এবং অপেক্ষাকৃত গরিব কারিগরদের মধ্যে নয়।'* এর ফলে ভারতীয় হস্তশিল্পে ব্যাপারিক পুঁজির রক্ষণশীল ভূমিকাটা আরও প্রবল হয়ে উঠত, ঢিমিয়ে পড়ত সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন, আর সাক্ষাৎ উৎপাদকদের অবস্থার অবনতি ঘটত।

মধ্যযুগের শেষের দিকে কারিগরদের গরিবি আর তাদের উপর নৃশংস শোষণ সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য রয়েছে। যেমন, ১৬৩৮ সালে ভারতে গিয়েছিলেন জে. এ. দে ম্যাণ্ডেলস্লো নামে একজন হলস্টেইনের কূটনীতিক, তিনি সুরাটের (গুজরাট) কারিগরদের সম্বন্ধে লিখেছেন: 'তারা রোজগার করতে পারে দিনে বড়জোর পাঁচ-ছ' পেনি। কাজেই তাদের দিন চলে অত্যন্ত গরিবি হালে, তাদের সাধারণ আহার্য হল শুধু খিচুড়ি, সেটা তারা তৈরি করে গুড়ানো শিম আর চাল দিয়ে, তারা এই দুটোকে একত্রে জলে সিদ্ধ করে জলটা ফুরিয়ে যাওয়া অবধি। তারপর তারা তাতে দেয় সামান্য একটা গলানো মাখন, আর সেটা হয় তাদের রাতের খাবার, সারা দিন তারা খায় শুধু ভাত আর গমের রুটি।'**

সতর শতকের শেষের দিকে বৃটিশ বণিকতান্ত্রিক সমাজের প্রকাশিত

রচনায়ও গুরুত্ব দিয়ে বলা হয় ভারতীয় কারিগরদের উঁচু মাত্রার দক্ষতার কথা, আর তাদের অত্যন্ত নিচু জীবনযাত্রার মানের কথাও। এই রচনার লেখক বলেন, 'সাধারণত ঈস্ট ইণ্ডিজ নামে পরিচিত দেশগুলিতে নানা মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী আর ভাল-ভাল সস্তা কাঁচামাল অজস্র, এইসব দেশে অসংখ্য দক্ষ কারিগর ঐসব মালমশলা নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত, তারা কোন-কোন জায়গায় কাজ করে দিনে এক পেনি বাবত।' তিনি আরও বলেন, 'এইসব দেশে মশলা প্রচুর, কেননা অনেক রকমের মশলার ফসল তোলা হয় বছরে দু'বার, আরও কোন-কোনটা চার-বার অবধি; আরও আছে নানা রকমের হীরক এবং অন্যান্য রত্ন, আর কয়েক রকমের ওষুধ, তাছাড়া হরেক রকমের কেজো আর দামী জিনিসপত্র যা ইউরোপের সমস্ত বানিয়া জাতির দৃষ্টি আর মন আকর্ষণ করে।'* সাধারণভাবে বলা যায়, হস্তশিল্পের 'স্বর্ণযুগ' বলতে যদি বোঝায় কারিগরদের বাড়-বাড়ন্ত, তাহলে সেটা কখনও ছিল না সামন্ততান্ত্রিক ভারতে, তবে তাদের ছিল অন্তত কাজ আর খাবার, যদিও পর্যাপ্ত উৎপাদী সঞ্চয়নের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত ছিল।

আলোচ্য কালপর্যায়ে ভারতে পুঁজিতান্ত্রিক ধরনের কর্মশালা থাকা সম্বন্ধে আকরগুলির কোন-কোন তথ্য নিয়ে এখন বিচার-বিবেচনা করা হচ্ছে। যেমন, খুবই বিমৃশ্যকারী হাবিব পর্যন্ত হীরক খনির কাজকে পুঁজিতান্ত্রিক ম্যানুফ্যাকচারির (কর্মশালা) অন্তর্ভুক্ত করেছেন – যদিও কিছুটা রেখে-চেপে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন উত্তুরে সরকারগুলির রাজ্যক্ষেত্র দখল করে তখন তারা স্থানীয় হীরক তোলার ব্যাপারটাকে তুচ্ছ করে নি। এইসব ক্রিয়াপ্রণালীতে কোম্পানির শামিল হবার সম্ভাবনা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে ১৭৯৫ সালে এলুরু খনি এলাকায় গিয়েছিলেন হেইন, যাঁর বক্তব্য থেকে আমি উদ্ধৃতি দিয়েছি আগে। হীরক আবিষ্কার এবং খনি থেকে হীরক তোলা আরম্ভ সম্বন্ধে কিংবদন্তির বিবরণ তিনি দিয়েছেন। একদিন এক মেষপালক পাহাড়ের ঢালে কিছু পাথর পেয়ে সেটাকে চকমকি পাথর মনে ক'রে সেটাকে ব্যবহার করে পাইপ ধরাবার জন্যে। তার বরাত ছিল খারাপ, 'চকমকি পাথর' দিয়ে

সে পাইপ ধরিয়েছিল স্থানীয় বড় জমিদারের কাছারিতে যাবার সময়ে; আর ঐ জমিদারের একজন কর্মচারী ঐ পাথর লক্ষ্য ক'রে ঐ মেষ-পালকের কাছ থেকে ব্যাপারটা বের ক'রে এই আবিষ্কারককে নিয়ে গিয়েছিল জমিদারের কাছে। জমিদারটি সেই জায়গায় গিয়ে আরও কিছু পাথর পায় এবং নিজের হঠাৎ সমৃদ্ধির জন্যে কৃতজ্ঞতাভরে ঐ দুর্ভাগা মেষপালককে বলি দেয় লক্ষ্মীদেবীর উদ্দেশে।

কিংবদন্তিতে আছে, নিজাম ঐ আবিষ্কারের কথা শুনে জায়গাটায় সরাসর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার আগেই ঐ জমিদার সবচেয়ে বড় হীরক-গুলো সংগ্রহ করে লুকিয়ে ফেলেছিল (হেইন বলেন, নিজামের এই নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়েছিল তিনি (হেইন) যাবার ৮০ বছর আগে, অর্থাৎ ১৭১৫ সালে)। তিনি আরও বলেন, 'নিজাম যাদের প্রাধিকার দিতেন কেবল তারাই সেখানে হীরকের সন্ধান করতে পারত তখন থেকে।'* আপসোসের কথা, এইসব লোকের সামাজিক প্রতিষ্ঠা কী ছিল সেটা মোটেই স্পষ্ট নয়: তারা কি ছিল নিজামের কোন-কোন আমলারা, না, স্বাধীন ঠিকাদার যারা হীরকক্ষেত্রে কাজ চালাবার অধিকার পেত ইজারা অনুসারে?

হেইন হীরকক্ষেত্র পরিদর্শন করেছিলেন এলুরু-তে ছাড়াও কাড্ডাপায়, এখানে কাজ চলছিল 'কয়েক শতাব্দী ধরে'। এটা ছিল খোলা খনি, সেখানে খোঁড়ার কাজ চালিয়ে হীরকের স্তর পাওয়া গিয়েছিল ৫-৭ মিটার গভীরে। এই স্তরটাকে স্থির করা গিয়েছিল কোন-কোন শিলা-স্তর দেখে (এগুলোর প্রধান ন'টা স্তরের কথা হেইন উল্লেখ করেছেন)। প্রথমে সরানো হয়েছিল বড়-বড় পাথর, তারপর শিলা ধুয়ে ফেলা হয়, তখন হীরক খোঁজা হয় রাশি-রাশি ছোট পাথরের মধ্যে। হীরকগুলোকে চার বর্গে ভাগ করা হত রঙ অনুসারে, সেগুলোর নাম হত চার বর্ণের নামে, আর দাম ধার্য হত তদনুসারে।

একটি মোড়ল কোম্পানির কাছ থেকে দশটা খনি ইজারা নিয়েছিল বছরে ১৩০ প্যাগোডা (প্রায় ৪০০ টাকা) দিয়ে, তার বিবরণ দিয়েছেন হেইন। তিন-চারটে খনিতে কাজ চালাত সে নিজেই, আর প্রত্যেকটা খনি বাবত মাসে ৯ টাকা নিয়ে দর-ইজারা দিয়েছিল বাদবাকিগুলোকে,

---

তার মানে সমস্ত খনি ইজারা নেওয়া বাবত তার দেওয়া সমস্ত টাকা উঠে আসত এর থেকে। প্রত্যেকটা খনিতে কাজে লাগানো হত মেয়ে-পুরুষ মোট ১৬ জনকে, তারা প্রত্যেকে পেত মাসে ১ প্যাগোডা (প্রায় ৩ টাকা)। এরা ছিল কাছাকাছি বিভিন্ন গ্রামের নিচু শূদ্র বর্ণের মানুষ, খনিতে তারা কাজ করত শৈশব থেকে, আর মনিবের ব্যাপারে নিজেদের সততার জন্যে গর্ববোধ করত।

হেইন-এর মোটামুটি হিসাবে এক-একটা খনি থেকে ইজারাদারের আয় হত ৫০০০ প্যাগোডা অবধি, তার থেকে তার খরচ-খরচা দাঁড়াত ২০০০ প্যাগোডা। এইসব অঙ্ক মনে হয় অত্যন্ত বাড়িয়ে ধরা হয়েছে, কেননা – দৃষ্টান্ত হিসেবে – তার ব্যয়ের প্রধান দুটো দফা – খাজনা (বছরে ১৩ প্যাগোডা) আর মজুরি (বছরে ১৯২ প্যাগোডা) – মিলিয়ে ব্যয়ের পরিমাণটা দাঁড়াত হেইন যেমনটা দেখিয়েছেন তার দশমাংশের সামান্য বেশি। আরও প্রশ্ন ওঠে – এমন মস্ত আয়ের উপর কোম্পানি অত কম খাজনা ধার্য করেছিল কেন। তাই দেখা যাচ্ছে, দশটা খনির সবগুলোতেই প্রযোজ্য হেইন-এর অঙ্ক। প্রত্যেকটা খনির ভার থাকত একজন ভাল মাইনের তত্ত্বাবধায়কের উপর, ইজারাদার নিজে কোন খনিতে যেত না কখনও, কিংবা সেখানে দেখা দিত কচিৎ-কদাচিৎ। এই উদ্যোগী-কারবারিকে শিল্পপতি না বলে হয়ত বরং ভূমি-মালিক-বণিক বলাই ঠিক।

১৮০৮ সালে হেইন তৃতীয় বার যান হীরক ক্ষেত্রে, এবার বাঙ্গানা-পাল্লা এলাকায়, সেখানে হীরকওয়ালা স্তরটা ছিল ৩ থেকে ৬ মিটার গভীরে। হেইন বলেন, ঐ স্তরটা অবধি গভীর-গভীর গর্ত খুঁড়ত মজুরেরা, তারা শিলা স্তরে পৌঁছে থাবড়ি খেয়ে বসে গাঁইতি চালাত শিলায়; এরা ছিল চাণ্ডার জাতের মানুষ, আর এদের মনিবেরা ছিল 'আরও বিশিষ্ট লোক'। এই ক্ষেত্রটায় হীরক যথেষ্ট ছিল না, মজুরদের উপর তত্ত্বাবধান ছিল ঢিলেঢালা ধরনের।* মনে হয় হীরক কিনে এবং সেটা আবার বেচে দিয়ে মনিবদের বেশ চলে যেত। এখানে আবার দেখা যাচ্ছে সাধারণ ধরনের ব্যাপারিক পুঁজি, সেটা উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার দিকে যেত না।

কোন-কোন তন্তুবায়দের মধ্যে সম্পত্তির দিক থেকে প্রভেদ ছিল, আর তাঁত-শিল্পে ছিল সাদাসিধে পুঁজিতান্ত্রিক সহযোগ এবং ম্যানুফ্যাকচারের কোন-কোন প্রারম্ভিক উপাদান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেমন, মৈসুরে তাঁত-শিল্পে মজুরি দিয়ে জন খাটানো হত আকছার। মনিব-তন্তুবায়রা দুই থেকে পাঁচ জন সহকারী রাখত, তারা পারিশ্রমিক পেত উৎপন্ন জিনিসের পরিমাণের হিসাবে। তন্তুবায়দের গড় দৈনিক রোজগার সম্বন্ধে তথ্য আছে: দক্ষতা আর কাজের জটিলতা অনুসারে ৬ থেকে ৮ পেনি। যেক্ষেত্রে এক-একজন মালিকের থাকত কয়েকটা তাঁত এমন বন্দোবস্ত ছিল এতই বহুবিস্তৃত যাতে সেটা প্রকাশ পেয়েছিল মৈসুরের কর-সংক্রান্ত আইন-কানুনে। যেমন, একখানা তাঁতের মালিক কর দিত ৩·৭৫ ফানাম (২ শিলিং ৬·২৫ পেনি), দু'খানা তাঁতের মালিক দিত ৫ ফানাম, তিনখানা কিংবা আরও বেশি তাঁতের মালিক প্রতি-তাঁত বাবত দিত ২ ফানাম।* এইভাবে, মৈসুরের কর-কর্মনীতিতে তাঁত-কর্মশালা বড় করতে উৎসাহ দেওয়া হত। মৈসুরে যেসব খুদে ওস্তাদ-তন্তুবায় মজুর নিয়োগ করত তাদের মাসিক ২ শতাংশ সুদে ধার দিত বণিক আর ব্যাঙকাররা।** এই ধরনের সম্পর্ক ছিল বাংলারও তাঁত-শিল্পে। যেসব সচ্ছল তন্তুবায় মজুরি দিয়ে জন খাটাত তারা অনেক সময়ে শুধু মধ্যগ হিসেবে কাজ করত ঐসব মজুর আর বণিকদের মধ্যে। এমন সম্পর্ক বিলম্ব ঘটাত উন্নত আকারের পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশে।

লোহা ধাতুশিল্পে বিভিন্ন ধরনের সংস্থা

ভারতের প্রধান-প্রধান হস্তশিল্পগুলির মধ্যে কয়েক ধরনের সংস্থা দেখা যাচ্ছে যেগুলি নির্ধারিত হয় প্রধানত উৎপাদ কোন্ প্রয়োজনে লাগে সেটা এবং চাহিদার বৈশিষ্ট্য অনুসারে। লোহা ধাতু-শিল্পে এইসব উপাদান ছাড়াও চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা ছিল আকরিক নিষ্কাশন আর আকরিকের গুণাগুণ, আবার কাঠকয়লা পোড়ানোও। এমন স্পষ্ট ধারণা জন্মায় যে, অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ উৎপাদনের আদিম ধরনের

আকার আর প্রণালী থেকে উন্নতির সহায়ক না হয়ে বরং সেগুলোর বজায় থাকাতেই সুবিধে করে দিত। মনে হয়, যেসব সংস্থার কাজ চলত অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিস্থিতিতে সেগুলোর আরও দ্রুত উন্নয়নে প্রতিযোগিতা আর উদ্দীপনের প্রক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্ন উৎপাদন-পরিব্যয়ের মধ্যে তুলনা করা চলত না কোন বিস্তৃত বাজার ছিল না বলে। প্রকৃত-পক্ষে, প্রাকৃতিক পরিবেশের অবনতির ফলে ঘটেছিল উৎপাদন-প্রক্রিয়ার জটিলতা আর তার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনে সামাজিক-আর্থনীতিক সংগঠ-নের উন্নতি। এখানে বলা দরকার, অপেক্ষাকৃত আদিম ধরনের উৎপাদ-গুলোর দাম কিছুটা কম ছিল, তার ফলে সেগুলোকে সরেস করে তোলার প্রবর্তনা সৃষ্টি হতে দেরি হত। অর্থাৎ কিনা, স্বাভাবিক সুবিধাগুলোকে ছড়িয়ে সমান-সমান করে দিয়েছিল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

আঠার শতকের শেষ আর উনিশ শতকের গোড়ার দিকে হেইন লোহা নিষ্কাশনের খুবই সাদাসিধে একটা প্রণালী লক্ষ্য করেছিলেন সটগু-র্ডের কাছে একটা গ্রামে (মাদ্রাজ শহর থেকে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার পশ্চিমে, এখনকার অন্ধ্র প্রদেশের সীমান্তে)। মজুর ছিল মাত্র তিন জন তারা ছিল গ্রামের সবচেয়ে নিচু সম্প্রদায়ের আলাদা-আলাদা পরিবারের মানুষ; ঐ গ্রামের ভিতর দিয়ে যারা যেত তাদের মালপত্র বওয়াই ছিল তাদের প্রধান কাজ। লোহা বিগলনের কাজ তারা করত শুধু শুখা মরসুমে – জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিক থেকে মার্চ মাসের শেষাশেষি পর্যন্ত; তবে তারা পাত্রে আকরিক ভরতে শুরু করত অনেক আগে – হয় বর্ষাকালে, নইলে সেটা শেষ হবার ঠিক পরেই। পার্বত্য নদীর গর্ভে কালো বালির পলি জমত, সেটাই ছিল আকরিক। তাতে লোহা উপাদানটার পরিমাণ ছিল অসাধারণ বেশি রকমের, হেইন-এর কথা মেনে নিলে -- ৯ সের (২ পাউণ্ড বা ০·৯ কিলোগ্রামের সামান্য বেশি) বালি থেকে পাওয়া যেত ৭ সের অশোধিত লোহা আর ৫ সের ব্যবহার্য ঢালাই লোহা।

আকরিকে ধাতু-বস্তু এত বেশি ছিল বলে, আর সেটার সংযুতি যা ছিল তার ফলে বিগলনের প্রক্রিয়াটা অপেক্ষাকৃত সহজ হত নিশ্চয়ই. চুল্লি ছিল লম্বায় ১ মিটারের বেশি আর খাড়াইয়ে ৭০ সেণ্টিমিটার অবধি একটা অপ্রতিসম আধা-শঙ্কু। চুল্লিতে কয়লা চাপাবার সময়ে সেটাতে প্রায় ১৫ মিনিট অন্তর-অন্তর যোগানো হত পাঁচ ভাগ আকরিক

ভার কয়লা, তাতে তৃতীয় ভাগটায় থাকত ২½ সের আকরিক, বাদবাকিগুলোতে ১ সের করে। এইভাবে, এই বিগলন প্রক্রিয়ায় সময় লাগত প্রায় ২ ঘণ্টা, সেটা চলতে পারত দিনে তিন বার। বিগলন সমাপ্ত হলে যে-জড়পিণ্ডটা পাওয়া যেত সেটাকে জল দিয়ে শীতলান হত, আর তারপর আবার গরম করে ঢালাই করা হত, এই প্রক্রিয়ায় সেটার ওজন ⅔ ভাগ কমে যেত। পরিসমাপ্ত লোহাটাকে এক-সেরা পিণ্ড আকারে বিক্রি করা হত, তার এক-একটার দাম ছিল ৪ আনা, অর্থাৎ টাকায় ৩·৬ কিলোগ্রাম। ঐ মজুরেরা এক-একটা মরসুমে উৎপন্ন করত ৩৬০টা পিণ্ড, অর্থাৎ মোটামুটি ৩২০ কিলোগ্রাম পরিসমাপ্ত লোহা।

হেইন-এর পরবর্তী হিসাবগুলো স্পষ্ট নয়। তিনি বলেন, ঐ ৩৬০টা পিণ্ড বিক্রি হত ৪০ টাকায়।* কিন্তু তিনি নিজেই যে-দাম উল্লেখ করেছেন (এক-একটা পিণ্ড – ৪ আনা) তাতে প্রাপ্তিটা দাঁড়ায় ৯০ টাকা। হেইন হয়ত বোঝাতে চেয়েছেন নীট আয়টা: লোহাওয়ালাদের হয়ত টাকা দিতে হত আকরিক সংগ্রহ করা আর কয়লা পোড়ানো বাবত, হয়ত কর দিতে হত, আর ছিল অন্যান্য খরচ-খরচা।

১৭৯৪ সালে জুন মাসে রাজামন্দ্রী (এখনকার অন্ধ্র প্রদেশে) থেকে ১৪ মাইল দূরবর্তী একটি গ্রামের অধিবাসীরা তাদের লোহা-বিগলনের নিজস্ব প্রণালীর কথা হেইন-কে বলেছিল সহজেই। তারা গরিব মানুষ, বর্ষাকালে তারা করত কৃষিকাজ, ধাতু নিয়ে তারা কাজ করত শুধু শুখা মরসুমে। দুই মরসুমের মধ্যে তারা কাঠ কাটত, কাঠকয়লা তৈরি করত (সাধারণত জঙ্গলে তাদের ম্যালেরিয়া হত, তখন বাড়ি ফিরে তাদের শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হত কিছুকাল)। হেইন বলেন, স্থানীয় লোহা-প্রস্তুতকারকেরা রোগে ভুগত, তাদের কৃষিকাজ করা দরকার হত – এটা ছিল তাদের উৎপাদনশীলতা কম হবার কারণ। 'তবু হাতিয়ার, খুর, ইত্যাদি তৈরি করার জন্যে তাদের পয়দা-করা লোহা সবদিক থেকেই সবচেয়ে সরেস বলে বিবেচিত হয়।'** তিনি আরও বলেন, প্রচুর চাহিদা ছিল এই লোহার জন্যে, কেননা স্থানীয় খনি-মজুর, ঢালাইকার, কাঠুরে, প্রভৃতি ছিল বড়জোর মোট আট-ন'জন।

আকরিক পাওয়া যেত গ্রামের কাছেই, ১১-১৪ মিটার গভীরে। অনুভূমিক খনির ব্যাপারটা জানত না স্থানীয় খনি-মজুরেরা, তাই তারা খনি (বরং বলা ভাল, প্রস্থে এক-মিটারের সামান্য বেশি খাদ) খুঁড়ত ৪-৫ মিটার দূরে-দূরে। কাঠকয়লা প্রস্তুত করা হত একটা বিশেষ রকমের গাছের কাঠ থেকে, এই গাছ জন্মাত গ্রাম থেকে ২৪-৩০ মাইল দূরেই শুধু। কাঠকয়লা আনতে বেশ খরচ পড়ত, তাই – হেইন বলেন – অন্যান্য পরিস্থিতির সঙ্গে মিলে তার ফলে লোহা উৎপাদনটা ছিল না-নির্ভরযোগ্য বৃত্তি (লাভজনকতার দিক থেকে), তবে তিনি আরও বলেন, ক্ষুদ্রায়তনের হলেও এই উৎপাদন কৌতূহলী পর্যবেক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণ করত, তার কারণ প্রক্রিয়াটা ছিল খুবই সাদাসিধে, আর উৎপন্ন লোহাটা হত খুবই সরেস।

চুল্লি তৈরি করা হত কাদামাটি দিয়ে, সেটা দেখতে ৪·৫ ফুট লম্বা আর ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি চওড়া আধখানা ডিমের মতো। তাতে থাকত কয়েক-টা ফাঁক, সেগুলো দিয়ে আকরিক আর কাঠকয়লা (১ : ২ অনুপাতে) ভরা হত, ধাতু বের করা আর ধাতুমল বের করা হত, হাওয়া ঢোকানো হত বিগলন-প্রক্রিয়ার মধ্যে। ভোর পাঁচটায় শুরু হয়ে সারাদিন ধরে চলত বিগলন। হাওয়া ঢোকানো হত দুই জোড়া হাপর দিয়ে, সেগুলো চালাত দু'জনে। পয়দা হত প্রায় ১১২ পাউণ্ড, অর্থাৎ ৫০ কিলোগ্রামের সামান্য বেশি লোহাপিণ্ড, তার অর্ধেকটা ধাতুমল। এই পিণ্ডটা নিয়ে আরও কাজ চালাতে হত; সেটা বিক্রি হত এক টাকায়। কিন্তু ঢালাই করার পরে 'এটায় দেখা দেয় ইস্পাতের ধর্ম, তখন সেটা বিভিন্ন সাধিত্র তৈরি করার উপযোগী'।* আপসোসের কথা, খাস বিগলন সম্বন্ধে, কিংবা লোহাটার আখের মূল্য কিংবা পরিসমাপ্ত উৎপাদের দাম সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি হেইন।

রাজামন্দ্রীর কাছে লোহা উৎপাদনটা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চালাবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিজের বিচার-বিবেচনা তুলে ধরে হেইন শেষ করেছেন এই বিষয়ে তাঁর বিবরণ। তিনি মনে করতেন, আদিম ধরনের হাপরের বদলে হাওয়া ঢোকাবার শক্তিশালী যন্ত্র বসানোটা যতই জটিল হোক, সেটা করা হলে কোম্পানি বৃটেন থেকে ইস্পাত

রপ্তানি করার প্রয়োজন থেকে রেহাই পেত। তবে খুবই স্বচ্ছদৃষ্টিতে হেইন এটা দেখতে পেয়েছিলেন: 'যেসব দেশে কয়লা নেই সেগুলিতে বিস্তৃতভাবে লোহা উৎপাদন চালু করাটা দূরদর্শিতার পরিচায়ক কিনা তাতে আমার ঘোর সংশয় আছে। বাস্তবিকপক্ষে আমার মনে হয় এটা সম্ভব যে, ইংলণ্ডের লোহা-কারখানাগুলোর এমন শ্রেষ্ঠত্ব আছে যেক্ষেত্রে অন্য কোন দেশ সেটার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না।'* শেষোক্ত কথাটা সঠিক ছিল তারপর আরও প্রায় ৫০ বছর ধরে।

ভারতীয় ধাতুবিদ্যা সম্বন্ধে হেইন-এর আর-একটা বিবরণ হল মাসুলিপটমের উত্তরে নুজভিদের কাছে একটা গ্রাম প্রসঙ্গে। হেইন ঐ গ্রামে যাবার স্বল্পকাল আগে সেখানে যে-আকাল হয়েছিল সেটার আগে সেখানে চালু চুল্লি ছিল ৪০টা, সেগুলোর মধ্যে মাত্র ১০টাতে কাজ চলছিল যখন হেইন গিয়েছিলেন পরিদর্শন করতে। প্রযুক্তি আর চুল্লিগুলো ছিল আগেই যা বলা হয়েছে সেই রকমেরই, কিন্তু উৎপাদনের সংগঠন ছিল অন্য রকমের: লোহা-প্রস্তুতকারকেরা নিজেরাই নয়, বিশেষ-বিশেষ লোকবর্গ আকরিক আর কয়লা সংগ্রহ করে তা যোগান দিত চুল্লিতে, আর তারপর বিক্রি করত ঝুড়ি-ঝুড়ি করে। প্রত্যেক বার বিগলনে লোহাপিণ্ড পয়দা হত মোটামুটি ১ মন (৪০ সের = ৮০ পাউণ্ড = ৩৬ কিলোগ্রাম), সেটা বিক্রি হত ২ টাকায়, অর্থাৎ কাছাকাছি রাজামন্দ্রীতে যা সেটার তিনগুণ দামে। দামের এমন প্রভেদের কারণ মূল্য-মানদণ্ড দিয়ে ব্যাখ্যা করা কঠিন, কেননা এক্ষেত্রে আকরিক পাওয়া যেত কার্যত উপরের স্তরে, গ্রামের কাছেই, আর কাঠকয়লা প্রস্তুত করা হত কাছেই। হয়ত দুর্ভিক্ষের ফলে, লোহা-প্রস্তুতকারক কমে গিয়েছিল বলে তাদের উৎপাদের দাম বেড়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ কিনা, স্থানীয় যোগান-চাহিদা স্থিতিটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিষ্পত্তিকর।

আশপাশের আরও ছ'টা গ্রামের মানুষ লোহা বিগলনের কাজ করত, সেগুলির কথাও উল্লেখ করেছেন হেইন।** কাজেই দেখা যাচ্ছে, লোহা-উৎপাদনে বিশেষ কৃতি ছিল গোটা-গোটা এলাকার। ঐ এলাকায়

চুল্লি ছিল ডজন-ডজন, সেগুলোতে লোহা-উৎপাদনের দৈনিক পরিমাণ ছিল কয়েক টন।

শেষে বলি, মৈসুরে ইস্পাত উৎপাদনেরও একটা বিবরণ দিয়েছেন হেইন, তার ফলে বুকাননের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে। চিত্রাদুর্গের কাছাকাছি পাহাড়ে অবস্থিত একটি ছোট গ্রামে ইস্পাত প্রস্তুত করা হত, সেখানে লোহা আসত কাছাকাছি কোন গ্রাম থেকে (লোহা বিগলন হত সালেম জেলার ১৫টা গ্রামে)। লোহা বিগলন করা হত প্রচলিত প্রণালীতে: একঘণ্টা অন্তর-অন্তর চুল্লিতে ভরা হত (মোট চারবার) এক-ঝুড়ি (৩৩ পাউণ্ড বা ১৪ কিলোগ্রাম) আকরিক আর উপযুক্ত পরিমাণ কাঠকয়লা। বিগলন প্রক্রিয়াটা চলত পাঁচ-ছ'ঘণ্টা ধরে, তারপর লোহাপিণ্ডটাকে শ্বেততপ্ত করে ঢালাই করা হত কয়েক বার। কৃষিকাজের সরঞ্জাম তৈরি করার জন্যে উপযোগী এই স্থানীয় লোহার এক মনের (২৭ পাউণ্ড বা ১২·২ কিলোগ্রাম) দাম ছিল ২ টাকা, অর্থাৎ টাকায় ৬·১ কিলোগ্রাম। লোহা-প্রস্তুতকারকদের মধ্যে শ্রম-সংগঠন সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি হেইন, তবে তাদের অসুস্থ, হাড্ডিসার চেহারার কথা তিনি বলেছেন।

এই লোহা থেকে ইস্পাত প্রস্তুত করার জন্যে সেটাকে এক-একটা ৩০০ গ্রাম ওজনের ৫২টা ছোট-ছোট ধাতুপিণ্ডে ভাগ করে রাখা হত মুচিতে। ছ'ঘণ্টার বিগলন প্রক্রিয়ায় লোহাটা ইস্পাতে পরিণত হত, তাতে ইস্পাতের পরিমাণ হত মুচিতে রাখা লোহার চেয়ে পাঁচ-ভাগের একভাগ কম (অর্থাৎ ১৫·৬ কিলোগ্রাম লোহা থেকে মোটামুটি ১২·৪ কিলোগ্রাম ইস্পাত)। এই ইস্পাত বিক্রি করার দাম ছিল ২৭ পাউণ্ডের জন্যে ১৫ সোনার ফানাম (১০ শিলিং ৮ পেনি বা ৫ $\frac{১}{৩}$ টাকা), অর্থাৎ টাকায় ২·৩ কিলোগ্রাম।*

মৈসুরে লোহা-উৎপাদনে ঢালাইঘরের ব্যাপারে খুদে উৎপাদকদের মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের সহযোগ ছিল, সে-সম্বন্ধে তথ্য আছে। এক-একটা কামারশালায় কাজ করত ১৩ থেকে ২২ জন। জিনিস বিক্রি করে পাওয়া টাকাটাকে নির্দিষ্টসংখ্যক (এক্ষেত্রে ৪২) অংশে ভাগ করা হত। প্রত্যেকটি উৎপাদকের হিসসা নির্ভর করত উৎপাদন-প্রক্রিয়ায়

তার স্থান আর সরঞ্জাম বাবত খরচের উপর। মালিক পেত উৎপাদের মূল্যের সিকি ভাগ, কখনও-কখনও আরও বেশি। উত্তর মৈসুরে একটা কামারশালায় উৎপাদটা ভাগাভাগি হত নিম্নলিখিতরূপে: মালিক পেত ১১টা অংশ, কর্মকার – ৩·৫, আকরিক-বাহক – ২·৫, ৪ জন হাতুড়িওয়ালা – ৭, ৬ জন হাপরওয়ালা – ৮, ৯ জন কয়লাওয়ালা আর ১ জন খনি-মজুর – ১০টা অংশ।*

কর্মকার আর আকরিক-বাহকের হিসসা অপেক্ষাকৃত বেশি হবার কারণ এই যে, কর্মকার ছিল সরঞ্জামের মালিক আর গাড়ি এবং বলদ ছিল বাহকের। এইভাবে, এমনকি এই আয়-শরিকানার (তার চেয়ে বরং বলা ভাল – উৎপাদ-শরিকানার) নিয়মে এবং উৎপাদনের উপকরণে মালিকানার নানাত্বে ছিল খুদে উৎপাদকদের মধ্যে প্রাক্-পুঁজিতান্ত্রিক সহযোগের কোন-কোন লক্ষণ। মজুরেরা ছিল গ্রামবাসী; ধাতু-সংস্কার কাজে মাঝে-মাঝে বিরতির সময়ে তারা ধনী জোতজমার মালিকদের কাছে মজুরি করত। এই প্রারম্ভিক প্রাক্পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক জড়িত ছিল দাসদশার সঙ্গে: মজুরদের কাজ বাবত দেওয়া লোহা বিক্রি হওয়া অবধি সময়ে তাদের জীবনধারণের জন্যে মনিব তাদের ধার দিত ৭০ থেকে ১০০ ফানাম; মজুরেরা ধারশোধ করতে অপারক হলে ঐ মনিবের জন্যে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে হত।

তার সঙ্গে সঙ্গে, ভারতে কোন-কোন বিস্তারিত শ্রমবিভাগের মাত্রার দিক থেকে আদিম ধরনের থেকে গিয়েও এইসব প্রাক্পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক থেকে অনেকটা মুক্ত ছিল। মৈসুরের কোন-কোন লোহা-উৎপাদন সংস্থা সম্বন্ধে বিবরণে বুকানন বলেছেন সেগুলোতে ছিল উন্নত ধরনের শ্রমবিভাগ আর কাজ বাবত নগদ মজুরি, এতে পার্থক্য ছিল মজুরের কাজের বিশেষত্ব অনুসারে (এক-এক মরসুমে ৬ থেকে ১২ ফানাম)। এমন একটা সংস্থায় নিযুক্ত ছিল ২০ জন; ৪ জন আকরিক সংগ্রহ করত, ৬ জন প্রস্তুত করত কাঠকয়লা, চুল্লিতে কাজ করত ৪ জন, আর ৬ জন কাজ করত কামারশালায়; পুরো মরসুমের (৮ মাস) জন্যে তাদের মোটমজুরি ছিল ১২০০ ফানাম: তাছাড়া মালিক কর আর খাজনা দিত ১০০ ফানাম। যেগুলোতে ১১ থেকে ২২ জন মজুর খাটানো

আকরিক পাওয়া যেত বস্তুত উপরিভাগেই, সেটা নিষ্কাশনের প্রণালী ছিল খুবই সাদাসিধে। ২০ ফুট (৬ মিটার) অবধি গভীরেও আকরিক পাওয়া না গেলে খাদ খোঁড়া হত অন্যত্র। ছাদ থাকত না, কিংবা সেটা হত আনাড়ী ধরনের। যা-ই হোক, খনি-মজুরদের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন ফর্বেস: 'কোন খনি তিন মাসের বেশি থাকে কদাচিৎ; অনেকগুলো ভেঙে পড়ে নষ্ট হয়ে যায় তার আগেই।'* আকরিক ছিল খুবই সরেস, এই মন্তব্য করে ফর্বেস বলেন, তাঁর কম্পাসের কাঁটা সরে গিয়েছিল তিন পয়েণ্ট। লোহা-উপাদানটার পরিমাণ খুব বেশি ছিল বলেই আদিম ধরনের বিগলনেও লোহা পয়দা হত আকরিকের ওজনের অন্তত তৃতীয়াংশ।

খনিগুলো ছিল সরকারের সম্পত্তি, কেননা 'বণিকদের কাছ থেকে মাটির দাম নেবার জন্যে' সরকারের নিযুক্ত একজন বিশেষ কর্মচারী থাকত। তাছাড়া, 'সরকার মজুরদের মাইনে দিয়ে নিয়মিতভাব নিযুক্ত করে না, তাদের ভরতি করা হয় খনিতেই; বলদ বোঝাই করার জন্যে তাদের মুরি দেয় বণিকেরা।'** দিনে গড়ে ৫০টা বলদ বোঝাই মাল দেওয়া হলে, আর এক-একটা বলদে আকরিক বোঝাই করা বাবত খরচ যদি হয় এক পয়সা, তাহলে ৭টা খনি থেকে দৈনিক প্রাপ্তি হত মাত্র ৫০ পয়সা (১ টাকা = ৬৪ পয়সা), আর বার্ষিক প্রাপ্তি হত ১৫০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে। প্রাপ্তির মাত্রা এইরকমের হলে কোন কারবারী উদ্যোগের বিশেষ কোন আশা ছিল না — খনিগুলোর মালিকানা ব্যক্তির হলেও না। ঠিক বটে, লোহা বিগলনের কর্মকাররা বলত, এক-একটা বলদ বোঝাই করা বাবত খনিতে দেওয়া হত ২ পয়সা, আর বণিকেরা সেই আকরিক কর্মকারদের কাছে বিক্রি করত ৩ পয়সার সামান্য বেশিতে (১০০ মন — ২½ টাকা), কিন্তু তাহলে ৭টা খনির বার্ষিক প্রাপ্তি ৩০০-৪০০ টাকার বেশি হত না।

লোহা-বিগলন সংস্থাগুলো সম্বন্ধে ফর্বেস কোন বিবরণ দেন নি, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ এবং এইসব সংস্থার বিরাট সংখ্যাটা (ফর্বেস বলেন আকরিক নিয়ে কাজ চলত পাঁচটা শহরে) বিবেচনায় থাকলে

স্পষ্ট বোঝা যায় সংস্থাগুলো আকারে বড় ছিল না। তবে কর্মকারদের প্রস্তুত-করা ধাতু 'বিক্রি হত চতুর্দিকে, অবশ্য অন্তর্দেশীয় নৌ-পরিবহণের অভাবের মধ্যে যা সম্ভব অন্তত ততটা'।* ঐ রচনাংশে গোয়ালিয়রের ধাতু-শিল্পের বিস্তৃত বাজার সম্বন্ধে তথ্য ছাড়াও এই পরোক্ষ আভাস রয়েছে যে, লোহার জন্যে স্থানীয় চাহিদা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ (অবশ্য যদি এমন হয় যে, বছরে প্রায় ১০০ টন লোহা বিগলনের জন্যে যোগান দিত যে-৭টা খনি সেগুলোই ছিল ঐ রাজন্য-শাসিত রাজ্যে আকরিকের একমাত্র যোগানদার)।

মৈসুরে লোহা প্রস্তুত করার কর্মশালাগুলোতে যাবার দশ বছর আগে বুকানন বিহারে ভাগলপুর জেলায় অনুরূপ বিভিন্ন কর্মশালা পরিদর্শন করেছিলেন। স্থানীয় লোহা-শিল্পের জন্যে কাঁচামালের যোগান-দার আকরগুলো ছিল খুবই উৎকৃষ্ট, সে-সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন সেটার নিচু প্রযুক্তিগত মান সম্বন্ধে: আকরিকপিণ্ড প্রস্তুত করার নিরেস প্রণালী, আকরিক আর কাঠকয়লার অনুপাত সম্বন্ধে স্থানীয় ধাতু-প্রস্তুতকারকদের ধারণার অভাব; তিনি বলেছেন তারা ছিল একেবারেই অজ্ঞ আর ভীতু (তারা হয়ত ছিল 'অচ্ছুৎ' উপজাতির মানুষ)।

ভাগলপুরে বিগলনের চুল্লি ছিল মৈসুরে যেমনটা তার চেয়ে ছোট (খাড়াইয়ে ৩·৫ ফুট, অর্থাৎ ১ মিটারের সামান্য বেশি, আর মৈসুরে সেটা ছিল ২·৫-৩ মিটার)। দহন বজায় রাখা হত হাপর দিয়ে হাওয়া ঢুকিয়ে। বিগলন হত দিনে দু'বার। প্রক্রিয়াটা আদিম ধরনের ছিল বলে চুল্লি চালু রাখতে পারত একটি পরিবার, নিরেস লোহা পয়দা হত দিনে ৯·২৫ পাউণ্ড (৪ কিলোগ্রাম), সেটার বিনিময়ে মিলত ৪·৫-৭ কিলোগ্রাম চাল। নিজেদের জমি-বন্দে কৃষিকাজ করতে হত, দু'মাস কোন ফরমাশ থাকত না, তাই প্রত্যেকটি পরিবার অশোধিত লোহা প্রস্তুত করত বছরে ৩০ মন অবধি (প্রায় ১১০০ কিলোগ্রাম); বুকাননের কথা ধরলে, সেটার বিনিময়ে চাল মিলত ১২০০-১৫০০ কিলোগ্রাম। নগদে, এই পরিমাণ লোহার দাম ছিল ৩০-৪৫ টাকা, কেননা থোকে-ক্রেতারা দিত প্রতি মন বাবত ১-১½ টাকা। এইভাবে লোহার পরিবারের

বার্ষিক রোজগার ছিল ২½-৩¾ টাকা (বুকানন বলেন – গড়ে ২¾ টাকা)। তাছাড়া, এক-একটি পরিবার খাটত ৪ কিংবা ৫ বিঘা (০·৫-০·৬৫ হেক্টর) অ-সেচসেবিত জমিতে। তবে তাতে তাদের ছিল এইসব খরচ-খরচা : আকরিক আর কাঠকয়লা ব্যবহার করার স্বত্ব বাবত ১-১ ১/১৬ টাকা, আর জমি-বন্দ ইজারা নেবার বাবত ১২ আনা।

তবু লোহারদের সরাসর আয়ের যে-অঙ্কটা বুকানন দিয়েছেন সেটা মনে হয় অত্যুক্তি, কেননা এতে তিনি লোহা-উৎপাদনের বার্ষিক পরিমাণটা হিসাব করেছেন মোটামুটি ৩০০ দিন ধরে, দিনে দুটো বিগলনের ভিত্তিতে, যদিও আগে তিনি নিজেই বলেন লোহা বিগলন হত বছরে ১৫০ থেকে ২৪০ দিন, বাদবাকি সময় যেত কৃষিকাজে, বুনো ফল সংগ্রহ করতে, কিংবা বিয়ের মরসুমে কিছুই না করে। তাছাড়া, কাঠকয়লা প্রস্তুত করা আর আকরিক আনার কাজে পরিবারের কর্তার কোন সময় বাদ যেত না চুল্লিতে বিগলনের কাজ থেকে এমনটা মনে করা তো কঠিন। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে লোহা-উৎপাদনের বার্ষিক পরিমাণ আর সেটা বিক্রি করে পাওয়া আয়টাকে অনেক বাড়িয়ে দেখান হয়েছে, ধরা হয়েছে হয়ত দ্বিগুণ করে। কাজেই কৃষিকাজ ছিল লোহারদের একেবারেই অপরিহার্য একটা আনুষঙ্গিক বৃত্তি, তারা ছিল – যা বুকানন নিজেই বলেছেন – অত্যন্ত গরিব, আর তার উপর মাতাল।

এক-একটা চুল্লিতে লোহা-উৎপ্রাদন বন্ধে বুকাননের হিসাবটা যেহেতু স্পষ্টতই অ ক, তাই ভাগলপুর জেলায় নিরেস লোহা-উৎপাদনের বার্ষিক পরিমাণ ছিল ৯৬০০ মন (৩৩০ টন), এই মর্মে তাঁর হিসাবটাকে আরও বিচার-বিবেচনা করে দেখা দরকার। কথাটা হল এই যে, এই অঙ্কটা তিনি পেয়েছেন ৩০ মনকে স্রেফ ৩২০ দিয়ে গুণ করে (এটা হল যে-তিনটে জায়গায় লোহাররা জড়ো হয়ে থাকত সেগুলোতে তাদের পরিবারগুলির সংখ্যা)। তবে সেগুলোর একটা জায়গায় প্রত্যেকটা পরি-বারের বিগলন সম্বন্ধে বুকানন পেয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত পরিমিত অঙ্ক – ১২ মন, কিন্তু সেটাকে তিনি মেনে নেন নি। এই সমস্ত বিচার-বিবেচনা থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে এই জেলায় নিরেস লোহা বিগলনের যথার্থ পরিমাণটা ছিল ২০০ টনেরই কাছাকাছি।

বিগলন-করা নিরেস লোহাটাকে ঢালাই করা হত, সেটা করত বিশেষ ধরনের কর্মকাররা। এই ক্রিয়াপ্রণালীতে লোহার মূল ওজনটা

ক্রমে যেত – কর্মকাররা বলত – ৩০:৮ কিংবা ২০:৭ অনুপাতে, কিন্তু বুকানন বলেন, ওরা কমির পরিমাণটাকে বাড়িয়ে বলত, তাঁর নিজ অনুপাতটা হল ৯ : ৪। এইভাবে, ৩ টাকা দামের ৯০ সের নিরেস লোহা থেকে পয়দা হত ৪·৫ টাকা দামের ৪০ সের (১ মন) ঢালাই-করা লোহা, অর্থাৎ টাকায় প্রায় ৮·৬ কিলোগ্রাম, তার মানে ১ টন প্রোসেস-করা লোহার দাম পড়ত মোটামুটি ১২০ টাকা (১২ পাউণ্ড)। নিরেস লোহা বিগলনের ব্যাপারে আমার সংশোধনটা ধরলে ভাগলপুরে ঢালাই লোহা-উৎপাদনের পরিমাণটা ১২,০০০ টাকা দামের ১০০ টন মালের মাত্রার এদিক-ওদিক হত। ধাতু-উৎপাদনের মাত্রা এমনই ছিল বিহারের এই জেলাটিতে, যেখানে ছিল প্রচুর লোহা আকরিক, আর কাঠকয়লা ছিল সস্তা।

সবচেয়ে সরেস লোহা বিক্রি হত মুঙ্গেরে – টাকায় ১৩ পাউণ্ড (প্রায় ৬ কিলোগ্রাম), সেটা ব্যবহৃত হত লাঙলের ফাল তৈরি করার জন্যে, এই ফাল বিক্রি হত কাছাকাছি এলাকাগুলিতে। নিড়ানি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরি করার লোহা ছিল আরও সস্তা : টাকায় ১৭ ½ পাউণ্ড বা ৮ কিলোগ্রাম। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কৃষি সরঞ্জাম তৈরি করতে ব্যবহার করা হত অন্যান্য জিনিসের জন্যে যা তার চেয়ে সরেস লোহা।

ভারতীয় ইস্পাতের গুণাগুণ সম্বন্ধে মতামত আছে কয়েকটা। যেমন, হেইন বৃটেনে ফিরে (আপসোসের কথা, তারিখটা দেওয়া যেতে পারে শুধু খুবই আনুমানিক, তবে মনে হয় উনিশ শতকের প্রথম দশকের শেষাশেষি) ভারতীয় ইস্পাতের কয়েকটা নমুনা নিপুণ বিশ্লেষণের জন্যে পাঠিয়েছিলেন সুবিদিত হাতিয়ার-নির্মাতা স্টড্যার্ডের কাছে, ইনি বলেছিলেন ভারতীয় ইস্পাত 'ছুরি-কাঁটা-চামচ কাঁচি ইত্যাদি সূক্ষ্ম জিনিসের প্রয়োজনে নিখুঁতভাবে উপযুক্ত নয়। এই ধাতুর ভর অসম, আর এই অসমতার কারণটা স্পষ্টতই গলনের ত্রুটি'।* ভারতীয় ইস্পাতটাকে সমসত্ত্ব করার জন্যে সেটাকে তিনি নতুন করে বিগলন করে তখনকার দিনের বৃটিশ মানের সমান সরেস ইস্পাত পেয়েছিলেন, যেটাকে শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি তৈরি করতেও ব্যবহার করা চলত। এই ওস্তাদ ইংরেজ

কারিগর বলেছিলেন, তার ৩০-৪০ বছর আগে ব্রিটিশ ইস্পাত ছিল তাঁকে যে-ভারতীয় ইস্পাত দেওয়া হয়েছিল সেটার চেয়ে নিরেস। তিনি শেষে বলেছিলেন: 'এখন আমার হাতে বেশকিছু পরিমাণ উট্‌স* রয়েছে, সেটা আমি ব্যবহার করতে মনস্থ করেছি বহু প্রয়োজনে। তার চেয়ে ভাল ইস্পাত পাওয়া গেলে সেটা আমি নেব সানন্দে; তবে এযাবৎ আমি যত রকম দেখেছি সেগুলির মধ্যে ভারতীয় ইস্পাতই নিঃসন্দেহে সবার সেরা।'**

লোহা বিগলন এবং সেই লোহা থেকে ইস্পাত প্রস্তুত করার ভারতীয় প্রযুক্তির একটা বিবরণ ১৮৩৯ সালে দিয়েছিলেন একজন সুবিদিত লোহা-উৎপাদক। বিভিন্ন ক্রিয়াপ্রণালীর যথাযথ পারম্পর্য এবং সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোর সংযুক্তির বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোন-কোন ইংরেজ বিশেষজ্ঞের মন্তব্য তিনি উদ্ধৃত করেন, এঁরা বলেছিলেন, যাবতীয় ইস্পাত সেরা-সেরা পশ্চিম-ইউরোপীয় ইস্পাতের চেয়ে সরেস ছিল: 'ব্যবহারিক বিদ্যাগুলির ইতিহাসক্ষেত্রে বরাবর আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য একটা ব্যাপার বলে মনে হয়েছে এটাকে: হিন্দুরা এমন একটা প্রক্রিয়া আয়ত্ত করেছে যেটার তত্ত্ব খুবই দুর্বোধ্য, আর যেটার আবিষ্কারে আপতিকতার স্থান বড় একটা নেই। অথচ, প্রক্রিয়াটা আবিষ্কৃত হয়েছিল কোন বৈজ্ঞানিক অনুমিতি অনুসারে, এমনটা মনে করাও সম্ভব নয়, কেননা এটার তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে শুধু আধুনিক রসায়নের জ্ঞান অনুসারে।'*** এই নির্মায়ক নিশ্চয় করে বলেছিলেন, ইস্পাত প্রস্তুত করার ভারতীয় প্রণালীতে বস্তুত প্রয়োগ করা হত এমন প্রযুক্তিগত নিয়ম যা বৃটেনে দু'জন উদ্ভাবক পেটেন্ট করেছিলেন সবে ১৮০০ আর ১৮২৫ সালে।

কাঠিয়াবাড়ে লোহা-উৎপাদন এবং বৃটেনের লোহার সঙ্গে তুলনায় সেটার পরিব্যয় সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন এল. জেকব একটা বিবরণ পেশ করেছিলেন ১৮৪০ সালে। সেখানে চালু ছ'টা কামারশালের মধ্যে দুটো

তিনি পরিদর্শন করেছিলেন, কিন্তু তিনি বলেন আকারে আর প্রযুক্তিতে সবগুলিই ছিল একই রকমের। যাতে লোহার পরিমাণ ছিল চড়া মাত্রায় এমন আকরিক সেখানেই পাওয়া যেত ৫ থেকে ৩০ ফুট গভীরে। ৭ বোম্বাই মনের সামান্য বেশি আকরিক চাপানো হত চুল্লিতে, তাতে বিগলন প্রক্রিয়া চলত ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ধরে। দিনে দু'বার করে বিগলন হত। এইভাবে পাওয়া নিরেস লোহা চাপানো হত আর-একটা চুল্লিতে, তাতে আর-একবার বিগলন চলত ধাতুমল বের করে দেবার জন্যে। আকরিকের ওজনের প্রায় ৪০ শতাংশ মাল পাওয়া যেত দ্বিতীয় চুল্লি থেকে – এটা মনে হয় কিছুটা বাড়িয়ে ধরা হয়। দ্বিতীয় বিগলনের পরে লোহাটা বিক্রি হত (গুণাগুণ অনুসারে) প্রতি মন ৫ থেকে ৮ কড়ি (১ কড়ি = ¼ টাকা) দামে, অর্থাৎ টাকায় ১০-১৫ কিলোগ্রাম।

কামারশালের দৈনিক হিসাব-নিকাশ ছিল নিম্নলিখিতরূপ (কড়ির হিসাবে) :

মজুরি	১০
আকরিক – ১৫ মন বা ৮ ঝুড়ি	৮
কর	১২
কাঠকয়লা – ১২ ঝুড়ি	১২
মালমশলা বাবত খরচ	১
মোট খরচ	৪৩
দৈনিক উৎপাদের দাম	৪৮
দৈনিক লাভ	৫

ওস্তাদ কারিগর পেত দিনে ১½-২ কড়ি বা ৮-১০ আনা, অর্থাৎ মোটামুটি ১ শিলিংয়ের সমান। লোহারদের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি কষ্টসাধ্য, স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর খাটুনির কথা বলেন এই ইংরেজ আমলাটি। প্রত্যেকটা চুল্লিতে বার্ষিক উৎপাদের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৫ বোম্বাই খাণ্ডি বা ১৪-১৫ টন। মরসুমের দৈর্ঘ্য অনুসারে কাঠিয়াবাড়ে লোহা উৎপন্ন হত ১০০-১৫০ টন।

ভারতে সবচেয়ে উন্নত ধাতু-শিল্প সংস্থা এবং বৃটেনের তখনকার ধাতু-শিল্পের মধ্যে পার্থক্যের আরও বেশি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার জন্যে এই পরিচ্ছেদের কালানুক্রমিক কাঠামটাকে আমি ছাড়িয়ে গিয়েছি।

ভারতে লোহা আর ইস্পাত উৎপাদনের কোন-কোন সাধারণ নিয়ম সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ধারণা করতেও এই তুলনাটা সহায়ক হবে। এসম্বন্ধে তথ্যাদি প্রচুর রয়েছে বলে মনে হলেও এটার বিভিন্ন দফা সাধারণত বড় একটা তুলনীয় নয় দুটো মূল দফা ছাড়া: উৎপাদক এবং খুদে মালিকের (মালিক যেক্ষেত্রে থাকে) পারিশ্রমিক, আর আখেরী উৎপাদের দাম। হেইন-এর দুটো বিবরণে মজুরের পারিশ্রমিক একই: দিনে ২ আনা (অর্থাৎ মাসে প্রায় ৪ টাকা, কিন্তু উৎপাদন মরসুমী বলে প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে কম); জেকব বলেন আরও বেশি – দিনে প্রায় ৫ আনা, তবে গুজরাটে মজুরি কিছুটা বেশি ছিল সাধারণভাবেই। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, গোটা শিল্পে ঐ অঙ্কটা ছিল মোটামুটি মাঝামাঝি।

অগঠিত লোহাপিণ্ডের দাম বেশি-কম হত অনেক বেশি পরিমাণে, কেননা আকরিক আর কাঠকয়লা বাবত খরচ নির্ভর করত স্থানীয় অবস্থার উপর, আর আকরিকের গুণাগুণ কোন মাফিকসই ছিল না আদৌ। তাছাড়া, তথ্যের আকরগুলিতে লোহাপিণ্ড উৎপাদনের খরচ এবং সেটা বিক্রি করার দাম ভাগ-ভাগ করে দেখান হয় নি (যেক্ষেত্রে পিণ্ডটা বিক্রি হত প্রোসেসিংয়ের আগে)। তবে আখেরী উৎপাদ লোহা কিংবা ইস্পাতের দাম সমস্ত ক্ষেত্রেই হত টাকায় ৩-৬ কিলোগ্রাম চৌহদ্দির ভিতরে। বাজার-দরের নজির থেকেও সেটা দেখা যায়। যেমন, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বহালকোটে স্থানীয় আধ-মন বা ১৫ পাউণ্ড (প্রায় ৭ কিলোগ্রাম) লোহার দাম ছিল ২ টাকা।* ১৮১৮ সালে খান্দেশের বাজারে-বাজারে ইস্পাত বিক্রি হত প্রতি মন ১৮-২৫ টাকায়।** দুঃখের কথা, স্থানীয় মনের পরিমাণটা নির্দিষ্ট করে বলা হয় নি সংশ্লিষ্ট দলিলে, তবে মহারাষ্ট্রে সাধারণত যা ছিল (৪০ পাউণ্ড) তাই ধরে নিলে এক কিলোগ্রাম ইস্পাতের দাম পড়ত ১-১½ টাকা মাত্র।

কিন্তু এই অবস্থায় একটা নতুন উপাদানের সম্মুখীন হতে হয় –

সেটা বৃটিশ প্রতিযোগিতা। আঠার শতকের মাঝামাঝি সময় নাগাত বৃটিশ ইস্পাত হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতীয় ইস্পাতের চেয়ে সস্তা এবং সরেস, সেটা ব্যবহৃত হত অস্ত্র তৈরি করতে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর মারাঠা সর্দারদের মধ্যে খোলাখুলি যুদ্ধবিগ্রহের সময়গুলোতে ইস্পাত সামরিক-গুরুত্বসম্পন্ন বলে গণ্য হত, সেটাকে মহারাষ্ট্রে চালান করতে দেওয়া হত না। যেমন, বোহ্‌রা এবং অন্যান্য বণিকেরা বোম্বাইয়ের পোতাশ্রয় পার করে মারাঠাদের জন্যে যে-লোহা নিয়ে যেত সেই চালান আঠার শতকের অষ্টম দশকে নিষিদ্ধ করেছিল বোম্বাইয়ে কোম্পানির পরিষদ।*

উনিশ শতকের পঞ্চম দশকের গোড়ার দিকে ভারতে বৃটিশ লোহা আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল দেড়-লাখ টন; বৃটেনে লোহা উৎপাদন ১৭৮৮ সালের ৬৮ হাজার টন থেকে বেড়ে ১৮২৮ সালে দাঁড়িয়েছিল ৭ লাখ ৩ হাজার টন, আর এক-একটা চুল্লিতে উৎপাদনের গড় পরিমাণ ঐ সময়ে ৮০০ টন থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২৫২৯ টন। তাই ভারতে যেসব এলাকায় লোহা উৎপন্ন হত সেগুলিতে পর্যন্ত সাধারণত অপেক্ষাকৃত সরেস ইউরোপীয় লোহা বিক্রি হত অপেক্ষাকৃত কম দামে।**

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গোড়ার দিককার পুঁজিতান্ত্রিক ধরনের সবচেয়ে উন্নত ভারতীয় লোহা-উৎপাদনও যেমন উৎপাদনের পরিমাণ তেমনি আর্থনীতিক সূচকের দিক থেকেও বৃটিশ ধাতু-শিল্পের সঙ্গে তুলনীয় ছিল আরও কম মাত্রায়। পুঁজিতান্ত্রিক কিংবা প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক ধরনের অন্যান্য ভারতীয় শিল্পের (সেগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে জাহাজ-নির্মাণই ছিল আগুয়ান) সঙ্গে লোহা উৎপাদনেরও লুপ্ত হওয়াটা ছিল অবধারিত।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের টুকরো-টাকরা

উল্লিখিত তথ্য থেকে দেখা যায়, বিস্তারিত শ্রমবিভাগ যেগুলোতে ছিল এমনসব কর্মশালা বেশ বহুবিস্তৃতই ছিল প্রাক্‌বৃটিশ ভারতের

কোন-কোন শিল্পে। তবে ধাতু-শিল্প আর রঞ্জন-শিল্প থেকে দেখা গেছে, শ্রমবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশক্তি অবাধে বিক্রি করতে পারে এমন শ্রমিক, আর পুঁজির মূর্তিস্বরূপ মনিবের মধ্যে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি সমস্ত ক্ষেত্রে। তাই বিস্তারিত শ্রমবিভাগ থাকলেই যেকোন কর্মশালাকে বেকড়ারে পুঁজিতান্ত্রিক নির্মায়ক ধরনের সংস্থা বলে ধরাটা ঠিক নয়। যেসব সংস্থায় প্রস্তুত করা হত চিনিজাত দ্রব্য-সামগ্রী আর উদ্ভিজ্জ তেল সেগুলো সম্বন্ধে পরবর্তী বিবরণে সেটার যাথার্থ্য আবার দেখা যাবে।

প্রাক্‌বৃটিশ ভারতে শিল্পোৎপাদনে মজুরি-শ্রম নিয়োগ সম্বন্ধে খুবই বিস্তারিত মালমশলা রয়েছে ভারত সম্বন্ধে বিভিন্ন (সেগুলির মধ্যে সোভিয়েত গ্রন্থকারদেরও) বিচার-বিশ্লেষণে। গোড়ার দিককার পুঁজিতান্ত্রিক সংস্থার উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে ছাড়াও ছিল মধ্য আঠার শতকের বাংলায় রেশমী সুতো-কাটা শিল্পে, কাশ্মীরে রেশম-বোনা শিল্পে, আর আঠার শতকের শেষের দিকে নীল-শিল্পে। পরবর্তী উপাত্তের ভিত্তিতে নিশ্চয় করে বলা যায় শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে চালানো বড়-বড় কর্মশালা ছিল কাগজ-উৎপাদনের ক্ষেত্রে।

গুজরাটের বিখ্যাত জাহাজ-নির্মাণ ক্ষেত্রগুলিতে উৎপাদন-প্রক্রিয়াটা সংগঠিত ছিল মনে হয় পুঁজিতান্ত্রিক ধারায়, তাতে ছিল খুবই উন্নত ধরনের শ্রমবিভাগ। প্রকৃতপক্ষে, গুজরাটে জাহাজ-নির্মাণ শিল্প যেসব প্রযুক্তিগত প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারত সেগুলো নিয়ে এঁটে উঠতে পারত আর কোন রকমের উৎপাদন? একজন ইংরেজ পর্যবেক্ষক লিখেছেন: 'বোঝা বইবার দিক থেকেই হোক, কিংবা দ্রুত জলযাত্রার দিক থেকে হোক, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে উপযুক্ত ইংলণ্ডের যেকোন জাহাজের নির্মাণের যাবতীয় সুকৌশল আর কারিগরী দক্ষতার সবচেয়ে নিপুণ উদাহরণগুলি-সমন্বিত মডেলকে সুরাটের জাহাজ-নির্মাণের সূত্রধররা ধরে নেবে সেটা প্রথমে ডিজাইন করেছিল যেন ঠিক তারাই। যে-কাঠ দিয়ে তারা নিজেদের জাহাজ নির্মাণ করে সেটা খুবই উপযুক্ত হতে পারে ইউরোপে আমাদের যুদ্ধজাহাজের জন্যে; কেননা সেটার আছে এই উৎকর্ষ: বুলেটের চোটে সেটা কখনও ফাটে না...'* সুরাটের জাহাজ-

নির্মাণ কেন্দ্রগুলিতে ৫০০-১০০০ টন ডিসপ্লেসমেণ্টের জাহাজ নির্মিত হত, এইসব জাহাজ জলযাত্রা করতে পারত চীনে আর ইউরোপে।

জাহাজ-নির্মাণ আর কাগজ-প্রস্তুত শিল্পে ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় শিল্পে পুঁজিতান্ত্রিক কর্মশালা ধারার প্রাধান্য ছিল না। উৎপাদন আর কর্মনিয়োগের পরিমাণের দিক থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য শিল্পে – যেমন তাঁত-বোনা আর লোহা-ইস্পাত উৎপাদনে – অমন ধরনের কর্মশালা গড়ে উঠেছিল শুধু উপর-স্তরে, আর উৎপাদনের কোন একটা ধারা কিংবা কোন শিল্পজোটের কাঠামের ভিতরে সেটা সামাজিক শ্রমবিভাগের কোন বিশেষ ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় নি। পুঁজিতান্ত্রিক ধারায় সংগঠিত কর্মশালাগুলোর উৎপাদ নিয়ে পণ্য-পরিচলন তখনও নিয়মিত বাজারী সম্পর্কতন্ত্র হয়ে ওঠে নি – কর্মশালাগুলোর নিজেদের মধ্যেও না, সেগুলো আর কৃষির (বাজারের জন্যে উদ্দিষ্ট কৃষির যে-অংশ সেটার) মধ্যেও না।

স্পষ্ট ধারণা জন্মায় যে, ঔপনিবেশিক বিজয়ের আগে ভারতে ম্যানুফ্যাকচারি বহুবিস্তৃত হয়ে ওঠে নি, কাজেই ম্যানুফ্যাকচারি আমল আসে নি। তাই প্রাক্‌বৃটিশ ভারতে এখানে-ওখানে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে উঠলেও সেটা পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় নি। ভারত ঔপনিবেশিক দাসদশায় পড়ার আগে দেশটিতে উৎপাদন-শক্তির যে-অবস্থা ছিল তার একটি চমৎকার চিত্র আছে জওহরলাল নেহরুর 'ভারত আবিষ্কার' ('Discovery of India') বইয়ে। ভারতীয় কারিগরদের দক্ষতা আর তাদের তৈরি-করা জিনিসের চমৎকারিতার কথা, ব্যবসাবাণিজ্য আর আর্থিক ব্যবস্থাপনের খুবই উন্নত সংগঠনের কথা তিনি বলেছেন স্বদেশভক্তের গর্বভরে। জোর দিয়ে খুব উচিত কথাই তিনি বলেছেন যে, বৈদেশিক রাজনীতিক শাসনের ফলে 'দ্রুত ধ্বংস হয়ে যায় ভারত গড়ে তুলেছিল যে-অর্থনীতি, সেটার জায়গায় এল না স্পষ্ট-নির্দিষ্ট কিংবা গঠনমূলক কিছুই'।* তবে একমত হওয়া যায় না তাঁর এই উক্তিটির সঙ্গে: বৃটিশ বিজয়ের আগে 'ভারতের অর্থনীতি এইভাবে এগিয়ে এমন উঁচু পর্বে পৌঁছেছিল যতটা পারা যেত শিল্প-বিপ্লবের আগে'।**

আর আর্থনীতিক প্রশ্নাবলি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করার জন্যে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালে, — দেশটিতে শিল্প-বিপ্লব ঘটল না কেন সেটা নিয়ে তাতে আলোচনা হয়। এই আলোচনার বিবরণ থেকে দেখা যায়, শিল্প-বিপ্লব বলতে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছিলেন ক্ষুদ্রায়তনে পণ্য-উৎপাদকদের ভিত্তিতে পুঁজিতান্ত্রিক কর্মশালার স্থাপনা, অর্থাৎ শিল্পে পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভব; শিল্প-বিপ্লব বলতে তাঁরা বোঝান নি এটা: শ্রমবিভাগভিত্তিক পুঁজিতান্ত্রিক কর্মশালার (ম্যানুফ্যাকচারি) পর্ব থেকে কারখানা উৎপাদনের পর্বে উত্তরণ। নেহরুর বই থেকে আমার উদ্ধৃত অংশটায় 'শিল্প-বিপ্লব' কথাটা তিনি হয়ত পূর্বোক্ত অর্থেই ব্যবহার করেন।

ঐ সম্মেলনে সতীশ চন্দ্র যে-থিসিস পেশ করেন তাতে তিনি বুনিয়াদী বলে গণ্য করেন এই প্রশ্নগুলিকে: শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে সম্পর্ক; অন্তর্বাণিজ্য আর বহির্বাণিজ্যের ধরন আর পরিমাণ; শিল্পের সংগঠন; বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অবস্থা। তাঁর মতে, গ্রামাঞ্চলে পরিস্থিতি যা ছিল তার ফলে শহর থেকে সেখানে মালপত্রের চালান সীমাবদ্ধ ছিল বটে, তবু ভারতীয় গ্রামাঞ্চল একেবারেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল এমন উক্তি অতিকথা — বিশেষত অপেক্ষাকৃত উন্নত এলাকাগুলির বেলায়। ভারতীয় শহর ছিল সামরিক সদর ঘাঁটি, এই মর্মে বার্ণিয়ারের উক্তি সমর্থন করার কোন ভিত্তি দেখতে পান না সতীশ চন্দ্র; তিনি বলেন, শহর ছিল বিস্তীর্ণ বাজার, যা কালক্রমে হয়ে দাঁড়িয়েছিল উৎপাদনকেন্দ্র। সতীশ চন্দ্র নিজেই লক্ষ্য করেন যে, বহির্বাণিজ্য আর উপকূল-বাণিজ্যের প্রভাবে শহরগুলি গড়ে উঠেছিল সর্বোপরি গুজরাট, করোম্যাণ্ডেল আর মালাবারের উপকূল বরাবর, আর বাংলায় গঙ্গানদী বরাবর প্রসারিত সংকীর্ণ ভূভাগে, আর তাছাড়া, কোন-কোন রাজনীতিক কারণের (নজরানা আদায়) প্রভাব এবং অন্তর্বাণিজ্য প্রসারের ফলে দোয়াবে — বিশেষত এটা বিবেচনায় রেখে উল্লেখযোগ্য এই যে, দেশজোড়া কিংবা আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের ক্ষেত্রে শহরগুলির স্থান-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর নেই শহরগুলি উৎপাদনকেন্দ্র হয়ে ওঠা সম্বন্ধে তাঁর উক্তিতে।

ভারতের যা মহাদেশীয় আয়তন তাতে দেশটির সর্বত্র উন্নয়নের অনুরূপ মাত্রা আশা করাটা অবাস্তব — সতীশ চন্দ্রের এই বক্তব্যটা সঠিক। যেমনটা ইউরোপে সেইভাবে শিল্পোৎপাদন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল

কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকায়: গুজরাট, করোম্যাণ্ডেল এবং মালাবারে, আর কিছুটা কম পরিমাণে বাংলায়। টেক্সটাইল, ধাতু, খনি এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যাপারিক পুঁজি ঢোকার কথা তিনি বলেছেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, উৎপাদনে নতুন প্রযুক্তির বিকাশে আগ্রহান্বিত ছিল না বণিকেরা। ওস্তদ-কারিগরের স্থানটাও স্পষ্ট নয়।

বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতের পিছিয়ে-পড়াটা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আঠার শতক নাগাদ, এটা সতীশ চন্দ্র লক্ষ্য করেন, কিন্তু সেটাকে তিনি সংশ্লিষ্ট করেন ধোঁয়াটে অ-যুক্তিবাদ, বর্ণভেদ প্রথা আর সমস্ত বৈদেশিক ধ্যান-ধারণার প্রতি বিরুদ্ধতার প্রভাবের সঙ্গে। তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও বলেন, ফৌজের প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে ঘটেছিল বিভিন্ন অগ্রগতি: ধাতুবিদ্যার প্রসার, কামান ঢালাই করা, আর মাস্কেটের এবং জাহাজ-নির্মাণেরও উন্নতি। তিনি তুলে ধরেন এই প্রকল্পটা: উপকূলবর্তী গুজরাট, আর হয়ত করোম্যাণ্ডেল এবং মালাবারও পৌছে গিয়েছিল – তাঁর ভাষায় – 'পুঁজিতান্ত্রিক পর্বের প্রাথমিক পর্বে', যে-প্রকল্প তখনকার মতো অনুমানই থেকে গিয়েছিল বলেই মনে হয়। সতীশ চন্দ্র আরও বলেন, উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে বৃটিশ বিজয়ের ফলে অন্তর্বাণিজ্য লণ্ডভণ্ড হয়েছিল শুধু তাই নয়, অধিকন্তু ক্রমে কমে গিয়েছিল বহির্বাণিজ্য, আর ধ্বংস হয়েছিল শিল্পোৎপাদন। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় পুঁজি চলে যায় ভূমি আয়ত্ত করার দিকে, তাতে সেটা অবাধে ভূমি হস্তান্তরণের বৃটিশ ঔপনিবেশিক আইন কাজে লাগিয়েছিল।

উপসংহারে আমি জোর দিয়ে বলতে চাইছি যে, আলোচ্য কাল-পর্যায়ে ভারতে কোন মৌলিক পূর্বশর্ত গড়ে ওঠে নি কারখানা-উৎপাদনে উত্তরণের জন্যে (মার্কসবাদীরা 'শিল্প-বিপ্লব' বলতে বোঝায় সেটাকে) – যেটা হল উন্নত ধরনের পুঁজিতান্ত্রিক কর্মশালা, যেখানে থাকে বিস্তারিত শ্রমবিভাগ, সেটা সর্বোপরি শ্রমের সরঞ্জাম তৈরি করায়। শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে স্বাধীন পণ্য-বিনিময়ের মধ্যে ছিল খুবই স্বল্পসংখ্যক প্রধানত ভোগ্য জিনিস। পণ্য-উৎপাদন, যা সম্প্রদায়-বহির্ভূত হস্তশিল্পে আর কৃষকের অর্থনীতিতে ছিল পৃথক-পৃথক উপাদানের আকারে, সেটা নিজস্ব রূপে তখন পরিণত হয়ে ওঠে নি, কেননা কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রি করা হত প্রধানত ভোগ-ব্যবহারের জিনিস পাবার জন্যে কিংবা খাজনা কর ইত্যাদি দেবার সংস্থানের জন্যে।

খামারিরা পুনরুৎপাদনের ব্যবস্থা করতে জিনিস কিনত শুধু ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে, আর কারিগরেরা কিনত শুধু আধা-তৈরি জিনিস আর মালমশলা (সুতো, রঞ্জক, ধাতু, কাঠ, ইত্যাদি) – সেগুলোর বাইরে কিছুই না। অর্থাৎ কিনা, যা-ই হোক, পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক উদ্ভবের বিস্তৃত ভিত্তি যোগাবার মতো পরিসরে পরিণত হয়ে উঠল না ভারতের ক্ষুদ্রায়তনের পণ্য-উৎপাদন। যেসব বিচ্ছিন্ন টুকরো-টাকরা শিল্পক্ষেত্রে এমন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেগুলোর অর্থসংস্থান হত (বহির্বাণিজ্য বাদে) খাজনা থেকে, আর ব্যাপারিক পুঁজি তখন ছিল সবে অর্থনীতির বিদ্যমান আকারগুলোতে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার প্রক্রিয়ার মধ্যে – খাস পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াটাকে কিংবা সেটার প্রযুক্তি না বদলে। ভারতে ক্ষুদ্রায়তনের পুঁজিতান্ত্রিক ধরনের উৎপাদন হত চিরাগত খাজনা-প্রাপ্তা আর বিদেশী ব্যবহারকদের জন্যে, কিংবা (যেমন ধাতু-শিল্পে) উৎপন্ন হত এমনসব জিনিস যেগুলো পরে হয়েছিল বৃটিশ কারখানা-উৎপাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে প্রথম-প্রথম শিকার, এই বিনাশ ছিল ইতিহাসনির্দিষ্ট।

ভারতের সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নয়নের মাত্রা সম্বন্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ – যদিও নেতিবাচক – সূচক এই: ছিল না উন্নত আকারের শহুরে স্বশাসন, শহরগুলির স্বাধীনতা আর স্বাধীন রাজনীতিক কৃতির সামর্থ্যের তো কথাই ওঠে না। ব্যাপারী, মহাজন আর কারিগরদের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণ আর সম্প্রদায় সংক্রান্ত ব্যবস্থা এবং কর ধার্য করার নিয়ম নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটা তোলা হয়েছে আগেই। তবে ভারতীয় শহরের বিশেষত্বগুলোর ব্যাখ্যা মেলে শেষে গিয়ে দেশটির জনসমষ্টির গঠনের মাঝে, আর, একদিকে জনসমষ্টির পৃথক-পৃথক অংশ এবং অন্য দিকে রাষ্ট্র আর খাজনা-প্রাপ্তা শ্রেণীগুলোর মধ্যে সম্পর্কের মাঝে।

এন. কে. সিনহা বলেন, 'বাংলায় বৃটিশ শাসন আরম্ভ হবার আগে শহরগুলিতে সর্বজনীন নাগরিক জীবন ছিল না। খুব বড়-বড় শহরগুলিও ছিল খুবই বেড়ে-যাওয়া গ্রামের চেয়ে বড় একটা বেশি কিছু নয়। এইসব শহরে যারা থাকত তাদের মধ্যে খুব কম লোকই সেখানে স্থায়ী বাসিন্দা হবার কথা ভাবত। তারা ছিল স্বল্পকালের শহরবাসী। শহুরে অভিজাত সম্প্রদায় বলে কিছু ছিল না – স্থায়ী বাসিন্দা ধনী

বণিক শ্রেণী ছিল না এইসব শহরে। নিগমবদ্ধ শহর ছিল না, শিল্প-ক্ষেত্রের লালনাগার ছিল না। শহুরে মধ্য শ্রেণীও ছিল না।'* এটা মোটের উপর ঠিকই, কিন্তু মনে হয় জোর দেওয়া হয়েছে কিছুটা বেশি। যেমন, বাংলার শহরগুলিতে নিশ্চয়ই ছিল স্থায়ী মেহনতী জনসমষ্টি – প্রথমত কারিগরেরা। ছিল বিভিন্ন ধনী বণিক পরিবার আর ব্যাঙ্কার পরিবারও (যেমন, শেঠেরা – তারা দীর্ঘকাল ধরে ছিল মুর্শিদাবাদের স্থায়ী বাসিন্দা)। শহুরে মানুষের স্থানবদল সম্বন্ধে সিনহার মন্তব্য প্রযোজ্য হয়ত অভি-জাতদের সম্বন্ধে – বিশেষত সামরিক লোক-লশকর, তাদের পোষ্যবর্গ আর কর্মচারীদের সম্বন্ধে। আর একেবারেই অন্য ব্যাপার হল এটা: যেমন সারা ভারতে তেমনি বাংলায় বহু শহরে জনসমষ্টির মঙ্গল, আর তাই আকার নির্ভর করত বিভিন্ন সামরিক অভিযানের ভাগ্য-পরিবর্তন এবং স্থানীয় শাসক আর হোমরা-চোমরাদের বাড়-বাড়ন্তের উপর।

যা-ই হোক, চিরাগত সম্পর্কের পাশাপাশি নতুন-নতুন ব্যাপারও দেখা দিয়েছিল ভারতের সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামে। বিভিন্ন আকর থেকে পাওয়া তথ্যাদি থেকে আসে এই সিদ্ধান্ত: আঠার শতক নাগাদ ভারতে ভূমি-মালিকানা আর রায়তিস্বত্বের আকার আর উন্নত এলাকা-গুলিতে হস্তশিল্পে সামাজিক শ্রমবিভাগ এবং উৎপাদন-সম্পর্ক পৌঁছেছিল উন্নত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিশেষক মাত্রায়।

ব্রিটিশ পুঁজির আদি সঞ্চয়ন এবং ভারতের সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থার উপর সেটার প্রভাব

ব্রিটিশ ব্যাপারিক পুঁজি এবং ভারতে প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী

যেসব দেশে ঘটেছিল আদি সঞ্চয়ন, আর অন্যান্য রাষ্ট্র এবং সেসবের শাসক শ্রেণীগুলির পুঁজি-সঞ্চয়নের লক্ষ্যস্থল ছিল যেসব দেশ, এই দু'রকমেরই দেশগুলির ক্ষেত্রে ঐ সঞ্চয়ন-প্রক্রিয়ার যুগের মূল পরিণতিগুলো নির্দিষ্ট হয়ে যায় উনিশ শতকের গোড়ার দিক নাগাদ। তবে এইসব পরিণতির বিশ্লেষণ কঠিন হয়ে পড়ে এই অবস্থাটার দরুন: কোন-কোন আবশ্যক শর্তাধীনে ছাড়া ইউরোপের অনেক দেশকে অমুক কিংবা অমুক বর্গে ফেলা যায় না। দুষ্করতা দেখা দেয় এই কারণেও: সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে আদি সঞ্চয়ন-প্রক্রিয়াটা মোটের উপর সমাধা হয়ে গিয়েছিল শুধু ব্রিটেনে, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশে সেটা হয় আদৌ শুরুই হয় নি, নইলে চলে কাটা-ছাঁটা কিংবা অসম্পূর্ণ আকারে। এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলিতে ঔপনিবেশিক শোষণের পরিমাত্রা আর প্রণালীতে মৌলিক ধরনের পার্থক্য ছিল। এই দুটি বিশাল মহাদেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কোন-কোন দেশে এবং অঞ্চলে ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ তখনও আর্থনীতিক আকারে প্রকাশ পায় নি, আর অন্যান্য দেশে এবং অঞ্চলে সেটার লক্ষণীয় ক্রিয়া ঘটেছিল শুধু উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে। এইভাবে, আদি সঞ্চয়নের যুগে উপনিবেশবাদ পৃথিবী-জোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল সামরিক আর রাজনীতিক বিজয়ের ক্ষেত্রে, কিন্তু তখনও তেমনটা হয়ে ওঠে নি অর্থনীতিক্ষেত্রে।

সতর আর আঠার শতকে বিষয়ীগত দিক থেকে বুর্জোয়া এবং বিষয়গত পরিণতির দিক থেকে পুঁজিতান্ত্রিক ছিল শুধু ব্রিটিশ আর ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক কর্মনীতি, কিন্তু তাতেও কোন-কোন শর্ত জুড়তে

হয়। তাই ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন জাতীয় আদি সঞ্চয়ন-প্রক্রিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছিল শুধু বৃটেনে আর হল্যাণ্ডে (যদিও প্রক্রিয়াটার পরিসর আর পরিমাত্রার দিক থেকে বৃটেন তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল বহুদূর)। স্বৈরতান্ত্রিক ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ সামাজিক আর আর্থনীতিক প্রক্রিয়ার উপর দেশটির ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের ক্রিয়াফল হয়েছিল খুবই পরস্পরবিরোধী। সামন্ততান্ত্রিক স্পেন আর পোর্তুগালের ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের সম্পদ দেশ-দুটির রাজকোষে ঢুকে সামন্ততান্ত্রিক আর যাজকতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার শক্তি বাড়ায় আর তার বিপরীতে বুর্জোয়া এবং সাধারণ মানুষ নিয়ে যে-প্রতিপক্ষ সেটাকে দুর্বল করে ফেলে। স্পেন আর পোর্তুগালের সামন্ততান্ত্রিক রাজ-দুটোর 'দাম-বিপ্লব' কর্ম-বন্দেজ আর জাতিবিরোধী কর্মনীতির ফলে তাদের বিদেশে লুট-করা সম্পদ দেশ-দুটি থেকে বেরিয়ে যায় – যে-লুণ্ঠিত সম্পদ আদি সঞ্চয়নে সহায়ক হয় অন্যান্য দেশে, প্রথমত হল্যাণ্ডে আর বৃটেনে।

কোন-কোন শক্তির ঔপনিবেশিক কর্মনীতি জাতীয় আদি সঞ্চয়ন-প্রক্রিয়ার অঙ্গ-উপাদান ছিল না, তা সত্ত্বেও ষোল-আঠার শতকের উপনি-বেশবাদকে আদি সঞ্চয়নের যুগের উপনিবেশবাদ বলে অভিহিত করাটা খুবই সঠিক। যা-ই হোক, ঐ কালপর্যায়ের ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের প্রধান ঐতিহাসিক ফলটা এই যে, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে এসে ইউরোপে ঢুকল যেসব মূল্যবস্তু সেগুলো সরাসরি কিংবা পরোক্ষে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনক্ষেত্রে চালিত হল সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিতে – সর্বপ্রথমে বৃটেনে। তাছাড়া, বৃটেনে নিজস্ব ঔপনিবেশিক কর্মনীতি, বিশেষত ভারত সম্বন্ধে সেই কর্মনীতি, আর সবসময়ে সরাসরি না হলেও শেষে গিয়ে পুঁজির আদি সঞ্চয়নের জাতীয় প্রয়োজনে এই কর্মনী-তির বশবর্তিতা স্বতঃপ্রতীয়মান।

তবে সম্পর্কের এই রকমফেরটার অতি-সরলীকরণও চলে না। কথাটা হল এই যে, বৃটেনের শিল্পক্ষেত্রের পুঁজির নয়, ব্যাপারিক পুঁজির সংস্থা ছিল বৃটিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, তার ফলে কিছু-কিছু বিরোধ দেখা দিয়েছিল শিল্পক্ষেত্রের বুর্জোয়া আর ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চক্রতন্ত্রের মধ্যে, এই কোম্পানির লাভ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে চালান করার পর্ব-বিভক্ত প্রণালী প্রচলিত ছিল এই সংস্থাটায়। যেসব জিনিস পরিচলনক্ষেত্রে যেত পণ্য হিসেবে সেগুলোর উৎপাদন চলত কোন

অবস্থায় সে-সম্বন্ধে, আর আদিম সম্প্রদায়, না, দাস-মালিকানার সমাজ, না, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ, কোনটার ধারায় সংগঠিত ছিল অর্থনীতি সে-সম্বন্ধে ব্যাপারিক পুঁজি কিছুটা নির্বিকার থেকে গিয়েছিল পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্র গড়ে ওঠা সত্ত্বেও। 'যেসব বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে মধ্যস্থ হিসেবে ব্যাপারিক পুঁজি সক্রিয় থাকে সেগুলো সেটার পক্ষে নির্দিষ্ট, ঠিক যেভাবে সেগুলো নির্দিষ্ট অর্থ আর অর্থের পরিচলনের পক্ষে। একমাত্র যা আবশ্যক সেটা এই যে... এইসব বিসদৃশ বস্তু প্রাপ্তিসাধ্য হবে পণ্য হিসেবে: উৎপাদনটা পুরোপুরিই পণ্যের উৎপাদন, না, স্বাধীন উৎপাদকদের নিজেদের উৎপাদন থেকে তাদের সাক্ষাৎ প্রয়োজনগুলো মিটিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকে সেটাকে বাজারে ফেলা উৎপাদ মাত্র, তাতে কিছু আসে-যায় না।'*

মধ্যযুগে ইতালীয় আর্মেনীয় আরব ভারতীয় চীনা এবং অন্যান্য ব্যাপারিক পুঁজি (আর অপেক্ষাকৃত হাল আমলে বৃটিশ আর ওলন্দাজ ব্যাপারিক পুঁজি তো বটেই) অত বিপুল ভৌগোলিক অঞ্চলে কাজ চালাল, সেটা আরও ভালভাবে বুঝতে সুবিধে হয় ব্যাপারিক পুঁজি যে সামাজিক-আর্থনীতিক পরিবেশে কাজ চালায় সেটা সম্বন্ধে (এবং সেটার পৃথক-পৃথক অঙ্গ-উপাদান সম্বন্ধে) এই পুঁজির নির্বিকার ভাব দিয়ে। কিন্তু এই নির্বিকার ভাবের বহিস্থ দিক ছাড়াও ছিল একটা অভ্যন্তরীণ দিক, সেটা হল স্বদেশের সামাজিক-আর্থনীতিক রূপান্তরে বিষয়গত আগ্রহের অভাব কিংবা সেটার প্রারম্ভিক অস্তিত্ব। যেসব এশীয় দেশে ইউরোপীয় ব্যাপারিক পুঁজি রাজনীতিক ক্ষমতা কিংবা অন্তত পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল সেগুলির বদ্ধ গঠনে সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছিল ব্যাপারিক পুঁজির আর্থনীতিক 'রাক্ষুসে খাই'য়ের সামাজিক রক্ষণশীলতা।

তবে এই রক্ষণশীলতাটা দু'মুখো। ভারতে আর চীনে অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা আর **'প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক, জাতীয় উৎপাদন-প্রণালীর সংগঠন'** ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষয়কর প্রভাবের পথে যে-প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটার কথা উল্লেখ করেছেন মার্কস।** যে-কথাটা উদ্ধৃত করা হল তার থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতে 'এশীয়', সামন্ততান্ত্রিক কিংবা অন্য কোন বিচ্ছিন্ন

উৎপাদন-প্রণালীর প্রতি মার্কসের নাকি পরম এবং বেকড়ার পক্ষপাতিত্ব ছিল এই মর্মে কথা তোলাটা একেবারেই ভিত্তিহীন। দেখা যাচ্ছে এই রচনায় তিনি নির্দিষ্ট আকারে খুবই স্পষ্ট তুলে ধরেছেন নিজের এই অভিমত: ভারতীয় (এবং চীনা) সামাজিক-আর্থনীতিক গঠন ছিল নানা-ক্ষেত্রযুক্ত (ক্ষেত্রই সংশ্লিষ্ট বিন্যাসের মর্ম নির্দিষ্ট করে দেয়, এইভাবে সেটাকে তুলে ধরার প্রশ্নটার উপর জোরও পড়েছে এতে)।

বিভিন্ন প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর উপর বৃটিশ ব্যাপারিক পুঁজির প্রভাব নিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে মার্কসের এই উপস্থাপনায়; সেগুলোর মধ্য থেকে তিনি তুলে ধরেছেন শুধু সেই উৎপাদন-প্রণালীটাকে যেটার ভিত্তি ছিল 'ক্ষুদ্রায়তনের কৃষি আর কুটিরশিল্পের সমন্বয়', সেটার সঙ্গে ভারতে সংযোজিত ছিল গ্রাম-সম্প্রদায় সংস্থা, যার অবলম্বন ছিল ভূমিতে সম্প্রদায়গত মালিকানা।* মনে হয় মার্কস ধরে নেন যে, এই উৎপাদন-প্রণালীটা বস্তুত বিভিন্ন উৎপাদন-প্রণালীর সমগ্র কাঠামে প্রাধান্যশালী হয়ে সেটাকে সাধারণভাবে সুস্থিত করে তুলেছিল। অন্যান্য উৎপাদন-প্রণালী সম্বন্ধে, তাই বৈদেশিক ব্যাপারিক পুঁজির সঙ্গে সেগুলোর সংস্রবের বাস্তব পরিণতি সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি এই রচনাংশে। তবে, বৃটিশ প্রতিযোগিতার ফলে যাদের সর্বনাশ হয়েছিল ঢাকার সেই তন্তুবায়দের দূরদৃষ্ট সম্বন্ধে তাঁর সুবিদিত উক্তি অনুসারে বিবেচনা করলে দেখা যায় তাঁর বিবেচনাধারা মূল উৎপাদন-প্রণালী সম্বন্ধে যা সেটা থেকে পৃথক এবং কম অনুকূল ছিল ঐ প্রধানত ক্ষুদ্রায়তনে পণ্য-উৎপাদনের সুস্থিতি সম্বন্ধে। টুকরো-টাকরা পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক যা ছিল সেগুলোর উপর বৃটিশ শাসনের প্রভাবের কথাও মার্কস উল্লেখ করেছেন, সেটা যদিও একটা পরবর্তী ঐতিহাসিক পটভূমিতে।

এইভাবে, ভারতের অর্থনীতির বিভিন্ন এলাকার সাকল্যের উপর বৃটিশ সম্প্রসারণের ক্রিয়াফল সম্বন্ধে মার্কসের বিভিন্ন উক্তি নিয়ে ভেবে দেখলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই ক্রিয়াফলটাকে তিনি লক্ষ্য করেছেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বাস্তব নিরিখে – সম্প্রসারণের লক্ষ্য অনুসারে। এটা

মনে রাখা দরকার: ব্রিটিশ ব্যাপারিক পুঁজি আর সেটার সামরিক-প্রশাসনিক সংস্থা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামটাকে খয়ে দেওয়া এবং অধীন করার পৃথক-পৃথক উপায় অবলম্বন করেছিল ঐ কাঠামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

কৃষি আর হস্তশিল্পের স্বাভাবিক সমন্বয়টাকে বাজারের সাহায্যে বিনাশ করতে অপারক হয়ে ব্রিটিশ ব্যাপারিক পুঁজি হাতে নিতে লেগেছিল রাজস্ব সংস্থাটাকে – প্রথমত ভূমি-খাজনা আদায়ের ব্যাপারে। এই পুঁজি খুদে পণ্য-উৎপাদকদের (কারিগরদের) পুলিসী নিয়ম-কানুনের বশবর্তী করে, কৃষিজীবীদের উপর চাপিয়ে দেয় রপ্তানিদ্রব্য জন্মাবার কাজ। অর্থাৎ কিনা, আপকেওয়াস্তে অর্থনীতি আর চিরাগত সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দাঁড়ানো কাঠামটার অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ব্যাপারিক পুঁজি চালিত করে উৎপাদ আত্মসাৎ করার বিভিন্ন অর্থনীতি-বহির্ভূত, জবরদস্তির প্রণালীর একটা গোটা ব্যবস্থা, সেইসব প্রণালীর কিছু-কিছু তারা নেয় প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র থেকে, আর নিজেরাই উদ্ভাবন করে কিছু-কিছু।

একগুচ্ছ সামরিক-পুলিসী আর প্রশাসনিক উপায়াদির সাহায্যে ব্রিটেনের পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ হস্তক্ষেপ করে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর, প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্রগুলোতে। ভারতে ইংরেজরাই প্রথম বিজেতা যাদের সমাজের ছিল স্পষ্টতই উন্নততর সামাজিক-আর্থনীতিক এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক বিশেষক উপাদান। তাই ভারতে তারা যেসব যুদ্ধবিগ্রহ চালায় সেগুলোতে দুটো উৎপাদন-প্রণালীর দু'রকমের প্রযুক্তিগত-আর্থনীতিক সাধনসাফল্যের (সামরিক-সাংগঠনিক দিক থেকে) মুখোমুখি বিরোধ ঘটে – অসাধারণ রকম নৃশংস আকারে।

এদিক থেকে দেখলে, যেটা ছিল ভারতীয় সমাজের ভিত্তি সেই আপকেওয়াস্তে আর স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থনীতিক সম্পর্ক দিয়ে গণ্ডিবদ্ধ অর্থনীতির একটি দেশে চালানো যুদ্ধটা হল উৎপাদন, বণ্টন আর সামাজিক সংগঠনের পুঁজিতান্ত্রিক ধারার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের একটা প্রত্যয়জনক উপায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পৃথিবীজোড়া আদি সঞ্চয়নের যুগে ভারতে বিভিন্ন প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী

ভারতের বিপুল প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক বিন্যাসে উৎপাদন, শ্রম বাবত পারিশ্রমিক এবং মেহনতী আর ব্যবহারক শ্রেণী আর বর্গগুলির জীবন-যাত্রার ধরন সম্বন্ধে, বহির্জগতের সঙ্গে আর্থনীতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে দলিলপত্র থেকে পাওয়া তথ্যাদি এবং সামাজিক-আর্থনীতিক সম্পর্ক-সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে উনিশ শতকের প্রথম দশকের শেষের দিককার বাংলা আর তৃতীয় দশকের গোড়ার দিককার মহারাষ্ট্র সংক্রান্ত উপাত্ত কাজে লাগানো যেতে পারে। এইসব তথ্যের মধ্যে তুলনা চলে না, তার কারণ ততটা নয় দশ-পনর বছরের কাল-ব্যবধান, যতটা কিনা এই অবস্থাটা: বাংলা-সংক্রান্ত মালমশলায় বর্ণিত হয়েছে এমন একটা সমাজ যেটা প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক উৎপীড়নে জর্জরিত হচ্ছিল অর্ধ-শতাব্দী ধরে, আর তার বিপরীতে মহারাষ্ট্র-সংক্রান্ত মালমশলায় বর্ণিত হয়েছে এমন একটা সমাজ যেটা সশস্ত্র প্রতিরোধ চালাচ্ছিল ততকাল ধরে; অর্থাৎ কিনা, রয়েছে খুবই বিসদৃশ দুটো রকমফের (উপমহাদেশের চৌহদ্দির ভিতরে) – তার প্রত্যেকটাতে সেটার নিজ ধরনে প্রদর্শন করছে চিরাগত কাঠাম কী পরিমাণে বৈদে-শিক ব্যাপারিক পুঁজির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় সমাজের উপর বৃটিশ বিজয়ের প্রভাবক্রিয়ার সামগ্রিক সাধারণ নিয়মগুলো পড়ছে এই দুটো অতি বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে।

মহারাষ্ট্র-সংক্রান্ত তথ্য হল বাংলা-সংক্রান্ত মালমশলা যখনকার তার চেয়ে পরবর্তী কাল প্রসঙ্গে, তবু এটা নিয়েই বিচার-বিবেচনা করা দরকার আগে, কেননা পরে বিজিত মহারাষ্ট্রে ইতিহাসক্রমে বদ্ধমূল সম্পর্ক রূপান্তরিত হয়েছিল বাংলায় যতটা তার চেয়ে কম পরিমাণে। তবু মহারাষ্ট্র আর বাংলা সংক্রান্ত মালমশলা একত্রে একই পরিচ্ছেদের চৌহদ্দিতে হাজির করা হচ্ছে অন্তত এই কারণে যে, এক-একটা জেলার চৌহদ্দির ভিতরে তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে আকরগুলির ধরন-ধারন একই (৫ থেকে ২০ লক্ষ মানুষের বড়-বড় প্রশাসনিক ইউনিট হল জেলা)। তবে মহারাষ্ট্র আর বিহার সমেত বাংলা সম্বন্ধে উপাত্তগুলোর

মধ্যে তুলনা ঢের বেশি দুষ্কর হয়ে ওঠে এই কারণে যে, বাংলা আর বিহার সম্বন্ধে গবেষণায় এফ. বুকানন বিভিন্ন দফার অনেক বেশি পরিমাণ উপাত্ত সমন্বিত করতে ঢের বেশি কাজ করেন অন্যান্য গবেষকদের চেয়ে (যদিও এঁরাও সংগ্রহ করেন এমনসব উপাত্ত যেগুলোর জুড়ি নেই)।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মহারাষ্ট্রে সামাজিক-আর্থনীতিক সম্পর্ক। সামাজিক কাঠাম, কৃষিতে আর হস্তশিল্পে উৎপাদকের অবস্থা। নাগপুরে বাণিজ্য আর ক্রেডিট

উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে পূর্ব মহারাষ্ট্রের সামাজিক আর আর্থনীতিক জীবন সম্বন্ধে কিছু-কিছু তথ্য আছে ভোঁস্‌লে-দের রাজ্যের রাজধানী নাগপুর এবং একই নামের জেলা সম্বন্ধে ইংরেজ আমলা আর. জেনকিন্সের রিপোর্টে। ইংরেজ রেসিডেণ্টের নির্দেশে ১৮২০-১৮২১ সালে যে-আদমশুমার হয় তদনুসারে নাগপুর জেলায় ছিল ২,৪৯,৮০০ পুরুষ (মনে হয় গোনা হয়েছিল শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের), তাদের মধ্যে ন'রকমের ব্রাহ্মণ — ১২,৯০০, কৃষিকাজে ব্যাপৃত ১৩টা বর্ণের ১,১১,৪০০ জন, আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের আরও ১৯,০০০ জন, যাদের জীবনযাপনের অবলম্বন ছিল কৃষি (এরা ছিল খুবই বিভিন্ন স্তরের — জমিদার আর পেটেল থেকে কৃষক আর দিনমজুর)। অন্য দিকে, কৃষিকাজে ব্যাপৃত বর্ণগুলির ৬৪০০ জন তাদের চিরাগত বৃত্তিতে কাজ করত না; নির্মায়ক, মিস্ত্রি আর কারিগর ছিল মোট ৭৭,৭০০ জন, কিন্তু এদের মধ্যে ধরা হয়েছে মাহারদের, যারা সাধারণত সংখ্যায় খুবই বেশি, যাদের কোন দিক থেকেই নির্মায়ক বলা যায় না (তাদের বলা যেতে পারে বরং চাকর-বাকর কিংবা খামারী)। ১৪টা সম্প্রদায়ের ব্যাপারী আর মহাজন ছিল ৪৯০০ জন। তারা ছাড়া বহু ব্রাহ্মণ, মুসলমান এবং কৃষি সম্প্রদায়ের লোকও ব্যাপারী আর মহাজনের কাজ করত। শেষে, এই জেলায় ছিল ২১,৩০০ জন 'কুলি', কিন্তু এদের মধ্যে ছিল ১৮,৬০০ জন গোণ্ডা উপজাতির মানুষ, যারা প্রধানত খেতমজুরের কাজ

করত।* দেখা যাচ্ছে এইসব উপাত্তের সাহায্যে কর্মনিয়োগের বৃত্তিগত গঠন যথাযথভাবে স্থির করা সম্ভব নয়। তবে মোটের উপর ধারণা করা যায় জেলাটির অধিবাসীদের অর্ধেকের একটু বেশি ছিল কৃষি-জনসমষ্টি, আর কারিগর ছিল প্রায় চতুর্থাংশ।

নাগপুর শহরে কারিগর ছিল ১০,৯০০, অর্থাৎ সারা জেলায় যা তার পঞ্চমাংশ (মাহারদের সংখ্যাটা বাদ দিলে)। শহরে হস্তশিল্পে নিযুক্ত জনসমষ্টির বিভিন্ন বিভাগ ছিল নিম্নলিখিতরূপ: তন্তুবায় – ৪১৬২, মেয়ে কাটনী (মনে হয় পেশাদার) – ১০০৮, রঞ্জন কারিগর – ৩৬৭, দরজি – ২৮৬, মুচি আর চর্মকার – ২৮৪, জিন্-এর কারিগর আর চর্মকার – ১০৮, তেলি – ১৫৯৪, মদ-চোলাইকারী আর ময়রা – যথাক্রমে ৩৫১ আর ৭৮, সেকরা – ৩৫৬, তাম্রকার – ২৯৪, ধাতু-পরিষ্কারক – ৭৪, কুম্ভকার – ২৭১, কর্মকার – ২৬৫, সূত্রধর – ২২৩, রাজমিস্ত্রি – ৪২৯, পাথর-কাটা মিস্ত্রি – ৭৯; অন্যান্য বৃত্তিতে লোক ছিল অপেক্ষাকৃত কম-কম।** এখানে আবার দেখা যাচ্ছে সামগ্রিক বিশেষীকরণ ছাড়াই হস্ত-শিল্পের বিভিন্ন শাখার বহুলীকৃত অবস্থা, যেটা ভারতের নমুনাসই শহর-কেন্দ্রে প্রচলিত ছিল।

নাগপুরে কৃষিতে লাভের পরিমাণটা বিবেচনা করে জেনকিন্স বলেন, একদিকে, কৃষিতে ব্যবহৃত অর্থ (জমি কেনার জন্যে, না, উৎপাদন উন্নতির জন্যে, সেটা স্পষ্ট নয়, সম্ভবত প্রথমটাই) ধার করা হত ২৫ শতাংশ সুদে, তবু মনে হয় খাতকের লাভ থাকত, আর অন্য দিকে, কর বাড়লে রায়তরা জমি ছেড়ে দিত সাগ্রহে; তাই জোতের মালিকের হাতে থেকে যেত প্রকৃত খাজনার সম্ভবত ক্ষুদ্রাংশই।*** এই অসংগতি নিয়ে ভাবতে গেলে মনে রাখা দরকার এই দুটো পরিস্থিতি: এক, জমি-বন্দের দাম কমে গেলে ঔপনিবেশিক ভূমি-কর ধার্য হবার পর জমি আয়ত্ত করাটা খুবই আশাপ্রদ হত – সেজন্যে টাকা ধার করতে হলেও; দুই, আকর-দলিলে বলা হয়েছে যে, এখানে পেটেলদের অনেক সময়ে

* R. Jenkins, 'Report on the Territories of the Raja of Nagpur', ১২-১৩ পৃঃ।

** R. Jenkins, 'Report on the Territories...', ৩৮ পৃঃ।

*** ঐ।

থাকত ১০ থেকে ২০খানা লাঙল, অর্থাৎ এক-একজনের হাতে বেশকিছু পরিমাণ জমি জড়ো হত, তাতে উদ্বৃত্ত-উৎপাদের পরিমাণ বাড়ত।

কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুরদের অনেক সময়ে নগদ পারিশ্রমিক দেওয়া হত বছরে আট মাস ধরে। শ্রমশক্তি যখন কম পাওয়া যেত তখন শক্তসমর্থ মজুরকে দেওয়া হত দিনে ২½ পয়সা, কিন্তু সাধারণত হারটা ছিল ২ পয়সা – মেয়ে আর পুরুষ দুয়েরই জন্যে। এক মাস কিংবা এক বছরের জন্যে জন লাগানো হলে প্রায় সবসময়েই পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হত শস্য – যখন-যখন শস্য খুব আক্রা হত সেইসব সময়ে ছাড়া। মজুর পেত মাসে ৫ কুরু বা ৪০ পাইলী শস্য, আর একখানা কম্বল, একজোড়া জুতোর জন্যে ২ টাকা (এটা নিশ্চয়ই দেওয়া হত বার্ষিক হিসাবে)। কৃষিকাজে নিযুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক দিনমজুর পেত দিনে ২ পাইলী শস্য, আর অল্পবয়স্করা পেত ১ পাইলী। এইসব ওজনের সমতুল অন্য ওজনের কথা আকর-দলিলে বলা হয় নি। পরিমাণটা অনুমান করা যেতে পারে এই তথ্যটা থেকে: মজুরেরা খেত দিনে দু'বার – দুপুরে আর রাত্রে – শুধু খেতের কাজের সময়ে, আর অন্যান্য দিন তাদের চালিয়ে দিতে হত একবার খেয়ে – সূর্যাস্তের পরে।*

মনিব আর উৎপাদকদের মধ্যে সম্পর্কের সামাজিক মর্মের দিক থেকে খেতমজুরদের পারিশ্রমিক-সংক্রান্ত উপাত্ত অস্পষ্ট আর বিকৃত, – এইসব উপাত্ত বৃটিশ আকর-দলিলগুলোতে সাধারণত ঐরকমই। তবু এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, কোন একটা নির্দিষ্ট কালপর্যায় বাবত বস্তুশোধই ছিল পারিশ্রমিক দেবার মাফিকসই রেওয়াজ; কোন একটা খামার যে-দীর্ঘ সময়ের জন্যে কিংবা বরাবর একজন মজুরকে নিয়োগ করত সেটা থেকে দেখা যায় মনিবের কাছে মজুরের দীর্ঘকালস্থায়ী অধীনতার সম্পর্ক। বঞ্চিত 'কুলি' এবং কৃষিকাজে লাগানো অন্যান্য নিম্নতর বর্গের মানুষ সম্বন্ধে উল্লেখ থেকে এটা সপ্রমাণ। নগদ পারিশ্রমিক দেওয়া হত শুধু যখন মনুষ্য-শক্তির অভাব ঘটত, আর যখন মজুর নেওয়া হত বা'র থেকে, অর্থাৎ যারা স্থানীয় প্রভু-ভৃত্য ব্যবস্থার অঙ্গ নয়।

এই ব্যবস্থাটা বজায় ছিল, সেটা প্রতিপন্ন হয় কারিগরদের অবস্থা থেকেও। যখন কাজ পেত তখন তারা খাটত সকাল ৯টা থেকে সূর্যাস্ত

---

* ঐ, ৩৭, ২৮-২২ পৃঃ।

অবধি। কিন্তু গ্রামের কারিগরেরা নিজেদের বৃত্তির কাজ পেত না সব-সময়ে, তখন তাদের খামারে কাজ করে কোনমতে দিন গুজরান করতে হত। পূর্ব মহারাষ্ট্রে সরঞ্জাম তৈরি করা আর মেরামত বাবত কারিগর-দের পারিশ্রমিক দেবার সম্প্রদায়মধ্যস্থ প্রথাও চালু ছিল; জেনকিন্স এটার আভাস দিয়েছেন সরাসরি – তিনি বলেছেন, কৃষকেরা কারিগরদের যে-পারিশ্রমিক দিত সেটা একেবারেই বাঁধা থাকত। সরঞ্জাম তৈরি করার জন্যে ফরমাশ বাদ দিলে কারিগরদের কাজের জন্যে চাহিদা ছিল সামান্যই, কেননা কৃষকেরা নিজেদের ঘর বাঁধত, আসবাব তৈরি করত নিজেরাই।

সম্প্রদায়ের কারিগর আর কর্মচারীদের (যাদের বলা হত আফকা-রী) নিয়ে যে গ্রাম-সংস্থা তাদের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য আছে জেনকিন্সের বিবরণে। ছ'জন কর্মচারীকে বলা হত সরকারী চাকুরে, তাদের পারিশ্রমিকের নিয়ম ছিল জটিল: পেটেল কর-রাজস্বের একটা অংশ পেত, আর রায়তদের কাজ থেকে জবর-আদায় করত; পাণ্ডিয়া (গ্রাম্য কেরানি) পেত মাইনে আর ইনাম – নিষ্কর জমি-বন্দ; জোশী পেত একটা ইনাম, প্রত্যেকটি কৃষকের কাছ থেকে ১ কুরু শস্য আর টাকা; কোতোয়াল (চৌকিদার) পেত একটা ইনাম, প্রত্যেকটা লাঙল থেকে ১ কুরু শস্য; আর নানা মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে যে বিপদ-আপদ ঠেকাত সম্প্রদায়ের সেই গারপাগারি (একরকমের 'অভিভাবক') প্রত্যেকটি জোত-মালিকের কাছ থেকে পেত সিকি কুরু শস্য। সম্প্রদায়ের তিন জন কারিগর আর দু'জন কর্মচারীকে বলা হত 'গাওঁ সমান্দি' (গ্রাম-সেবক) – এরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন পারিতোষিক পেত না। কৃষি সরঞ্জাম মেরামত করা ছিল সূত্রধর আর কর্মকারের কাজ – সেটা বাবত তারা পেত প্রতি লাঙলপিছু বছরে ৪-৫ কুরু শস্য। কিন্তু নতুন সরঞ্জাম বাবত তারা আলাদা পারিশ্রমিক পেত। কুয়ো ইত্যাদির চামড়ার সরঞ্জাম মেরা-মত করে চর্মকার পেত যৎসামান্য শস্য। ক্ষৌরকার আর রজক পেত উপঢৌকন। এটা খুবই সম্ভব যে, গর্বিত পরাক্রমশালী লোকেদের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে মারাঠা কৃষক আর কারিগরেরা যে মর্যা-দাভরে দাঁড়াত (যাতে বিস্মিত হত ইংরেজ আমলারা) সেটার কারণ বোঝা যায় সম্প্রদায় বজায় থাকার ব্যাপারটা থেকে।

প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের সুস্থিতির একটা প্রামাণিক তথ্য এই যে,

আখের রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করার সংস্থাগুলো ছিল আখ-বাগিচা মালিকদের, অর্থাৎ ধনী জোতওয়ালাদের সম্পত্তি, – একদিক থেকে দেখলে, আখ জন্মানো থেকে সেটা থেকে পরিসমাপ্ত জিনিস তৈরি করার প্রক্রিয়া অবধি চক্রটা এইভাবে পূর্ণাঙ্গ হত। বিবরণ যা রয়েছে তার থেকে মনে হয় আখ-মাড়াই কলটা আর সেখানে কাজের সংগঠন জটিল ছিল না: আখ ঢোকানো হত দুটো কেঠো সিলিণ্ডারের মধ্যে, সিলিণ্ডার-দুটো চালু রাখত একজোড়া বলদ, ফোঁটায়-ফোঁটায় রস পড়ত লোহার জালায়, তাতে রস জ্বাল দেওয়া, ঠাণ্ডা করা এবং শোধন করা হত। প্রত্যেকটা কলে থাকত তিনটে জালা, সেগুলোতে দিনে ২৭ মন গুড় তৈরি হতে পারত। অন্যান্য, আরও বিস্তারিত বিবরণ থেকে দেখা যায়, মালিকের পরিবারের লোকেরা থাকত এই কাজের মধ্যে, আর তাছাড়া কয়েক জন মজুর লাগানো হত গ্রাম-সেবকদের মধ্য থেকে, তারা পারিতোষিক পেত উৎপন্ন জিনিসের একটা অংশ।

ভাইনগাং জেলার দুটো পরগনায় আখ হত – সেখানে গুড় তৈরি হত ৪০০০ মন। আপসোসের কথা, স্থানীয় মনের পরিমাণ সম্বন্ধে আকর-দলিলে কিছুই বলা হয় নি, তবে সচরাচর যা ছিল সেটা ধরে নিলে এখানে উৎপাদন হত ১০০ টনের একটু বেশি, সেটা স্থানীয় চাহিদা ছাপিয়ে যেত না বড় একটা।* এইভাবে, গুড় তৈরি করার ব্যাপারে উৎপাদন-সম্পর্ক আর বিপণনস্থিতি- দুইই থেকে গিয়েছিল প্রাক্‌পুঁজি-তান্ত্রিক।

নাগপুরে উদ্ভিজ্জ তেল-উৎপাদনের সংগঠন প্রযুক্তির দিক থেকে ছিল কিছুটা গুড়-উৎপাদনের মতো। এতেও ছিল ঘানি-গাছ, যে-কলটাকে চালু রাখত এক কিংবা দু'জোড়া বলদ। তৈলবীজ কিনত, তেল বিক্রি করত তেলিনী, তেলি তদারক করত ঘানি-ঘরের।** পরিবারটি ছোট্ট হলে তেলি জন খাটাত খুব সম্ভব। সে জমির মালিক হত কিনা, কিংবা কাঁচামাল কিনত কিনা, সেটা জানা নেই।

কারিগরদের মধ্যে তন্তুবায়রাই ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বড় বর্গ। তুলো জন্মাত, সুতো কাটা হত সর্বত্র, তাই সেটা মিলত সহজেই, আর

স্থানীয় কাপড় অপেক্ষাকৃত সস্তা আর সাদাসিধে ছিল বলে সুতো কিনতে টাকা ধার করার দরকার পড়ত কম। তার সঙ্গে সঙ্গে, জেলাটিতে কাপড় উদ্বৃত্ত হত, সেটা বিক্রি হত জেলার বাইরে। চালান দেবার জন্যে কাপড় কিনত প্রধানত পারোয়ার জৈন্ সম্প্রদায়ের ব্যাপারীরা, তারা সেটা নিয়মিতভাবে বেচত পুনা-তে আর পান্ঢারপুরে।

কোন তন্তুবায় চটপট কাপড় বিক্রি করে উঠতে না পারলে সে কোন মহাজনের কাছে সেটা বন্ধক দিয়ে ধার নিত; সেটা হত কাপড়ের দামের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। জেনকিন্স লক্ষ্য করেছিলেন কারিগরদের ধার মিলত অত্যন্ত কঠোর শর্তে: মাসে ৩, ৪ কিংবা আরও বেশি শতাংশ সুদে, আর রায়ত, পেটেল এবং অন্যান্যদের জিনিস বন্ধক রেখে টাকা পেত ২ শতাংশ হারে।* এইভাবে নাগপুরে – যেখানে কাঁচামাল (তুলো) আর আধা-তৈরি জিনিস (সুতো) ছিল হাতের কাছেই – মহাজনের প্রতি তন্তুবায়ের মুখাপেক্ষিতা দেখা দিত সুতো পাবার সময়ে (যেমনটা হত বাংলায়) নয়, সেটা হত কাপড় বিক্রি করার সময়ে।

নাগপুর সম্বন্ধে রিপোর্টে জেনকিন্স বিভিন্ন কাপড়ের দাম উল্লেখ করেছেন, আর সেটা তিনি যে-মাপে দিয়েছেন সেটাকে মিটারে হিসাব করা যায়। এই তথ্যটা আরও মূল্যবান এই কারণে যে, সেটা হল যখন বৃটিশ মিল্-এ তৈরি কাপড় প্রথম আমদানি হয়েছিল তার ঠিক আগের কালপর্যায় (১৮২৭) সম্পর্কে। সাধারণ রকমের ধোয়া সুতী কাপড়ের লম্বায় ২২ হাত (১০ মিটার) থেকে ৩২ হাত (১৪·৫ মিটার) আর বহরে ১¼ হাত (৫৬ সেণ্টিমিটার) থেকে ২ হাত (৯০ সেণ্টিমিটার) মাপের এক-একখানার দাম ছিল ৬ টাকা ১০ আনা থেকে ১০ টাকা। এইভাবে, গড় দাম ছিল প্রত্যেক ২ মিটারের জন্যে ১ টাকার মধ্যে, অর্থাৎ একজন সাধারণ কারিগরের মাসিক রোজগার হতে পারত ৪-৮ মিটার সাধারণ কাপড়ের যা দাম। লম্বায় ১৪ থেকে ১৮ হাত (৬·৩ থেকে ৮·১ মিটার) আর বহরে ২·২৫ থেকে ৩ হাত (১ থেকে ১·৩৫ মিটার) এক-একখানা শাড়ির দাম ছিল (গুণাগুণ আর শেষ-উৎকর্ষ অনুসারে) ৫ থেকে ৪০ টাকা। আর প্রচুর চাহিদা ছিল খদ্দরের জন্যে, – লম্বায় ১৩ থেকে ২২ হাত (৫-৯ মিটার) আর বহরে ১¼ থেকে ২ হাত

(৫৫ থেকে ৯০ সেণ্টিমিটার) এই কাপড়ের এক-একখানার দাম ছিল ১২ আনা থেকে ৩ টাকা।*

জেনকিন্স বলেন, নাগপুর জেলায় স্থানীয় কেনা-বেচা ছিল নগণ্য। বছরে অন্তত ৭ লাখ টাকার অত্যাবশ্যক জিনিস (সর্বোপরি শস্য) নাগপুর শহরে আনানো হত বা'র থেকে, তেমনি কিছুটা শহরবাসীদের ব্যবহারের জন্যে, আর কিছু চালান দেবার জন্যে নানা রকমের কাপড়ও বা'র থেকে আনানো হত। গ্রামাঞ্চলগুলি শহর থেকে পেত অন্যান্য এলাকা থেকে আনানো বিভিন্ন অত্যাবশ্যক জিনিস (নুন, পটাশ, ধাতু, নারকেল, মশলা), আর বা'র থেকে আমদানি এবং স্থানীয় কাপড়ও। গ্রামাঞ্চলে ব্যবহারের জন্যে এই শহরে উৎপন্ন একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল কাপড়। তবে এমনটা বলারও কোন কারণ নেই যে, গ্রামাঞ্চলে তৈরি কাপড় শহরে যেত সমান পরিমাণেই। শহুরে আর গ্রামীণ কারিগরদের মধ্যে সংখ্যানুপাতের (১:৪) মতো এইসব উপাত্ত থেকে মনে হয় নাগপুরের মতো শহরকেন্দ্র প্রধানত ছিল না হস্তশিল্পজাত জিনিসপত্রের উৎপাদক, ছিল সেগুলোর পুনঃবণ্টনকেন্দ্র, তাতে উৎপাদন আর ভোগ-ব্যবহারের মধ্যে সার্মগ্রিক স্থিতি হয়ত ছিল খাস শহরটির বেলায় নেতিবাচক।

নাগপুরের বহির্বাণিজ্য চলত প্রধানত নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির সঙ্গে: ঢাকা, মির্জাপুর আর বুন্দেলখণ্ড থেকে যেত কাপড় আর চিনি, পুনা আর আওরঙ্গাবাদ থেকে স্থানীয় টাঁকশালের জন্যে মুদ্রা ও বাট আকারে নানা বহুমূল্য ধাতু এবং তাছাড়া মৃৎপাত্র, চন্দনকাঠ আর লোহা এবং লৌহেতর ধাতু (আপসোসের কথা, এগুলো কোথা থেকে সেটা উল্লেখ করা হয় নি)। এই জেলা থেকে চালান দেওয়া হত কাপড়, তুলো, গুড় আর শস্য। স্থানীয় কাপড় ছিল বা'র থেকে আনানো কাপড়ের চেয়ে নিরেস, এটা লক্ষ্য করলে জেলাটির চালানী মালের কৃষিগত ধরনটা (নগদ টাকার হিসাবে) আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নাগপুরের বাণিজ্যের মোট পরিমাণ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ উপাত্ত নেই। নাগপুর শহরে বা'র থেকে আনানো শস্যের পরিমাণ আমি উল্লেখ করেছি আগেই। ৭,২৫,০০০ টাকার স্থানীয় কাপড় চালান দেওয়া হত (১৮২৬)।

একটা আগ্রহজনক তথ্য: সেটার একটা বড় অংশ যেত পশ্চিমাঞ্চলে, পশ্চিম মহারাষ্ট্রে (৫ লাখ টাকার) আর ইন্দোরে (৫০ হাজার টাকার), অর্থাৎ মিল্-এ তৈরি বৃটিশ কাপড়ের সবে-শুরু হওয়া আমদানি স্রোতের উজানে। পরে দেখা যাবে দু'-তিন দশকের মধ্যে বৃটিশ পণ্য-আমদানির আঘাত পড়েছিল মধ্য ভারতের তন্তুবায়দের উপর; তবে ১৮২৬ সালে নাগপুরে গিয়েছিল মাত্র ৭০০খানা বৃটিশ কাপড়, আর তাছাড়া আমদানি-করা ছুরি, কাচের জিনিসপত্র, ছোট-ছোট আয়না, ইত্যাদি অল্প পরিমাণে।* বৃটিশ প্রতিযোগিতার আর্থনীতিক ক্রিয়াফল নিশ্চয়ই নগণ্যই ছিল তখনকার মতো।

এমন ধারণা জন্মায় যে, উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেও পূর্ব মহারাষ্ট্রে চিরাগত বাণিজ্য-সম্পর্ক বজায় থেকে গিয়েছিল, আর ভিতরকার এবং বাইরেকার বাণিজ্যের পণ্য-বিন্যাস ছিল অপরিবর্তিত, তবে অবনতির লক্ষণ দেখা দিয়েছিল ইতোমধ্যে – যেমন, পুনাতে একসময়ে কাপড় চালান দেওয়া হত বছরে ১২-১৫ লাখ টাকার, কিন্তু ১৮২৬ সাল নাগাদ সেটা কমে দাঁড়িয়েছিল ৩ লাখ টাকা।** এমনকি পাইকারী ক্ষেত্রেরও বাণিজ্যের পরিমাণ স্থির করা কঠিন, তবে সেটা নিশ্চয়ই দাঁড়িয়েছিল নিযুত-নিযুত টাকা।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেও মাড়োয়ারি ব্যাপারী আর মহাজনেরা পূর্ব মহারাষ্ট্রে বাণিজ্য আর মহাজনী কারবারের সমস্ত ক্ষেত্রে জুড়ে বসে নি, যেটা তারা করতে পেরেছিল পরের কয়েক দশকে। জেনকিন্স বলেন, 'গ্রামাঞ্চলে ভিতরকার বাণিজ্য চালাত প্রধানত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্থানীয় মারাঠা ব্যাপারীরা। তবে যাদের টাকা ধার করতে হত তাদের মধ্যে পেটেলদের কথা সবসময়ে উল্লেখ করা হয় দেখে মহাজনদের প্রতি জোত-মালিকদের বেড়ে-চলা মুখাপেক্ষিতার আভাস পাওয়া যায়। বাস্তবিকই, বাণিজ্যের এবং বিশেষত মহাজনী কারবারের উপর-মহলগুলোতে নিয়ন্ত্রণ ইতোমধ্যে চলে গিয়েছিল 'অমারাঠাদের হাতে। জেলাটির বাইরেকার বাণিজ্য সাধারণত থাকত যেসব এলাকার সঙ্গে বাণিজ্য চলত সেগুলির বণিকদের হাতে।***

——

জেলাটির সাহুকারদের বেশির ভাগ ছিল মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের মানুষ। আলোচ্য কালপর্যায়ে তখন অবধি তারা মুদ্রাবিনিময়ের কারবার করত, কেননা বিভিন্ন মূল্যের টাকা চালু ছিল জেলাটিতে, আর বহুবিধ মুদ্রা ছিল অপেক্ষাকৃত কম-কম মূল্যের। স্থানীয় মুদ্রাগুলোর জায়গায় যখন ইংরেজদের তৈরি-করা টাকা এসেছিল তখন মুদ্রাবিনিময়কারীদের আয় খোয়া যায়, কিন্তু প্রসারিত হয় বাণিজ্য আর মহাজনী কারবারের ক্ষেত্র। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে মহাজনেরা কম দামে মোটা-মোটা পরিমাণ শস্য কিনে সেটা মজুত করে রেখে সেটা ৮ মাসের জন্যে ধারে দিত ২৫ শতাংশ সুদে, তারা মুনাফাখোরি চালাত শস্যহানির বছরগুলোতে। জেনকিন্স বলেন, 'তারা গ্রামাঞ্চলে কৃষিজাত দ্রব্য এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে ফড়ের কারবার করত, আর সুদে টাকা ধার দিত কারিগরদের।'* দুঃখের কথা, ক্রেডিট ব্যবসায়ের এই ধারাটা সম্বন্ধে সুদের চড়া হার ছাড়া কিছুই জানা নেই।

আগে নাগপুরে কোম্পানির কাগজে কারবার চালাত দু'-তিনটে কারবার, যেগুলোর উপর রাজার কোপদৃষ্টি পড়ে নি। অন্যগুলো বাড়িতে বেশি পরিমাণ নগদ টাকা রাখতে ভয় পেত। জেনকিন্স বলেন, বৃটিশ রাজ কায়েম হবার সঙ্গে সঙ্গে বাট্টা নিয়ে কোম্পানির কাগজ ভাঙিয়ে দিত সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কার আর সাহুকার, যদিও তার ফলে প্রতিযোগিতা দেখা দেবার দরুন কারবারটা অপেক্ষাকৃত কম লাভজনক হয়ে পড়ে, তখন সেটা চালাত প্রায় সম্পূর্ণভাবেই মাড়োয়ারিরা। মাড়োয়ারিদের উন্নতির কারণটা সম্ভবত ছিল এই যে, ভোঁসলে-দের পতনের পরে মারাঠা ব্যাঙ্কারদের আগের অবস্থান খোয়া যায় কর-সংস্থায়, আর তেমনি যোগানের শাখায়ও।

যা-ই হোক, দুটো ব্যাঙ্ক কারবারের মালিক ছিল মারাঠা ব্রাহ্মণরা, আর বাদবাকি ১৫টা ছিল মাড়োয়ারিদের। জেনকিন্স সপ্রশংস হয়ে লিখেছেন এই মালিকদের ব্যবসা-বুদ্ধি আর বিচারশক্তির কথা, তবে এইসব গুণের সঙ্গে তাদের ছিল ধড়িবাজি আর যেকোন সুযোগে মুনাফা তোলার প্রবৃত্তি। নাগপুরে অন্যান্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায় (বোহরা, পাওয়ার) ব্যাঙ্কের ব্যবসা করত না। বৃটিশ রাজের একেবারে প্রথম দশকেই

ব্যবসাবাণিজ্যের নতুন-নতুন সুযোগ আর নিরাপত্তা বুঝে মাড়োয়ারিরা চার-পাঁচটা নতুন কারবার ফেঁদেছিল নাগপুরে।*

ব্যাঙ্কারদের নিজেদেরই হিসাবে হুণ্ডি হস্তান্তরণের বার্ষিক পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল মোটামুটি ৫০ লক্ষ টাকা, তার অর্ধেকটা বারাণসীতে, সিকি ভাগ পুনা-তে, আর বাদবাকিটা কলকাতা, বোম্বাই, জয়পুর, হায়দরাবাদ এবং অন্যান্য শহরে। বাট্টার কাজ-কারবারের ধারাটা নির্ধারণ করতে একটা মস্ত ভূমিকা ছিল বাণিজ্য-সম্পর্কের, তবে অন্যান্য অবস্থারও ক্রিয়া ঘটত। যেমন, বারাণসীতে যা হস্তান্তরিত হত তার অর্ধেকটা (১২-১৫ লক্ষ টাকা) যেত ব্যবসায়ের কাজ-কারবারে, ১ লক্ষ টাকা যেত তীর্থযাত্রীদের খরচ-খরচা বাবত, আর বাদবাকিটা যেত টাকার ফটকাবাজিতে। বলা হয়েছে, পুনা-তে যা হস্তান্তরিত হত তার সবটাই টাকার ফটকাবাজির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকত।** (এটা মনে হয় কিছুটা অতি-সরলীকৃত; কথাটা হল এই যে, যেখান থেকে যেত প্রচুর মুদ্রা আর বাট সেই পুনার সঙ্গে লেনদেনস্থিতিটা স্পষ্টতই সক্রিয় ছিল নাগপুরের জন্যে, তার ফলে হুণ্ডির প্রত্যর্পণ ঘটত।)

নাগপুরে হুণ্ডি পরিচলনের উদ্দেশের এবং বিশেষত ধারার চিরাগত বৈশিষ্ট্য তখনও নিশ্চয়ই বজায় ছিল – সেদিক থেকে দেখলে এইসব কাজ-কারবার-সংক্রান্ত উপাত্ত খুবই আগ্রহজনক। ভারতের কেন্দ্রে অবস্থিত এই শহরটির সরাসর আর্থনীতিক যোগাযোগ মনে হয় সীমিত ছিল এই কেন্দ্র থেকে চতুর্দিকে ৬০০-৭০০ কিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চলের ভিতরে, সেটা প্রতিপন্ন হয় বাণিজ্য-সংক্রান্ত উপাত্ত দিয়েও। বোম্বাই আর কলকাতার সঙ্গে সরাসর যোগাযোগ তখনও ছিল নগণ্য।

এই হল উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে পূর্ব মহারাষ্ট্রের আর্থনীতিক জীবন সম্বন্ধে কিছু-কিছু তথ্য, আর বৃটিশ বিজয়ের গোড়ার দিককার পরিণতি (মহারাষ্ট্রের সার্বভৌম অতীতের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট কিছু-কিছু সূচক আমি আগে ব্যবহার করেছি)। দক্ষিণ-পশ্চিম মহারাষ্ট্রে কোলহাপুর সামন্ত-রাজ্য সম্বন্ধে আরও বেশি প্রণালীবদ্ধ তথ্যাদি আছে। তবে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কার সেই মালমশলা নিয়ে বিচার-

বিবেচনা করার আগে দেখা যাক কোলহাপুরের সন্নিহিত যেটাকে বলা হয়েছে দক্ষিণ মারাঠা ভূমি সেটা সম্বন্ধে টি. মার্শালের উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের গোড়ার দিককার বিবরণে কী আছে।

দক্ষিণ মারাঠা ভূমিতে জোতজমা কৃষি আর শহুরে জীবন

সদ্যবিজিত রাজ্যক্ষেত্রগুলো নিয়ে গোড়ার দিককার ইংরেজ গবেষকরা যেভাবে বিচার-বিবেচনা করতেন সেইভাবেই মার্শাল মনোযোগ নিবদ্ধ করেন অঞ্চলটির কর-সম্ভাবন বিষয়ে, তবে প্রসঙ্গত বলি, যে-পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য হস্তান্তরিত হয় সেটা নির্ধারণে এটা সহায়ক। তিনি বলেন, আগে বিভিন্ন ওলটপালট ঘটেছিল, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সেগুলোকে সুবিধামতো কাজে লাগিয়ে কিছু-কিছু স্থানীয় লোক বেআইনী উপায়ে নিজেদের ভূসম্পত্তি বাড়িয়ে সেগুলোকে করাধান ব্যবস্থার আওতা থেকে সরিয়ে ফেলেছিল। ভূমি-করের পরিমাণটাকে খুবই অল্প বিবেচনা করে মার্শাল অসন্তোষ প্রকাশ করেন – যেমন, ১০ হাজারের বেশি মানুষের পাদশাপুর তালুক থেকে কর আদায় হয়েছিল মাত্র ১৪-১৫ হাজার টাকা।

‘প্রকৃতপক্ষে, স্থানীয় কর্মকর্তারা (সাধারণ কিন্তু অনির্দিষ্ট জমিদার নামে পরিচিত) যা আত্মসাৎ করেছে সেটা এতই বিপুল যাতে সরকার যেটা থেকে আরও বিলি করতে পারে এমন জমি বড় একটা অবশিষ্ট নেই।’ তবু ‘যারা ঠিক জমিদার’ তাদের মধ্যে মার্শাল নিজেই ধরেছেন নিম্নলিখিত চার রকমের কর্মকর্তাদের: দেশাই – ‘একটা মহকুমার সাধারণ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট’, যার আগেকার প্রভাব আর ছিল না; দেশপাণ্ডে – ‘অনুরূপ মহকুমায় নিবেশক’; নার্গোণ্ডা – ‘মহকুমায় পুলিসের কর্তা’; আর কানুনগো, যার কাজ ছিল মোটামুটি দেশপাণ্ডেরই মতো। পেটেলদের আগেকার প্রতিষ্ঠা ইতোমধ্যে খোয়া গিয়েছিল অনেকাংশে।* এইভাবে, পাদশাপুর তালুকে স্থানীয় ভূস্বামীদের মধ্য-স্তর আর কর্মকর্তারা পৃথক-পৃথক ভূসম্পত্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগটা হস্তগত করেছিল।

ভূস্বামীদের মধ্যে সম্প্রদায়-বহির্ভূত কর্মকর্তাদের প্রাধান্য ছিল,

---

সম্ভবত এরই ফলে একদিকে ভূসম্পত্তির আয়তন আর অন্য দিকে প্রধানত মাঝারি আর খুদে জমি-বন্দগুলিতে চালানো কৃষিকাজের সংগঠনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। জমিদারিগুলো বাদ দিয়ে, তালুকে জোতজমার পরিমাণ ৮-১০ একরের বেশি হত না, তার বাবত দেওয়া হত ৭০-৮০ টাকা। কিন্তু কোন কোন জোতজমার পরিমাণ ছিল তার অর্ধেক থেকে সিকি ভাগ মাত্র। চাষীদের গভীর করে চাষ করার মতো পশুর অভাব থাকত সাধারণত, তাই খুদে জোতজমাগুলির পশু একত্র করে তারা এক-একটা জমি-বন্দ চষত পালা করে (খেতমজুরদের, বিশেষত লাঙল-দেওয়া মজুরদের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে ইংরেজদের উপাত্তের সমাজবিদ্যাগত মূল্যায়ন করতে গিয়ে এটা মনে রাখা দরকার)। দু'খানা লাঙলের জন্যে নিজ বলদ ছিল শুধু অল্প কয়েক জন জমিদারের, তারা নিজেদের খেতি-খামারের মধ্যে যে-পরিমাণ জমিতে চাষআবাদ করতে অপারক হত সেটাকে উল্লিখিত শর্তে খাজনা-বিলি করত আত্মীয়-স্বজন কিংবা অন্যান্যের কাছে। শুধু দু'-একটা ক্ষেত্রে জমিদারের খামার ঐ এলাকায় তার সম্পত্তির চেয়ে বড় হত; তার মানে কৃষিকাজের জন্যে তারা জমি খাজনা-বিলি করত।

মোটামুটি একই পরিস্থিতি ছিল খানাপুর জেলায়, সেখানে অধঃপাতে গিয়েছিল গ্রামাঞ্চল। বিস্তৃত পরিসরে কোন কৃষিকাজ মার্শাল এখানে দেখতে পান নি। ৩০ থেকে ৪০ একরের জমিদারিগুলোর একাংশ খাজনা-বিলি করা হয়েছিল, আর পেটেলদের ২০ একর অবধি পরিমাণের জমি-বন্দগুলোর একাংশে খেতি-খামার চালাত তাদের আত্মীয়-স্বজন। ১০ একরের বেশি পরিমাণের জমি-বন্দ থেকে যে কর দিত, এমন কোন সাধারণ রায়ত দেখা যায় নি।*

বেশির ভাগ অন্যান্য ইংরেজ পর্যবেক্ষকের মতো মার্শালের বিবেচনায় কৃষি সরঞ্জামে আর কর্ষণ-রীতিতে (বিশেষত চার কিংবা পাঁচ বারের গভীর চাষ) ত্রুটি ছিল। তিনি একথা চাষীদের বললে তারা বলেছিল অন্য কোন উপায়ে তাদের ফসল ফলবে না। তিনি বলেন: 'আমার তো মনে হয় আরও উন্নত ধরনের লাঙল চালু করাটা বৃথা চেষ্টা, কেননা কারিগর আর চাষী উভয়েরই বেলায় যে-অধিকতর পরিমাণ

15-517

পুঁজি আর দক্ষতা আবশ্যক হবে তা জুটবার সম্ভাবনা নেই।'* তবে কৃষি সরঞ্জামের ত্রুটি সম্বন্ধে তাঁর উক্তি তাঁর নিজেরই দেওয়া পরবর্তী তথ্য দিয়ে খণ্ডিত হয়ে যায়। যেমন, লাঙলের মতো বিদেও ছিল দু'রকমের: একরকমের বিদে ছিল কাঠের, তাতে ছ'টা 'মজবুত লোহার দাত', আর অন্য রকমের বিদে ছিল সবটাই কেঠো। দুটো বলদে টানা বীজ-বোনা সরঞ্জাম তৈরি হত সবচেয়ে সাদাসিধে, অতি সহজপ্রাপ্য উপকরণ দিয়ে, প্রধানত বাঁশ দিয়ে, আর সেটা দিয়ে কাজ হত এমন খাসা যাতে মনে হয় সেটা যেন 'ছিল খুবই পরিসমাপ্ত এবং দামী বৃটিশ দক্ষ কারিগরির' জিনিস। একজোড়া বলদে টানা আর-একটা সরঞ্জামও মূল উপাদানের দিক থেকে ঘোড়ায় টানা বৃটিশ নিড়ানির মতো।**

পারিশ্রমিক নগদে দেবার পাশাপাশি থেকে গিয়েছিল বস্তুশোধের ব্যবস্থা, এটা প্রচলিত ছিল গ্রামাঞ্চলে। প্রত্যেকটি চাষীর জন্যে ধার্য পরিমাণ অনুসারে সূত্রধর আর কর্মকারদের সবসময়েই দেওয়া হত শস্য-পারিশ্রমিক। খানাপুরে মজুরদের দেওয়া হত দিনে ৩-৪ পয়সা (৩৮ পয়সায় ১ টাকা); গ্রামাঞ্চলে তাদের সাধারণত দেওয়া হত শস্য (রাগি) – দিনে দেড় থেকে দুই সের, আর মরসুমে ৩ সের অবধি। খানাপুর বাজারে রাগি, চাল আর গম বিক্রি হত টাকায় যথাক্রমে ২০, ১২ আর ১০ সের, অর্থাৎ একদিনের নগদ রোজগার ছিল ১/১৬ - ১/৮ টাকা বা মাসে ২ থেকে ৪ টাকা।

পাদশাপুরে দাম ছিল কিছুটা বেশি: ১ টাকায় কেনা যেত ৯ সের জোয়ার, কিংবা ৮ সের গম কিংবা চাল। কিন্তু এখানে রোজগারও ছিল কিছুটা বেশি: শক্ত-সমর্থ পুরুষ পেত দিনে ১/৮ টাকা, আর তার ১/২ কিংবা ১/৪ পেত নারী। স্থায়িভাবে নিযুক্ত একজন অবিবাহিত পুরুষ পেত দিনে ১ সের জোয়ার, সেটা নগদ হিসাবে দাঁড়াত ১/৯ টাকা। ফসল কাটার সময়ে মজুরকে দেওয়া হত দিনে ৪-৬ সের শস্য। সূত্রধর আর রাজমিস্ত্রিরা পেত ১/৪ টাকা – এটা অন্যান্য মজুরদের চেয়ে অনেক বেশি।*** স্থানীয় সের ছিল ৩·২৫ পাউণ্ড বা মোটামুটি ১·৪ কিলোগ্রামের সমান,

---

তাই কিছু-কিছু হিসাব কষা যায়। দেখা যায়, একজন খেতমজুর ভুট্টার হিসাবে পেত দিনে ১·৫ থেকে ৩ কিলোগ্রাম, আর উপযুক্ত মরসুমে ৪·২ থেকে ১০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত। আর অন্য দিকে, সূত্রধর কিংবা রাজমিস্ত্রি তার ¼ টাকা দিয়ে কিনতে পারত ৩ কিলোগ্রামের বেশি জোয়ার কিংবা কিছুটা কম গম কিংবা চাল। ফসলের হিসসা পেত যেসব সূত্রধর আর কর্মকার তাদের পারিশ্রমিকের যথাযথ পরিমাণ জানা নেই। মনে হয় সেটা ছিল মজুরি দিয়ে খাটানো সূত্রধরের পারিশ্রমিকের কাছাকাছি। সাধারণভাবে বলা যায়, বছরে ২০০ থেকে ২৫০ দিন কাজে লাগানো মজুর পরিবার প্রতিপালন করতে পারত – সেটা যতই কষ্টেসৃষ্টে হোক।

যা আগেই বলা হয়েছে – কৃষিজীবী খাজনা দিত প্রতি একরের জন্যে ৬ টাকা। এই পরিমাণ অর্থ পেতে হলে তার রাগি, চাল কিংবা গম বিক্রি করতে হত যথাক্রমে ১৬০, ৯৬ কিংবা ৮০ সের (২২৪, ১৩৪·৫ কিংবা ১১২ কিলোগ্রাম)। অ-সেচসেবিত জমির বেলায় রাগি ফসল সবটাই নিঃশেষ হত কর দেবার জন্যে। তাই যে-কৃষিজীবী ধান আর রাগি জন্মাত সে সমস্ত সার দিত ধানখেতে; প্রকৃতপক্ষে – মার্শাল বলেন – কর দেবার জন্যে রায়ত ভরসা করত, ধান ফসলেরই উপর। সবচেয়ে সরেস, সেচসেবিত জমি রাখা হত ধানের জন্যে।

কৃষিকাজ আর গ্রামীণ মানুষের ভোগ-ব্যবহার একেবারেই আপকে-ওয়াস্তে ধারায় হত বলে পৃথক-পৃথক তালুকের ভিতরেও, আর তালুকগুলো এবং বহির্জগতের মধ্যেও পণ্য-বিনিময়ের কাজ-কারবার ছিল ক্ষুদ্রায়তনে, অনিশ্চিত, আর তাতে জিনিসের দফাও বেশি ছিল না। যেমন, পাদশাপুর তালুকে দুটো গ্রামীণ হাটে বিক্রি হত শস্য, তরিতরকারি, ফল, সুতো আর খুব মামুলি রকমের কাপড়। লোকে হাটে নিয়ে যেত সেই পরিমাণ জিনিস যতটা বেচা দরকার আবশ্যক জিনিস কেনার জন্যে, তাতে – মার্শাল বলেন – নগদ পয়সা ছিল দ্রব্য-সামগ্রী হস্তান্তরণের মাধ্যম মাত্র। মোটের উপর, এই তালুকে শিল্পোৎপাদন ছিল খুবই নগণ্য; তুর আর জোয়ার চালান দেওয়া হত শুধু ভাল ফসলের মরসুমে; চাল গম নুন লোহা তামা আর কাপড় কেনা হত বিনিময়ের লেনদেনে।* কৃষি সরঞ্জামের লোহার অংশগুলো তৈরি করত গ্রামবহির্ভূত কারিগরেরা,

সেগুলো রায়তরা কিনত। 'যারা লোহা প্রস্তুত করত তারাই সেটা দিয়ে তৈরি করত নিড়ানি এবং অন্যান্য সাদাসিধে সরঞ্জাম, সেগুলোকে হয় সেখানেই বিক্রি করা হত খামারীদের কাছে যারা তা কিনতে যেত, নইলে নেওয়া হত খানাপুরের বাজারে।*

১০,৮২৯ জন অধিবাসীর খানাপুর জেলায় ছিল একটা শহর (লোক-সংখ্যা ২৬৪৮), (তাতে একটা বাজার) আর প্রায় ১২০টা গ্রাম। জেলাটির গ্রামীণ জনসমষ্টির তিন-চতুর্থাংশ আর ঐ শহরের অধিবাসীদের তিন-পঞ্চমাংশ ছিল মারাঠা খামারী, যাদের মার্শাল বলেন 'কুলুম্বি'। দেশাইরা আর প্রায় সমস্ত পেটেল ছিল ঐ একই সম্প্রদায়ের মানুষ। ব্রাহ্মণরা গ্রামে বড় একটা থাকত না, কিন্তু শহরে ছিল প্রায় ১২০টা ব্রাহ্মণ পরিবার। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম ছাড়াও করত দেশ-পাণ্ডের কাজ। মুসলমানরা কাজ করত পুলিসে আর তহসিলে। অন্যান্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আর উপজাতির মধ্য থেকে মার্শাল 'সাধারণ গ্রামীণ কারিগরদের' কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু শহরের কারিগরদের কথা কিছুই বলেন নি।**

মনে হয় খানাপুর ছিল প্রাক্‌বৃটিশ মহারাষ্ট্রে সাধারণত প্রচলিত রকমের গ্রামীণ প্রশাসনকেন্দ্র (কসবা); সেটা হস্তশিল্পের তো নয়ই, বাণিজ্যের কেন্দ্রও ছিল না – সেখানে ছিল প্রশাসনিক দপ্তর, আর সেখানে বাস করত যাজকেরা, আর তাদের পোষ্যবর্গ এবং পাহারাদারেরা। গ্রামাঞ্চল আর শহরের জমি প্রায় সবটাই ছিল ইনাম-দেওয়া (নিষ্কর) ভূমি, সেগুলোর মালিক ছিল হয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, নইলে জমিদারেরা আর তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোক-জন।

ভূস্বামীদের মধ্য থেকে কাউকে নগর-প্রধান নিযুক্ত করা হত, সে আর 'ব্যাপারিক বর্গ' মিলে ছিল শহরবাসীদের মধ্যে সচ্ছল মহল। সমাজের ধনী স্তরগুলোর পরিচারকেরা আর পোষ্যবর্গ ছিল গরিব। যাদের জীবিকানির্বাহের কোন স্থায়ী উপায় ছিল না সেই অত্যন্ত গরিবেরা ছিল 'বিপুল কর্মক্ষেত্রে কুড়ানিয়া। এদের কেউই তাদের স্বাভাবিক মাত্রার নিচে নয় মোটেই: মোটের উপর খানাপর হল

সুসংগঠিত সচ্ছল ভারতীয় মফস্বল শহরের একটা দৃষ্টান্ত'।*

মার্শালের দেওয়া তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলারা স্থানীয় ভূস্বামীদের উচ্ছেদ করে বহুসংখ্যক গ্রামে কর্তৃত্ব কায়েম করতে পেরেছিল। খানাপুর কসবায় ৭৪টা গ্রাম ছিল কোম্পানির তহসিলদারদের শাসনাধীন, ১২টা গ্রাম ছিল ভিমগড় গ্যারিসনের হাতে, ১৭টা ছিল একজন দেশাইয়ের জায়গির আর আরও ১৫-১৮টা ছিল জমিদারদের আর ধর্মীয় সংস্থাগুলোর। খানাপুর শহর অনেকগুলো খুচরো কর বাবত দিত ২২ হাজার টাকা: সেগুলোর মধ্যে মোহতুরিফ (গৃহ কর) – ৬৬৩ টাকা, মদ্যাদি বাবত ৫৫৭ টাকা, নুন বাবত ১২৫ টাকা, আমগাছ বাবত ১১৬ টাকা, পান-পাতা বাবত ১১৬ টাকা। কিন্তু কার্যত কোন কর ছিল না জমি বাবত।**

খানাপুরের ব্যবসাবাণিজ্য আর হস্তশিল্প ছিল ক্ষুদ্র পরিসরে, আর জনসমষ্টির গঠনও ছিল তদনুযায়ী, তার একটা কারণ এই যে, আগেকার শাসক তাঁর দুর্গের কাছে নান্দগড়ে নতুন ব্যবসাবাণিজ্য-কেন্দ্র পত্তন করতে মনস্থ করে সেখানে বসতি করিয়েছিলেন ব্যাপারী আর কারিগরদের। খানাপুরে থেকে গিয়েছিল শুধু মৃৎশিল্প, শহর থেকে ছ'মাইল দূরে লোহা বিগলন হত – সেটা বন্ধ হয়ে যায়, আর ৩০-৪০টা তাঁতের একটাও অবশিষ্ট ছিল না।*** তবে আমরা দেখছি ব্যাপারী আর কারিগরেরা সরে যাবার ফলে শহরটির জীবন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় নি, শহরটির অবনতির কোন লক্ষণ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁতের সংখ্যাটা থেকে আরও নিশ্চিত হওয়া যায় যে, হস্তশিল্প যোগান দিত প্রধানত শহরবাসীদেরই জন্যে, আর গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে বস্তু-বিনিময়ের সাহায্যে শহরটির বাড়-বাড়ন্তের উপায় নিশ্চয়ই ছিল না এই শিল্প। শহরটি জীবনযাত্রা করত খাজনা দিয়ে।

এইভাবে দেখা যায়, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মহারাষ্ট্রের সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থার উপর যে-সর্বাত্মক চাপ পড়েছিল সেটার ফলে সেটা রূপান্তরিত হওয়া তো দূরের কথা, বিশৃঙ্খল হয়েও পড়ে নি। চিরাগত পরস্পর-সংযোগ ব্যবস্থাটা অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল,

---

কিন্তু তাতে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যতিক্রম: বণ্টনের উপর-স্তর, ভূমি-কর ব্যবস্থাটা বৈদেশিক ব্যাপারিক পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছিল। আপকেওয়াস্তে অর্থনীতির পৃথক-পৃথক পণ্য-আর-অর্থ উপাদানগুলো সমেত ঐ আর্থনীতিক সম্পর্কের যাতে প্রাধান্য ছিল সেই সমগ্র সমতাপূর্ণ ব্যবস্থা উলটে পড়ার পূর্বশর্ত (কিন্তু তার বেশি কিছু নয়) সৃষ্টি হয় তার ফলে।

বাংলায় সামাজিক সোপানতন্ত্র, ভূমি-সম্পর্ক, উৎপাদন আর ব্যবহারের গঠন

চিরাগত সম্বন্ধগুলো বড় একটা লণ্ডভণ্ড হল না, সেটা দেখা যায় বাংলার কর-সংস্থায় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্ধ-শতকের নিয়ন্ত্রণের ফলাফল থেকেও। পশ্চিমী সমাজবিদ্যার আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায় — ব্রিটিশ প্রশাসনের তেজী সম্ভাবন আটক পড়ে ফুরিয়ে যেতে থাকে স্থানীয় প্রশাসনিক আর কর-সংস্থার গভীরে, এই সংস্থাটার জায়গায় তারা আনে নি, আসলে আনতে পারে নি বুর্জোয়া আমলাতন্ত্র (সেটা সম্ভব ছিল সমানই অগ্রহণীয় এবং অবাস্তব দুটো উপায়ের একটা দিয়ে: ভারতীয় কর্মী-কর্মচারীদের জায়গায় ব্যাপক পরিসরে ইংরেজদের নিয়োগ, কিংবা ঐ কর্মী-কর্মচারীদেরকে সমানই ব্যাপক পরিসরে 'শ্বেত ডমিনিয়ন' ধরনের বুর্জোয়া-ঔপনিবেশিক সংস্থায় পরিণত করা)।

বাংলা-সংক্রান্ত মালমশলা থেকে চমৎকার দেখা যায় এই তিন-স্তরের ব্যবস্থাটা: একেবারে উপরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন; জেলা পর্যায়ে একই রকমের কর-সংস্থা, যেটা জমিদারির 'নেটিভ' কর্মী-কর্মচারীদের সঙ্গে একত্রে গ্রথিত; আর 'বড় রায়ত' এবং অন্যান্য একেবারেই স্থানীয় তহসিলদারদের (অংশত সচ্ছল বাঙ্গালী করদাতারা) নিচের স্তর। এই তিনটের প্রত্যেকটা স্তর ছিল এক-একটা পরস্পর-সংযুক্ত ব্যবস্থা, তেমনি প্রত্যেকটার ছিল নিজস্ব জাতিগত আর সামাজিক অসংগতি (বলা যেতে পারে — ভাঙনের দিক), কেননা সেটার সমস্ত কর্মী-কর্মচারীদের বর্গবিভক্ত করা ছিল পদ আর মালিকানা সংক্রান্ত সূচক অনুসারেই শুধু নয় (সেটা তো যেকোন আমলাতান্ত্রিক সোপানতন্ত্রের আমলে অনিবার্য), অধিকন্তু তাদের সামাজিক উদ্ভব আর শ্রেণী

অনুসারেও। তবু, আপাতদৃষ্টিতে যতই আত্মবিরোধী হোক, স্থানীয় কর্মী-কর্মচারীরা (আরও যথাযথ ভাষায় – তাদের বংশধরেরা) পুনর্বণ্টিত উৎপাদে নিজেদের যে-হিসসা বরাবর দাবি করত সেটা প্রসঙ্গে ঔপনিবেশিক শোষণের পরবর্তী, প্রধান আর্থনীতিক প্রণালী যতটা উপযোগী ছিল তার চেয়ে বেশি উপযোগী ছিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধস্তন ভারতীয় কর্মী-কর্মচারীদের কৃত্য প্রসঙ্গে কোম্পানির ব্যাপারিক কর্তৃপক্ষের প্রযুক্ত অর্থনীতি-বহির্ভূত প্রণালী।

রত্না রায় তাঁর ব্যাপক বিচার-বিশ্লেষণে খুবই স্পষ্ট দেখিয়েছেন এক-একটা জমিদারির কর-সংস্থা ছিল সেটার সাধারণ-কার্মিক সামাজিক গঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাই কোন জমিদারির ভিতরকার সোপানতান্ত্রিক সম্পর্কের সমগ্র ব্যবস্থাটা থেকে কর-আদায়ের কৃত্যটাকে পৃথক করে তুলে ধরার চেষ্টা সাধারণত নিরর্থক। রত্না রায়ের উল্লেখ-করা একটা দৃষ্টান্ত এই: 'বিষ্ণুপুরে নিলামে বিক্রির ফলাফল থেকে যেন এমন ধারণাই জন্মায় যে, যেটার থাকে কোন 'রাজত্ব' (রাজ)-এর বৈশিষ্ট্য এমন কোন সংগঠিত জমিদারিতে বাইরের ঝুঁকিদার ধনপতি-রা – এক্ষেত্রে কলকাতার স্থানীয় পুঁজিপতিরা – নিলামে ক্রয়টাকে বলবৎ স্বত্বে পরিণত করার পক্ষে খুব উপযোগী অবস্থানে ছিল না। বর্ধমানের রাজবংশের মতো প্রতিষ্ঠা, ধনদৌলত আর প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী পরিবারের নিলামে-ক্রয়কে বলবৎ করার সুযোগ-সম্ভাবনা ছিল ঢের বেশি। দামোদর সিংহকে টাকা ধার দিয়েছিলেন কলকাতার একজন মস্ত পুঁজিপতি জয়নারায়ণ ঘোষাল, ইনি ঐ ঋণ-পরিশোধ বাবত ভিতর-জোত মহল হাতে নিতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নি (১৭৮৭ সালে। – ভ. প.)। বাইরের অন্যান্য ব্যক্তি, যেমন দুর্গাচরণ পাকড়াশি (কলকাতার), আর কাশীনাথ এবং বিশ্বনাথ ব্যানার্জি নিলামে কিনেছিলেন বিষ্ণুপুর মহল, কিন্তু দখলে নিতে পারেন নি। এই অপারক হবার কারণ ছিল বিষ্ণুপুরের রাজবংশের দৃঢ় বাধা, যার ফলে খাজনা আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তাঁদের পক্ষে।'*

রত্না রায় আরও উল্লেখ করেছেন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নবাগত জমিদারদের অভিযোগের কথা, তারা বলেছিল আগেকার জমিদারেরা

দু'হাজার লোক জড়ো করে তাদের জমিদারিতে হানা দিয়ে গ্রামকে-গ্রাম পুড়িয়ে রায়তদের বেদখল করে ভাগিয়ে দিয়ে করের টাকা কেড়ে নিয়ে যায়। তার ফলে আগেকার জমিদারেরা যৎসামান্য টাকা দিয়ে তাদের জমিদারি পুনরুদ্ধার করে।

প্রসঙ্গত বলি, এমনকি উনিশ শতকের প্রথম দশকে পর্যন্ত কোন-কোন জমিদারি দখলে নেবার জন্যে বাংলার রাজারা এবং তাদের তালুকদারদের মধ্যে ছোটখাটো সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধবিগ্রহ চলেছিল। রত্না রায় মনে করেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা শেষে গিয়ে সুবিধাজনক হয়েছিল 'অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্থানীয় অভিজাতদের' পক্ষে (তিনি বর্ধমান আর বিষ্ণুপুর নিয়ে গবেষণা করেন, অন্তত সেখানকার হিন্দু এলাকাগুলোতে), কেননা তারা পত্তনি ভূমিস্বত্ব বলবৎ করতে পেরেছিল। 'অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্থানীয় অভিজাতেরা, যারা আগে ছিল বড়-বড় রাজা আর জমিদার-দের অধীন শ্রেণী, তাদের স্বাধীনতা আর মজবুতির ভিত্তি স্থাপন করল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। আঞ্চলিক রাজাদের বিষয়সম্পত্তি থেকে কেটে নিয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি ছোট-ছোট জমিদারি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ি-ভাবে ইজারা-দেওয়া খাজনা-আদায়ের স্বত্ব লাভ করার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল অবস্থায় এসে গিয়েছিল কলকাতার বণিক শ্রেণী ততটা নয়, বরং স্থানীয় অভিজাতেরাই। 'উঁচু-বর্ণের এইসব রাজস্বদাতা খুদে মালিক-দের নিচে ভূমিতে দখলদার থেকে গেল প্রাধান্যশালী গ্রামীণ ভূস্বামীবর্গ, যারা নিজেদের খেতে খাটাত গরিব ভূমিহীন গ্রামবাসীদের শ্রম। এই গ্রামীণ ভূস্বামীদের 'প্রজা' হিসেবে ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা স্থায়ী উত্তেজনা সৃষ্টি করল আইনগত কাল্পনিকতা (অর্থাৎ, জমিদার আর তালুকদারেরা 'ভূস্বামী', এই উক্তিটা) আর আর্থনীতিক বাস্তবতার (অর্থাৎ, গ্রামের সবচেয়ে লাভজনক কৃষি-জমি প্রকৃতপক্ষে থেকে গেল জোতদার আর মণ্ডলদের নিয়ন্ত্রণে, এই বাস্তব অবস্থাটার) মধ্যে, তারই থেকে এল ১৯৫০-এর দশকে জমিদারি লোপ হওয়া অবধি বাংলার গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার পিছনকার চালকশক্তির অনেকটা।'*

কোন্ রকমের আর্থনীতিক গঠনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এই আমলাতান্ত্রিক কর-ব্যবস্থাটাকে সেটা দেখা যাবে বুকাননের উপাত্ত

থেকে। তিনি ১৮০৭ থেকে ১৮১১ সালে বাংলা আর বিহারের জেলায়-জেলায় পরিদর্শনে যাবার সময়ে তাঁর চৌহদ্দি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল সংশ্লিষ্ট নির্দেশপত্রে, তাতে ছিল তাঁর বিবেচ্য দফাগুলোর একটা তালিকা: প্রাকৃতিক পরিবেশ, জনসমষ্টি এবং সেটার বিভিন্ন অংশের অবস্থা, বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়, প্রাকৃতিক সম্পদ, 'খামারগুলো'র অবস্থা আর কৃষিকাজ, খাজনার পরিমাণ এবং বিভিন্ন রকম, পারিশ্রমিক, কৃষির প্রসার আর উন্নতির সম্ভাবনা, ভূমি-মালিকানা এবং কৃষির উপর সেটার ক্রিয়াফল, বিভিন্ন হস্তশিল্প এবং সেগুলোর হাতিয়ারসজ্জা, উৎপন্ন জিনিসপত্রের তালিকা, কাঁচামাল এবং অন্যান্য মালমশলার যোগান, পুঁজির পরিমাণ এবং উৎপাদকদের অবস্থা, বাণিজ্য আর যোগাযোগের অবস্থা। ১৮০৮ সালে বুকানন পরিদর্শন করেন উত্তর-পূর্ব বাংলার দুটো জেলা – দিনাজপুর আর রংপুর। প্রথমটার জন্যে আমি ব্যবহার করেছি ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত একটা পৃথক সংস্করণ, আর দ্বিতীয়টার জন্যে – আর. এম মার্টিনের বইয়ের সংশ্লিষ্ট অংশ।

রংপুরে সামাজিক-আর্থনীতিক সম্পর্ক বিষয়ে বুকাননের বিবরণে বহু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক নেই, তার কারণ মনে হয় এই যে, সেগুলো দিনাজপুরে যা তদনুরূপ মনে করে তিনি পুনরুক্তির প্রয়োজন বোধ করেন নি। বিচার-বিশ্লেষণের জন্যে এই জেলা-দুটি বেছে নেওয়া হল, এটা ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে যাঁরা যাঁচ-বিচার করেন তাঁদের পক্ষে আপসোসের বিষয় দুটো কারণে: জেলা-দুটি প্রায় একই রকমের; আর বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষেত্র থেকে বাদ পড়ল গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণে জেলাগুলি, যেখানে শহুরে জীবন ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত। তাছাড়া, দিনাজপুর আর রংপুর মুসলিমপ্রধান ছিল বলে বর্ণগত সূচক অনুসারে সামাজিক-বৃত্তিগত গঠন স্থির করা সম্ভব নয়। তবে সমীক্ষার জন্যে দিনাজপুর আর রংপুর বেছে নেওয়াতে কিছু-কিছু সুবিধেও আছে, কেননা প্রাক্‌বৃটিশ বাংলার সামাজিক-আর্থনীতিক সম্পর্ক সেখানে বজায় ছিল সুবাটির দক্ষিণাঞ্চলে যেমনটা তার চেয়ে অনেকটা ভালভাবে।

দিনাজপুর জেলার জনসংখ্যার হিসাব করতে গিয়ে বুকানন এই তথ্যটা ধরে এগিয়েছেন: সেখানে লাঙল ছিল ৪ লক্ষ ৮০ হাজারখানা, সেজন্যে দরকার ৫ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। গড়ে পাঁচ-জনের পরিবার ধরে নিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন কৃষিক্ষেত্রে জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি

২৪ লক্ষ। হস্তশিল্প ছিল প্রারম্ভিক পর্বে, তাই বাদবাকি জনসংখ্যা সেটার চতুর্থাংশের বেশি ছিল না, অর্থাৎ সব মিলিয়ে জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩ কোটি।

এই হিসাবের সমর্থনে তিনি দিয়েছেন এইসব তথ্য: জেলাটিতে বীজ হিসেবে রাখা শস্য বাদে ছিল ২ কোটি ৭৬ লক্ষ মন (কলকাতার ১ মন ছিল ৮৪ পাউণ্ড বা প্রায় ৩৮ কিলোগ্রামের সমান) চাল, সেটা থেকে চালান দেওয়া হয়েছিল ৪৪ লক্ষ মন (দাম – ৩২ লক্ষ টাকা), আর জেলায় ব্যবহৃত হয়েছিল ২ কোটি ৩২ লক্ষ মন। মাথাপিছু দৈনিক খোরাক আধ সের (১ ¼ পাউণ্ড বা ৫৭০ গ্রামের সামান্য কম) হলে ঐ পরিমাণ চাল হয় ৪০ লক্ষ মানুষের খোরাক। তবে ঐ শস্যের একাংশ গিয়েছিল পশুখাদ্য, মদচোলাই, ইত্যাদির জন্যে।* দিনাজপুরের জনসংখ্যা সম্বন্ধে বুকাননের হিসাব আমি আপাতত মেনে নিচ্ছি, – এইসব অঙ্কের বিশ্লেষণ করব পরে।

বুকানন যেখানে সমীক্ষা চালান সেই বাংলা-বিহার অঞ্চলের চৌহদ্দির ভিতরে – গাঙ্গেয় উপত্যকা বরাবর উত্তর-পশ্চিম দিকে এগলে – গ্রামাঞ্চলে সামাজিক-আর্থনীতিক সম্পর্কক্ষেত্রে পরিবর্তনের লক্ষণ চোখে পড়ত। বিশেষত, চিরাগত গ্রাম-সম্প্রদায়ের পুনঃস্থাপনা গোছের কিছু ঘটেছিল কৃষিকাজ আর হস্তশিল্পের সমন্বয়ের ভিত্তিতে। ঠিক বটে, তার সঙ্গে সঙ্গে জনসমষ্টিতে মুসলমানের সংখ্যা কমেছিল (উত্তর আর পূর্ব বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে তাদের সংখ্যা প্রাধান্যের দরুন কারিগরদের পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থাটা উলটে পড়েছিল, সেটা অনিবার্য ছিল, – বর্ণগত সোপানতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা ব্যবস্থায় ঐ পারিশ্রমিক দিত সরঞ্জামের মালিক)।

আপাতদৃষ্টিতে আত্মবিরোধী একটা ব্যাপার: জোর্ত-মালিক আর কারিগরের মধ্যে আপকেওয়াস্তে-আর্থনীতিক সম্পর্কটার পাশাপাশি চলেছিল কৃষি সরঞ্জামের জটিলতা বাবত ব্যয়বৃদ্ধি। বাংলার নরম মাটিতে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ছিল অপেক্ষাকৃত সাদাসিধে এবং সস্তা। বুকানন উল্লেখ করেছেন এইগুলো: কেঠো লাঙল (কখনও-কখনও লোহার ফালওয়ালা) – ১২ আনা, বাঁশ দিয়ে তৈরি মই – ১ আনা, লোহার নিড়ানি –

---

১৪ আনা, লোহার কাটারি – ৮ আনা, আর হাতে চালানো অন্যান্য সরঞ্জাম মিলিয়ে মোট ৩ টাকা ৪ আনা। সরঞ্জামের এই তালিকায় নেই ভারি লাঙল, বীজ-বোনা সরঞ্জাম আর বিদে (যদিও একজোড়া বলদে টানা মইয়ের কথা আছে, লোহার দাঁত লাগানো এই মই ব্যবহৃত হত বিদে হিসেবে)। যেক্ষেত্রে খামারীর ছিল কয়েক প্রস্ত সরঞ্জাম সেখানে কোন-কোনটা হতে পারত অসম্পূর্ণ, তাই প্রত্যেকটার গড় দাম পড়ত ২¼ টাকা।* এইভাবে, বাংলায় একটা প্রস্তের দাম ছিল মহারাষ্ট্রে সেটার দামের ভগ্নাংশ।

মধ্যম গোছের খামারী পরিবারের সাধ্যের উপযোগী মাফিকসই বলে বিবেচিত ১৫ বিঘার (৫ একর বা ·২ হেক্টর) জমি-বন্দে খেতি-খামারের জন্যে যেক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত এক-প্রস্ত সরঞ্জাম, তাতে পরিবারটির অর্থসংস্থান থাকত নিম্নলিখিতরূপ: সরঞ্জাম বাবত ২ টাকা ৬ আনা, গবাদি পশু বাবত ৯ টাকা, ৩ টাকা ৬ আনা বীজের জন্যে, ঘরের জন্যে ৫ টাকা, বাসন-কোসন আর আসবাব বাবত ৩ টাকা ৪ আনা, কাপড়-চোপড় আর গয়নাগাঁটি – ৪ টাকা, ফসল-তোলা অবধি ছ'মাসের খোরাক বাবত ১৫ টাকা, প্রতি বিঘায় বছরে ১০ আনা করে ছ'মাসের খাজনা – ৪ টাকা ১১ আনা; মোট ৪৭ টাকা ১ আনা। এইসব দফা অবশ্য বেখাপ, কেননা কোন-কোন খাতে খরচ ছিল এককালীন, আর অন্য কোন-কোনটা (যেমন, গবাদি পশু, সরঞ্জাম, বাসন-কোসন) বাবত খরচে চলত ছ'মাসের বেশি। এই সমস্ত খরচ-খরচা অপরিহার্য হত শুধু যখন কোন নবীন খামারী পরিবার পৃথক খেতি-খামার শুরু করত, কিংবা যখন কোন গ্রামে গিয়ে বসবাস শুরু করত কোন নবাগত পরিবার (সেক্ষেত্রে গয়নাগাঁটি আর বাসন-কোসনের খরচ বাদ দেওয়া যেত)।

দেনা শোধ করার দফাটা নেই খরচের এই তালিকায়। কিন্তু কথাটা হল এই যে, জমি ইজারা নিতে সাধারণত ঋণগ্রস্ত হতে হত, সর্বোপরি যার কাছ থেকে জমি-বন্দ ইজারা নেওয়া হত সেই রায়তের কাছে। প্রকৃতপক্ষে, শস্য দাদনও দিত প্রধানত 'বড় রায়তরা', আর মুর্শিদাবাদ এবং কলকাতার ব্যাপারীরাও, এরা এই জেলায় থেকে ধান কিনে নিত বছরে ৪০ লক্ষ টাকার। এইসব খরচ-খরচা আর দেওন থেকে দেখা

যায় ইজারা নেওয়া জমিতে নতুন খামার চালু করতে গিয়ে প্রজাটি সঙ্গেসঙ্গে খাতক হয়ে দাঁড়াত। বুকানন দেখেছিলেন দিনাজপুর জেলায় বিপুল পরিমাণ জমি অনাবাদী পড়ে ছিল; তাঁর মতে, গরিব চাষীরা ঐসব জমিতে চাষআবাদ শুরু করত না তার কারণ এইসব জমিতে ফসল জন্মে শ্রমফল উঠে আসা অবধি অপেক্ষা করতে তারা অপারক ছিল; তবে যাদের টাকা ছিল তারা সেটা ভূমি উন্নয়নে না লাগিয়ে অভাবী প্রতিবেশীকে চড়া হারের সুদে ধার দিয়েই বেশি আগ্রহান্বিত ছিল। *

কৃষক পরিবারের এইসব খরচ-খরচায় বিভিন্ন দফার হিসসা বার্ষিক হিসাবে হাজির করার চেষ্টা করছি। ধরা যাক, সরঞ্জাম, ঘর, বাসন-কোসন, আসবাব, কাপড়-চোপড় আর গয়নাগাঁটি বাবত এককালীন খরচগুলো করা হয়েছিল বছর-তিনেকের জন্যে, অর্থাৎ এইসব দফার জন্যে ২৪ টাকা থেকে প্রায় ৮ টাকা করে খরচ করা হয় বছর-বছর; সেক্ষেত্রে বার্ষিক হিসাবে খরচ দাঁড়ায় গবাদি পশু বাবত ২-৩ টাকা, বীজ – ৬ টাকা, খোরাক – ৩০ টাকা, খাজনা – ৯ টাকা ৬ আনা; আর তার উপর হস্তশিল্পের জিনিসপত্র বাবত খরচ ৮ টাকা (ঘরখানা বেঁধেছিল কৃষক পরিবারটি প্রধানত নিজেই, তাই শেষের খরচটাকে কমিয়ে ধরা যেতে পারে ৬ টাকা ৮ আনা), তাতে (ঋণের সুদ বাদে) মোট বার্ষিক খরচ দাঁড়াত প্রায় ৫৫ টাকা, অর্থাৎ খামারীর বাজেট থেকে পারিবারিক খরচ-খরচা দাঁড়িয়েছিল ৬৩-৬৪ শতাংশ, পুনুরুৎপাদন বাবত খরচ প্রায় ২০ শতাংশ, আর খাজনা ১৭-১৮ শতাংশ। পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হস্তশিল্পজাত জিনিস বাবত খরচ হয়েছিল বাজেটের মোটামুটি ১০ শতাংশ, আর সরঞ্জাম বাবত ২ শতাংশের কম। কিন্তু এই সমস্ত হিসাবের মধ্যে ঋণশোধের দফাটা ধরা হয় নি, সেটা ঢোকান হলে তদনুসারে উল্লিখিত প্রত্যেকটা দফার হিসসা কমে যেত, আর বেড়ে যেত মোট খরচ।

আর-একটা হিসাবে বুকানন কৃষি-উৎপাদের দফাওয়ারি বিবরণ দিয়েছেন কিছুটা অন্য রকমের। দিনাজপুরে উর্বর নামালে প্রতি বিঘায় (১ একরের তৃতীয়াংশ) ফলত ২ টাকার শস্য; সংসার-খরচে লাগত ১ টাকা, ৮ আনা যেত খাজনা দিতে, আর ৮ আনা থাকত খামারীর

'নীট লাভ'। আলোচ্য ১৫-বিঘা জমি-বন্দের বেলায় এইসব অংক ব্যবহার করলে ছকটা দাঁড়ায় এইরকম: উৎপাদন বাবত খরচ – ১৫ টাকা, খাজনা – ৭ টাকা ৮ আনা, আর 'নীট লাভ' – ৭ টাকা ৮ আনা। আরও তুলনার জন্যে বলা দরকার, আমরা ধরে নিয়েছি একটা ফসল, কিন্তু মাঝে-মাঝে উঠত দুটো ফসল; তবে এটা ধরে নিলেও একটা জমি-বন্দ থেকে আয় হত বড়জোর ৩৫-৪০ টাকা।

'নীট লাভটা' আসে কোথা থেকে? মনে হয়, ক্ষুদ্রায়তনের জোতজমার বেলায় এই দফাটাকে উদ্বৃত্ত-উৎপাদের মধ্যে না ধরে 'উৎপাদনের খরচ-খরচায়' প্রযুক্ত শ্রমের সঙ্গে একত্রে খামারীর নিজ পরিবারের ভোগ-ব্যবহার তহবিলের মধ্যে ধরা চাই। যারা ভাগ-চাষে জমি দর-ইজারা দিত, আর কখনও-কখনও জমিতে চাষআবাদ করাত ভূমিদাস খাটিয়ে, কেবল সেইসব, বড় 'খামার-মালিকের আয়ের' মধ্যেই 'নীট লাভটাকে' ধরা যেতে পারে উদ্বৃত্ত-উৎপাদ হিসেবে। যেমন, এক একর (৩ বিঘা) জমি-বন্দে চাষ-আবাদের খরচ-খরচার মধ্যে বিভিন্ন দফা ছিল নিম্নলিখিতরূপ: চাষ দেওয়া বাবত (গড়ে দৈনিক ১১খানা লাঙল) – ১ টাকা, ধান-চারা রোয়া (১০ জন) – ৮ আনা, বীজ – ৪ আনা, ধান-কাটা (১২ জন) – ৯ আনা, খাজনা – ১ টাকা ৬ আনা, বিবিধ – ৫ আনা – মোট ৫ টাকা। উৎপাদের দাম ছিল ৬ টাকা। * এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-উৎপাদ হয়েছিল ফসলের অর্ধেকের কাছাকাছি। সেটা ঠিক কতটা তা নির্দিষ্ট করতে হলে চাই কাজে 'খামার-মালিকের' পরিবারের মানুষের ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ-সংক্রান্ত তথ্য, আর গবাদি পশু, সরঞ্জাম এবং বীজ বাবত খরচ।

কারবারী উদ্যোগে বিমুখ ছিল না 'খামার-মালিকেরা', এমন উদ্যোগ সবচেয়ে বেশি দেখা যেত আখ জন্মানো আর সেটা থেকে জিনিস উৎপাদনে। প্রতি-বিঘায় আখ হত ২০-২১ টাকার, এটা ছিল সমান পরিমাণ জমিতে জন্মানো ধানের দামের ১০ গুণ। তবে, এক, আখ জন্মানো এবং সেটা থেকে জিনিস প্রস্তুত করতে খরচ পড়ত অনেক বেশি; দুই, আখ জন্মাত শুধু সবচেয়ে উর্বর জমিতে, আর পরিণত হতে সময় লাগত প্রায় তিন-মরশুম; তিন, হয় আখ-রোয়া জমির মালিক

বন্দটার খাজনা সরাসরি বাড়িয়ে দিত (১ টাকার জায়গায় ৫ টাকা), নইলে আখ হবার পক্ষে উপযোগী জমির খাজনা বাড়ান হত সাধারণভাবে। তদনুসারে, জমিটা যে খাজনা করত তাকে স্থির করতে হত কোন্ ফসল বেশি লাভজনক হবে। এমন পরিস্থিতিতে একর পরিমাণ জমিতে আখ জন্মাত শুধু সবচেয়ে বড়-বড় খামারীরাই।

এক একর জমিতে জন্মানো আখ থেকে দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত করতে সময় লাগত ২৪ দিন, তখন কাজে লাগাতে হত ৮ জন মজুর আর ১২টা বলদ। তাই আখের গুড়ের ভিয়ানখানার মালিক (সাধারণত সচ্ছল ব্যক্তি) সেটাকে পালা করে ভাড়া দিত প্রতিবেশীদের কাছে, তারা সেটাকে চালাত নিজেরা-নিজেরাই। গুড় তৈরি করতে রসটাকে ঢাকা হত কয়েকটা জালায়, সেগুলিতে রস জ্বাল দিয়ে যেমনটা দরকার সেইভাবে ঘন করা হত। ১৬ জন মজুর আর ২০টা বলদ নিয়ে দিন-রাত কাজে এই ভিয়ানখানায় প্রস্তুত হত ৪৭৬ পাউণ্ড গুড়। যদিও বুকানন বলেন সাধারণত কাজ চলত যতক্ষণ দিনের আলো থাকে (সেক্ষেত্রে মজুর আর বলদের সংখ্যা নিশ্চয়ই অর্ধেক হয়ে যেত)। *

তাহলে, উল্লিখিত ধরনের কৃষিকাজের সঙ্গে যেটাকে সংযুক্ত করা যেত সেই জোতজমার পরিমাণ এবং ভূমির উপযোগিতাটা ছিল কী? দিনাজপুর জেলায় জোতওয়ালাদের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদ দেখিয়েছেন বুকানন: ৬৬০০ 'মুখ্য খামারীর' প্রত্যেকের গড়ে ১৬৫ বিঘা জমি – মোট ১০,৮৩,০০০ বিঘা; ৮৮০০ 'বড় খামারীর' প্রত্যেকের গড়ে ৭৫ বিঘা – মোট ৬,৫০,০০০ বিঘা; ১১,০০০ সচ্ছল খামারীর প্রত্যেকের গড়ে ৬০ বিঘা – মোট ৬,৬০,০০০ বিঘা; ১৯,৮০০ স্বয়ম্ভর খামারীর প্রত্যেকের গড়ে ৪৫ বিঘা – মোট ৮,৯১,০০০ বিঘা; ৫৫,০০০ গরিব খামারীর প্রত্যেকের গড়ে ৩০ বিঘা – মোট ১৬,৫০,০০০ বিঘা; ১,১০,০০০ অভাবী খামারীর প্রত্যেকের গড়ে ১৫ বিঘা – মোট ১৬,৫০,০০০ বিঘা। এই জেলায় করপ্রদ জমির মোট আয়তন ছিল ৬৬ লক্ষ বিঘা (এটা মনে হয় কলকাতার বিঘা, সেক্ষেত্রে এই মোট আয়তনটা ২২ লক্ষ একর বা প্রায় ৯ লক্ষ হেক্টর)। আবাদ-করা জমির মোট পরিমাণ ছিল ৭২ লক্ষ বিঘা, তার মানে এটার ৯০ শতাংশ ছিল করযোগ্য।

এইভাবে, এক-প্রান্তে ছিল ১৫,৪০০ বড় জোতওয়ালা, তাদের মোট ১৭,৪০,০০০ বিঘা জমি, আর অন্য প্রান্তে ১,১০,০০০ খুদে জোতওয়ালা, তাদের জমি মোট ১৬,৫০,০০০ বিঘা। কিন্তু জোতস্বত্ব সাধারণত ছিল ঢের বেশি খণ্ড-বিখণ্ড, কেননা বড় রায়তদের জমির একটা মোটা অংশ ইজারা দেওয়া হত। যেসব বড় রায়তের নিরেস জমিতে মাত্র একটা ফসল হত তারাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জমি ইজারা দিয়ে নিজেদের খেতি-খামার বন্ধ করে দিত। সবচেয়ে ধনী যেসব স্থানীয় ব্যাপারী আর মহাজন ৫ থেকে ২০ হাজার টাকা নিয়ে কারবার করত তাদের মধ্যেও সেটা প্রচলিত ছিল। *

এইসব 'খামারী' অর্থাৎ রায়তের মোট সংখ্যা ছিল ২,১১,২০০। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, জমি চাষ করাবার জন্যে লাগত প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, যারা সাধারণত পরিবারের কর্তা, তার মানে কৃষিক্ষেত্রের জনসমষ্টির ৬০ শতাংশ বাদ পড়ত রায়তের বর্গ থেকে। এরাই খাটত সেইসব রায়তের জমিতে যাদের জমি ছিল 'শ্রম-মাফিকসই' ১৫ বিঘার বেশি। যাদের প্রত্যেকের জমি ছিল ৩০ বিঘা এবং তার চেয়ে বেশি এমন ১ লক্ষ রায়তের জমি ছিল মোট ৩৯,৪০,০০০ বিঘা। এই সমস্ত রায়তের প্রত্যেকে যদি এমনকি ১৫ 'শ্রম' বিঘাও চাষ করে থাকে তবু মোটামুটি ২৫ লক্ষ বিঘা অবশিষ্ট থাকত ইজারা দেওয়া কিংবা ভূমিদাস খাটিয়ে চাষ করাবার জন্যে।

তাছাড়া, সমস্ত বর্গের রায়তদের ছিল মাত্র ৫৬ লক্ষ বিঘা, আর করপ্রদ জমির আয়তন ছিল ৬৬ লক্ষ বিঘা, আর আবাদ-করা জমি ছিল মোট ৭২ লক্ষ বিঘা, তার মানে রায়তদের যতটা ছিল তার চেয়ে ১৬ লক্ষ বিঘা বেশি। অর্থাৎ কিনা, যারা রায়ত নয়, আর যেসব রায়তের জমি ছিল ১৫ বিঘার কম, তারা সবাই মিলে চষত ৪০ লক্ষ বিঘার বেশি (২৫ লক্ষ বিঘা এবং ১৬ লক্ষ বিঘা), অর্থাৎ দিনাজপুরে সমস্ত জমির অর্ধেকের বেশি। নিশ্চিত হয়ে ধরে নেওয়া যায় যে, জেলাটির কৃষিক্ষেত্রের জনসমষ্টির মধ্যে যাদের ১৫ বিঘা কিংবা তার চেয়ে বেশি জমি ছিল উল্লিখিত সেই রায়তদের মধ্যে পড়ে নি যে ৩ লক্ষ জন তারা ছিল ঐসব বর্গের মানুষ।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার এই জেলাটির গ্রামাঞ্চলে মালিকানা ক্ষেত্রে, আর বিশেষত উৎপাদন-সংক্রান্ত স্তরবিন্যাস সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণার চেয়ে বেশি কিছু পাওয়া যায় না এইসব উপাত্ত আর হিসাব থেকে, তা তো বটেই। যা-ই হোক এটা স্পষ্টই যে, বাংলার গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রের জনসমষ্টির মধ্যে মালিকানা-সংক্রান্ত আর সামাজিক প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত অসমতার অবস্থায় আপকেওয়াস্তে-আর্থনীতিক ভিত্তিতে কৃষিকাজ আর হস্তশিল্পের সমন্বয় হিসেবে গ্রাম-সম্প্রদায় চলতে থাকাটা ছিল অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। এটা হতে পারে একটা কারণ যেজন্যে বুকানন বাংলার যে-দুটি জেলার বিবরণ দিয়েছেন সেখানে বালুতি ধরনের প্রথার আদৌ কোন উল্লেখই করেন নি।

পাশাপাশি মুসলমান-প্রধান জেলা-দুটি সম্বন্ধে তথ্যাদির ভিত্তিতে আশা করা যায় না যে, অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল বাংলার অন্যান্য জেলায়, বিশেষত পশ্চিমে, যেগুলি হিন্দুপ্রধান। এমনকি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিককার আকর-দলিলপত্রেও গ্রামীণ কারিগরদের ফসলের হিসসা দিয়ে বস্তুশোধ চলতে থাকার কথা দেখা যায়। তবে বাংলার মুসলিম এলাকাগুলির গ্রামাঞ্চলে সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠাম গড়ে উঠেছিল জোতওয়ালাদের ইসলামে ধর্মান্তরণ, না, প্রাকৃতিক এবং অন্যান্য পরিবেশের প্রভাবে, সেটা স্থির করতে হলে বিশেষ বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। দিনাজপুরে আর রংপুরে যে-পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল সে-সম্বন্ধে একটা বিবরণই শুধু আমি দিচ্ছি।

কর আর পুলিস সংস্থার নিম্নতর স্তর সম্বন্ধে বুকাননের দেওয়া উপাত্ত থেকে দেখা যায় ইংরেজ সামরিক এবং অন্যান্য লোকজনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হলেও স্থানীয় 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষকদের' বিস্তৃত সংগঠন বজায় রাখার ফলে সেই কমতিটা বেশ পুষিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া আমি মনে করি, এই বর্গের লোক যে-পারিতোষিক পেত সেটা লক্ষ্য করলে বাংলার কৃষির উদ্বৃত্ত-উৎপাদ বণ্টন আর নিষ্কর জমি ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণা আরও বিস্তৃত করতে সুবিধে হয়।

বাংলার জমিদারদের গড়ে-তোলা কর-সংস্থার কাঠাম আর তাতে কাজ-করা লোকজনের পারিতোষিক বিষয়ে ধারণা করা যায় দিনাজপুরের রাজার জমিদারি সম্বন্ধে বুকাননের দেওয়া উপাত্ত থেকে। সর্বোচ্চ কর্মকর্তা দেওয়ানের বার্ষিক পারিতোষিক ছিল ১২০০ টাকা, তার অধীনে

ছিল ৮ জন সহকারী (তহসিলদার), এরা প্রত্যেকে পেত ৩০০ টাকা করে, ৮ জন কেরানি – প্রত্যেকে পেত ৯৬ টাকা করে, ২৪ জন সর্দার (রক্ষিদলের প্রধানেরা) – এরা প্রত্যেকে ইনাম-জমি ভোগ করত ৫০ বিঘা করে (১৮·২৫ একর বা ৭·৩ হেক্টর), রক্ষিদলের ১৬ জন ছোট সর্দার – এরা প্রত্যেকে জমি পেত ৩০ বিঘা (১১ একর বা ৪·৫ হেক্টর), বাদবাকি রক্ষীরা মাইনে পেত নগদে: ৮ জন বড় আর ২৪ জন পাইক যথাক্রমে ৪৮ আর ৩৬ টাকা করে বছরে; ১৬ জন হিসাবরক্ষক – ১২ বিঘা (৪·৪ একর বা ১·৮ হেক্টর) করে, আর ২০০ চাপরাসি – ১০ বিঘা (৩·৭ একর বা ১·৫ হেক্টর) করে। নগদে মোট পারিতোষিক ছিল ৮৬৮৮ টাকা, আর জমিদারির লোকজনকে ভোগ করতে দেওয়া জমির পরিমাণ ছিল ৭৮৭২ বিঘা (২৮৭৩ একর বা ১১৫০ হেক্টর), সেটা প্রতি বিঘায় ১০ আনা হিসাবে কর ধরলে কার্যত হত নগদে আরও ৪৯২৪ টাকা, তার মানে কর আর পুলিস সংস্থা বাবত খরচ হত ১৩,৬০০ টাকা (ঘুষ এবং অন্যান্য জবর-আদায় বাদে)। তাছাড়া, দাখিল-করা খাজনা হিসেবে আগম হত যে ১,১০,০০০ টাকা তার ৪ শতাংশ অর্থাৎ ৪৪০০ টাকা পেত তহসিলদারেরা। জমিদারের লোকজনের নিষ্কর জমি থেকে পাওনা (কিন্তু প্রাপ্ত নয়) পরিমাণ সমেত জমিদারি অঞ্চলের মোট খাজনা-আয় ছিল ১,১৪,৯২৪ টাকা, সেটা থেকে ৭৯,০০০ টাকা যেত ভূমি-কর বাবত, কর আর পুলিস সংস্থা বাবত যেত ১৮,০১২ টাকা, আর ১৭৯১২ টাকা পেত জমিদার।

প্রাপ্ত করের মোট পরিমাণ আর প্রতি-বিঘার কর-হারের ভিত্তিতে জমিদারির আয়তন হিসাব করা যায়, সেটা ছিল মোটামুটি ১,২২,০০০ বিঘা (৪০,৮০০ একর বা ১৬,৩০০ হেক্টর)। এই জমি চাষ করতে লাগত ৮০০০ চাষী, আর দেখা যায় জমিদারির চৌহদ্দির ভিতরে অতজন চাষীর জন্যে প্রশাসনিক আর পুলিসী লোকজন ছিল ৫০০-এর কিছু বেশি, অর্থাৎ ২৪৫ বিঘা (৩২·৬ হেক্টর) জমি আর ১৬ জন চাষীর জন্যে একজন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষক।

অন্য জমিদারিটার আয়তন ছিল আগেরটার কাছাকাছি, আর পারিতোষিকের ব্যবস্থাও ছিল মোটামুটি একই রকমের। এখানে খাজনা উসুল হত ৯৯,৬৭৪ টাকা, সেটা থেকে ভূমি-কর বাবত যেত ৮১,৫৯১ টাকা, লোকজনের বিভিন্ন পারিতোষিক বাবত যেত ৭৯৭৮ টাকা, আর

জমিদারের থাকত ১০,১০৫ টাকা। কিছুটা ছোট একটা জমিদারিতে খাজনা আদায় হত ৬৩০০ টাকা, লোকজনকে পারিতোষিক দেওয়া হত ৬৭৯ টাকা ৮ আনা, কর দেওয়া হত ৪৫০০ টাকা, আর এই সমীক্ষার একটু আগে জমিদারিটা কিনেছিল যে-বণিক সেই জমিদারের থাকত ১১২০ টাকা ৮ আনা। *

ভূমি থেকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ, জমিদারেরা আর তাদের লোকজন যথার্থই কত পেত সেটা এইসব অঙ্কের ভিত্তিতে স্থির করার পক্ষে যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। জমিদারেরা যে-কর দিত সেটার পরিমাণ মোটামুটি ঠিকই। তবে তাদের আয় যা ছিল সে-সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বলেছিল জমিদারেরা নিজেরাই, কাজেই সেটা কমিয়ে বলা হয়েছিল নিশ্চয়ই, এমনকি সরাসরি-পাওয়া খাজনার বেলায়ও (স্মরণ করা যেতে পারে আখ-চাষের উপযোগী জমির খাজনা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবার দৃষ্টান্তগুলো)। তাছাড়া ছিল সেলামি, ভেট, বেগার, ইত্যাদি আকারে জমিদারের পাওয়া পরোক্ষ করের ব্যবস্থা। তবে এইসব ক্ষেত্রে, জমিদার-দের নিজেদেরই দেওয়া তথ্য অনুসারেও, তাদের অংশটা ছিল পাওনা করের দশমাংশের ৫০ শতাংশের বেশি।

যেমন সারা বাংলায় তেমনি দিনাজপুরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদার-দের ন্যায্য আর অন্যায্য আয় বাড়িয়ে দিয়ে ভূসম্পত্তিতে পুঁজি আকৃষ্ট করেছিল। এই জেলায় জমিদারদের বেশির ভাগই জমিদারি আয়ত্ত করেছিল অল্প কয়েক বছর আগে, তার আগে তারা ছিল বণিক, 'নির্মায়ক', কোন জমিদারির প্রতিনিধি কিংবা সরকারী আমলা। তবে এরা সংখ্যায় খুব বেশি ছিল না। ** এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জমিদারদের ওই অংশটা অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল কলকাতার চারপাশের জেলাগুলিতে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার পরে জমিদারিগুলোর আয় অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল, এটা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লেখা রচনাগুলিতে সর্বসম্মত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার পরে জমির দাম (আরও যথাযথ ভাষায়—জমিদারদের বিষয়সম্পত্তির দাম) এক পুরুষ-পর্যায়ের মধ্যে বেড়ে গিয়ে-

ছিল দশগুণ, কখনও-কখনও কুড়িগুণ পর্যন্ত, এই মন্তব্যের উপর এন. কে. সিন্‌হা আরও বলেন, এটা ঘটেছিল জমির উপর বেড়ে-চলা চাপের ফলে, আর এই চাপ বাড়ার কারণ হল সাধারণভাবে জনসংখ্যাবৃদ্ধি, উচ্ছন্ন কারিগরদের কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক সমাগম, আর রায়তদের মালিকানা স্বত্ব সম্বন্ধে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অবহেলা। এই সবকিছুর ফলে জমিদারেরা খাজনা বাড়িয়ে দিতে পেরেছিল অনেকটা: খাজনা প্রকৃতপক্ষে দ্বিগুণ বেড়েছিল ১৮০০ থেকে ১৮১০ সালের মধ্যে। *

উনিশ শতকের গোড়ার দিককার বাংলার জাতীয় উৎপাদের গঠন সম্বন্ধে উপাত্ত আমাদের হাতে নেই, তবে জেলায়-জেলায় কৃষি-উৎপাদের গঠন আর চালান সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করার সুযোগ আছে বটে। দিনাজপুরে প্রধান-প্রধান ফসলের জমির পরিমাণ আর নগদ টাকার হিসাবে উৎপাদ সম্বন্ধে তথ্য দিয়েছেন বুকানন। এইসব উপাত্ত বিশ্লেষণ করা দুষ্কর দুটো কারণে: এক, সেগুলোর কোন-কোন ফসল শীতকালের – প্রধানত ধান (মোট ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার সমস্ত ফসলের মধ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার), আর কোন-কোনটা গ্রীষ্মের, আবার কোন-কোনটা উভয় মরসুমের। আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় রংপুর জেলার কৃষি-উৎপাদের গঠন সম্বন্ধে। সবগুলো মিলিয়ে মোট ২,১১,০০,০০০ টাকার ফসলের মধ্যে ৯৩ লক্ষ টাকার ২,৮১,২০,০০০ মন (বীজ বাদে – ২,৬৬,০০,০০০ মন) (প্রসঙ্গত বলি, এইসব অঙ্ক থেকে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে ১১৫ কিলোগ্রাম ধানের দাম ছিল ১ টাকা, আর – স্মরণ থাকতে পারে – ৫০ কিলোগ্রাম চালের দাম ছিল ১ টাকা; এই মস্ত তফাতটার কারণ হয়ত ধান ভানার খরচ [ভানাতে গিয়ে ফেলাও যেত অনেকটা], আর ব্যাপারিক পুঁজির অংশগ্রহণের দরুন দামে 'যে-বাড়তি' ঘটত); ২,১৩,৩০০ টাকার ৭,৮৪,০০০ মন জোয়ার (বীজ বাদে – ৭,৬৮,০০০ মন); ১,০৮,৫০০ টাকার ২,৬৮,০০০ (বীজ বাদে ২,৫০,২০০) মন গম আর যব; ২,১৭,০০০ টাকার ৫,১৬,৫০০ (৪,৬৭,২০০) মন ডাল; ১০,৬৯,০০০ টাকার ১২,১২,৭০০ (১১,৫১,৬০০) মন তৈলবীজ; ৪,৪৫,০০০ টাকার ২,৮৫,০০০ মন আখ; ১,৮৭,৮০০ টাকার পাট; ৩৮০০ টাকার তুলো; ১,৭৯,৭০০ টাকার পানপাতা; ৪,৬৯,৩০০ টাকার

সুপারি; ২,৫৩,৩০০ টাকার তামাক; ১,২৭,৮০০ টাকার নীল। *

ফসল ফলানোতে খাদ্যশস্য আর ডালের প্রাধান্য (৯৭,৫০,০০০ টাকা) এইসব অঙ্ক থেকে সুস্পষ্ট। (উল্লিখিত সমস্ত ফসলের দাম ছিল মোটামুটি ১,২৫,০০,০০০ টাকা।) এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ৮৬,০০,০০০ টাকা হল শুধু কিংবা প্রধানত প্রধান ফসল প্রসঙ্গে, যাতে খাদ্যশস্যগুলোর মধ্যে ধানই প্রধান। তবে তাতে এটাও নাকচ হয়ে যায় না যে, ঐ ৮৬,০০,০০০ টাকার মধ্যে একটা দ্বিতীয় ফসল ছাড়াও থাকতে পারে পশুপালন, বনপালন আর মাছ-ধরা শাখাগুলোর উৎপাদ। শিল্পে-প্রয়োজনীয় ফসল আর গৌণ ফসলের (সুপারি, তামাক) অংশ ছিল নগণ্য, আর সেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বাজারী উৎপাদের চড়া অনুপাতের কথা বিবেচনায় রাখলেও সেগুলো নিশ্চয়ই হতে পারে নি সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্যের প্রধান অংশটা।

হস্তশিল্প সম্বন্ধে তথ্যাদি খুবই কম, কেননা স্থানীয় কারিগরেরা কার্যত চালানের জন্যে কাজ করত না, আর কৃষি-দ্রব্যের বণ্টনেও অংশগ্রহণ করত না; এইভাবে, ইংরেজ পর্যবেক্ষকেরা প্রধান যে-দুটো কারণে ভারতীয় কারিগরদের সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহান্বিত হত তা এক্ষেত্রে ছিল না। তাদের সংখ্যা ছিল বড়জোর ৬ লক্ষ – যেটা হল দিনাজপুরে কৃষি-বহির্ভূত জনসমষ্টি সম্বন্ধে বুকাননের হিসাব। সন্নিহিত রংপুরে কারিগরেরা ছিল জনসমষ্টির মোটামুটি ১২ শতাংশ; অনুপাতটা একই হলে দিনাজপুরে কারিগরদের সংখ্যা হত প্রায় ৩ লক্ষ ৬০ হাজার।

তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা সাধারণত ছিল নিচু। 'অচ্ছুত' ছিল ব্যাপারী আর কারিগরদের তেরটা সম্প্রদায়: পোদ্দার (বুকানন বলেছেন – সুবর্ণবণিক), সূত্রধর, শস্য আর নুনের ব্যাপারীরা (সুঁড়ি), এক-জাতের কুম্ভকার, তেলি, চার-জাতের জেলে, সেকরা, ময়রা, সুঁড়ি। এদের সংখ্যা ছিল মোট দেড় লক্ষ, অর্থাৎ জেলাটির হিন্দু জনসমষ্টির ষষ্ঠাংশ। 'অচ্ছুত'দের একটা বিশেষ বর্গে (২ লক্ষ ২৫ হাজার) ছিল সাতটা সম্প্রদায়: রজক, চট-তন্তুবায়, এক-জাতের জেলে, ঝুড়ি-বোনা কারিগর, মালী আর চর্মকার। ** ৯ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে মাত্র ৯০ হাজার 'সদ্বংশ-

---

জাত বলে গণ্য হত।* এইভাবে, হস্তশিল্পক্ষেত্রে প্রধান-প্রধান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে শুধু কাপড়-তন্তুবায় আর কর্মকাররাই বাংলার বর্ণগত সোপানতন্ত্রের একেবারে তলায় পড়ে নি। মুসলিম কারিগরদের কথা কিছুই বলা হয় নি, যদিও ধরে নেওয়া যেতে পারে কিছু-কিছু তন্তুবায় ছিল মুসলমানদের মধ্যে।

দিনাজপুরে সূত্রধর উপ-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঠিক সূত্রধররা ছাড়াও ছিল কাঠের মিস্ত্রি, আসবাবপত্র-নির্মাতা আর খোদকাররাও। ছ'-সাত শ' ঘর মানুষ ছিল এইসব উপ-সম্প্রদায়ের। এদের বেশির ভাগই তৈরি করত 'কৃষিকাজের নানা অপকৃষ্ট জিনিস' কিংবা কৃষকদের জন্যে পিঁড়ি চৌকি ইত্যাদি, — এরা ছিল কারিগরদের মধ্যে সবচেয়ে গরিব। শহরে সূত্রধররা তৈরি করত বিভিন্ন কাঠাম, দরজা, খুঁটি, কড়ি-বরগা, আর পালকিও — এদের রোজগার হত ৪-৮ টাকা অবধি। প্রায় ৮ টাকা রোজগার করতে হলে ৪০-৫০ টাকা পুঁজি লাগত, আর কয়েক জন মজুর লাগাতে হত। বুকানন কোন-কোন জিনিসের দাম উল্লেখ করেছেন: পালকি — ১০ থেকে ২০ টাকা, খাট — ২ থেকে ৪ টাকা। কিন্তু কাজের সরঞ্জামের দাম ছিল অনেক সস্তা: চরকা — ২ আনা, লাঙল (লোহার ফাল ছাড়া) — ৪ থেকে ৬ আনা। আখ-মাড়াই আর তৈলবীজ পেষা সরঞ্জামের কথাও বলা হয়েছে। দিনাজপুরে নৌকা তৈরি হত, কিন্তু বেশি নয়, কেননা স্থানীয় ব্যাপারীদের মধ্যে নৌকার জন্যে চাহিদা ছিল কম। সেখানে, নৌকা তৈরির কারবার করত একজন বণিক, সে মাসিক ৭ টাকায় ওস্তাদকারিগর এবং মাসিক ৩-৬ টাকায় অন্যান্য সূত্রধর খাটাত।

সূত্রধরের হাতিয়ারের মধ্যে ছিল — একখানা টাঙি, একখানা খুদে কুড়াল, নানা রকম বাটালি, অত্যন্ত আনাড়ি ধরনের একটা রেঁদা, একখানা হাত-করাত, একটা তুরপুন, একটা কেঠো হাতুড়ি। রুলার, স্কয়্যার, পাটা কিংবা কম্পাস দেখতে পান নি বুকানন। প্রসঙ্গত বলি, পাটা না থাকার ফলে কোন-কোন কাজে — কাঠ মসৃণ এবং সমতল করার জন্যে — আর-একজন লোক দরকার হত। সমস্ত রকমের রেঁদা, কম্পাস, রুলার, স্কয়্যার, ইত্যাদি 'ইউরোপীয় ধরনের হাতিয়ার' ব্যবহৃত হত শুধু দিনাজপুর শহরে।

বুকানন শুনেছিলেন দিনাজপুরে ছিল সাতটা কুন্দকারশালা, প্রত্যেক-টাতে দু'জন করে লোক লাগানো হত – একজন কুন্দ (লেদ) ঘোরাবার জন্যে একবার এক-হাত, অন্য বার অন্য-হাত দিয়ে একটা দড়া টানত, আর বাটালি লাগাত অন্য জন। কুন্দকারেরা তৈরি করত চরকার একটা অংশ, কেঠো থালা আর বাটি, বেলনা, হুঁকোর বিভিন্ন অংশ, খাটের পায়া। * এই বিস্তারিত বর্ণনা থেকে আরও স্পষ্ট বোঝা যায় কত অনগ্রসর ছিল ভারতীয় হস্তশিল্পের প্রযুক্তি, আর শুধু তাই নয় – সেই অনগ্রসরতার অতিরঞ্জনও এটার সাহায্যে এড়ানো যায়, যে-অতিরঞ্জন নিঃসন্দেহে করা হয়েছে উল্লিখিত কোন-কোন বিবরণে।

কোন-কোন হস্তশিল্পে বিশেষীকরণ মহারাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে গিয়ে-ছিল বাংলায় আর বিহারে। যেমন, পুর্ণিয়া জেলায় কৃষি সরঞ্জাম তৈরি করার কাজটা সূত্রধরদের হাত থেকে মোটের উপর নিয়ে নিয়েছিল কর্মকাররা। গৃহস্থালির সাদাসিধে আসবাব, নৌকা আর গাড়ি তৈরি করার কাজ থেকে গিয়েছিল সূত্রধরদের জন্যে। বুকানন লক্ষ্য করেন বেশির ভাগ সূত্রধর ছিল আবার কুন্দকারও, তাই তারা তৈরি করতে পারত চরকা আর খাটও, যা ছিল কুন্দকারের কুন্দে সবচেয়ে বেশি তৈরি-করা জিনিস।** এইভাবে, কৃষি সরঞ্জামের জন্যে ফরমাশ আর না পেয়ে স্থানীয় সূত্রধররা তৈরি করতে থাকে বিভিন্ন ভোগ্য বস্তু, যানবাহ-নের উপকরণ, আর – যা বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন – কাটনিদের এবং হয়ত অন্যান্য কারিগরদেরও বিভিন্ন হাতিয়ার। বুকানন আরও বলেন, দিনাজ-পুর জেলায় সূত্রধররা কুন্দকারের কাজ করত। তবে তাদের উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে কৃষি সরঞ্জাম হাতছাড়া হয়ে যাবার ফলে বাংলায় আর বিহারে সূত্রধর সম্প্রদায়গুলির সামাজিক প্রতিষ্ঠার অবনতি ঘটেছিল – কোন-কোন বর্গ 'অচ্ছুত' বলে গণ্য হত।***

দিনাজপুরের ১৪০০ ঘর কুম্ভকারদের সম্বন্ধে বুকানন বলেন, তাদের কল্যাণ ছিল সবদিক থেকে, কেননা সরঞ্জাম (কুম্ভকারের চাক

আর চুল্লি) ছিল সস্তা এবং টেকসই, আর তাদের উৎপন্ন জিনিস খদ্দে-রের কাছে বিক্রি হত সরাসরি এবং অবিলম্বে। একটি পরিবার (হয়ত যৌথ পরিবার, কেননা তাতে ছিল চারজন পুরুষ আর দু'জন স্ত্রীলোক) তৈরি করত মাসে ২০ টাকার জিনিস, তার থেকে লাগত জালানির জন্যে ৫ টাকা, কাদামাটির জন্যে ৩ টাকা ২ আনা, আর কারিগরদের এবং তাদের পরিবারের মানুষের সংসারযাত্রার জন্যে ১১-১২ টাকা। তবে এই কাজ করত ৬ জনে, কাজেই তাদের মাথাপিছু রোজগার ছিল স্বল্প।

মৃৎশিল্পের প্রযুক্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন বুকানন, তবে উৎপন্ন প্রধান-প্রধান জিনিসগুলোর সচিত্র তালিকাটি আরও বেশি আগ্রহজনক, কেননা এতে সেগুলোর বৈচিত্র্য আর কারিগরদের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।* মনে হয় ক্ষুদ্র-পণ্য হস্তশিল্প দিনাজপুরে প্রচলিত ছিল, সেটা স্থানীয় ভোগ-ব্যবহারের জন্যে, আর সম্প্রদায়গত হস্তশিল্প এবং গোড়ার দিককার বিভিন্ন পুঁজিতান্ত্রিক শাখা ছিল হয় ব্যতিক্রম হিসেবে, কিংবা ছিল না আদৌ।

অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে দিনাজপুরের বাণিজ্যের গঠন-সংক্রান্ত তথ্য থেকেও দেখা যায় দিনাজপুরে আর রংপুরে উৎপন্ন বেশির ভাগ জিনিসই বাংলার সার্ব সামাজিক শ্রমবিভাগের বাইরে ছিল। দিনাজপুর জেলা থেকে চালান দেওয়া হত ৪৮,১৯,৪০০ টাকার জিনিস, আর ১২,৮৫,৯০০ টাকার জিনিস এই জেলায় আনানো হত। প্রধান-প্রধান চালানী মাল ছিল এইরকম: চাল – ৩১,৭৯,০০০ টাকা, ঘি – ৪০,৫০০ টাকা, গোলম-রিচ – ৮১,৪০০ টাকা, চট আর চটের বস্তা – ১,২৪,৬০০ টাকা, কাঁচা রেশম – ৬২,৬০০ টাকা, সুতী কাপড় – ১,৪৫,০০০ টাকা, গুড় – ৩৫,৫০০ টাকা, চিনি – ৩,০০,০০০ টাকা, চিটেগুড় – ৭২,০০০ টাকা, নীল – ২,৬২,৫০০ টাকা। অন্যান্য অঞ্চল থেকে আনানো প্রধান-প্রধান জিনিস: নুন – ৮,২৫,০০০ টাকা, তুলো (প্রধানত মধ্য ভারত থেকে) – ১,০৫,৫০০ টাকা, চট আর চটের বস্তা – ৫১,০০০ টাকা। অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যের অন্যান্য জিনিসের পরিমাণ বেশি ছিল না, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ছিল এইগুলো: টিন – ২২০০ টাকা (৩২ টাকায় ৪০ সের), সীসা – ১৫০০

টাকা (১২ টাকায় ৪০ সের), দস্তা – ৭০০০ টাকা (২৬ টাকায় ৪০ সের), লোহা – ২৯,৮০০ টাকা (৪-৭ টাকায় ৪০ সের), ইস্পাত – ২২০০ টাকা (২০ টাকায় ৪০ সের), তামা – ১৮,৯০০ টাকা (৫৫ টাকায় ৪০ সের), ভরন আর তামার জিনিস – ২০,০০০ টাকা, সুতী কাপড় – ৩৯,০০০ টাকা, বৃটিশ পশমী কাপড় – ১০,০০০ টাকা।

উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল বিরাট – বছরে ৩৫,৩৩,৫০০ টাকা, চালান-দেওয়া চালের দামের প্রায় সমান, আর চাল এই জেলার প্রধান করযোগ্য ফসল। ভূমি-কর ছিল ৪০ লক্ষ টাকার কিছুটা বেশি, এটা বিবেচনায় থাকলে মনে হয় নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ভূমি-কর থেকে স্থানীয় প্রশাসন আর সৈন্য মোতায়েন রাখা বাবত খরচ বাদ গেলে যা থাকে সেটাই বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত। এই অনুমান অনুসারে, বাংলা থেকে সম্পদ যেটা বেরিয়ে যেত সেটাকে মোটামুটি ধরা যেতে পারে জেলাগুলির বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত আর এই প্রেসিডেন্সিতে কর্তৃপক্ষের খরচ-খরচার মধ্যে বিয়োগফলটা।

এমন অনুমান সঠিক হতে পারে, কিন্তু শুধু খুবই সাধারণভাবে, কেননা ব্যাপারিক আর চোটার পুঁজির কর্ম-বন্দেজটা এতে ধরা হয় না। তবে মনে রাখা দরকার, কলকাতা আর মুর্শিদাবাদের বণিকেরা কিনত বছরে ৪০ লক্ষ টাকার চাল, আর বাংলা থেকে যে-নজরানা আদায় করা হত সেটা চাল নয়, সেটা ছিল হস্তশিল্পজাত বিভিন্ন জিনিস, নীল আর কাঁচা রেশম। কর আর খাজনা হিসেবে রায়তের (জোত-মালিক) কাছ থেকে জোর করে আদায়-করা ধান-চালকে চালানী মালে পরিণত করার জন্যেও ব্যাপারিক পুঁজির অংশগ্রহণ আবশ্যক ছিল, কিন্তু বাংলার পরিসরে খুবই সাধারণভাবেও এই পুঁজির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ধারণা করতে পারার মতো তথ্যাদি আমাদের হাতে নেই।

চালের চালান সম্বন্ধে উপাত্ত থেকে এই ফসলের পণ্য-উপাদানের মাত্রা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। (করযোগ্য জমি সমেত) সমস্ত জমিতে ধান ফলনের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় পণ্য হিসেবে যে-পরিমাণ ধান-চাল এই জেলা থেকে বেরিয়ে যেত সেটা ছিল মোট ফসলের সিকি ভাগ। তাছাড়া, অন্তত ঐ একই হিসসা জেলার ভিতরে থেকে যেত কৃষি-বহির্ভূত জনসমষ্টির জন্যে; বুকাননের হিসাবে এদের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ, বা মোট জনসংখ্যার পঞ্চমাংশ। এইভাবে দেখা যায়, এই

জেলায় উৎপন্ন ধানের ৪০ শতাংশ পণ্যে পরিণত হত – আর এই অঙ্কটা আমাদের আগেকার হিসাবের সঙ্গে মেলে।

হস্তশিল্পজাত জিনিস (পাটজাত জিনিস এর মধ্যে ধরা চলে না, কেননা তখন এইসব জিনিস তৈরি করত কৃষকেরা নিজেরাই) এই জেলা থেকে চালান দেওয়া হত এতই কম পরিমাণে, এমনকি নগণ্য পরিমাণে যাতে সেটা বেশ লক্ষণীয়। ৩০ লক্ষ মানুষের এই জেলায় ধাতু ব্যবহৃত হবার বার্ষিক পরিমাণ মোটামুটি হিসাব করা যায় ধাতু যা বার থেকে আনানো হত সেটার ভিত্তিতে, কেননা স্থানীয় ধাতু-শিল্পের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মোট যে-পরিমাণ ধাতু নিয়ে কাজ করা হত সেটার কথা আমি বলছি নে (কেননা তার মধ্যে পড়ত ছাঁট ধাতুও), আমি বলছি ধাতুর বার্ষিক ক্ষয় ক্ষতি আর সেটা পূরণের পরিমাণ সম্বন্ধে। আমার হিসাব এইরকম: টিন ১০·৯ টন (১ কিলোগ্রাম – ০·৮৫ টাকা), সীসা ৪·৭৫ টন (১ কিলোগ্রাম – প্রায় ০·৩ টাকা), দস্তা ১০·২৫ টন (১ কিলোগ্রাম – প্রায় ০·৭ টাকা), লোহা ১৭০-২৮০ টন (১ কিলোগ্রাম – ০·১-০·১৮ টাকা), ইস্পাত ৪·২ টন (১ কিলোগ্রাম – ০·৫ টাকার বেশি), তামা ১৩ টন (১ কিলোগ্রাম – ১·৪ টাকার বেশি)। হস্তশিল্পজাত পরিসমাপ্ত জিনিসের বেলায় দেখা যায় সেগুলোর উৎপাদন আর ব্যবহার কার্যত সীমাবদ্ধ ছিল জেলাটির, হয়ত আরও ছোট্ট-ছোট এলকার চৌহদ্দির ভিতরে।

অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সন্নিহিত রংপুরের বাণিজ্যের গঠনও ছিল মোটামুটি একই রকমের। এখানে বার থেকে আনানো হত ১৪,৫০,০০০ টাকার মাল, আর এখান থেকে চালান দেওয়া হত ৩৬,৪৮,৫০০ টাকার মাল, এগুলোর মধ্যে প্রধান-প্রধান দফা ছিল এই: চাল – ১১,৭৭,৫০০ টাকা, ধান – ১,০৬,৮০০ টাকা, সুপারি – ৪৪,১০০ টাকা, তামাক – ১,৬৮,৪০০ টাকা, আফিম – ৩২,০০০ টাকা, কাগজ – ৩০০০ টাকা, নীল – ৬,৪৪,০০০ টাকা, নুন – ৩,৩২,০০০ টাকা (চালান আসত ৬,৯২,০০০ টাকার, তার মানে চালান দেওয়াটা কার্যত ছিল গমন-পথের ব্যাপার), চট আর বস্তা – ১,১৩,০০০ টাকা, কাঁচা রেশম – ২,৫২,০০০ টাকা, সুতী কাপড় – ৬৩,৫০০ টাকা (আবার চালান আসত ৬৪,৭০০ টাকার, তার মানে কাপড়ের ব্যবসা ছিল মোটামুটি সমতুল), বৃটিশ পশমী কাপড় – ১৪,০০০ টাকা (সেটার চালান আসত

১৭,০০০ টাকার), চিনি – ৬৭,০০০ টাকা, চিটেগুড় – ৮১,৬০০ টাকা, কাঠ – ২৭,০০০ টাকা, চরকা – ২০০ টাকা। যেসব জিনিসের চালান আসত, সেগুলো উপরে উল্লেখ করা হয় নি: নুন – ৬,৯১,৭০০ টাকা, ওষুধ আর ঔষধি – ৩৬,৪০০ টাকা, তামা – ৯০০০ টাকা (চালান দেওয়া হত ৪৮০০ টাকার), টিন – ১৬০০ টাকা, লোহা – ২৭,০০০ টাকা, তামা আর ভরনের জিনিসপত্র – ১৭,৩০০ টাকা (চালান দেওয়া হয় ৪০০০ টাকার), তুলো – ২,৩১,০০০ টাকা।* এইভাবে দেখা যাচ্ছে দিনাজপুর থেকে বিশেষ পার্থক্য ছিল নীলের প্রচুর চালান দেওয়াতে (এর থেকে আগম হত কৃষিক্ষেত্রে এটার উৎপাদনে যা খরচ পড়ত তার পাঁচগুণ, এর কারণটা সম্ভবত এই যে, চাষীকে যে-কাঁচামাল দেওয়া হত সেটার দাম ছিল খুবই কম, আর পরে প্রসেসিংয়ে খরচ ছিল চড়া), আর ধান-চাল চালান দেওয়া হত অপেক্ষাকৃতভাবে এবং অনপেক্ষভাবে কম। এটার কারণ, আর এর সঙ্গে দিনাজপুরের চেয়ে রংপুরের চালান দেওয়া কৃষিজাত দ্রব্যের মোট পরিমাণ কম হবার কারণ ছিল হয়ত দিনাজপুর জেলায় মাটির বেশি উর্বরতা,** সেটা থেকে আরও বোঝায় উদ্বৃত্ত-উৎপাদেরও অধিকতর পরিমাণ।

কৃষিতে আর হস্তশিল্পে জাতদ্রব্যের উৎপাদন-প্রণালী আর বণ্টন সম্বন্ধে উল্লিখিত বর্ণনার ভিত্তিতে তাহলে গড়ে উঠেছিল কোন্ সামাজিক কাঠাম? দিনাজপুর আর রংপুর ছিল মুসলিম-প্রধান, বিশেষত চাষীদের মধ্যে, তাই কেবল সম্প্রদায়গত গঠনের ভিত্তিতে এই কাঠাম সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করা যায় না, তবে দিনাজপুরের সামাজিক-শ্রেণীগত কাঠাম সম্বন্ধে কয়েকটা সাধারণ সিদ্ধান্ত আমি সবিনয়ে হাজির করেছি আগেই। রংপুরের জনসমষ্টি সম্বন্ধে উপাত্তটা আরও বেশি যথাযথ: মুসলিমের সংখ্যা ছিল ১৫,৩৬,০০০, আর হিন্দু – ১১,৯৪,০০০, মোট ২৭,৩০,০০০; এদের মধ্যে চাষী – ২০,৫৬,০০০, কারিগর – ৩,৩১,০০০, আর 'নিষ্কর্মা' – ৩,৪৩,০০০।***

এইভাবে দেখা যাচ্ছে জেলাটিতে চাষীরা ছিল জনসমষ্টির ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ, নিশ্চয়ই বাংলায় সবচেয়ে বেশি, কেননা দিনাজপুর

আর রংপুর উভয় জেলা ছিল গ্রামাঞ্চল, তাতে ছোট-ছোট শহর। দিনাজপুর থেকে চাল যা চালান দেওয়া হত সে-সম্বন্ধে উপাত্ত থেকে দেখা যায় মুর্শিদাবাদে, কলকাতায় এবং জেলাটির বাইরে অন্যান্য জায়গায় যাদের জীবনযাত্রা চলত জেলাটির কৃষিজাত দ্রব্যের সাহায্যে তাদের সংখ্যা ছিল জেলাটিতে কৃষি-বহির্ভূত বিভিন্ন পেশার মানুষের সংখ্যার মোটামুটি সমান।

দুঃখের কথা, জেলাটির জনসমষ্টির অন্য দুটি বর্গ সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া হয়েছে বড়-বেশি সাধারণভাবে। যেমন, কাদের মধ্যে ধরা হয়েছে বণিকদের সেটা স্পষ্ট নয়। তখনকার দিনের বৃটিশ মালমশলায় সমস্ত বর্গের খাজনা-প্রাপ্তাদের 'নিষ্কর্মাদের' মধ্যে ধরাই সাধারণ ধারাটা। তাই মনে হয়, বইখানার অন্যান্য বিভিন্ন অংশে যেমন সেইভাবে বণিকদের ধরা হয়েছে কারিগরদের সঙ্গে একত্রে (যারা বিভিন্ন কৃত্যকে কাজ করত তাদেরই মতো, যেটা আরও স্পষ্ট)। যেহেতু সবচেয়ে বড় জমিদারেরা তাদের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে জেলাটির বাইরে বড়-বড় শহরে থাকতেই বেশি পছন্দ করত, তাই খাজনা-প্রাপ্তা 'নিষ্কর্মাদের' অংশটাকে (জনসমষ্টির প্রায় ১২ শতাংশ) ধরা চাই বাংলার বেলায় যেটা গড় পরিমাণ তার চেয়ে কমে (কৃষি-বহির্ভূত জনসমষ্টি হিসাব করার বেলায় যেমনটা সেই একই ধারায় বিবেচনা করা চলে বলে)। তাছাড়া, রায়তদের ('খামারীদের') যে-উপর-স্তরটার জীবনযাত্রা চলত খাজনার সাহায্যে তাদের নিশ্চয়ই আনুষ্ঠানিক সূচকের ভিত্তিতে বৃটিশ পরিসংখ্যানে ধরা হয়েছে কৃষকদের মধ্যে, আর এইভাবে খাটো করে দেখান হয়েছে খাজনা-প্রাপ্তাদের সংখ্যাটাকে। তবে সেটা যা-ই হোক, খাজনা-প্রাপ্তাদের উল্লিখিত শতাংশটাও খুবই বেশি।

বুকানন দিয়েছেন দিনাজপুরের জনসমষ্টির মালিকানা-সংক্রান্ত সোপানতন্ত্রের একটা বিবরণ, আর জেলাটির প্রশাসন কেন্দ্রে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দুদের পারিবারিক বাজেট সম্বন্ধে তথ্যাদি। বাংলার অন্তর্দেশীয় অঞ্চলগুলির সামাজিক কাঠাম এবং জনসমষ্টির বিভিন্ন অংশের গুরুত্বপূর্ণ পরিসর আর গঠন সম্বন্ধে আমাদের চিত্রখানাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে এইসব উপাত্ত সহায়ক।

দিনাজপুর জেলায় ছ'টা বর্গের মালিকানা-ভিত্তিক সোপানতন্ত্রের একটা ছক তুলে ধরেছেন বুকানন (বড়-বড় ভূস্বামীরা বা জমিদারেরা

জেলায় স্থায়িভাবে বাস করত না, তাই এই বর্গবিভাগ থেকে তাদের বাদ দিয়েছেন বুকানন)। প্রথম বর্গ – উঁচুদরের আমলারা, বড়-বড় জমিদারদের প্রতিনিধিরা এবং খুদে আর মাঝারি জমিদাররা, আর 'প্রধান-প্রধান বণিক এবং নির্মায়করা'; দুঃখের কথা, কারা ছিল এই 'নির্মায়করা' সে-সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নি, – তারা তো হতে পারত নীলের বাগিচা আর নীলকুঠির মালিক। দ্বিতীয় বর্গ – যেসব আমলা আর জমিদারের এজেণ্টের কথা উল্লিখিত হয়েছে তাদের চেয়ে নিচু স্তরের ঐ বর্গের মানুষ, আর খুদে জমিদারেরা এবং বেশকিছু বণিক, কার্যত শুধু চিনি-শিল্পের বণিকেরা, যারা ছিল 'নেটিভ', অর্থাৎ স্থানীয় বাসিন্দা – ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে আগত নয়। তৃতীয় বর্গ – নিচু স্তরের আমলারা আর জমিদার এবং বণিকদের গোমস্তারা, ছোট দোকানদার আর 'নির্মায়করা', ধনী 'খামারীরা', অর্থাৎ উঁচু স্তরের রায়তরা। চতুর্থ বর্গ – যাদের তিন-চারখানা লাঙল ছিল এমনসব 'খামারীরা' আর সচ্ছল কারিগরেরা। পঞ্চম বর্গ – একখানা কিংবা দু'খানা যাদের লাঙল এমনসব চাষী, খুদে দোকানদার আর স্বল্প আয়ের কারিগরেরা, যেমন যাদের দুটো ঘানি-গাছ এমনসব তেলি, আর একটা কিংবা দুটো যাদের তাঁত এমনসব তন্তুবায়। ষষ্ঠ বর্গ – ভাগচাষী, দিনমজুর এবং নিচু স্তরের কারিগর, যেমন যারা ঝুড়ি বুনত, রজক, সূত্রধর, ইত্যাদি।*

উঁচু স্তরের 'নির্মায়কদের' বিষয়টা অস্পষ্ট (যা আমি বলেছি) বলে এই বর্গবিভাগের মূল্য অনেকটা কমে গেছে; কিন্তু আখ-মাড়া কলের মালিকদেরকে ছোট জমিদারদের সঙ্গে একই বর্গে ধরা থেকে দেখা যাচ্ছে উঁচু স্তরের রায়তদের (যাদের নগদ পুঁজি ছিল ৫ থেকে ২০ হাজার টাকা) জীবনযাত্রার মান ছিল নিচু স্তরের জমিদারদের কাছাকাছি। যেসব রায়ত খেতি-খামার করত তিন-চার প্রস্ত সরঞ্জাম দিয়ে, অর্থাৎ ৬ থেকে ৮ হেক্টর জমিতে, তাদের সঙ্গে একই (চতুর্থ) বর্গে ধরা হয়েছে যে-সচ্ছল কারিগর তাদের সম্বন্ধে আর কিছুই বলা হয় নি। এদের হয়ত ধরা যেতে পারত খুদে 'নির্মায়কদের' সঙ্গে একত্রে। পঞ্চম বর্গে যেসব কারিগরদের ধরা হয়েছে তাদের নাম নেই 'অচ্ছুতদের'

মধ্যে। তাদের অবস্থা ছিল আমাদের পুরান বন্ধু এক-লাঙলের মালিকেরই মতো, কিংবা তার চেয়ে একটু ভাল। শেষে, কারিগরদের প্রধান অংশটা ছিল গ্রামাঞ্চলের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত নিচু স্তরগুলির মতো একই অবস্থায়। এককথায়, মালিকানা-ভিত্তিক এই সোপানতন্ত্রের এই বর্ণনায় এমনকিছু নেই যেটার ভিত্তিতে কারিগরদের মধ্যে কারবারী উদ্যোগের সুযোগ-সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করা যেতে পারে, তবে এমনটা মনে করা যেতে পারে যে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তেমন সুযোগ-সম্ভাবনা খোলা ছিল তন্তুবায়, তেলি এবং হয়ত আরও কোন-কোন পেশার মানুষের সামনে।

দিনাজপুর শহরের হিন্দু পরিবারগুলিকে বুকানন জীবনযাত্রার খরচ আর ভোগ-ব্যবহার অনুসারে ছ'টা বর্গে ভাগ করেছেন নিশ্চয়ই সংগত কারণেই, এইভাবে তিনি ঐসব বর্গের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট করে তুলেছেন ভোগ-ব্যবহারের হিসাবে। তবে মনে রাখা দরকার, এইসব উপাত্ত সরাসরি প্রযোজ্য শহুরে মানুষের বেলায়ই শুধু। বুকাননের সহকারী হিসেবে নিযুক্ত একজন হিন্দু কর্মচারী সংগ্রহ করেছিলেন এইসব উপাত্ত; তিনি বলেছিলেন মুসলিম পরিবারগুলির খরচ-খরচা একই সামাজিক প্রতিষ্ঠার হিন্দু পরিবারগুলির থেকে বড় একটা পৃথক ছিল না।

সমস্ত গৃহস্থালির বাসন-কোসন আর আচার-অনুষ্ঠানের জিনিসপত্র, গয়নাগাঁটি এবং কাপড়-চোপড়ের তালিকা দিতে গেলে – বিশেষত সেটা যদি হয় ধনী পরিবারগুলির – আর তাদের খাদ্যাদির সবিস্তার বর্ণনা করতে গেলে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা এসে যায়। তাদের নিজস্ব ব্যবহারের জিনিসপত্র এতই বহুবিচিত্র যাতে অবাক হয়ে যেতে হয়, আর সেগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ছিল তাদের স্পষ্টতই চিরাগত ব্যক্তিগত মান। দিনাজপুর শহরে একটি উঁচুদরের হিন্দু পরিবারের (স্বামী, স্ত্রী, সন্তান আর সাত জন চাকর) ছিল: বিভিন্ন বারবাড়ি সমেত একটা বাড়ি (দাম ৪৪০ টাকা, জমি-বন্দের খাজনা এবং বাড়ি মেরামত আর বজায় রাখা বাবত বছরে যথাক্রমে ৬ টাকা আর ১৫৮ টাকা); আচার-অনুষ্ঠানের পাত্রাদি ১৯খানা – ৩৬ টাকা; গৃহস্থালির ব্যবহারের জন্যে তামা লোহা আর মাটির ১০০খানার বেশি জিনিস – ২৩৮ টাকা (সমস্ত বাসন-কোসনের জন্যে বার্ষিক খরচ মোট ৬৬ টাকা); সহজে নষ্ট হয় এমনসব আসবাব,

অর্থাৎ গালিচা, ফরাশ, শজনে, শতরঞ্চি, বিছানার চাদর ইত্যাদি – ১৪৪ টাকা (তার উপর এইসব জিনিস বাবত বার্ষিক খরচ প্রায় ৫৪ টাকা); স্ত্রী স্বামী আর সন্তানের গয়নাগাঁটি – ৬৭৫ টাকা (তাতে বার্ষিক খরচ ১৬২ টাকা ৮ আনা); কাপড়-চোপড়, মনিবদের – ১৬৬ টাকা ৮ আনা, আর চাকর-বাকরের – ৪৩ টাকা ৮ আনা (কাপড়-চোপড় বাবত মোট খরচের কথা বুকানন বলেছেন বার্ষিক হিসাবে, তবে মনে হয় সেটা ধরতে হবে তার অর্ধেক)। খরচ-খরচা ছিল (সবই বার্ষিক হিসাবে): খাদ্যাদি – প্রায় ৩৩৫ টাকা; চাকর-বাকর, ক্ষৌরকার, রজক, ঘোড়া আর গাড়ি – প্রায় ২১৭ টাকা; ধর্মকর্ম – ৩০০ টাকা, সন্তানের শিক্ষা – ৬ টাকা। * পরিবার আর চাকর-বাকর বাবত মোট বার্ষিক খরচ – ১৪১৪ টাকা (কাপড়-চোপড় বাবত খরচে আমার সংশোধন ধরে)।

উঁচুদরের একটি পরিবারের যাতে এমন খরচ করা সম্ভব হয় সেজন্য বাংলার একজন কৃষককে কতটা জমি চাষ করতে হত সেটা স্থির করতে একটা ছোট জমিদারি সম্বন্ধে উল্লিখিত তথ্যাদি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা যেতে পারে (আগম – ৬৩০০ টাকা; তার থেকে ভূমি-কর ৪৫০০ টাকা, আর পাইক-পেয়াদা আর ব্যবস্থাপন বাবত ৬৭৯ টাকা ৮ আনা বাদ গিয়ে জমিদারের হাতে থাকত ১১২০ টাকা ৮ আনা)। শেষের অঙ্কটা সম্পূর্ণভাবে যথাযথ হলেও ধরে নেওয়া যাক বাধ্য হয়ে দেওয়া নজর-সেলামি সমেত জমিদারটির আয় হত দিনাজপুরের উঁচুদরের হিন্দু পরিবারটির যা ছিল সেটার কাছাকাছি। এই অনুমান অনুসারে দেখা যায়, বিঘা-প্রতি গড়ে ৮ আনা হিসাবে ৪৫০০ টাকা খাজনা আগম হত ৭২০০ বিঘা জমি থেকে। 'কর্ম'-মান ১৫ বিঘা হলে, তার মানে, জমিদার পরিবারটি আর সেটার চাকর-বাকরের জন্যে খাটতে হত ৪৮০টি চাষী পরিবারকে।

জীবনযাত্রার এইসব খরচ নিয়ে বিবেচনা করা যাক বৈষয়িক হিসাবে। ঘর-বাড়ি, বাসন-কোসন, গয়নাগাঁটি আর কাপড়-চোপড় মেরামত বাবত ছিল খরচের সবচেয়ে বড় দফাটা (৫৪৫ টাকা), এইসব কাজ করত হস্তশিল্পের মানুষ – সূত্রধর, সেকরা, তাম্রকার, কুম্ভকার আর তন্তুবায়েরা। এটার সঙ্গে তুলনা করা যাক খাদ্য বাবত খরচটাকে (৩৩৫

টাকা), এতে কৃষিজাত দ্রব্য ব্যবহৃত হত সরাসরি। তারপর আসে ব্যক্তিগত আর দৈনন্দিন খিদমত বাবত (২১৭ টাকা) এবং ধর্মকর্ম বাবত (৩০৬ টাকা) খরচ। টাকার এইসব পরিমাণ (বিশেষত কৃষিজাত দ্রব্যের অংশ) বাস্তবে পরিণত হওয়াটা নির্ভর করত যারা এইসব কাজ করত তাদের প্রয়োজন আর সামর্থ্যের উপর। তবে সেটা যা-ই হোক এটা স্পষ্ট যে, ধনী খাজনা-প্রাপ্তা শহুরে পরিবেশে এটাকে প্রধানত অ-কৃষিজাত উৎপাদ আর সার্ভিসে পরিণত করত।

তারপর আসছে একটা পরিবার যেটার কর্তা উল্লিখিত মালিকানা-ভিত্তিক সোপানতন্ত্র অনুসারে হতে পারে কোন আমলা কিংবা খুদে জমিদার। স্বামী, স্ত্রী, দুটি সন্তান আর চার জন চাকর নিয়ে এই 'কিছুটা গুরুত্বসম্পন্ন পরিবারের' বিষয়সম্পত্তি আর খরচ-খরচা ছিল এইরকম: চাকর-বাকরের ঘর সমেত বাড়ি – ১৫০ টাকা, সেটার রক্ষণাবেক্ষণ খরচ – ৫৪ টাকা; জমি-বন্দের (০·৫ একর) খাজনা – ২ টাকা; পূজা-আহ্নিকের বাসন-কোসন (১৩ দফা) আর গৃহস্থালির বাসন-কোসন (৩২ দফা, ৬৫খানা) – যথাক্রমে ১৮ এবং মোটামুটি ৮১ টাকা, সেগুলো বাবত বার্ষিক খরচ ২৩ টাকা ১১ আনা; বিছানাপত্র, ফরাশ, পরদা, ইত্যাদি – ৭৬ টাকা ৮ আনা, সেগুলো বাবত বার্ষিক খরচ ২৭ টাকা; গয়নাগাঁটি – ২৬২ টাকা, বার্ষিক খরচ ৬২ টাকা (সুদ সমেত); কাপড়-চোপড়, মনিবদের জন্যে ৬২ টাকা, চাকর-বাকরের জন্যে ১০ টাকা; খাদ্য – ১৭৪ টাকা; খিদমত বাবত বছরে ৬০ টাকা; ধর্মকর্ম আর দান-ধ্যান – ৮০ টাকা; সন্তানদের শিক্ষা – বছরে ৪ টাকা। এইভাবে, বছরের হিসাবে এটা দাঁড়ায় ৫২২ টাকা, সেটা থেকে কারিগরদের কাজ বাবত দেওয়া হত ২০২ টাকা, খাদ্যাদি বাবত ১৭৪ টাকা, দৈনন্দিন কাজকর্ম আর ধর্মকর্ম বাবত যথাক্রমে ৫০ আর ৮৪ টাকা। দেখা যাচ্ছে, এই খরচ-খরচার কয়েকটা দফার অনুপাত মোটামুটি আগেকারটার মতোই।

স্বামী, স্ত্রী, দুটি সন্তান আর দু'জন চাকর নিয়ে 'স্বচ্ছন্দে চলা' যে-পরিবারের কর্তা হতে পারে সামান্য কেরানি, কোন জমিদারের গোমস্তা কিংবা বণিক, খুদে দোকানদার কিংবা 'নির্মায়ক', যে গ্রামে মোটামুটি উপর-স্তরের রায়ত (অর্থাৎ কিনা তখনকার মধ্য শ্রেণীর নিচু স্তরের একজনের মতো), সেটার খরচ-খরচা ছিল এইরকম: ঘর-বাড়ি – ৬০

টাকা, বার্ষিক খরচ – ২৪ টাকা; পূজা-আহ্নিকের বাসন-কোসন (৫ দফা) আর গৃহস্থালির বাসন-কোসন (৩০ দফা, ৪৩খানা) – যথাক্রমে ২ টাকা ৬ আনা আর ৩৬ টাকা, তাতে বার্ষিক খরচ ৯ টাকা ৫ আনা; বিছা-নাপত্র, ফরাশ, ইত্যাদি – ১৮ টাকা ৪ আনা, তাতে বার্ষিক খরচ – ৬ টাকা ৯ আনা; গয়নাগাঁটি – ৫৩ টাকা ৬ আনা, তাতে বার্ষিক খরচ – ১২ টাকা ১২ আনা; কাপড়-চোপড় – ৩৭ টাকা ৮ আনা; খাদ্য – বছরে ১২৮ টাকা; বিভিন্ন খিদমত – ১৬ টাকা; ধর্মকর্ম – ৪৮ টাকা। এখানে বিভিন্ন দফার মধ্যে অনুপাতটা অন্য রকমের: ২৬২ টাকার প্রায় অর্ধেকটা খরচ হয় খাদ্যের জন্যে, আর কারিগরদের কাজ বাবত খরচ (৭১ টাকা ৫ আনা) আগেকার পরিমাণটার প্রায় অর্ধেক। অন্য দিকে, ধর্মকর্ম বাবত খরচ অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি।

স্বামী, স্ত্রী, দুটি সন্তান আর একজন আত্মীয়কে নিয়ে স্বচ্ছন্দে-চলা কারিগর পরিবারের বার্ষিক খরচ-খরচা ছিল এই: ঘর-বাড়ির দাম – ২৪ টাকা, আর সেটা বাবত খরচ – ৯ টাকা ১০ আনা; গৃহস্থালির বাসন-কোসন – ৮ টাকা ১১ আনা, আর বার্ষিক খরচ – ২ টাকা ১ আনা; বিছানপত্র – ৬ টাকা ৩ আনা, আর বার্ষিক খরচ – ৩ টাকা ৬ পয়সা; গয়নাগাঁটি – ১১ টাকা ১ আনা, আর বার্ষিক খরচ – ২ টাকা ১০ আনা; কাপড়-চোপড় – ১৭ টাকা ১২ আনা; খাদ্য – মাসে ৫ টাকা ৮ আনা, অর্থাৎ বছরে ৬৬ টাকা, তাতে বিভিন্ন জিনিসের মাসিক পরিমাণ ছিল – ২ মন চাল (১ টাকা ১২ আনা), ১০ সের ডাল (৩ আনা), ৪ সের নুন (৭ আনা), ৫ সের উদ্ভিজ্জ তেল (৮ আনা), মাছ আর তরিতরকারি (১ টাকা), তামাক আর সুপারি (৮ আনা); ক্ষৌরকার – ১২ আনা; ধর্মকর্ম – বছরে ১৫ টাকা। এখানে দেখা যাচ্ছে খাদ্য বাবত খরচটার অংশ আরও বেশি – ৯০ টাকার মধ্যে ৬৬ টাকা, আর কারিগরদের কাজ বাবত খরচ মাত্র ১৮ টাকা সাড়ে ৬ আনা। তার সঙ্গে সঙ্গে, ধর্মকর্ম বাবত খরচও অনেক কম, সেটা হয়ত এই বর্গটার সামাজিক আর বর্ণগত প্রতিষ্ঠা নিচু স্তরের ছিল বলে।

স্ত্রী আর দুটি সন্তান নিয়ে একজন সাধারণ কারিগরের পরিবারের খরচ-খরচা ছিল এই রকম: ঘর বাঁধার খরচ ৫ টাকা, আর সেটার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ২ টাকা ৪ আনা; বাসন-কোসন – ২ টাকা ১১ আনা, আর বার্ষিক খরচ ১০ আনা; বিছানাপত্র – বছরে ৯ আনা; গয়না-

গাঁটি – ১ টাকা ৩ আনা, আর বার্ষিক খরচ ৪ আনা ৬ পয়সা; কাপড়-চোপড় (দাম আর বার্ষিক খরচ) – ৩ টাকা ৬ আনা; খাদ্যাদি – মাসে ২ টাকা ৮ আনা (তাতে দেড় মন চাল – ১ টাকা ৫ আনা, ১২ সের ডাল – ৪ আনা, ২ সের তেল – ৪ আনা, ২ সের নুন – ৪ আনা); ক্ষৌরকার (মাসে একবার) – ৮ আনা (স্পষ্টতই এক-বছরের জন্যে); ধর্মকর্ম – বছরে প্রায় ২ টাকা ৬ আনা। এই আকর-দলিল অনুসারে, মোট বার্ষিক খরচ ছিল ৩৬ টাকা ৮ আনা। কিন্তু আমরা নতুন করে হিসাব করে দেখেছি পরিমাণটা ছিল আরও বেশি – ৪৪ টাকা ১৩ আনা, যেটা হল স্বচ্ছন্দে-চলা কারিগরের পারিবারিক খরচের অর্ধেক। বিভিন্ন দফার অনুপাত মোটামুটি একই হলেও মোটের উপর অর্ধেক, তার মানে অপুষ্টি, অভাব-অনটন।

শেষে, স্ত্রী আর দুটি সন্তান নিয়ে একজন সাধারণ মজুরের সম্পত্তি আর খরচ-খরচা ছিল এইরকম: কুঁড়েঘর সারাবার খরচ – ৩ আনা; জমি-বন্ধ বাবত খাজনা – বছরে ৪ আনা; বাসন-কোসন – ৩ আনা; বিছানাপত্র – ১০ আনা; গয়নাগাঁটি – বছরে – ৬ পয়সা; কাপড়-চোপড় – ২ টাকা ৬ আনা (পুরুষের ধুতি – ৫ আনা, কামিজ – ৪ আনা, আর তার স্ত্রীর শাড়ি – ৮ আনা, ত-খানা গায়ের কাপড় – ৮ আনা, বাচ্চাদের ৪-টে গেঞ্জি আর দুটো কামিজ – ১২ আনা; এই গরিব পরিবারের কাপড়-চোপড় এত কম ছিল যে প্রতি-বছর নতুন করে না কিনলে চলত না); খাদ্য ছিল দিনে দেড় সের চাল (বছরে ১০ টাকা ৪ আনা), মাসে ১ সের তেল (বছরে ১ টাকা ৮ আনা), মাসে ৬ সের ডাল (বছরে ১ টাকা ৮ আনা), নুন – বছরে ১ টাকা ৮ আনা (যদিও অনেকের চালাতে হত ছাই দিয়ে), তামাক আর সুপারি – বছরে ১ টাকা ৮ আনা, সব খাদ্য মিলিয়ে বছরে ১৬ টাকা ১০ আনা; তাছাড়া ছিল যাজক – ২ টাকা, ক্ষৌরকার – ৮ আনা। বুকাননের হিসাবে সবচেয়ে গরিব এইসব পরিবারের বার্ষিক খরচ ছিল ২২ টাকা ১০ আনা করে, অর্থাৎ মাসে ২ টাকার কম।*

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, বাংলায় মালিকানা-ভিত্তিক এবং সামাজিক সোপানতন্ত্রে উপভোক্তার স্থান যত নিচে তার ব্যবহৃত জিনিসের পরিমাণ

ততই কম, আর জিনিসও ততই নিরেস, সেটা প্রকাশ পায় ব্যবহৃত জিনিসগুলোর মধ্যে হস্তশিল্পজাত জিনিসের হিসসা আর রকমের কমি থেকে। তাই বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন সস্তা বৃটিশ পণ্য-ব্যবহারের জন্যে সবচেয়ে উপযোগী ছিল সমাজের সবচেয়ে গরিব বর্গগুলি। তবে তাদের ক্রয়ক্ষমতা ছিল যৎসামান্য। গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন মানুষ (প্রায় ৩ লক্ষ পরিবার) আর শহরের গরিবদের (অন্তত ৫০ হাজার পরিবার) মিলিয়ে ছিল দিনাজপুরের জনসমষ্টির দুই-তৃতীয়াংশ, এরা ১০ লক্ষর কম টাকার ম্যানুফ্যাকচার করা জিনিস কিনতে পারত (প্রত্যেকটি পরিবার বছরে প্রায় ৩ টাকার)। কাজেই বেশকিছু পরিমাণে বাজারের প্রসার ঘটানো সম্ভব ছিল শুধু অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অংশগুলির প্রয়োজন অনুসারে. সরবরাহ করে, সেক্ষেত্রে বৃটিশ পণ্যকে পাল্লা দিতে হত হস্তশিল্পজাত জিনিসের সঙ্গে, এগুলি ছিল চিরাগত উঁচু মানের জিনিস, কোন-কোনটা খুবই সরেস।

এইভাবে, বৈদেশিক ব্যাপারিক পুঁজির জোয়ালে প্রথম অর্ধ-শতক কাটার পরে বাংলার প্রধান-প্রধান সামাজিক-আর্থনীতিক সূচক বদলালেও সেটা ছিল না গুণীয় বিচারে নতুন বিন্যাসগত পরিবর্তনের দিকে। বাংলায় সামাজিক সোপানতন্ত্রের উপর-স্তরে কায়েমী হয়ে দাঁড়িয়ে ইংরেজ বিজেতারা পশ্চাদ্‌গতি ঘটাল আর্থনীতিক জীবনের বহু ক্ষেত্রে। কিন্তু মোটের উপর, সামাজিক কর্ম-বন্দেজের প্রধান-প্রধান সমস্ত অভ্যন্তরীণ পরস্পর-সংযোগ চালু থাকল। পণ্য-অর্থ খাতে এই কর্ম-বন্দেজে ইংরেজ বণিকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা ঢিমিয়ে পড়েছিল বৃটিশ প্রশাসনিক আর কর-ব্যবস্থারই ক্রিয়াফলে, কেননা এতে করে জবর-আদায় করা হত কৃষি আর হস্তশিল্পের উৎপাদের একটা বড় অংশ, যেটা হতে পারত বাজার মারফত অবাধে হস্তান্তরণের বস্তু এবং উৎপাদনকারী জনসাধারণের মধ্যে বেড়ে-চলা ক্রয়ক্ষম চাহিদার ভিত্তি, আর – যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ – অপেক্ষাকৃত মাফিকসই চাহিদার ভিত্তি।

বিহার : ভূমির ব্যবহার আর চাষবাস ; জাতীয় উৎপাদ ; হস্তশিল্পে উৎপাদন, বাণিজ্য আর ক্রেডিটের অবস্থা

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিহারে চিরাগত সামাজিক-আর্থনীতিক রূপান্তরটা হয়েছিল মনে হয় সমসাময়িক বাংলার চেয়ে কম প্রগাঢ়, আর তার কারণ ছিল হয়ত এই দুটো : এক, প্রশাসনিক আর ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে ইংরেজরা বিহারে কাজ করেছিল অপেক্ষাকৃত কম ; আর দুই, হিন্দু বর্ণভেদ প্রথার বাঁধনগুলো ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি টেকসই বিশেষত গ্রামাঞ্চলে। প্রথম কারণটা দেখা দেয় এই অবস্থাটা থেকে : ইংরেজরা বাংলা জয় করেছিল অনেক আগে, আর বিহার যেকোন সমুদ্রীয় বন্দর থেকে বহুদূরবর্তী ; বিহারের গ্রামাঞ্চলের সামাজিক-আর্থনীতিক সম্পর্ক নিয়ে বিচার-বিবেচনা করলে দ্বিতীয় কারণটার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়।

বৃটিশ বিজয়ের ঠিক আগে বিহারে প্রজা (আরও সঠিক হল – জমিভোগী) ছিল তিন বর্গের : গ্রামের 'মুখিয়া রায়তরা' ; খুদকস্ত ধরনের রায়তরা ; আর এই দুই বর্গের বহির্ভূত বিপুল সংখ্যাগুরু রায়তরা। বৃটিশ তহসিল সংস্কার উপাত্ত, কোলব্রুকের উপাত্ত, হাণ্টারের পরবর্তী রচনা এবং অনুরূপ অন্যান্য তথ্যাদির ভিত্তিতে ঐ সিদ্ধান্ত করেন এস. এন. সিন্‌হা। গ্রামের তহসিলদারি পেয়ে মুখিয়া রায়তদের বাড়-বাড়ন্তের যেসব সুযোগ খুলে যায় সেটা বিবৃত করেছেন এই ভারতীয় গবেষক, কিন্তু নিজেদের খেতি-খামার তারা চালাত কেমন পরিসরে সে-সম্বন্ধে তিনি বিশেষকিছু বলেন নি ; খুদকস্ত স্বত্ব অনুসারে জমিভোগীরা জমি ব্যবহার করত উত্তরাধিকারক্রমে (ধার্য কর যদি দেওয়া হত), আর অন্যান্য প্রজাদের দেওয়া খাজনা পুনর্বিবেচিত হত মাঝে-মাঝে।* উপরের এই তিনটে বর্গের প্রজারা পাট্টাদার হত সরাসরি জমিদারের কাছ থেকে, কিন্তু বাংলায় আর বিহারে আরও ছিল বহু কোর্ফা প্রজা, আর দিনমজুরেরা, যারা প্রধান দুই বর্গের রায়তদের জমিতে মজুরি করত।

জমি-ভোগের নিয়ম বাদ দিয়ে, মালিকানা আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা

অনুসারে প্রজারা বিভক্ত ছিল চারটে বর্গে: (১) আশরফরা, (২) ব্যাপারী আর গোপরা, (৩) চাষীরা, আর (৪) কোলাত বা কোর্ফা প্রজারা। বুকাননের কাছ থেকে নেওয়া এই বর্গবিভাগটায় ভিত্তির দিক থেকে সামঞ্জস্য নেই, এইসব ভিত্তির মধ্যে ছিল বর্ণ, উৎপাদন আর ভূমি-সূচক। বিহারে আশরফরা লাঙল রাখত না, যদিও জমিতে লাঙল দেওয়া ছাড়া কোন-কোন কাজ তারা করতে পারত – বুকাননের এই বক্তব্য এস. এন. সিন্‌হা মেনে নিয়েছেন। পরের দুটো বর্গের প্রজাদের কতকগুলো ভূমি-স্বত্ব ছিল না, যা ছিল আশরফদের, তবু তারা অনেক সময়ে আশরফ-দের চেয়ে ধনী ছিল, খেত-খামার ছিল অপেক্ষাকৃত ভাল। যারা ছিল উত্তরাধিকারসূত্রে ভূমিভোগী তারা, বিশেষত খুদকস্ত প্রজারা অধিকারহীন. প্রজায় পরিণত হয়েছিল উনিশ শতকের চতুর্থ আর পঞ্চম দশকে ইংরেজ-দের ভূমি-সংক্রান্ত কর্মনীতির ফলে।*

দুঃখের কথা, বিহারের গ্রামাঞ্চলের মানুষের কোন-কোন অংশের খেতি-খামার সম্বন্ধে, তাদের উৎপাদী আর ভোগ-ব্যবহারক চাহিদা সম্বন্ধে, নির্মায়কদের সঙ্গে বাজারী আর সরাসর সংযোগ সম্বন্ধে, আর সেখানে ব্যাপারিক আর চোটার পুঁজির কাজ-কারবার সম্বন্ধেও কোন তথ্যাদি দেন নি এস. এন. সিন্‌হা। তবে বিহারের গ্রামাঞ্চলের জীবনের এইসব দিক সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে বুকাননের বিবরণ থেকে। যেমন, বিহারের বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলে আর পাটনায় বিভিন্ন ধরনের প্রজাস্বত্ব আর খেতি-খামারের বিবরণ তিনি দিয়েছেন। আশরফরা খাজনা দিত শুধু আবাদ-করা জমি বাবত, খাজনার পরিমাণ ধার্য হত জমিদারের সম্মতি অনুসারে, আর সেটা হত অন্যান্য বর্গের চাষী-দের যা তার চেয়ে অনেকটা কম। মনে হয় সরাসরি জমিদারের কাছ থেকে জমি খাজনা করার অগ্রাধিকার ছিল আশরফদের, আর এই বিশেষাধিকার পাবার কারণটা সম্ভবত ছিল এই যে, তারা ছিল একটা সামরিক বর্গ, আর – বুকানন বলেন – বৃটিশ রাজ কায়েম হবার আগে তারা সশস্ত্র লুটতরাজ চালাত, তাই তাদের সংখ্যাশক্তি আর আনুগত্যের 'উপর নির্ভর করত জমিদারের নিরাপত্তা।

আশরফরা কিন্তু খেতি-খামার এড়িয়ে চলত না, তারা শুধু লাঙল

দিত না, কেননা তাদের রীত-রেওয়াজে লাঙল ধরা মানা ছিল; তবে লাঙল আর টানা-বওয়া পশুর মালিক ছিল তারাই। তিন প্রস্ত সরঞ্জাম থাকলে একজন আশরফ ৩০-৪০ একর জমি খাজনা করতে পারত, সেটা থেকে তার আয় হত বছরে ১৯০ টাকা। এই জমিতে চাষবাস করত প্রধানত মনিব-চাষীরা, তাদের স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য মানুষ। গ্রামাঞ্চলে নিচু স্তরের এইসব মানুষ পারিতোষিক হিসেবে পেত শস্য, আর কোন-কোন ক্ষেত্রে নগদ পারিশ্রমিক এবং ছোট্ট জমি-বন্দ, তাতে তারা চাষ-আবাদ করত মনিবের সরঞ্জাম দিয়ে। বিহারে গ্রাম-সম্প্রদায়ের রীত-রেওয়াজ খুবই টেকসই ছিল বলে এমন অবস্থা দেখা দিয়েছিল যাতে বাংলায় জমিদারেরা যেমনটা করত সেইভাবে গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত সেখানকার 'সদ্বংশজাত কুলীনদের' উপর উৎপীড়ন চালাতে পেরে ওঠে নি বিহারের জমিদারেরা। এই প্রসঙ্গে বুকাননের একটা পর্যবেক্ষণ-উপাত্ত খুবই আগ্রহজনক। তিনি লিখেছেন: 'বিহারে প্রজারা সাধারণত নিজেদের কাজ-কারবার চালায় জমিদারের গোমস্তার সঙ্গে, শুধু সাউংতার নামে অশিষ্ট উপজাতির মধ্যে আর অঞ্চলটার বাঙালী এলাকাগুলিতে এক-রকমের মুখিয়া প্রজা নিযুক্ত হয় সম্প্রদায়ের সমস্ত কাজকর্ম চালাবার জন্যে। এই রেওয়াজটা – যা আমি উল্লেখ করেছি – রংপুরে প্রচলিত, আর মনে হয় একসময়ে বেশ সর্বব্যাপীই ছিল ভারতে: কেননা গ্রাম-প্রধানেরা যে-নামেই (মণ্ডল, মুকদ্দম, গাউদা, শানাবোগা, ইত্যাদি) পরিচিত হোক, আমার মনে হয় গোড়ায় তারা ছিল প্রজাদের প্রতিনিধি, সরকারের আমলা কিংবা জমিদারের কর্মচারী নয়, যা এখন তারা সাধারণত বটে। যেখানেই স্থানীয় রীত-রেওয়াজ সযত্নে বজায় রাখা এবং সুনির্বাহিত হয়েছে সেখানে তাদের কর্মকর্তা নিয়োগ সবসময়েই নিয়ন্ত্রিত হয় প্রজাবর্গের প্রবণতা অনুসারে। আমি যা বলেছি – বিহারে প্রজাবর্গের আত্মবিশ্বাস অপেক্ষাকৃত বেশি। বাঙালীরা একটু বেশি লাজুক; গ্রাম্য কেরানির (পাটোয়ারি) মতো বিশিষ্ট ব্যক্তির সামনে কথা বলতে ক্ষমতা-শালী শুধু মণ্ডল; আর জমিদারের সামনে গিয়ে বলার কথা খুঁজে পাবার দুঃসাহস থাকতে পারে যেকোন মণ্ডলেরই এমনটাও মনে করা হয় না; তাই কিছুটা বড়রকমের যেকোন জমিদারিতে আছে একজন মুখ্য মণ্ডল, সে হল অন্যান্যের মুখপাত্র।'*

বিহারে গ্রামাঞ্চলে জনসমষ্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে কৃষি-সরঞ্জামের বণ্টন থেকে কিছুটা দেখা যায় সেখানে আর্থনীতিক প্রভেদের পরিসর। পুর্ণিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় লাঙলের বণ্টন ছিল এইরকমের (হিসসা হিসাবে) : হাভেলিতে – 'যারা জমি খাজনা করে' তাদের ছিল ১/৮, 'যারা ভাগ পাবার জন্যে চাষ করে' তাদের ১/৪, 'চাকর-বাকর আর দাসদের' ১/৮, কোর্ফা প্রজাদের ১/১৬, আথোয়ারদের চাকর-বাকরের ১/১৬ : দাঙ্গরখোরায় – বিভিন্ন বর্গের বেলায় অঙ্কগুলো ছিল যথাক্রমে ৫/৮, ১/৩২, ১/৩২, ১/৩২ আর ১/৩২ ; গোণ্ডওয়ারায় সেগুলো ছিল যথাক্রমে ৩৩/৬৪, ১/১৬, ১/৪, ০ আর ১/৮ ; দমদহে – ২১/৩২, ১/৩২, ১/৪, ০ আর ১/৩২ ; বেহাদগঞ্জে – ১/২, ৫/১৬, ১/৮, ১/১৬ আর ০ ; কৃষণগঞ্জে – ১/৮, ৫/৮, ১/৮, ১/৮ আর ০।* দেখা যাচ্ছে, উচ্চতর স্তরের প্রজারা, অর্থাৎ যারা জমি খাজনা করত সরাসরি জমিদারের কাছ থেকে তারাই ছিল সবচেয়ে প্রবল আর্থনীতিক বর্গ, সেটা একেবারে সবসময়ে না হলেও। কখনও-কখনও গ্রামাঞ্চলে নিচের অংশগুলোর হিসসাও ছিল বেশ মোটারকমের।

দিনাজপুরের মতো পুর্ণিয়ায় 'গরিব খামারীরা' নিজেদের চাষ-আবাদের জন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছু জোটাবার জন্যে সরঞ্জাম একত্র করত, এটা প্রচলিত ছিল সাধারণভাবে। এই তথ্যটা পরোক্ষে বুকানন্নের নিজেরই নিম্নলিখিত উক্তির বিরুদ্ধ : পুর্ণিয়ায় কৃষি-সরঞ্জামের দাম ছিল যৎসামান্য, সেটা ছিল মোটামুটি দিনাজপুরের মতো, আর যেখানে লাঙলে ছিল না লোহার ফাল সেই উত্তর-পশ্চিম এলাকায় সেটা ছিল একেবারেই নগণ্য। তিনি নিশ্চয় করে বলেন, গঙ্গা বরাবর জমিগুলিতে লাঙল দেওয়া হত না আদৌ। এখানে বলা হয়েছে হয়ত নরম পাললিক মাটির কথা, যাতে কয়েক বছরের জন্যে কার্যত লাঙল দেবার দরকার হত না – বোনার আগে শুধু মই দিলেই চলত। সরঞ্জাম একত্র করার কারণটা হয়ত ছিল নিচের অংশগুলির চূড়ান্ত গরিবি (তাদের পক্ষে 'যৎসামান্য' দামটাও ছিল অত্যধিক), আর পৃথক-পৃথক খামারে বলদের অভাব, সেটা বিশেষত পুর্ণিয়ার অবস্থায়, যেখানে চাষ করতে হত (হয়ত পতিত জমিতে) ছ'টা বলদ দিয়ে।

খেতমজুরদের উৎপাদনশীলতা আর পারিশ্রমিক সম্বন্ধে ধারণা করা যায় নিম্নোক্ত উপাত্ত থেকে। একটি বালক রাখালকে সঙ্গে নিয়ে একজন চাষী ছ'টা বলদে টানা একখানা লাঙল দিয়ে চাষ করত ৪৫ স্থানীয় বিঘা বা ৬ হেক্টর জমি। উৎপন্ন শস্যের দাম ছিল ১০৪ টাকা ২ আনা। পুর্ণিয়ায় ধানের দাম রংপুরের মতো একই (টাকায় ১১৫ কিলোগ্রাম) ধরলে, ফসল ফলত হয়ত প্রতি হেক্টরে ২০ সেণ্টনার*, তাহলে ঐ চাষী আর বালকটি এই দু'জনে মিলে ১২০ সেণ্টনার ধান ফলাবার জমিতে কাজ করে উঠতে পারত।

তবে উৎপাদন-পরিব্যয় তো শুধু লাঙল দেবার খরচ নয়। শুধু চাষ করাতেই খরচ পড়ত ৩৭ টাকা ৮ আনা (তার মধ্যে বলদ বাবত ৯/১৫, চাষীর পারিশ্রমিক ৪/১৫, আর বালকটি এবং সরঞ্জাম বাবত ১/১৫ করে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অঙ্কের হিসাবে যথাক্রমে ২২ টাকা ৮ আনা, ১০ টাকা, আড়াই টাকা আর আড়াই টাকা)। নিড়নো আর সাফাই বাবত ৫ টাকা আর ১ টাকা ৪ আনার শস্য দেওয়া হত। তার উপর বীজের খরচ ছিল ৪ টাকা ৫ আনা। এইভাবে চষা-বোনার খরচ ছিল ৪৬ টাকা ৪ আনা। ফসল কাটা আর মাড়াইয়ের খরচ ধার্য ছিল ফসলের দামের ১/৭, এক্ষেত্রে সেটা দাঁড়াত প্রায় ১৫ টাকা। ফলে খাজনা দেওয়া আর আয় হিসেবে অবশিষ্ট থাকত ৪২ টাকা ১৪ আনা, অর্থাৎ থোক উৎপাদের প্রায় ৪০ শতাংশ।** শস্যের দামের বিভিন্ন গঠন-উপাদানগুলি ছিল এই: বলদ বীজ আর সরঞ্জাম বাবত খরচ ২৮ শতাংশ, শ্রমের পারিশ্রমিক ৩২·৪ শতাংশ, আর খাজনা প্রায় ৪০ শতাংশ। এক্ষেত্রে সরঞ্জাম বাবত খরচ ছিল খাজনার ১/১৬ কিংবা ১/১৭।

এখানে লক্ষণীয় এই যে, পুর্ণিয়ায় উল্লিখিত উৎপাদী ইউনিট যে-পরিমাণ জমিতে (৬ হেক্টর) চাষ-আবাদ করত সেটা ছিল নিকটবর্তী দিনাজপুরের 'আবণ্টিত অংশের' (২ হেক্টর) চেয়ে তিনগুণ বেশি। কারণটা মনে হয় এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে জমিতে কাজটা ছিল একটামাত্র ক্রিয়াপ্রণালীর ব্যাপার (লাঙল দেওয়া), আর তার উপর, তাতে লাগানো হত ছ'টা বলদ (যা ২ হেক্টর জমি-বন্দে রাখা যেত না স্বভাবতই)। চাষ করার পরে ছিল বিভিন্ন শ্রমবহুল কাজ – নিড়নো, আর ফসল-

কাটা। ৬ হেক্টরের ধান-খেতে এইসব কাজ নিশ্চয়ই করতে পারত না একটি কৃষক পরিবার (দু'-তিন জন সুস্থদেহী মানুষ)। কাজেই উৎপাদনশীলতা সম্বন্ধে বুকাননের দৃষ্টান্তটা প্রযোজ্য শুধু উপর-স্তরের খেতি-খামার সম্বন্ধে, যেখানে উৎপাদন-তহবিল (সর্বাগ্রে বলদ) আর নিচু স্তরের মনুষ্যশক্তি একত্র করা এবং সেগুলির সহযোগ ঘটানো সম্ভব ছিল। অর্থাৎ কিনা, এইসব হিসাব থেকে আবার দেখা যাচ্ছে উঁচু স্তরের খেতি-খামারে উদ্বৃত্ত-উৎপাদের হার ছিল ২ হেক্টরের 'আবণ্টিত অংশে' চাষীর প্রচেষ্টায় যা সম্ভব তার চেয়ে বেশি।

তবে গ্রামাঞ্চলে উদ্যোগী কারবারে এগিয়ে যাবার পথে বিভিন্ন চিরাগত প্রতিবন্ধক ছাড়াও ছিল খাজনা-সংক্রান্ত বাঁধাবাঁধির বাধা, যার ফলে দেখা দিত ঋণিতা, সেটা এমন মুখাপেক্ষিতা যা উদ্যোগী কারবারের দিকে যাদের ঝোঁক তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ত। পুর্ণিয়ায় শস্য, দুধ, রেশম-গুটি, নীল, ইত্যাদি হরেক রকমের জাতদ্রব্যের একটা বড় অংশ 'সাধারণত খরচ হয়ে যায় সেগুলোকে যে জন্মায় সে তা বাজারে নেবার আগেই, যাতে দাদনের ব্যবস্থাটা দিনাজপুরে যেমন তেমনি ব্যাপক পরিসরে পুরোপুরি বলবৎ করা হয়, আর বড় এবং ছোট খামারীদের একটা বড় অংশের খেতি-খামার চলে না ঐ দাদন ছাড়া। খামারীদের একটা বিরাট অংশ ঋণগ্রস্ত প্রধানত নানা রকমের ব্যাপারীদের কাছে, এরা খামারীদের জাতদ্রব্য রেশম, নীল, শস্য আর মাখনের জন্যে দাদন দেয়। বকেয়া খাজনার পরিমাণ বিস্তর, আর জমিদারকে খাজনা দেওয়ায় ঘাটতির দরুন মোট ক্ষতি হয় যৎসামান্য। শোনা যায় আগে এই পরিমাণটা হত বিরাট; ফসল উঠলে প্রজা তার শস্য বিক্রি করতে পারত না, তাকে পালিয়ে যেতে হত।'* বুকানন বলেন তার কারণটা ছিল এই যে, ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পরে জনসংখ্যা আবার আগের মতো হয়ে গিয়েছিল, তাই কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বেড়েছিল। এইভাবে, খাজনা আর কর-আদায়ের তখনকার বিদ্যমান ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে চালু থাকার ফলে কৃষিক্ষেত্রে উদ্যোগী কারবারে পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পুর্ণিয়া জেলায় আবাদ-করা জমির মোট উৎপাদের দাম হিসাব করা হয়েছিল ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা (হিসাবটা মনে হয় কর-

---

কর্তৃপক্ষের)। বুকানন মনে করেন খেতি-খামারের খরচ ছিল তার অর্ধেকটা, প্রজাদের নীট লাভ সিকি ভাগ, আর – তাঁর মতে – বাদবাকি সিকি ভাগটা ছিল জমিদার যা ন্যায্যত দাবি করতে পারত সেই পরিমাণটা। তবে জমিদারদের আয় অনেক বেশি হত নিষ্কর জমিগুলো থেকে মুনাফা মিলিয়ে।

এই পরিমাণটা আর অঙ্গ-উপাদানগুলোর মধ্যে বিভিন্ন অনুপাত হতে পারে শুধু মোটামুটি আর প্রাথমিক, সেটা অন্তত এই কারণে যে, 'প্রজা'-সংক্রান্ত ধারণাটাই ছিল খুবই বিস্তীর্ণ। প্রজাদের মূল বর্গগুলি সম্বন্ধে বুকাননের বর্ণনা এই: যারা জমিদারকে অল্প পরিমাণ বাঁধা খাজনা দিত জমির সেই যথার্থ মালিকরা থেকে বেশির ভাগ প্রজা যারা স্বল্পমেয়াদী চুক্তি অনুসারে জমি ব্যবহার করত, আর কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সেই জমিতে নিজেরা খেতি-খামার করত। কাজেই জমিতে খেতি-খামারের খরচ-খরচা আর প্রজার নীট আয়ের মধ্যে সীমারেখাটা ছিল খুবই অ-নির্দিষ্ট। নীট আয়টা অনেক সময়ে যেত উৎপাদন-পরিব্যয় কুলতে, সেটা অংশত যুক্ত হত প্রাপ্ত খাজনার সঙ্গে, আর সেটার সঙ্গে নিষ্কর জমি থেকে পাওয়া আয় মিলিয়ে পরিমাণটা স্পষ্টতই দাঁড়াত কৃষিজাত দ্রব্যের তৃতীয়াংশের বেশি।

তবে আমাদের যা প্রয়োজন তাতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা ততটা নয় এইসব মূল্য বিশেষ-নির্দিষ্টভাবে স্থির করা, যতটা কিনা পুর্ণিয়া জেলায় হস্তশিল্প উৎপাদের মূল্যের সঙ্গে সাধারণভাবে সেগুলোর তুলনা করা। তাঁত-বোনা ছিল প্রধান শিল্প, তাতে উৎপন্ন হত ১৬ লক্ষ টাকার মাল, সেটা থেকে সুতো বাবত খরচ হত ১১ লক্ষ টাকার বেশি। এইভাবে, কাপড়ের দামে কারিগরের শ্রম দিয়ে পয়দা-করা অংশটা ছিল ৬-৭ লক্ষ টাকা (কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের ৩-৩·৫ শতাংশ)। কাজেই তন্তুবায়দের পয়দা-করা উদ্বৃত্ত-উৎপাদটা আপেক্ষিক কিংবা অনপেক্ষভাবে কৃষিজাত দ্রব্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

বিহারে আখজাত দ্রব্যেরও উৎপাদন ছিল কৃষি-প্রক্রিয়ার সরাসর অনুবৃত্তি। শাহাবাদ জেলায় আখ-মাড়াই আর আখের রস জ্বাল দেবার একটা প্রতিষ্ঠানে তিন-মাসের মরসুমে কাজ চলত ৪৭২৫ সের বা ৯৭০০ পাউণ্ড (প্রায় ৪৪০০ কিলোগ্রাম) রস নিয়ে; সেটার দাম ছিল ১৭৬ টাকা (অর্থাৎ টাকায় প্রায় ২৫ কিলোগ্রাম), এর থেকে মনে হয় গুড়

সংশ্লিষ্ট ছিল এখানে এবং অন্যত্র। সরঞ্জাম আর চারটে বলদ বাবত খরচ পড়ত ১৪ টাকা বা ৩৬৪ সের রস (বস্তু হিসাবে) – মূল উৎপাদের মূল্যের ৮ শতাংশের কম। সাত জন মজুরের প্রত্যেকে পেত দিনে সওয়া সের রস – মরসুমে মোট ৭৮৭ সের, অর্থাৎ উৎপাদের ১৬·৭ শতাংশের কম। অন্যান্য খরচের মধ্যে ছিল আখের দাম, আর তার উপর প্রতিষ্ঠানের মালিকের লাভ।

অর্থাৎ কিনা, এখানেও কৃষি-উৎপাদের প্রাধান্যটা স্পষ্ট। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মালিকের কথা কিছুই বলা হয় নি আকর-দলিলে। সে হয়ত ছিল ঐ আখ-খেতের মালিক – এমনটা ভারতে প্রচলিত ছিল। একটা মরসুম জুড়ে অমন একটা প্রতিষ্ঠান চালাবার মতো আখ জন্মাতে দরকার হত ৬·৪ একর (প্রায় ২·৬ হেক্টর) জমি। হিসাব করে দেখা যায় এক-হেক্টর জমির ফসল থেকে উৎপন্ন হত বছরে ৪৫-৫০ টাকার জিনিস – প্রায় ১৩০০ কিলোগ্রাম গুড়।

কাছাকাছি পাটনায় যাদের আখজাত দ্রব্য-উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান ছিল তাদের খরচের দফাওয়ারী গঠন আর আয় দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন হত মাসে ১০০ মন (৮২৩৪ পাউণ্ড বা ৩৭৩০ কিলোগ্রাম) রস – দাম ১০০ টাকা। প্রোসেসিংয়ের খরচ ছিল এইরকম: জ্বাল দেবার জালায় রস পৌঁছে দিতে ২ টাকা; জালাগুলোর দাম ২ টাকা ৬ আনা; জালানি (ঘুঁটে) ৪ টাকা; দু'জন মজুরের পারিশ্রমিক ৪ টাকা; রস জ্বাল দিতে মেশানো দুধ ২ টাকা; দ্রব ঘন করে চিনি করাতে ব্যবহৃত উদ্ভিদ ২ টাকা; ঘর-ভাড়া ২ টাকা; বস্তাবন্দী করতে ১ টাকা; আর মালিকের লাভ ২৯ টাকা ১০ আনা – মোট ১৪৯ টাকা। এইসব খরচের অন্য দিকে বিভিন্ন উৎপন্ন জিনিসের দাম ছিল এইরকম: ৫০ মন (১৮৬৫ কিলোগ্রাম) গুড় ২৭ টাকা, ৩০ মন (১১৯০ কিলোগ্রাম) চিটেগুড় ২০ টাকা, ১৭ মন (৪০৩,৪ কিলোগ্রাম) চিনি ১০২ টাকা – মোট ১৪৯ টাকা। এখানে মরসুম ছিল ৫-মাসের; ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠানের আয় দাঁড়াত ১৪৮ টাকা, তার সঙ্গে চিনি শোধন থেকে আয় ধরলে – ১৬০ টাকা।*

তাহলে দেখা যাচ্ছে আখজাত দ্রব্য যারা প্রস্তুত করাত তাদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য ছিল। মনে হয় শাহাবাদে প্রতিষ্ঠানটা ছিল একজন ভূমি-মালিকের, আর সেটা ছিল আখ-খেতের কাছেই। মজুরদের সংখ্যা অনেক বেশি (দুয়ের জায়গায় সাত), এটাও তার প্রমাণ; এদের কাউকে-কাউকে হয়ত লাগানো হত আখ কাটা আর বওয়ার কাজে; তাদের কাজ বাবত পারিশ্রমিকও দেওয়া হত জিনিস (রস); মালিকের লাভ সম্বন্ধে কোন তথ্য নেই, আর রসের দাম ছিল কিছুটা কম। অন্য একটা জেলায় মালিক আখ আর জালানি ঘুঁটে কিনত 'খামারীদের' কাছ থেকে — সে ছিল খুদে উদ্যোগী-কারবারি, সে নিজে-নিজেই শিল্পোৎপাদন চালাত, মনে হয় শহুরে পরিবেশে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কৃষিজ উপাদানগুলো বাবত খরচ হত চিনি-উৎপাদনের খরচের তিন-চতুর্থাংশ। এই কারবারির আয়টাকে পুঁজিতান্ত্রিক লাভের পর্যায়ে ধরা যায়, কিন্তু সেটা অকুণ্ঠ নয়, কেননা বার্ষিক হিসাবে সেটা দাঁড়াত মাত্র ১৩-১৪ টাকা, তাতে পরিবারটির স্বচ্ছন্দে চলত, তবে সেটা পুঁজি সঞ্চয়ন আর সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের উপযুক্ত ভিত্তি ছিল না।

সাবান-উৎপাদনের খরচেও কৃষিজ উপাদানটা ছিল খুবই প্রকাণ্ড। শাহাবাদে এক-দফা কাঁচামাল (ক্রিয়াপ্রণালীটা চলত চার দিন ধরে) থেকে তৈরি হত মোটামুটি ৪৫ কিলোগ্রাম সাবান, সেটার দাম ৭ টাকা ১০ পয়সা। তার থেকে চর্বি আর উদ্ভিজ্জ তেলের জন্যে যেত ৫ টাকা (প্রায় ৭০ শতাংশ), সোডা ১ টাকা ৪ আনা, জালানি ৪ আনা, আর কারিগরের মাইনে মাত্র সাড়ে আট আনা। পুরোপুরি কর্মনিয়োগ হলে তার রোজগার হতে পারত মাসে ৩ টাকা ১১ আনা, কিন্তু সে ৩ টাকার বেশি বড় একটা পেত না।

উদ্ভিজ্জ তেলের দামে কৃষিজ উপাদানের হিসসাটা ছিল আরও বেশি। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিহারে একজন কলু দিনে ১৩ পয়সার তিল ঘানিতে পিষে পেত ৪ আনার তেল আর ১ আনার খোল। এইভাবে, কারিগরটির আয় হত দিনে ৭ পয়সা, অর্থাৎ মাসে ৩ টাকার বেশি নয়। কিন্তু এর থেকে যেত ঘানি-টানা বলদ বাবত আর ঘানি-গাছ মেরামতের খরচ। বলদকে খোল খাওয়ানো হত বলে কারিগরের আয় কমে যেত, আর উৎপন্ন জিনিস যা প্রকৃতপক্ষে বিক্রি করা হত সেটার দামে কৃষিজ উপাদানের হিসসাটা বেড়ে যেত।

এইসব উপাত্ত থেকে আবার প্রতিপন্ন হয় আমার এই অনুমানটা: পণ্য-অর্থ সম্পর্কের মাধ্যমে কৃষকেরা হস্তশিল্প থেকে যে-জিনিস পেত তাতে কৃষিজ উপাদানের হিসসাটা হত খুবই বড়। অর্থাৎ কিনা, যেটাকে পণ্য-অর্থ সম্পর্ক বলে মনে হত তাতে আসলে চলত বস্তু-বিনিময়।

গ্রামাঞ্চলে পৌছত যে সস্তা কাপড় সেক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। নিছক কৃষিজ দ্রব্য তুলোই তো সুতোর দামে প্রধান উপাদান। মেয়েরা যে সামান্য পারিশ্রমিক পেত সেটা সুতোর দামে অপেক্ষাকৃত সামান্য হিসসাই যোগ করত। বুকাননের হিসাবে, শাহাবাদে কাটনী ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার, তাদের বার্ষিক উৎপাদ ছিল মাথাপিছু গড়ে ৮ টাকার। তুলো আর তুলো ধোনার খরচ বাদ দিলে একজন কাটনীর নীট আয় ছিল বছরে দেড় টাকা। বুকানন আরও দিয়েছেন এই হিসাবটা: গয়া আর পাটনা জেলায় কাটনীদের রোজগার হত ৩ টাকা ৮ আনা। বাংলার দিনাজপুর জেলায় কাটনীরা রোজগার করত মাসে ৪ আনা – বছরে ৩ টাকা। তবে দামে এই বাড়তিটাও আসত প্রধানত কৃষক রমণীদের প্রচেষ্টা থেকে।

আখেরী ক্রিয়াপ্রণালী তাঁত-বোনাটা ছিল পেশাদার কারিগরদের কাজ, কিন্তু সেক্ষেত্রেও প্রাধান্য থাকত কৃষিজ উপাদানের হিসসাটার। যেমন, পূর্ণিয়া জেলার কোন-কোন জায়গায় এক-একটা তাঁতে মোটা কাপড়ের বার্ষিক উৎপাদন হত নিম্নলিখিতরূপে (টাকা-আনা হিসাবে):

এলাকা	কাপড়ের দাম		সুতোর দাম	
শিবগঞ্জ	১১২	৮	৭৩	২
ভুনিস	১২০	০	৮২	৮
ডাঙ্গরখোরা	১১২	০	৬৮	০
দৌলনগঞ্জ	১১২	০	৮৪	০
বাহাদুরগঞ্জ	৮৪	০	৬০	০
গোণ্ডওয়ারা	১২০	০	৮৮	৮
হাভেলি	১২০	০	৯৭	৮
কৃষ্ণগঞ্জ	১২০	০	৯০	০
ধমদহ	৭৬	৮	৪২	১২
	১০৮৯	০	৭৬৫	৮

এইভাবে, গড়ে বার্ষিক ১০৯ টাকার কাপড় বোনা হত এক-একটা তাঁতে, সেটা থেকে বছরে ৪৩ টাকা বা মাসে ৩ টাকা ৮ আনা যেত তন্তুবায়ের এবং তার পরিবারের মানুষের পারিশ্রমিক হিসেবে। বিহারে শাহাবাদ জেলায়ও তাঁত-বোনা-সংক্রান্ত অঙ্কগুলো অনুরূপ। এখানে তন্তুবায়দের গড় বার্ষিক মাথাপিছু উৎপাদন ছিল ৭৮ টাকার, সেটা থেকে তার পরিবারের মানুষের আয় ছিল ২০ টাকার একটু বেশি। উৎপাদের দাম আর আয় পুর্ণিয়ার চেয়ে কম হলেও অনুপাত ছিল একই।

বুকাননের উপাত্ত থেকে দেখা যায় উনিশ শতকের প্রথম দশকে বিহারে সুতো-কাটা আর তাঁত-বোনা শিল্পে কারিগরদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ছিল। সবচেয়ে নিরেস সুতোর কাটনীদের আয় কমে দাঁড়িয়েছিল মাসে সাড়ে দশ আনা, অর্থাৎ পড়তিটা ছিল ২০-৩০ শতাংশ। তবে যারা সরেস সুতো কাটত সেইসব দক্ষ মেয়ে কাটনীদের ক্ষতিটা হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। তাদের রোজগার দশ বছর আগেকার ২-৩ টাকা থেকে কমে হয়েছিল ১৪½-১৫ আনা। এমন সুতো দিয়ে যেসব দামী কাপড় বোনা হত সেগুলোর জন্যে চাহিদা কমে যাওয়াই নিশ্চয়ই এর কারণ ছিল বিশেষত। তন্তুবায়দের আয়ও কিছুটা কমে হয়েছিল মাসে দুই-আড়াই টাকা।

এটা আগ্রহজনক যে, সুতো আর কাপড়ের দামের গঠন সম্বন্ধে নিজস্ব হিসাব কষেছিলেন বুকানন, আর এগুলো উল্লিখিত হিসাবের কাছাকাছি। তিনি বলেন, পুর্ণিয়া জেলায় সুতো কাটা হত বছরে ১৩০০ টাকার; অপেক্ষাকৃত সরেস বিভিন্ন রকমের সুতো কাটা হত ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার; আর তুলোর দাম পড়ত ঐ পরিমাণের ১০ শতাংশের বেশি নয়। প্রসঙ্গত বলি, শতকরা হিসাবটা খাটো করে ধরা হয়েছে, কেননা ঐ একই জায়গায় তিনি আরও দিয়েছেন ১ : ১৬, এমনকি ১ : ১৭·৫ অনুপাত। মোটা সুতোর দাম ধরা হয়েছিল ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা, তার থেকে অর্ধেকটা তুলো কিনতে লাগত বলে তিনি মনে করতেন।*

ভাগলপুর জেলায় সুতো কাটত প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার মেয়ে কাটনী, তারা· প্রত্যেকে বছরে ৩৪ পাউণ্ড (১৫·৩ কিলোগ্রাম) তুলো দিয়ে ১১ টাকা ৬ পয়সার সুতো কাটত, তার থেকে তুলোর দাম পড়ত ৬ টাকা ৯ আনা ১ পয়সা, আর পারিশ্রমিক বছরে ৪ টাকা ৮ আনা ১ পয়সা।

ঐ জেলায় ৬২১২ ঘর তন্তুবায় ছিল, তাদের তাঁত ছিল মোট ৭২৭৯টা। সুতোর দাম ছিল কাপড়ের দামের ⅘ ভাগ। তবে তন্তুবায়েরা তাঁত বুনত বছরে দশ মাসের বেশি নয়, বাদবাকি সময়ে তারা বাজন-দারের কাজ করত, বিশেষত, বিয়ের অনুষ্ঠানে। তাই মাসে ৭ টাকার জিনিস তৈরি ক'রে তাদের বার্ষিক উৎপাদ হত ৭০ টাকার, সেটা থেকে ২০ টাকা হত আয়। তাদের বউদের নগদ আয় আর বাজনদার হিসেবে নিজেদের আয় (প্রধানত খাদ্য) মিলিয়ে তন্তুবায়রা পেত মাসে আড়াই তিন টাকা।*

পাটনা জেলায় ৩ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি মেয়ে কাটনী বছরে ২৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার সুতো কাটত। তুলোর দাম (১২ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা) বাদ দিলে তাদের রোজগার হত বাকিটা – ১০ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা, অর্থাৎ কাটনীদের মাথাপিছু বছরে গড়ে ৩ টাকা ৪ আনা। তবে এইসব গড় হিসাবের পিছনে মস্ত অসামঞ্জস্য ছিল একদিকে এই মেয়েরা, যারা সুতো কাটত গৃহস্থালির কাজ এবং অন্যান্য ঝঞ্ঝাট থেকে যখন ফুরসত জুটত, আর অন্য দিকে যারা অপেক্ষাকৃত সরেস সুতো কাটত সেইসব পেশাদার কাটনীদের মধ্যে।**

এই জেলায় তন্তুবায়দের দক্ষতা আর কাপড়ের গুণাগুণের দিক থেকে পার্থক্যের ফলে তাদের রোজগারে প্রভেদ ঘটত না। বুকানন বলেন, অভিজ্ঞতা যা-ই হোক, একজন তন্তুবায়ের গড় বার্ষিক আয় ছিল ২৮ টাকা। তিনি বলেন, দামী কাপড়ের ফরমাশের সঙ্গে দাদন দেওয়াটা ছিল অপরিহার্য – এই রেওয়াজের দরুন 'অধিকতর মূল্যের জন্যে' প্রস্তুত

করায় কিছুই এসে-যেত না। বুকানন বলেন, দাদন দেবার ব্যবস্থাটা ছিল একেবারেই অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু সমস্ত দেশীয় কারবারিরা সেটাকে বজায় রাখছিল তার কারণ এই যে, 'দাসত্বের মতো না হলেও তার চেয়ে একটু ভাল মুখাপেক্ষিতার দশায় মেহনতী মানুষকে' রাখতে সেটা সহায়ক ছিল।* তবে তন্তুবায়দের এমন মুখাপেক্ষিতার মাঝে ডুবিয়ে রেখেছিল দেশীয় কারবারিরাই শুধু নয়, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্টরাও। কোন তন্তুবায়কে দাদন দিলে এটা বোঝাত যে, কোম্পানির ফরমাশ মেটাবার আগে অন্য কারও কাছে তার জিনিস বিক্রি করা মানা ছিল।

পাটনায় সেকরাদের অবস্থা থেকেও দেখা যায় দামী-দামী আধা-তৈরি জিনিস ব্যবহার করতে গেলে সাধারণত কারবারিদের প্রতি কারিগরদের মুখাপেক্ষিতা বেড়ে যাওয়াটাই ভারতে নিয়ম ছিল। বুকানন বলেন, হাতিয়ার ছাড়া কোন পুঁজি ছিল না সেকরাদের। ব্যাপারীরা মালমশলা দিত, আর কারিগরদের পারিশ্রমিক দিত কাজের পরিমাণ অনুসারে।** সেকরাদের রোজগার ছিল খুবই কম – দিনে দুই থেকে চার আনা। ভাগলপুর জেলায় পালকি আর গাড়ি তৈরি করার কর্মশালাগুলি ছিল আদিম ধরনের ম্যানুফ্যাকচারি আর কারিগর-সমষ্টির মাঝামাঝি একটাকিছু। এমন কর্মশালা জেলা-কেন্দ্রে ছিল প্রায় ৩০টা, আর প্রায় ৪০টা ছিল মুঙ্গেরে। দুই থেকে দশ জন কারিগর কাজ করত সেগুলোর এক-একটায়। কোন-কোন ক্ষেত্রে মনিব তাদের জন খাটাত, তাদের দিত মালমশলা আর হাতিয়ার; অন্যান্য ক্ষেত্রে সমস্ত কারিগর ছিল অংশীদার। তারা পেত দিনে দেড় দুই আনা, অর্থাৎ মাসে আড়াই থেকে সাড়ে তিন টাকা। ভাগলপুরে তিনটে আর মুঙ্গেরে পাঁচটা কর্মশালার সম্পত্তির পরিমাণ ছিল এক হাজার থেকে তিন হাজার টাকার মধ্যে।

ভাগলপুরে প্রস্তুত-করা কাঠকয়লা ব্যবহার করত মুঙ্গেরের কর্মকারেরা আর বীরভুমের লোহা-প্রস্তুতকারকেরা, তাছাড়া সেটা চালান যেত জঙ্গিপুরে আর মুর্শিদাবাদে। শুধু বীরভুমেই যেত বছরে সাড়ে তিন

লাখ মন অবধি কাঠকয়লা (এক-মনে ৬০ পাউণ্ড হিসাবে সেটা প্রায় ১১ হাজার টন)। এই কাঠকয়লা প্রস্তুত করত বিভিন্ন পার্বত্য উপজাতির মানুষ, যাদের গাড়ি ছিল এমনসব খুদে ব্যাপারী আর কৃষকেরা সেটা কিনে নিয়ে বীরভুমে বিক্রি করত টাকায় ৫-৬ মন (১৩৫-১৫০ কিলোগ্রাম) দরে।

যারা মদ তৈরি করত সেইসব কারিগরের আর্থিক অবস্থা ছিল সবচেয়ে ভাল। ভাগলপুরে প্রত্যেকটি কারিগর তৈরি করত দিনে ৬০ বোতল, সেটা বিক্রি হত ১ টাকা ১৩ আনায়, অর্থাৎ মাসে ৫৪ টাকায়। তাতে খরচ ছিল – ময়দা বাবত ১২ টাকা, জালানি বাবত ২ টাকা ১৩ আনা, যোগাড়ের মাইনে ২ টাকা, পাত্র বাবত ১৫৫ আনা, আর কর ১৫ টাকা; অবশিষ্ট ২১ টাকা ১০ আনা হত লাভ।*

শাহাবাদে ৬০টা প্রতিষ্ঠানের মোট ৯০টা কাগজ তৈরি করার কর্মশালার কথা বলেছেন বুকানন। প্রত্যেকটা কর্মশালায় কাগজ তৈরি হত বছরে গড়ে ৩৭৫ টাকার, এইসব কাগজ ছিল গুণাগুণের দিক থেকে চার রকমের। কাঁচামাল বাবত ১৩৭ টাকা, জালানি বাবত ১৬ টাকা, সরঞ্জামের বিভিন্ন অংশ বাবত ১৪ টাকা ৮ আনা, মজুরি বাবত ১৬৪ টাকা ১২ আনা গিয়ে লাভ থাকত ৪১ টাকা ৬ আনা,** অর্থাৎ মাসে ৩ টাকা ৮ আনা – সেটা মালিককে খুদে পুঁজিপতি শ্রেণীভুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কাজ বাবত যা পারিশ্রমিক দেওয়া হত সেটার বিভিন্ন অঙ্গ-উপাদান অনুসারে দেখা যায় এইসব কর্মশালায় ছিল বিস্তারিত শ্রমবিভাগ। যারা কাঁচামাল প্রোসেস করত সেই চার জন স্থায়ী কারিগরের প্রত্যেকে পেত বছরে ২৫ টাকা। বিভিন্ন সাময়িক ক্রিয়া-প্রণালী বাবত পারিশ্রমিক দেওয়া হত আলাদা-আলাদা করে: ময়দার মণ্ড ঘোঁটা বাবত ১২ টাকা; পালিশ করা, কাটা আর গাঁটবন্দী করা বাবত ১০ টাকা; নির্দিষ্ট আকারে কাগজের তা তৈরি করা বাবত ২৫ টাকা; কাগজের তা শুকবার জন্যে মেলে দেওয়া বাবত ৬ টাকা, আর টুকটাক তিন রকমের কাজ বাবত প্রায় ১০ টাকা।

বুকানন বলেন, নির্দিষ্ট আকারে কাগজের তা তৈরি করার কাজটা মালিক করত নিজেই, আর মণ্ড মেশানো, পালিশ করা, কাটা আর শুকবার কাজগুলো করত তার পরিবারের স্ত্রীলোক আর ছেলেমেয়েরা। সেক্ষেত্রে পরিবারের মোট আয় বেড়ে দাঁড়াত বছরে ১০০ টাকা, যেটা ছিল সাধারণ কারিগরের রোজগারের চেয়ে দু'-তিনগুণ বেশি। মনে হয় এইসব প্রতিষ্ঠান ছিল বড়-বড় পারিবারিক কর্মশালা আর আদিম ধরনের পুঁজিতান্ত্রিক ম্যানুফ্যাকচারির মাঝামাঝি একটাকিছু। কিন্তু যেসব পরিবারের ছিল এমন একাধিক প্রতিষ্ঠান সেগুলোকে খুদে পুঁজিতান্ত্রিক কারবারের বর্গে ধরা চলে নিশ্চয়ই।

বিশ্লেষণের একটা বিষয় হিসেবে কাগজ-শিল্প সম্বন্ধে মার্কস বলেছেন: 'সাধারণভাবে কাগজ-শিল্পে বিস্তারিতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা যেতে পারে উৎপাদনের ভিন্ন-ভিন্ন উপকরণের ভিত্তিতে স্থাপিত বিভিন্ন উৎপাদন-প্রণালীর মধ্যে পার্থক্যই শুধু নয়, অধিকন্তু ঐসব প্রণালীর সঙ্গে উৎপাদনের বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের সম্বন্ধও: কেননা জার্মানিতে কাগজ-উৎপাদনের সাবেকী প্রণালী থেকে পাওয়া যায় হস্তশিল্প উৎপাদনের একটা নমুনা; হল্যাণ্ডে সতর শতকের আর ফ্রান্সে আঠার শতকের প্রণালী থেকে পাওয়া যায় যথাযথ অর্থে ম্যানুফ্যাকচারের নমুনা; আর আধুনিক ইংলণ্ডের প্রণালী থেকে পাওয়া যায় স্বয়ংক্রিয় উপায়ে জিনিসটা প্রস্তুত করার নমুনা। তাছাড়া, ভারতে আর চীনে এখনও রয়েছে ঐ শিল্পের দুটো স্পষ্ট-স্বতন্ত্র প্রাচীন এশীয় ধরন।'*

বিহারের জেলাগুলির পাইকারী বাণিজ্যে বিভিন্ন পণ্যের দফাওয়ারী গঠন সম্বন্ধে বিস্তারিত উপাত্ত আমাদের হাতে নেই, কিন্তু সেখানেও কৃষিজ দ্রব্যের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। পূর্ণিয়া জেলায় শস্যের বাণিজ্য ছিল খুবই বিস্তীর্ণ: গম চালান যেত পুবে – মুর্শিদাবাদে, আর চাল আনানো হত দিনাজপুর আর নেপাল থেকে। তবে স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছ থেকে কিভাবে শস্য সংগ্রহ করে সেটা বিক্রি করা হত সে-সম্বন্ধে বুকানন কোন তথ্য দেন নি। এমনও হতে পারে যে, এই ব্যাপারটার আখেরী পর্ব চলত ব্যাপারীদের মারফত, তারা টাকা ধার দিত। এই

জেলায় শস্যের বড়-বড় ব্যাপারীদের বলা হত গোলদার মহাজন. এরা 'ঘর্লা' আর 'ভুসি' এই দুটো বর্গে বিভক্ত ছিল। পুর্ণিয়ার সাতটা ব্যাঙ্কের মধ্যে দুটো ছিল মুর্শিদাবাদের ব্যাঙ্কার জগৎ শেঠ আর লালা মেঘরাজের ব্যাঙ্কের শাখা, আর পাঁচটা ছিল স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। প্রথমোক্ত দুটো প্রতিষ্ঠান হুণ্ডি ভাঙিয়ে দিত এবং হুণ্ডি ছাড়ত (১ লাখ টাকা অবধি), আর স্থানীয় ব্যাঙ্কারদের কাজ-কারবার চলত ভূমি-মালিকদের সঙ্গে – 'তাদের খাজনা জমা রাখে এবং কর দাখিল করে'। পুর্ণিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য আর ব্যাঙ্কিংয়ের এই উপর-মহল ছাড়াও ছিল অতি বিভিন্ন ধরনের এবং রকমের মালের ব্যাপারী, দোকানদার আর ফেরিওয়ালাদের বহু সম্প্রদায় আর উপ-বর্গ।*

ভাগলপুরে ব্যাপারীদের মধ্যে শস্যের ব্যাপারীরাও (গোলদাররা) ছিল বিশিষ্ট, তারপর ছিল কাপড়ের ব্যাপারীরা ('পশ্চিম থেকে মোগল-দের চারটে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান' এক-লাখ টাকার মাল নিত), আর তুলো আমদানির কারবারিরা। সমস্ত বাস্তুর কারিগরেরা জড়িত ছিল খুচরো বাণিজ্যে – এটাও ছিল বিশেষিত, যেমন কিনা পুর্ণিয়ায়। এই দুই জেলায় ব্যাঙ্কিং কারবারের বিভিন্ন ধারাও ছিল একই রকমের। তাদের পুঁজি ছিল গড়ে ১০-১৫ হাজার টাকা। প্রত্যেকটা বৃত্তিতে থাকত একজন প্রধান, সে নিজ বর্গের সদস্যদের কাছ থেকে অল্প-অল্প পরিমাণ কর নিত, বর্গের প্রতিনিধিত্ব করত কর্তৃপক্ষের কাছে, শ্রম আর জিনিসপত্রের দাম স্থির করত, বিবাদ-বিসংবাদ মেটাত, এলাকার ভিতর দিয়ে সৈন্যদল চলার সময়ে কিংবা হোমরাচোমরা কেউ এলে জিনিসপত্রের আবশ্যক যোগানের ব্যবস্থা করত। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এইসব প্রধানের অধিকার যথাবিধি স্বীকার না করলেও এরা নিজেদের চিরাগত প্রতিষ্ঠা আর ক্ষমতা বজায় রেখেছিল।** তবু জমিদার বাজারখোলায় চালা বাঁধতে পারত, সেটাকে বেচা-কেনার একমাত্র জায়গা বলে ঘোষণা করতে এবং জায়গাটা ব্যবহার করা বাবত বিক্রেতাদের কাছ থেকে তোলা আদায় করতে পারত।

শাহাবাদে শস্যের পাইকারদের পুঁজি থাকত ৫ লক্ষ টাকা অবধি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও পাইকার ছিল বেশকিছু। যাদের প্রত্যেকের পুঁজি ছিল ১ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা অবধি এমন একদল ব্যাপারী বছর-বছর ৩ লক্ষ টাকার বিলাসদ্রব্য, দামী কাপড় আর নুন পাঠাত দক্ষিণ বিহারের রামগড়ে। শাহাবাদে বাণিজ্য চলত স্থলপথে ছাড়া নদীপথেও। গড়ে ৪০০ মন বইতে পারে এমন ৫৬০-৫৭০খানা নৌকা প্রতি-বছর এই জেলায় নিয়ে যেত নুন, চাল, চট এবং সুপারি, আর এখান থেকে নিয়ে যেত শস্য, কম্বল, উদ্ভিজ্জ তেল এবং ঘি। এটা উল্লেখযোগ্য যে, হস্তশিল্পের বিশেষত কোন-কোন জিনিস বেচার ব্যাপারীদের মূলধন ছিল অপেক্ষাকৃত কম। যেমন, যারা কাগজ আমদানি করত তারা কারবার চালাত ৫০০ থেকে ৩০০০ টাকার মূলধন দিয়ে। কাপড়ের ব্যাপারীদের মূলধন ছিল আরও কম – ২০ থেকে ১০০০ টাকা, তবে তাদের সংখ্যা ছিল কয়েক-শ'। স্থানীয় বাজারে সস্তা কাপড়ের ক্ষুদ্রায়তনের খুচরো বিক্রি চলত নিশ্চয়ই এই ধারায়। বিভিন্ন ব্যাপারীর টাকা থাকত এই-রকম : জুতো – ১০০-১২৫ টাকা, ধাতুর থালা-বাসন – ২০-২০০ টাকা, লোহা আর টিন – ৫ থেকে ৩০ টাকা। প্রত্যেকটা বৃত্তির কারিগরেরা জিনিসপত্র বেচত সরাসরি তাদের কর্মশালা থেকে। বিভিন্ন বৃত্তির কারি-গরদের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল এইরকম : সাবান – ১৫, কাচের গয়না – ২২, সুগন্ধদ্রব্য – ৪০, আর কর্মকারদের – ৫৪, কুম্ভকারদের ৬৬, তন্তুবায়দের – ৭০, তুলো ধুনারিদের – ৭৪, ইত্যাদি।

শাহাবাদে ক্রেডিট ব্যবস্থা চালাত মহাজনেরা, তারা গ্রামের মানুষকে ধার দিত এবং আসল টাকা শোধা আর সুদ বাবত আদায় করত শস্য। তাদের মূলধন থাকত ৫০০ টাকা থেকে ৩০ হাজার টাকা অবধি। উনিশ শতকের গোড়ার দিক অবধি এই জেলায় ছিল এইরকমের রেওয়াজ : স্থানীয় ব্যাঙ্কার প্রায় সমস্ত কর দাখিল করত আগাম, আর তহসিলদারের গোমস্তা কর হিসেবে দেয় টাকা পেয়ে সেটা সুদে ধার দিত। ব্যাঙ্কারদের মূলধন থাকত গড়ে ২০-৩০ হাজার টাকার মধ্যে, তবে সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কারের ছিল ৪ লাখ টাকা।

শাহাবাদের মতো একটা সাধারণ জেলায়ও ব্যাপারী আর ব্যাঙ্কার-দের মধ্যে সম্পত্তির পরিমাণে পার্থক্য আর বৃত্তিগত বিশেষীকরণের দিক থেকে যথেষ্ট জটিলতা ছিল। গ্রাম্য মহাজনদের মূলধন প্রচুর

ছিল না, সেটা ছিল ১০০ থেকে ২০০০ টাকা অবধি, কিন্তু বলা হয়, এই জেলায় খাজনার তৃতীয়াংশের বেশি দেওয়া হত এদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে।* বুকানন বলেন, বৃটেনে এদের 'বলা যেত ব্যাপারী খামারী', কেননা তারা খেতি-খামারের সঙ্গে সঙ্গে চালাত মহাজনি (শস্য-ঋণ সমেত) আর বাণিজ্য। মাল চলাচলের কারবার করত বিশেষ ধরনের ব্যাপারীরা। তাদের মধ্যে ছিল মামুলি গাড়ির মালিকেরা, যাদের বলদ ছিল কয়েকটা করে, আর ছিল ৫০০ থেকে ৫০০০ টাকার মূলধন-ওয়ালারা, এরা কারবার চালাত পাটনা আর বারাণসীর সঙ্গে। খুদে দোকানদাররা ব্যাপারীদের কাছ থেকে শস্য কিনে সেটা খুচরো বিক্রি করত। এদের মূলধন হত সাধারণত ৪ থেকে ২৫ টাকার মধ্যে, তবে কারও-কারও ছিল ২০০ টাকা অবধি।

ওজন-করা আর মাপজোখের ধরন ছিল বিবিধ, সেটা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য মহলগুলোর পয়সা করতে সহায়ক একটা বাড়তি উপায়। শাহাবাদ জেলায় প্রত্যেকটা শহরের ছিল ওজনের নিজস্ব হিসাব — অর্থাৎ কত সিক্কায় এক-সের আর কত সেরে এক-মন তার হিসাব। সাধারণত ছিল ৪৪ সিক্কায় (১·১৩৯৩ পাউণ্ড) ১ সের, কিন্তু কোন-কোন ক্ষেত্রে সেটা ছিল ৮৮ সিক্কা অবধি। ৪০ থেকে ৫২ সেরে হত ১ মন। দৈর্ঘ্য আর আয়তনের মাপও ছিল তেমনি বিভিন্ন।**

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিহারের মধ্য এলাকাগুলির (পাটনা আর জিলা-বিহার) জনসমষ্টি-সংক্রান্ত তথ্য থেকে পাওয়া যায় সেখানকার সামাজিক গঠনের প্রধান-প্রধান উপাদান সম্বন্ধে খুবই সাধারণ একটা চিত্র। মোট ৩৩ লক্ষ ৬৪ হাজার মানুষের চতুর্থাংশের বেশি (৯ লক্ষ ৩৫ হাজার) ছিল সম্ভ্রান্ত, ৯২ হাজার ছিল ব্যাপারী, ২ লক্ষ ৪২ হাজার কারিগর, আর ২০ লক্ষ ৯৪ হাজার ছিল চাষী আর দিন-মজুর। এইসব অঙ্ক অবশ্য তখনকারমতো মোটামুটি ধরে-নেওয়া: এইসব বর্গের মধ্যে সীমারেখা অনেক সময়েই ছিল অস্পষ্ট, কেননা কোন-কোন ব্যাপারী আর ব্যাংকারদের ধরা হয়েছিল সম্ভ্রান্ত বর্গে, খেতি-খামারের সঙ্গে জড়িত গ্রামীণ কারিগরদের সবসময়ে চাষীদের

থেকে সহজে পৃথক করে ধরা যেত না, ইত্যাদি। তবু ব্যাপারী আর কারিগরেরা একত্রে ছিল জনসমষ্টির ১০ শতাংশ, অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত বর্গের তৃতীয়াংশ মাত্র, আর কৃষিজীবী ছিল ৬২ শতাংশের একটু বেশি।*

উঁচু বর্ণের হিন্দুরা আর মুসলমানদের বিশেষ-সুবিধাভোগী বর্গগুলিকে নিয়ে ছিল সম্ভ্রান্ত জনসমষ্টির মূল অংশটা – এদের গঠন আর কাজ সম্বন্ধে খুবই আগ্রহজনক তথ্য দিয়েছেন বুকানন। এইসব এলাকায় ২৫,৮৯০ জন ছিল জন্মসূত্রে কলমজীবী, এদের মধ্যে কাজ করত ১২,৯৭৫ জন, আর ১৫,২১৫ জন ছিল কাজ-ছাড়া। জন্মসূত্রে যারা যোদ্ধা তাদের মধ্য থেকে ১১৫০ জন ছিল নিয়মিত ফৌজে, পুলিসে আর রাজস্ব সংস্থায় কাজ করত ১১,৪৫২ জন, আর ২৮,৬৩০ জনের কাজ ছিল না বৃটিশ রাজের আমলে।

পাটনা শহরের জনসমষ্টির সামাজিক আর বৃত্তিগত গঠন সম্বন্ধে ধারণা করা যায় নিম্নোক্ত তথ্যগুলি থেকে। মোট ৩ লক্ষ ১২ হাজার মানুষের মধ্যে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ছিল সম্ভ্রান্ত, ৩০ হাজার ব্যাপারী, ৭৮ হাজার কারিগর, আর চাষী এবং দিনমজুর ৬৬ হাজার।** এখানে বলা দরকার, বুকানন এইসব অঙ্ক দেন বৃহত্তর পাটনা সম্বন্ধে, তার মধ্যে পড়ে শহরতলিগুলিও। কৃষিজীবীদের সংখ্যা অত বেশি সেই কারণেই। শহরের চৌহদ্দি বাড়াবার ফলে সম্ভ্রান্ত বর্গের সংখ্যা তেমন বাড়ে নি, কেননা তারা থাকত শহরের ভিতরেই (বুকানন এতে অবাক হন, কেননা ঘিঞ্জি শহরের চেয়ে শহরতলির বসতবাড়িই তাঁর বেশি পছন্দসই ছিল)। শহরকেন্দ্রের প্রতি সম্ভ্রান্ত মহলের আকর্ষণের কারণ তো মনে হয় ছিল এই যে, তারা থাকতে চাইত তাদের কর্মস্থলের কাছাকাছি – সেগুলো ছিল বিভিন্ন দপ্তর, মোতায়েন-করা সৈন্যদল, মন্দির আর মসজিদ (মুসলমানদের উপর-মহলগুলিও ছিল সম্ভ্রান্ত বর্গের মধ্যে)। সম্ভ্রান্ত বর্গের মানুষের চাকরি-বাকরির অবস্থা দেখা যায় নিম্নোক্ত অঙ্কগুলো থেকে: জন্মসূত্রে মসিজীবী ৭৭০০ জনের মধ্যে কাজ পেয়েছিল ৩৩০০ জন, আর সামরিক বৃত্তি যাদের পুরুষানুক্রমিক এমন

৪৪০০ জনের মধ্যে মাত্র ২০০ জন ভর্তি হতে পেরেছিল কোম্পানির পলটনে, পুলিসে এবং রাজস্ব সংস্থায় কাজ করত ২৮০০ জন, আর ৩৮০০ জন কাজ পায় নি এই প্রাক্‌স্বৈরতান্ত্রিক আমলের ঔপনিবেশিক শহরে।*

মোগল আমলের ভারতের যেকোন প্রধান শহরের মতো পাটনার বিশেষক ছিল খুবই বহুমুখী হস্তশিল্প আর সার্ভিস। ১৪৭টা শহুরে শাখা আর বৃত্তির উল্লেখ করেছেন বুকানন (এই জেলায় মোটের উপর ছিল ১৫টা)। বেশির ভাগ লোকই নিযুক্ত ছিল বয়নের কাজে: শহরে ২৩,৪০০ এবং গোটা জেলায় ৩,৩০,৪০০। কিছু-কিছু ব্যতিক্রম ছেড়ে, তাঁত-বোনাটা কোন স্থায়ী বৃত্তি ছিল না, সেটা ছিল প্রধান বৃত্তির উপরি করা কাজ। সেটা স্পষ্ট এই তথ্যটা থেকে: এই জেলায় সমস্ত হস্তশিল্পে যত কারিগর ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল মেয়ে কাটনী। বিভিন্ন হস্তশিল্পের মধ্যে তন্তবায়েরা ছিল প্রধান – শহরে ২৬৯২টা তাঁত (সারা জেলায় প্রায় ২৬,০০০); গালিচা বোনায় – শহরে ১২৮টা তাঁত (সারা জেলায় ২০৯টা); কম্বলের কারিগর – ৪৫ (৫৬৪); দরজি – ২৫৮ (৯০০); কুম্ভকার – ৩৫০ (২৯০০); সেকরা – ৫৮৩ (২২৮৩); ঘানি-মালিক – ৮৮১ (৫৪৬৬); ময়রা – ২৭০ (১৭০৫); চর্মকার আর মুচি – ৪৯৬ (৩৫৪৩); ইট-প্রস্তুত-কারক (সম্ভবত ইটখোলার মালিক) – ৪৭ (১৯২); রাজমিস্ত্রি – ৬০০ (৯৯০); মামুলি আসবাব আর কৃষি-সরঞ্জামের সূত্রধর – ৪৪১ (৬১২৮); কর্মকার – ২০৯ (১৭৩২); অস্ত্রনির্মাতা – ৩০ (১০৯)।

দেখা যাচ্ছে, জেলাটিতে পাটনা শহর কোন প্রধান হস্তশিল্পে উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল না – রাজমিস্ত্রিদের বেলায় ছাড়া (সারা জেলায় এদের সংখ্যাটাকে হয়ত কমিয়ে দেখান হয়েছে)। এটা ঠিক বটে সারা জেলা-সংক্রান্ত উপাত্তের মধ্যে রয়েছে একটি সর্বভারতীয় তীর্থক্ষেত্র গয়া শহরের কারিগরেরাও, কিন্তু পাটনার আর গয়া শহরের (এই শহর সম্বন্ধে পৃথক কোন উপাত্ত নেই) কারিগরদের সংখ্যাটাকে যোগ করলেও দেখা যায় কারিগরদের সংখ্যা শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলেই বেশি। শুধু বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের অল্পকিছু বিশেষিত শাখা ছিল পাটনার এক-

চেটে। এখানে বলা দরকার, পাটনার চৌহদ্দির ভিতরে ব্যাপক পরিসরে কোন শিল্পোৎপাদন হত না। তাই বেশ বোঝাই যায়, এই জেলার মোট ৩৬টা চিনি জ্বাল দেবার প্রতিষ্ঠান আর ৭টা নীলকুঠির সবগুলোই ছিল শহরের বাইরে। এই জেলার মোট ৬৪টা কাগজ প্রস্তুত করার কর্মশালার মাত্র ৩টে, আর ৪৮১টা ভাটিখানার মধ্যে মাত্র ২২টা ছিল পাটনা শহরের ভিতরে।

পাটনা শহরে জনসমষ্টির অনুৎপাদী অংশগুলো ছিল সংখ্যাগুরু; সারা জেলার মোট কারিগরদের অপেক্ষাকৃত কম অংশই (তৃতীয়াংশের কম) ছিল এই শহরে; হস্তশিল্পজাত জিনিসপত্র বেশি ব্যবহার করত এই শহরের মানুষ – তাই পণ্যের ঘাটতি ছিল এখানে। ৬৫ লক্ষ টাকার জিনিস এই শহরে যেত বার থেকে, আর ৩২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার জিনিস এখান থেকে চালান দেওয়া হত, এইসব মালের একাংশের নিশ্চয়ই শুধু চলাচলের পথ ছিল পাটনা। গয়া এলাকারও ছিল বাণিজ্যিক ঘাটতি (আগম ১,১১,৫০০, চালান ২৯,০০০, ঘাটতি ৮২,৫০০ টাকার), তবে প্রতি-বছর ১ লক্ষ তীর্থযাত্রী আর তাদের সঙ্গীরা এখানে দামী-দামী নৈবেদ্য আর দান নিয়ে যেত, আর তাছাড়া খরচ করত প্রচুর টাকা।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিহার আর বাংলার শিল্পোৎপাদন সম্বন্ধে, সামাজিক শ্রমবিভাগে স্থান আর সামাজিক গঠন সম্বন্ধে তথ্যাদি দেওয়া হল। আমি মনে করি এইসব তথ্য আগ্রহজনক হবার একটা বাড়তি কারণ এই যে, এগুলো যে-আমল সম্বন্ধে তখনও অবধি উল্লিখিত সম্পর্ক অনেকাংশে এমনটা ছিল যা এইসব অঞ্চলে অতীত মোগল আমলে ছিল সাধারণ-প্রচলিত। তার সঙ্গে সঙ্গে, বৃটিশ ব্যাপারিক পুঁজির অর্ধ-শতকের রাজনীতিক আধিপত্যের পর প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক আকারের সামাজিক আর আর্থনীতিক জীবনের সুস্থিতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতে সেগুলো সহায়ক।

প্রথমেই যা চোখে পড়ে সেটা এই যে, বৃটিশ পুঁজি ছিল বিজাতীয়, সেটা জড়িত হয় নি ভারতের উৎপাদন-সম্পর্কতন্ত্রের সঙ্গে। ভূমিতে চূড়ান্ত মালিকানা কায়েম ক'রে ঐ পুঁজি শুধু ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই নিজের কোন-কোন প্রতিনিধিদের বসিয়েছিল এমন জমিদার হিসেবে যার স্বত্ব ছিল বড় ভারতীয় জমিদারি কিংবা বৃটিশ ব্যক্তিগত-সম্পত্তি ধরনের।

এটা নয় বিজেতাদের সুবিবেচক হবার ব্যাপার, – ভূমি হস্তগত করতে কানুনী কূটতর্কের শরণও তাদের নিতে হয় নি কোন-কোন ক্ষেত্রে, কেননা বাংলা আর বিহারের বহ‍ু জমিদার ছিল হয় তাদের সামরিক প্রতিপক্ষ, কিংবা তারা ভূমি-রাজস্ব দেয় নি বশংবদ হয়ে। বৃটিশ ব্যক্তি-গত ভূমি-মালিকানা নগণ্য হবার প্রধান-প্রধান কারণ তো মনে হয় এই: ভারতে ভূমি আর ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে ছিল অঙ্গাঙ্গিভাব; কৃষক আর ভূমি-মালিকদের বিভিন্ন অংশের সোপানতন্ত্রটা ভারতীয় সমাজের বর্ণগত আর সম্প্রদায়গত পিরামিডের উপর চেপে বসে সেটার সঙ্গে মিলে গড়ে উঠেছিল একক কার্মিক ব্যবস্থা।

আগেকার বিজেতারা জাতি হিসেবে আর ধর্ম-সম্প্রদায়ের দিক থেকে বিজাতীয় হলেও ভারতের সামাজিক আর ভূমি সম্পর্ক ব্যবস্থার মধ্যে তাদের ঢুকে পড়ার পথে সেটা বাধা হয় নি। বাংলা কিংবা বিহারের হিন্দু অঞ্চলগুলিতে জমিদারের সমস্ত কাজকর্মই (ব্রাহ্মণদের পৈতা কিনে দেওয়া সমেত) যথারীতি করত তুর্কী কিংবা আফগান বংশের মুসল-মানরা। উত্তর ভারতে মুসলিম-প্রধান এলাকাগুলিতে বড়-বড় হিন্দু কিংবা শিখ জমিদার ছিল (গ্রামাঞ্চলের উপর-স্তর আর কৃষিজীবীদের গঠন অনুসারে প্রধানত), সে-বিষয়ে বিস্তর তথ্য আছে আকর-দলিলগুলিতে। এটা ঠিক যে, অন্য ধর্ম আর জাতির মানুষের উপর-স্তরগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের ছুতো হত ঐ অসামঞ্জস্যটা অনেক সময়ে, তবে স্থানীয় মানুষের উপর-স্তরগুলি তাদের অবস্থান দখল করে নিলে তাতে কার্যত বোঝাত শুধু ব্যক্তিগত আর বর্গীয় প্রতিনিধিত্বের বদল।

পরিস্থিতিটা হয়েছিল একেবারেই ভিন্ন যখন জমিদার হল ইংরেজ, যে কিনা উচ্চতর, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের মানুষ, বুর্জোয়াদের একজন – ঐতিহাসিক না হলেও সামাজিক বিচারে এই সমাজের উচ্চতর পর্যায়ের সন্তান – যে-সম্বন্ধে তখনও জ্ঞাত ছিল না ভারতীয় সমাজ। কোন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন বুর্জোয়া ইংরেজ অবশ্য 'ঐতিহাসিক অতীতের মাঝে সরে গিয়ে' সামন্ততান্ত্রিক জমিদারের কাজকর্ম চালাতে পারত আনুষ্ঠানিক-ভাবে। কিন্তু মেহনতী মানুষের সঙ্গে তো দূরের কথা, জমিদারির কর্মচারী-দের সঙ্গেও তার চিরাগত ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারত না ঐ সম্পর্কটাকে কার্যক্ষেত্রে প্রহসন এবং আকারের দিক থেকে ভুয়ো ঠাটে পরিণত করে ছাড়া। তাই ইংরেজরা ভারতের ভূমি-সম্পর্ক ক্ষেত্রে ব্যক্তি-

গতভাবে ঢুকল না। উনিশ শতকের শেষ পাদে ইংরেজরা হিমালয়ের পাদদেশে চা-বাগানের জন্যে যেসব জমি পেয়েছিল সেগুলো ছিল এমনসব অঞ্চলে যা ছিল সামাজিক বিচারে অহল্যা, আর সেগুলো জড়িত ছিল না ভারতের ভূমি-সম্পর্কের পরিণত ব্যবস্থার সঙ্গে।

যেকোন ভূমিকায় হোক, ইংরেজরা ছিল ভিন্ন ধরনের আইনগত ধারণা আর ভিন্ন বৈধ ব্যবস্থার বাহন। কোন ইংরেজ প্রশাসক ভারতীয় বিধি-বিধান নিয়ে যতই অধ্যয়ন করুক, সে ঐতিহ্যের রক্ষকে পরিণত হতে পারত না স্থানীয় বাসিন্দাদের দৃষ্টিতে। কিন্তু সেটা ছিল এমন সমাজ যেখানে উৎপাদন-সম্পর্ক এবং তদনুযায়ী উৎপাদন-প্রণালী এমন অবস্থায় ছিল যাতে – মার্কস যা বলেছেন – 'একটা প্রধান ভূমিকা থাকে ঐতিহ্যের। এটাও স্পষ্ট যে, যেমন বরাবর তেমনি এক্ষেত্রে, বিদ্যমান ব্যবস্থাটাকে আইন হিসেবে বলবৎ করা এবং প্রচলন আর ঐতিহ্য অনু-সারে নির্দিষ্ট সেটার চৌহদ্দিটাকে আইনত প্রতিষ্ঠা করাটা সমাজের শাসক অংশের স্বার্থের অনুযায়ী। আর সবকিছু ছেড়ে দিলে এটা আপনা থেকেই ঘটে যেই বিদ্যমান ব্যবস্থার ভিত্তি এবং মৌলিক সম্পর্কতন্ত্রের নিরন্তর পুনরুৎপাদন কালক্রমে নিয়মিত এবং সুশৃঙ্খল আকার ধারণ করে। যেকোন উৎপাদন-প্রণালীর সামাজিক সুস্থিতি এবং স্রেফ আপ-তিকতা আর আকস্মিকতা থেকে মুক্তি পেতে হলে এমন নিয়মন আর শৃঙ্খলা সেটার পক্ষে অপরিহার্য।'*

দেখা যায়, নতুন, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী ভারতে চালু করার সুযোগ ছিল না বৃটিশ ব্যাপারিক পুঁজির, এই পুঁজি তা করতে কখনও মনস্থ করে নি, আর এই উৎপাদন-প্রণালী মজবুত করার জন্যে আবশ্যক নিয়মন আর শৃঙ্খলা বলবৎ করার সামর্থ্যও সেটার ছিল না। তাছাড়া, বিজিত দেশটিতে প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের যে বিদ্যমান ব্যবস্থাটা সামনে পড়েছিল সেটার দৃঢ় সামাজিক আকারের মোকাবিলা করতে হয়েছিল ঐ পুঁজির প্রশাসনিক, আইনগত আর রাজনীতিক কর্মযন্ত্রটাকে। 'বৃটিশ উপনিবেশবাদ সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক (বা অবশেষগুলো) জিইয়ে রাখে' এই মর্মে আমাদের পুরান বক্তব্যটা তাই একদিক থেকে বেঠিক, সেটা এই যে, বৃটিশ শাসনের যে-ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতপক্ষে একরকমের

অনুযায়িতার শামিল, যার উপর বলপ্রয়োগ করা হল তার সঙ্গে বলপ্রয়োগকারীর মানিয়ে নেবার ব্যাপার সেটাতে সক্রিয়তা আর সচেতন ভাব আরোপ করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, মোগল সাম্রাজ্যের মতো প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের সামাজিক সংহতির মাঝে দৃঢ়সংলগ্ন নিয়মন আর শৃঙ্খলাতেই বোঝায় বৃটিশ বিজয়ের আকস্মিকতা থেকে চিরাগত ভারতীয় সমাজের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য। এই সমাজের উপর-কাঠামের উঁচু স্তরটাকে এবং খাজনা-কর আত্মসাৎ করার অধিকার হস্তগত করার পরে বৃটিশ ব্যাপারিক পুঁজি তলস্থ সামাজিক-আর্থনীতিক সম্পর্কতন্ত্রের বাধা অতিক্রম করতে এবং ঐ সম্পর্কতন্ত্রের সুনিয়মিত, সুস্থিত আর প্রণালীবদ্ধ প্রকৃতিটাকে নষ্ট করতে অপারক হল।

মার্কসের ধ্যান-ধারণা অনুসারেই বিচার-বিবেচনা করা চাই নিম্নোক্ত তথ্যটাকেও: ভারতের অভ্যন্তরীণ দ্রব্য-বিনিময় ক্ষেত্রে বা – অপেক্ষাকৃত মৌলিক কারণিক ধারণামৌল দিয়ে যা বোঝায় – সামাজিক শ্রমবিভাগ ব্যবস্থাক্ষেত্রে বৃটিশ ব্যাপারিক পুঁজির অনুপ্রবেশের পরিধি ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। ভূমি-ব্যবস্থার মতো ঐ ব্যবস্থাটাও আধিপত্য আর অধীনতার ব্যক্তিগত সম্পর্ক দিয়ে মজবুত-করা এবং নিয়মিত ছিল বলে সেখানে অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আসে কোন-কোন স্পষ্ট-নির্দিষ্ট ক্রিয়াকর্ম আর কর্তব্য। কর-ইজারাদার ব্যাঙ্কার, মধ্য-স্তরের শস্যের ব্যাপারী পাওনাদার আর গ্রামাঞ্চলে পাইকারী হারে শস্য-ক্রেতা খুদে মহাজন মিলে ছিল একটার উপর একটা অবস্থিত কার্মিক ত্রয়ী শুধু তাই নয়, অধিকন্তু সেটা ছিল সামাজিক সম্পর্কতন্ত্রের একটা অঙ্গ, তাতে প্রত্যেকে অবস্থিত ছিল সোপানতন্ত্রের নিজ ধাপে। ভারতে ব্যাপারিক পুঁজির পৃথক-পৃথক অঙ্গ-উপাদানগুলোর ঊর্ধ্বাধ আর ধাপে-ধাপে এই দ্বিবিধ অধীনতার ফলে সামাজিক, ভাবাদর্শগত আর আর্থনীতিক সম্পর্ক আর কৃত্যের সমানই অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ দেখা দিয়েছিল, যেমনটা ঘটেছিল ব্যক্তিগত আর ভূমি-সংক্রান্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে (দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণ করা যেতে পারে জনৈক জৈন্ ব্যাঙ্কারের সারা জীবনের কর্মপ্রচেষ্টার চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে মন্দির স্থাপনের কথা)।

এখানে আরও বলতে চাইছি এই কথাটা: ব্যক্তিগত আর ভূমি-সংক্রান্ত সম্পর্কক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ বলতে বৃটিশ ব্যাপারিক পুঁজির প্রতি-

নিধিদের পক্ষে যখন বোঝাত উৎপীড়িত সমাজের বিশেষ-সুবিধাভোগী অংশগুলোর সঙ্গে সংযুক্তি, তাহলে ব্যাপারিক আর মহাজনী সম্প্রদায়টিতে প্রণালীবদ্ধ অনুপ্রবেশের ফলে দেখা দিত এমন সামাজিক প্রতিষ্ঠা যেটা কর্তৃত্বশালী জাতিটির বণিক আর উদ্যোগী বুর্জোয়াদের বহুকাল আগে অর্জিত প্রতিষ্ঠার চেয়ে অনেকটা নিচু পর্যায়ের। অর্থাৎ কিনা, যা প্রয়োজন হত সেটা অধীন-করা জাতির সামাজিক কাঠামে অনুপ্রবেশই শুধু নয়, অধিকন্তু সেই কাঠামের চৌহদ্দির ভিতরে এমন স্থান পাওয়া যেটা খুবই সম্মানজনক হবার ধারে-কাছেও না, তার মানে জমিওয়ালার কাছ থেকে হস্তান্তরিত উৎপাদ নিয়ে অভ্যান্তরীণ দ্রব্য-বিনিময় থেকে টাকা করার অধিকার বাবত জাতিগত আর সামাজিক দ্বিবিধ মূল্য দেবার ব্যাপার।

উপসংহারে হাজির করছি প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কতন্ত্র সম্বন্ধে মার্কসের পর্ববিভক্ত সূত্রের প্রধান উপাদানগুলি: ঐতিহ্যের প্রাধান্যশালী ভূমিকা – ন্যায়সম্মত করে তোলা সীমাবদ্ধতা (অর্থাৎ বণ্টনের নিয়ামক) – উৎপাদন-প্রণালীর বিভিন্ন অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিদ্যমান ব্যবস্থা, নিয়মন আর শৃঙ্খলার ভিত্তিটার নিরন্তর পুনরুৎপাদন – এটার সামাজিক সুস্থিতি এবং নিছক আপতিকতা আর আকস্মিকতা থেকে স্বাধীনতা। এখানে পাওয়া যাচ্ছে পরস্পরক্রিয়ার গোটা কর্ম-বন্দেজটা, আর বিশেষত সেটার কেন্দ্রী উপাদানটা, যেটাকে সাধারণত তুচ্ছ করা হয়, সেটা হল উৎপাদন-প্রণালীর আবশ্যক দিক হিসেবে নিয়মন আর শৃঙ্খলা। এই উপাদানটায় অনুপ্রবেশ ঘটলে, এটা বিনষ্ট বিকৃত কিংবা রূপান্তরিত হলে, শুধু তার ফলেই সমগ্র শ্রেণী পরম্পরা ভেঙে পড়তে পারত, কিংবা ঘটতে পারত সেটার মৌলিক পরিবর্তন।

আগেই দেখা গেছে চিরাগত ভারতীয় আকারের সামাজিক নিয়মন ক্ষেত্রে এবং উৎপাদন, বণ্টন আর পরিচলন ক্ষেত্রগুলিতে সেটা করতে ব্রিটিশ পুঁজি অপারক হয়েছিল কী পরিমাণে। কিন্তু এটা প্রযোজ্য ছিল পশ্চাৎপ্রদেশ প্রসঙ্গে, যেখানে ছিল প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর প্রবল ব্যবস্থা। তবে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে উৎপাদন-সম্পর্ক ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ে, পুঁজিতন্ত্রের পৃথক-পৃথক ছিটক্ষেত্র পুঁতে দিয়ে এবং নতুন, বুর্জোয়া সম্পর্ক চালু করে ব্রিটিশ পুঁজি 'বিদ্যমান ব্যবস্থার ভিত্তির নিরন্তর পুনরুৎপাদনের' উপর হামলা শুরু করতে পারত। এটা যদি ঘটত তাহলে

পুঁজিতন্ত্রের ছিটক্ষেত্রগুলো হয়ে উঠতে পারত এমন প্রারম্ভিক কেন্দ্র যা প্রথমে সন্নিহিত এবং পরে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী এলাকাগুলোকে আকৃষ্ট করতে পারত পুঁজিতন্ত্রের ক্ষেত্রে। কার্যক্ষেত্রে সেটা ঘটেছিল কী পরি-মাণে? এর উত্তর পেতে হলে বৃটিশ ব্যাপারিক পুঁজি এবং ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির ব্যাপারী আর কারিগরদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে দেখা দরকার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৃটিশ ব্যাপারিক পুঁজি এবং ভারতীয় বাণিজ্য আর হস্তশিল্প

এই বিষয়টা নিয়ে বিবেচনা করতে গিয়ে, যেসব সমাজের মধ্যে মধ্যস্থ হিসেবে ব্যাপারিক পুঁজি কাজ চালায় সেগুলির সামাজিক-আর্থনী-তিক মাত্রা সম্বন্ধে এই পুঁজির উল্লিখিত নির্বিকার ভাবটার কথা ছাড়াও মনে রাখা দরকার বৃটিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাজ-কারবারে সেটার মধ্যস্থতার কোন-কোন বিশেষত্বের কথা।

ভারতে কোম্পানির বাণিজ্য প্রসঙ্গে

বৃটিশ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় বাজারে ভারতীয় মাল আমদানি করার একাধিকার ছিল বৃটিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির, এটাকে কাজে লাগিয়ে ভারতে আর ইউরোপে এইসব মালের দামের মধ্যে পার্থক্য থেকে টাকা করাই ছিল ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে আঠার শতকের শেষ অবধি কোম্পানির প্রধান লক্ষ্য। কাস্টমসের নথিপত্র থেকে দেখা যায় সতর শতকে বৃটেন ভারত থেকে আমদানি করত ওষুধ, শোরা, রেশমী কাপড় আর সুতো, হীরক, মশলা, ছিটকাপড়, নীল, চামড়া, কৌটা, চীনা জিনিস-পত্র, পশম, দস্তানা, মসলিন, পারসী রেশম। ভারতীয় জিনিসপত্র ছিল আদবকায়দা-দোরস্ত, আর সেটা বেশ সুস্থিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সতর শতকের শেষের দিককার একটা আলোচনার মধ্যে বলা হয়েছিল যে, 'ভারতীয় জিনিস পরে ছাড়া খুশি হত না কেউই – অতি বড় ফুলবাবু থেকে রান্নাঘরের ঝি অবধি'।

ভারতীয় কাপড়-চোপড় কত আদবকায়দা-দোরস্ত হয়ে উঠেছিল

সেটা দেখা যায় আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়কার একজন ইংরেজ লেখকের এই বর্ণনাটায়: 'ঈস্ট ইণ্ডিয়ার জিনিসপত্রের জন্যে লোকের ব্যাপক শখ এতই যাতে ছিটকাপড় আর ছাপা ক্যালিকো, যা আগে ব্যবহৃত হত গালিচা, লেপ-তোশক, ইত্যাদির জন্যে আর বাচ্চা-দের এবং সাধারণ মানুষের কাপড়-চোপড়ের জন্যে সেগুলো এখন হয়ে উঠেছে আমাদের মহিলাদের পোশাক; আর ফ্যাশনের জোর এতই যাতে দেখা যাচ্ছে আমাদের মর্যাদাশালী ব্যক্তিরা যে-ভারতীয় ফরাশ দিয়ে তৈরি পোশাক পরছেন সেটাকে তাঁদের পরিচারিকারা মাত্র অল্প কয়েক বছর আগেও তাদের পক্ষে বড্ড বেশি মামুলি বলে মনে করত; ছিটকাপড় তাদের মেজে থেকে উঠে গিয়ে লাগল তাদের পিঠে, ঘোড়ার পিঠ থেকে গিয়ে হল তাদের সায়া।'*

কিন্তু সেটার পালটা ধারা হিসেবে ভারতে কোন চাহিদা গড়ে উঠছিল না বৃটিশ মালপত্রের জন্যে। তাই, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যদি বৃটেনে ভারতীয় জিনিস বেচার কাজই শুধু করত তাহলে তার ফলে ভারতীয় কারিগর আর ইংরেজ ব্যবহারকের ঘাড় ভেঙে কোম্পানির অংশীদার-দের বাড়-বাড়ন্তই হত শুধু, আর আমদানি-করা ভারতীয় মালের প্রতি-যোগিতার দরুন জোর ঘা পড়ত ইংরেজ শিল্প-মালিকদের উপর। কিন্তু তা হয় নি। বণিকতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের উল্লিখিত আলোচনায় কোম্পানির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাবই অবলম্বন করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে এটা স্বীকার করা হয়েছিল যে, ভারত থেকে যত মূল্যের মাল যেত তার অর্ধেকটা বৃটেন থেকে আবার রপ্তানি করা হত ইউরোপের মূল-ভূমির বাজারগুলোতে।**

টমাস ম্যান-এর লেখা 'England's Treasure by Foreign Trade' ('বহির্বা-ণিজ্য থেকে ইংলণ্ডের সম্পদ') বই থেকে কোন-কোন অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে বি. এন. গাঙ্গুলীর একটি রচনায়। তিনি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের ফলাফলের মূল্যায়ন করেন বণিকতান্ত্রিক তত্ত্ব অনুসারে। যেমন, তিনি বলেন, বিলাসদ্রব্য কেনার জন্যে যে-পরিমাণ রুপো বৃটেন থেকে বেরিয়ে

চলে যেত প্রাচ্যে সেই ক্ষতি পূরণ করে আরও বেশি রুপো ইউরোপের মূলভূমি থেকে বৃটেনে যেত সেইসব জিনিস সেখানে বিক্রি হবার ফলে। তিনি আরও বলেন, কোম্পানি একবার ভারত থেকে ৮ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের মাল কিনে সেটা ইউরোপে বিক্রি করেছিল ৪০ লক্ষ পাউণ্ড দামে। এই ক্ষেত্রে মালটার পঞ্চমাংশ ইংলণ্ডের বাইরে বিক্রি করেই আগে চালান-দেওয়া কারেন্সি তুলে আনা গিয়েছিল। এইরকমের কাজ-কারবারই চালাত কোম্পানি, যার মূলধন ছিল মাত্র ৪ লক্ষ পাউণ্ড। এইভাবে, বৃটেনের বাণিজ্যিক-স্থিতিটাকে লাভজনক করে বজায় রাখার বণিকতান্ত্রিক নীতি বলবৎ রাখাটা নির্ভর করত প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যে লাভের চড়া হারের উপর।*

ওয়ারেন হেস্টিংসের মত ছিল এই: ইংলণ্ডকে 'ইউরোপের অন্যান্য সমস্ত দেশকে ভারতের বিভিন্নজাত দ্রব্য আর শিল্প-উৎপাদ সরবরাহ করার বড়বাজার' করে তোলার জন্যে কোম্পানির একচেটে আবশ্যক ছিল।** মার্কস বলেছেন, বৃটেনে যারা ভারতীয় পণ্যদ্রব্য নিয়ে মজুত্-দারি কিংবা চোরাকারবার করত তাদের মোটা টাকা জরিমানা হবার ফলে এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় যাতে 'আঠার শতকের বেশির ভাগ সময়ে ভারতীয় দ্রব্য-সামগ্রী সে-দেশে আমদানি করা হত সাধারণত শুধু ইউরোপের মূলভূমিতে বিক্রির জন্যে, আর বৃটিশ বাজারে ঢুকতে দেওয়া হত না ঐসব জিনিস।*** এইভাবে, আঠার শতকের 'বেশির ভাগ' সময়ে (কিন্তু গোটা শতাব্দীতে নয়) ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে কোম্পানির একাধিকারটা ছিল ভারতীয় কারিগরদেরই শুধু নয়, ইউরোপেরও ঘাড় ভেঙে ইংরেজ বুর্জোয়াদের বাড়-বাড়ন্তের একটা উপায়। ১৭৮৫ সালের জুলাই থেকে ১৭৮৬ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ঠিক এক-বছরে শুধু কোপেনহেগেনেই বিক্রি হয়েছিল ৯ লক্ষ থান ভারতীয় প্রধানত বাংলার কাপড়।****

ভারতে ইউরোপীয় মালপত্র বিক্রিতে দুষ্করতার একটা কারণ ছিল 'দাম-বিপ্লব': '১৭২৯ সালে প্রকাশিত একটা রচনায়... টমাস প্রায়ার বল্লেন, সোনা আর রুপো ইউরোপের চেয়ে প্রাচ্যে বেশি দুষ্প্রাপ্য ছিল বলে মজুরি আর পণ্যের দাম সেখানে স্বদেশের চেয়ে কম হবার কথা'... এই কারণেই 'আমরা সেখানে শিল্পজাত জিনিসপত্র রপ্তানি করি খুবই কম, কিন্তু তাদের পণ্য কেনার জন্যে আমরা সেখানে মুদ্রা পাঠাতে বাধ্য হই।'*

ইংরেজ শিল্পপতিদের মাল বিক্রি ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াবার জন্যে তাদের যাবতীয় চেষ্টা উনিশ শতকের গোড়া অবধি বৃথাই যায়। কোম্পানি এবং ভারতীয় মালের প্রতিযোগিতা যাদের বিঁধছিল সেই ইংরেজ শিল্পপতিদের মধ্যে আগেকার ঠোকাঠুকি আরও বেড়ে যাচ্ছিল ঐ শিল্পপতিদের এই অভিযোগের ফলে – বাণিজ্যে কোম্পানির একাধিকারের দরুন ভারতীয় বাজারে তাদের জিনিসের বিক্রি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে কোম্পানির একাধিকারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে আমার মনে হয় না, কেননা রপ্তানি বাড়াবার জন্যে বিনিময়স্থিতি অপেক্ষাকৃত অনুকূল করায় কোম্পানির ব্যবস্থাপন কর্তৃপক্ষেরই সুবিধা ছিল। 'সামরিক গুরুত্বপূর্ণ মালপত্রের' উপর কোন-কোন বাধানিষেধ (যেমন বৈরকার মহারাষ্ট্রে ইস্পাত পাঠাবার উপর রোখ) ছিল ব্যতিক্রম।

কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী ১৭৯৩ সালে একটা বিশেষ কমিটি পর্যন্ত বসিয়েছিল পশম-বোনা মিলগুলোর মালিকদের অভিযোগ খণ্ডন করার জন্যে – এই মালিকেরা বলেছিল কোম্পানির একাধিকারের দরুন তাদের মাল বিক্রি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছিল। ঐ কমিটি বলেছিল ভারতে তৈরি রেশমী আর সুতী জিনিসপত্র ছিল আরও সরেস এবং সস্তা। পশমী কাপড়-চোপড়ের দাম কমালেও ভারতে সেগুলোর ব্যবহার বাড়ত না, কেননা বহু বদলী ছিল যেগুলো সেখানকার জলবায়ুর পক্ষে বেশি উপযোগী এবং দেশটির মানুষের রীত-রেওয়াজ আর রুচির পক্ষে বেশি অনুযায়ী। কমিটি আরও বলেছিল ভারতে বৃটিশ মালের কাটতি বাড়ান

অসম্ভব, কেননা সেখানে ছিল খুবই সরেস কাঁচামাল এবং অসংখ্য পরিশ্রমী আর দক্ষ কারিগর যারা বৃটেনে যা দেওয়া হত তার পঞ্চমাংশ মজুরিতে খাটত। তাছাড়া, ভারতীয়দের জামা-কাপড় বর্ণ কিংবা সম্প্রদায়ের নিয়ম-বিধি অনুসারে ছিল এতই সাদাসিধে আর কম পরিবর্তনীয় যাতে সেগুলি কোন বিশেষ ফ্যাশনের ধার ধারত না।*

১৮১৩ সালে লর্ড-সভার একটা কমিটিতে সাক্ষ্য দেবার সময়ে কোম্পানির একজন কর্মচারী (যিনি প্রায় ১৮ বছর কাজ করেছিলেন গুজরাটে আর বোম্বাইয়ে) বলেছিলেন, স্থানীয় মানুষের মধ্যে ইউরোপীয় জিনিসপত্রের জন্যে চাহিদার কোন বৃদ্ধি তিনি লক্ষ্য করেন নি। ব্যতিক্রম ছিল পার্শীরা। তারা বৃটিশ জামা-কাপড় ব্যবহার করত, আর বোম্বাইয়ের জনসমষ্টির কোন-কোন ক্ষুদ্র অংশ। ভারতীয়রা মোটের উপর বৃটিশ আদবকায়দা এড়িয়ে চলছিল, যাতে বসতে চেয়ার দেওয়া হত শুধু সেইসব বাড়িতে যেখানে ইংরেজরা যেত।** অন্যান্য সাক্ষ্যেও বলা হয়েছিল ম্যাঞ্চেস্টারের জিনিসপত্র ভারতে বিক্রি হত স্থানীয় দামের চেয়ে কমে তার কারণ ঐসব জিনিস ভারতীয়রা পছন্দ করত না।*** বৃটেনে প্রযুক্তিগত পুনর্গঠন ঘটলে অবস্থাটা বদলাবে বলে মত প্রকাশ করা হয়।****

তার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সাক্ষীরা বলেছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক নাগাদ বৃটিশ ইস্পাত ভারতীয় ইস্পাতের চেয়ে সরেস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে এটাও তারা স্বীকার করেছিল যে, সামান্য কিছুকাল আগে অবধিও ভারতীয় ইস্পাতের চেয়ে সরেস ছিল শুধু সুইডেনের ইস্পাত। ইস্পাত দিয়ে তৈরি জিনিসপত্রের বেলায় – তখনও বেশি সরেস ছিল ভারতের তরোয়াল আর বৃটেনের ছুরি-কাঁচি। তবে অন্তর্দেশীয় অঞ্চল-

---

গুলিতে সবসময়ে চাহিদা ছিল শুধু ব্রিটিশ আগ্নেয়াস্ত্রের জন্যে, আর সেটা শুধু যেসব রাজ-রাজড়া ইউরোপীয় ধারায় ফৌজ পুনঃসংগঠিত করতে মনস্থ করেছিল তাদের মধ্যে।*

ইউরোপীয় টেকসই জিনিসপত্রের জন্যে ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে চাহিদা গড়ে উঠছিল ক্রমে-ক্রমে। ১৮০৯ সালে কুড্ডাপা থেকে হায়দরাবাদ যাবার পথে বি. হেইন-এর দেখা হয়েছিল একজন স্থানীয় 'পলিগড়ের' সঙ্গে; হেইন তাঁর নিজের ঘড়িটা দেখিয়ে দাম (১০০ প্যাগোডা) বললে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। হেইন লিখেছেন: 'তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেন নি তাতে আমি নিশ্চিত, আর আমি সমানই নিশ্চিত যে, দেশটিতে কোন জমিদার পলিগড় কিংবা অন্য কোন হিন্দু যে নিজেকে জাহির করে রাজা বলে, এরা কেউই ইংলণ্ড যা তৈরি করতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে সেরা ঘড়ির জন্যে তার অর্ধেক দাম দিতে চাইবে না। বন্দুক, ঘড়ি, দূরবীন, ইত্যাদি উপহার পেতে তারা সবসময়েই বড় খুশি এবং উৎসুক, কিন্তু জিনিসটা বাবত তাতে যতটা সোনা কিংবা রুপো আছে সেটার যা দাম তার চেয়ে বেশি দেবার কথা তারা ভাববেও না কখনও। এদিক থেকে মুরম্যানরা (মুসলিমরা – **ভ.প.**) কিছুটা পৃথক, যদিও অনেকটা নয়।'**

ভারতে শিল্পকর্ম ধরনের জিনিসের দাম সেটা তৈরি করতে ব্যবহৃত দামী মালমশলার দামের কাছাকাছি হবার (যে-ব্যাপারটা দেখা যায় এখনও অবধি) অন্তত দুটো কারণ ছিল: এক, এর থেকে দেখা যায়, বহু দামী জিনিস তৈরি করতে কারিগরের যে-পরিমাণ শ্রম লাগত সেটা ছিল সস্তা-কাপড় চিনি কিংবা উদ্ভিজ্জ তেলের মতো জিনিসে যা লাগত অপেক্ষাকৃতভাবে ততই কম; দুই, এমনসব জিনিসের উপযোগ-মূল্যের ধর্ম ছিল এতই নিষ্ক্রিয় যাতে সেগুলো হাতে পাওয়াটা কার্মিক দিক থেকে ছিল প্রায় সম্পদ মজুদ করারই শামিল। তাছাড়া, সোনা রুপো কিংবা রত্ন দিয়ে পূজা-অর্চনার জিনিসের তো কথাই নেই, শিল্পকর্ম বস্তু তৈরি করা হলেও ঐসব মালমশলায় মজুদ-করার সম্পদের প্রকৃতি আরোপ করা হয়।

নিয়োজিত কারিগরী শ্রমের মূল্য ছিল অপেক্ষাকৃত কম, আর তার সঙ্গে বিভিন্ন টঙ্কনের ভারতীয় টাকা-মুদ্রায় ধাতু-বস্তু নির্ভরযোগ্য ছিল না, তাই সম্পদের সেই আকারটা মজবুত হয়ে ওঠে যেটাকে মার্কস বলেছেন 'সোনা আর রুপোর জিনিসপত্রের কান্তিগত আকার'।* অর্থাৎ কিনা, অন্যান্য এশীয় সমাজের মতো ভারতে শিল্পকর্মের 'কান্তিগত আকারে' সম্পদ মজুদ রাখাটা বেশি নির্ভরযোগ্য ছিল মুদ্রা-সংগ্রহ আকারের চেয়ে – মুদ্রা পূর্ণমূল্যের ছিল না, আর সেগুলোর মূল্য ছিল বিভিন্ন রকমের, তার উপর পূর্বোক্ত জিনিসগুলোকে সহজেই বেচে দেওয়া যেত অস্বস্তিকর অবস্থার প্রথম-প্রথম লক্ষণ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে। গহনাদির আকারে ইউরোপ থেকে ভারতে সম্পদ রপ্তানি সাধারণভাবে অসম্ভব ছিল, তার কারণ হল জিনিসগুলোর পৃথক-পৃথক কান্তিগত মান এবং আচারপালন সংক্রান্ত প্রয়োজন।

১৯ শতকের প্রথম দশক নাগাদ বৃটেনে এইসব উৎপাদনক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল যেগুলো ভারত চীন এবং অন্যান্য এশীয় দেশের সঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্যের জন্যে বিশেষভাবে উদ্দিষ্ট। এই বাণিজ্যের উপর যেকোন বাধা-নিষেধের আরোপ করা হলে সেটার সম্ভাব্য সামাজিক পরিণতি সম্বন্ধে রাজাকে সতর্ক করে দিতে চেয়ে ঈস্ট ইণ্ডিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যকারী সম্মিলিত বৃটিশ বণিক কোম্পানির সাধারণ বোর্ড সেটার ১৮১৩ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখের অভিভাষণে বলেছিল: 'ভারত আর চীনের সঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী করে গড়া প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োজিত হয়েছে; লণ্ডন নগরীর এবং লণ্ডন সেতু থেকে গ্রেভ্‌স্‌এণ্ড অবধি টেম্‌স নদীর দুই পারের বহু মানুষ বড়-বড় রকমের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে, – ভারত আর চীনের সঙ্গে লণ্ডন বন্দরের রপ্তানী বাণিজ্য চুক্তি চলতে থাকার উপর নির্ভর করছে তাদের অনেকের অস্তিত্বই; রপ্তানী বাণিজ্য সেটার অভ্যস্ত ধারা থেকে অপসারিত হলে প্রায় ১০ হাজার পরিশ্রমী কারিগর যে-অনুপাতে কর্মচ্যুত হবে সেই পরিমাণে তারা তাদের পরিবারগুলি সমেত ভিক্ষাবৃত্তি ধরার বিপদে পড়বে। তাই এই বোর্ড মনে করছে ভারত আর চীনের সঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্য এখন যেমন সেইভাবে চলতে থাকাটা

লণ্ডনের শিল্প-বাণিজ্য মহল আর লণ্ডন বন্দরের পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্ব-সম্পন্ন।'* এশিয়ার বাজারগুলো আর কোম্পানির নিজেরই চাহিদা মেটা-বার অনুযায়ী করে গড়া কোম্পানি-নিয়ন্ত্রিত শিল্পগুলোর কথাই স্পষ্টত বলা হয় এই দলিলে। এমনসব বিশাল বাজার নিরাপদ করা যেত না সেই আয়তনের উৎপাদন-যন্ত্র দিয়ে, তাও স্পষ্ট।

ভারতকে বৃটিশ শিল্পের কাঁচামালের একটা বড়রকমের উৎপাদকে পরিণত করার জন্যেও বৃথা চেষ্টা চলেছিল দীর্ঘকাল যাবৎ, যদিও – কোম্পানির দলিলপত্র থেকে দেখা যায় – সেটার ব্যবস্থাপন কর্তৃপক্ষ যথো-পযুক্ত চেষ্টা চালাচ্ছিল পূর্ণোদ্যমে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'পেঁজা তুলোর উৎপাদন সম্বন্ধে কোম্পানির রিপোর্টে' (১৮৩৬ সাল) বলা হয়েছিল, বৃটেনে শিল্পোৎপাদনের জন্যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া থেকে সরেস পেঁজা তুলোর যোগান নিশ্চিত করাটা গুরুত্বপূর্ণ; তাতে আরও বলা হয়েছিল যে, মোটা-মুটি আঠার শতকের শেষাশেষি নাগাদ এটা সাধারণ গরজের বিষয় হয়ে ওঠে। সুতো-কাটা আর কাপড়-বোনার হরেক রকমের সরঞ্জামের উদ্ভাবন এবং উৎকর্ষের ফলে, তেমনি ১৭৬৯ সালে আর্করাইটের সুতো-কাটা যন্ত্রের প্রথম ব্যবহার থেকে ১৭৮৫ সালে কারখানা-প্রণালী চালু হওয়া অবধি বিরঞ্জন আর ছিট-কাপড় ছাপানোর কৌশলের উন্নতির ফলেও কাঁচামালের জন্যে চাহিদা সমানে বেড়ে গিয়েছিল, তাই সেগুলোর বেড়ে-চলা যোগান নিশ্চিত করার উপায়ের সন্ধান চলে।**

কিন্তু ভারত থেকে তুলো আমদানির পথে একটা বাধা পড়ল সঙ্গে সঙ্গে, সেটা হল এই যে, এই তুলো যথেষ্ট সরেস এবং মাফিকসই ছিল না, তার কারণ ভারতের প্রায় সমস্ত রকমের তুলোরই আঁশ ছিল খাটো, আর তুলো ধোনা ভাল হত না। ভারতের সবচেয়ে সেরা তুলো জন্মাত বাংলার ছোট-ছোট এলাকায়, তার সবটাই ব্যবহৃত ঢাকার হস্তশিল্পে। সরেস তুলো জন্মাবার আর-একটা এলাকা – নাগপুর জেলা – রাস্তার

—

অভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল উনিশ শতকের সপ্তম দশক অবধি। বৃটেনে রপ্তানি হত শুধু ব্রোচ্ আর সুরাটের তুলো – এটা ছিল প্রযুক্তিগত মানের অনুযায়ী, আর এই তুলোর পরিবহণ চলত অনায়াসে। কিন্তু এটা দিয়ে বৃটিশ মিলগুলোর চাহিদা মিটত না: যেমন, ১৭৮৯ সালে বৃটেনের তুলো আমদানির ৬ শতাংশ মাত্র গিয়েছিল ভারত থেকে, আর বাদবাকিটা তুর্কী সাম্রাজ্য থেকে এবং অন্যান্য শক্তির বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে।*

ভারতে তুলোর উৎপাদন বাড়ানো এবং সেটাকে আরও সরেস করার জন্যে ইংরেজরা ১৭৮৮ থেকে ১৮০১ সালের মধ্যে যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল তার বিবরণ আছে ডাব্লিউ. সিলভারের বইয়ে। গোড়ার দিককার চেষ্টাগুলোর মধ্যে ছিল মরিশিয়েস আর মালটা থেকে বীজ নিয়ে সেটা ব্যবহার করা (১৭৯০), তুলো পরিষ্কার করার বিভিন্ন যন্ত্র স্থাপন করা (১৭৯৪), মালাবারে এম. ব্রাউন নামে এর
আবাদে তুলো জন্মানো (১৮০১)।** কিন্তু পরবর্তী বছরগুলিতে
শিল্পে তুলোর প্রধান যোগানদার হিসেবে দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল দ্রুত। যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলো আমদানি করাটা দুষ্কর ছিল বলে ভারত থেকে বৃটেনের তুলো আমদানি বেড়ে গিয়েছিল সবে ১৮১০ সালে: পরিমাণটিও দাঁড়িয়েছিল ২ কোটি ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড – সেটা ছিল বৃটেনের তুলো আমদানির এক-পঞ্চমাংশ। তখনও ভারতের তুলো ছিল ল্যাংকাশায়ারের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একটা গৌণ স্থানে, যখন ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্ক খারাপ হত তখন সেটা যথেষ্ট হত না। বৃটেনে ভারতীয় তুলোর চাহিদা খুব বেশি পরিমাণে ওঠা-নামা করত, সেটা প্রকাশ পেত ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যের পরিমাণে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হত তুলো-চাষীরা, তারা মোটামুটি লাভবান হত যখন বাজার পাবার অনুকূল সম্ভাবনা থাকত (যেমন, ১৮১০-এর রেকর্ড বছরে পরিচালকমণ্ডলী দাম কমাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিল), কিন্তু রপ্তানি কমলে ক্ষতির পুরো চোটটা পড়ত তাদের উপর। ভবিষ্য

সম্ভাবনার অনিশ্চয়তা নিয়ে অভিযোগ তুলত কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী পর্যন্ত।*

ভারত থেকে, প্রধানত বাংলা থেকে বৃটেনে কাঁচা রেশম রপ্তানি শুরু হয়েছিল অনেক আগেই, তবে আঠার শতকের মাঝামাঝি সময় অবধি সেটা ছিল যৎসামান্য। তারপর, কাঁচা রেশমের উৎপাদন বাড়াতে এবং ইতালীয় আর স্পেনীয় মাত্রায় মান উন্নীত করতে উৎসাহ যোগাবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ঐ শতকের সপ্তম আর অষ্টম দশকে। রেশম-গুটি প্রোসেসিংয়ের উন্নত প্রণালীতে রেশম পাকাবার কয়েকটা সংস্থা কোম্পানি স্থাপন করেছিল ঐ উদ্দেশ্যে। তার ফলে ভারতীয় কাঁচা রেশম ইউরোপের ঐ জিনিসটাকে হটিয়ে দিতে শুরু করেছিল আঠার শতকের শেষাশেষি নাগাদ।**

ভারতে, বিশেষত বাংলায় নীল উৎপাদন করার প্রসার ঘটেছিল উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হবার পরে। তবে ১৭৮৯ সালে বৃটেনে আমদানি-করা ১৯,৫৮,৫০০ পাউণ্ড নীলের ৮,৪৬,৫০০ পাউণ্ড গিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, আর ভারত থেকে মাত্র ৩,৭১,৫০০ পাউণ্ড। তার পরের বছরগুলিতে বাংলা থেকে নীল রপ্তানি দ্রুত বেড়ে পরিমাণটা ১৭৯৫ সালের মরসুমে দাঁড়িয়েছিল ৩০ লক্ষ পাউণ্ড।*** নীল রপ্তানি কারবারের বিশেষত্ব ছিল এই যে, সেটা ছিল বেসরকারী ইংরেজ কারবারিদের হাতে। এখানে শুধু বলা দরকার – এই ধরনের কৃষিগত কারবার গোড়া থেকেই প্রশাসনিক জবরদস্তি দিয়ে ভারাক্রান্ত ছিল, আর অধীন সমাজে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক চালু করার সঙ্গে সেটা কোন মিল ছিল না। সেটা স্বাভাবিকই, কেননা নীলের কারবারটা ছিল সেই একই ব্যাপারিক পুঁজির কাজ-কারবারের অনুবৃত্তি মাত্র।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কল-কারখানা আর অঞ্চলগুলিতে ভারতীয় বণিক আর কারিগরেরা

বৃটিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কল-কারখানাগুলোতে গড়ে উঠেছিল একটা বিশেষ ধরনের আর্থনীতিক আর সামাজিক স্থানীয় আবহাওয়া

তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোম্পানির গোড়ার দিককার ভারতীয় প্রজাদের সম্বন্ধে সেটার কর্তৃপক্ষের শুভ অভিপ্রায় নয়, গোড়ার দিকে ইংরেজদের দখল-করা এইসব রাজ্যক্ষেত্রে যে রাজনীতিক পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছিল সেটা বিবেচনায় রাখার প্রয়োজন অনুসারেই সেটা ঘটেছিল।

ইংরেজদের বিশেষ মজবুত ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্ক ছিল বোম্বাইয়ের হিন্দু বণিকদের সঙ্গে – এরা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পশ্চিম ভারতে কোম্পানির ব্যবসাবাণিজ্য-সংক্রান্ত আর রাজনীতিক শক্তঘাঁটি। ১৬৬৮ সালে ২য় চার্লস ছোট্ট বোম্বাই দ্বীপটি পেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী পোর্তুগীজ রাজকুমারী মারিয়া ব্রাগাঞ্জার যৌতুক হিসেবে, সেটাকে তিনি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দেন প্রতীকমাত্র ১০ পাউণ্ডে। প্রাপ্তিটা কোম্পানির পক্ষে হল খুবই সময়োপযোগী, কেননা সুরাটে প্রধান কারখানা সমেত গুজরাটে উপকূলবর্তী শহরগুলিতে কোম্পানির কারখানাগুলোকে বিপন্ন করছিল মারাঠারা, আর বোম্বাইয়ের বিচ্ছিন্ন অবস্থানের ফলে সেটার প্রতিরক্ষা ছিল সহজতর, আর সেখান থেকে মহারাষ্ট্রের নিকটবর্তী এলাকাগুলিতে হামলা চালানো যেত, তাতে পালটা মার খাবার কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হবার ভয় ছিল না। তাছাড়া, সেখানে ছিল চমৎকার পোতাশ্রয়। তাই ১৬৮৭ সালে কোম্পানির প্রধান কারখানা স্থানান্তরিত করা হয়েছিল সুরাট থেকে বোম্বাইয়ে – সেটা ছিল একটা অস্বাস্থ্যকর এলাকায়, তা সত্ত্বেও।

১৬৬৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সুরাট পরিষদ লিপিবদ্ধ করেছিল কোম্পানির এই অভিপ্রায়: 'মান্য কোম্পানির ইচ্ছা এই যে, বোম্বাইকে পারস্য, মক্কা এবং অন্যান্য জায়গার মধ্যে মাল আর লোক চলাচলের বন্দর করে তোলার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় আমরা যেন বের করি।'* বোম্বাইয়ে একটা জাহাজ-নির্মাণকেন্দ্র স্থাপনের ইচ্ছাও প্রকাশ করা হয় এই দলিলে, সেখানে 'দারুকাঠ, লোহা কারখানা, সূত্রধরের মালমশলা এবং আরও অনেক মালমশলা খুবই সস্তা, ইমারতগুলো (বোঝানো হয়েছে, জাহাজ – ভ. প.) ইংলণ্ডে যা তার চেয়ে ঢের বেশি মজবুত।' হিসেবী বণিকেরা আরও বলে, জাহাজ-নির্মাতাদের মাইনে বাবত খরচ-করা টাকা 'দ্বীপেই থেকে যাবে, আর লোকের কাছ থেকে বছর-বছর যেসব

কর আর খাজনা পাওয়া যায় সেটা দিতে তারা আরও বেশি সক্ষম হবে'।*

গুজরাটের বন্দরগুলির আগেকার গুরুত্ব খোয়া যেতে থাকে আঠার শতকে। শহরগুলির এবং আন্তর-গুজরাটের, সর্বোপরি আহ্‌মেদাবাদের অর্থনীতি নষ্ট হচ্ছিল বহির্বাণিজ্যের অবনতি আর সামন্ততান্ত্রিক বিশৃঙ্খলার দরুন। অসংখ্য চালান-শুল্ক আর সশস্ত্র হামলার ফলে বাণিজ্য-পথগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।** ১৭৮৯ সালে ফর্বেস বলেন, 'একসময়ে সবকিছু ছিল আহ্‌মেদাবাদের বাণিজ্যের অনুকূল, তখন আহ্‌মেদাবাদ ছিল বণিক কারিগর আর নানা দেশের পর্যটকদের সমাবেশস্থল, যেটা কিনা তখনকার অবহেলিত ভগ্নদশার বিপরীত'। ১৮১৭ সালে একজন ইংরেজ আমলা জানিয়েছিলেন আহ্‌মেদাবাদে তিনি দেখেন 'ধ্বংসের করুণ দৃশ্য'।*** স্থানীয় বণিকেরাও চলে যাচ্ছিল বোম্বাইয়ে। যেসব এলাকার সঙ্গে বোম্বাইয়ের বাণিজ্য চলত সেগুলি মারাঠাদের হাতে ছিল বলে এই বাণিজ্যে স্থানীয় বণিকদের দালালি-কমিশন হয়ে উঠেছিল একেবারেই অনিবার্য। তাই যারা বোম্বাইয়ে গিয়ে বসতি করছিল তাদের অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক শর্ত দিতে কোম্পানি বাধ্য হয়। এইভাবে, সতর শতকের শেষের দিকে কোম্পানি সুরাটের বেনিয়াদের বোম্বাইয়ে যেতে আহ্বান জানালে তারা কয়েকটা সুবিধা আদায় করে নিতে পেরেছিল।**** হিন্দু বেনিয়াদের পেছনে-পেছনে বোম্বাইয়ে চলে গিয়েছিল পার্শীরাও।

১৬৭৭ সালে ১৭ জুলাই লেখা চিঠিতে বোম্বাইয়ের দালালি-পাওয়া বণিকেরা সুরাটে তাদের সহযোগীদের অনুরোধ করেছিল রতনজী নামে একজন টঙ্ককককে খুঁজে বের করতে, যে-টঙ্কক 'একজন দক্ষ কারিগর, যে যথাযথ এবং সম-পরিমাণের সমস্ত মুদ্রা তৈরি করে খুবই উপকারক হবে; তারা লিখেছিল আগে যা স্থির করা হয়েছিল সেইভাবে তাকে যেন বোম্বাইয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যত শীঘ্র সম্ভব।***** লাওজী নাস্‌সার-

---

ভানজী ওয়াদিয়ার সুপরিচিত ধনী পরিবারের অন্যতম পূর্বপুরুষ কুবা-রজী কামা আঠার শতকের পঞ্চম দশকে অন্যান্যের সঙ্গে বোম্বাইয়ে গিয়ে সেখানে জাহাজ-নির্মাণ শিল্প স্থাপন করেছিলেন, তেমনি রুস্তমজী দোরাবজীও, এঁকে ইংরেজরা পরে বোম্বাইয়ের পেটেল পদে নিযুক্ত করে।* এস. এম. এডোয়ার্ডেসের নিম্নলিখিত কথাটা স্পষ্টতই ভুল: লাওজী ওয়াদিয়া 'দ্বীপটির (বোম্বাইয়ের) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ১৬৯২ সাল থেকে, তখন তিনি একদল কোলির (একটি মৎস্যজীবী সম্প্রদায় – ভ. প.) সঙ্গে মিলে সিদি-দের আক্রমণ প্রতিহত করতে আনুকূল্য করেন। এই সুকৃতির জন্যে সরকার তাঁকে বোম্বাইয়ের পেটেল পদে নিযুক্ত করে।'** ওয়াদিয়ার যা বয়স ছিল (তিনি মারা যান ১৭৭৪ সালে), আর যা ছিল তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা, তাতে ১৬৯২ সালে এমন অদ্ভুত-কর্ম হাসিল করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

যেসব পার্শী গুজরাট থেকে গিয়ে বসতি করেছিল তাদের ১৭৭৩ সালে একটা বিশেষ এলাকা দেওয়া হয়েছিল বোম্বাইয়ের কেন্দ্রস্থলে মালাবার পাহাড়ে।*** বোম্বাইয়ে তিন হাজার পার্শী ছিল ১৭৮০ সালে, আর গুজরাটে দুর্ভিক্ষ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে আরও বহু পার্শী বোম্বাইয়ে গিয়ে বসতি করেছিল তার পরে বছর-দশেকের মধ্যে ফর্বেস বলেন, আঠার শতকের অষ্টম আর নবম দশক নাগাদ বোম্বাইয়ে পার্শীরা ছিল বেশ বড় আয়তনের জমি-আর সুন্দর-সুন্দর বাড়ির মালিক। বাড়িগুলো হয় তারা নিজেরা করিয়েছিল, নইলে যেসব ইংরেজ দেশে চলে যায় তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল। প্রসঙ্গত বলি, ফর্বেস বলেছেন, পার্শীরা রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল, আর হিন্দু এবং মুসলিম বেনিয়াদের বড়ই বিশেষক বহু সম্প্রদায়গত কুসংস্কার তাদের ছিল না।****

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বোম্বাইয়ের বড়-বড় বণিকদের জাতি

আর সম্প্রদায়গত গঠন এখানে দেওয়া হচ্ছে। ১৮০৫ সালে বোম্বাইয়ে রেজিস্ট্রিভুক্ত ছিল – প্রধান-প্রধান ৯টা বেসরকারী ইউরোপীয় কারবার; ১৬টা পার্শী কারবার আর ২টা পার্শী-চীনা এজেন্সি; আর ১৫টা হিন্দু, ৪টে মুসলিম (বোহ্‌রা), ৩টে পোর্তুগীজ এবং ৪টে মার্কিন কারবার।* এইভাবে, বোম্বাইয়ের ৫৩টা কারবারের মধ্যে ৩৭টার মালিক ছিল ভারতীয়রা। তবে ভারতীয়দের সংখ্যাপ্রাধান্য থাকলেও রাজনীতিক ক্ষমতা আর উন্নততর সংগঠনের জোরে ইংরেজদের ব্যাপারিক পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করত ভারতীয়দের ব্যবসাবাণিজ্য ক্রিয়াকলাপ।

বোম্বাইয়ের বণিক আর ইংরেজদের মধ্যে সহযোগিতা চলত নানা ধরনে। আঠার শতকের গোড়ার দিকে কোম্পানি বোম্বাইয়ে বাণিজ্য করত সেটার নিজস্ব দালালদের মারফত। ১৭৩১ সালে বৃটেন থেকে একখানা জাহাজ পৌঁছবার একটু পরেই সেটা যত পশমী কাপড়, সীসা, তামা আর লোহা নিয়ে গিয়েছিল তার সবটাই কিনে ফেলেছিল কোম্পানির লালজী নামে দালাল, সেজন্যে কোম্পানি তাকে সম্মানের পুরষ্কার দিয়েছিল ৮০০ টাকা দামের একটা ঘোড়া।** মারাঠা আর মোগলদের মধ্যে যুদ্ধের সময়ে কোম্পানি সেটার কর্মচারীদের অন্তর্দেশীয় এলাকা-গুলিতে জিনিসপত্র বেচা নিষিদ্ধ ক'রে এইসব কাজ-কারবার দিয়েছিল বোম্বাইয়ের এবং অন্যান্য ভারতীয় বণিকদের হাতে।***

কিন্তু স্থানীয় বণিকদের মধ্যে সম্বন্ধ মজবুত হয়ে উঠতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ সুবিধাভোগী দালালেরা ইংরেজদের বাধা দিতে থাকে, তাই দালালিপ্রথা লোপ করা হয় ১৭৩৭ সালে। এই সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে বোম্বাই পরিষদ বলেছিল সেটার কর্মচারীরা কখনও পায় নি 'পূর্ণ বাণিজ্যের স্বাধীনতা... তাদের সবসময়ে বাধা দিয়েছে দালালদের ক্ষমতা স্বার্থ আর প্রভাব'। ঐ পরিষদ মনে করল সেটার 'বিনিয়োগ আরও ভালভাবে চালানো যেতে পারে সরাসরি বণিকদের সঙ্গে চুক্তি ক'রে।'****

বোম্বাইয়ের বহু বণিক পরে বিভিন্ন বৃটিশ কারবারে অংশীদার

হয়েছিল। একখানা দলিলে (১৮২৮) বলা হয় ‘প্রত্যেকটা ইউরোপীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে ছিল একজন পার্শী অংশীদার, সে-ই সাধারণত যোগাত বেশির ভাগ পুঁজি।’* মুখাপেক্ষী অবস্থার দরুন ভারতীয় বণিকেরা ইংরেজ অংশীদার যেটার প্রতিনিধি সেই ক্ষমতাটাকে নজরানা গোছের কিছু দিতে বাধ্য হত। বৃটিশ কারবারগুলো তাদের ভারতীয় সহযোগী-দের খিদমতটাকে মূল্যবান মনে করত সেটা দেখা যায় এই সুবিদিত ঘটনা থেকে: ফটকাবাজি করতে গিয়ে পার্শী হোর্মুজীর খোয়া গিয়েছিল ২ লক্ষ পাউণ্ড (খুবই সম্ভব অঙ্কটাকে অনেক বাড়িয়ে বলা হয়), তখন তাকে আবার দাঁড় করিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল চার্লস ফর্বেসের কারবার, এটার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ কারবারী সম্পর্ক ছিল।**

বোম্বাইয়ের গ্যারিসন আর নৌবহরে রসদাদি যোগাত বোম্বাইয়ের বণিকেরা। ১৭৩৮ সালের এপ্রিল মাসের একখানা দলিলে আছে যে, বোম্বাইয়ের লাটসাহেব নিয়োগ করেন তিন জন যোগানদার – মোদি। হিরজী জিজী, ভিখাজী জিজী আর মানেকজী জিজী নামগুলি থেকে বলা যায় এঁরা ছিলেন পার্শী এবং তিন-ভাই। জামশেদজী জিজীভাই যে-পরিবারের সমৃদ্ধির প্রারম্ভিক নন, সর্বোচ্চ পর্বের প্রতিভূ সেটার পতন করেছিলেন হয়ত ওঁরা। কোম্পানির জাহাজগুলোয় আর কল-কারখানায় প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস সরবরাহ করাই ছিল ঐ তিন জনের কাজ।*** কোম্পানির কর্তাব্যক্তি আর কর্মকর্তারা তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ভারতীয় জিনিসপত্র কেনাত পার্শী দালালদের দিয়ে – এদের বলা হত দুবাশে।****

রামজী পরভু নামে এক ব্যক্তি একটা সুরক্ষিত প্রাকার নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন আঠার শতকের চতুর্থ দশকের শেষের দিকে – এটাকে বলতে হয় ইংরেজদের কাছ থেকে বোম্বাইয়ের পার্শীদের পাওয়া সামরিক কণ্ট্র্যাক্ট। পরভু এই কাজের বাবত পারিতোষিক হিসাব করে-ছিলেন ৩ হাজার টাকা, আর তিনি চেয়েছিলেন ৫০০ টাকা নগদে এবং

বাদবাকিটা ঐ প্রাকার বরাবর জমি হিসেবে। জমিটা ছিল পড়ো, এটা বিবেচনা করে বোম্বাই পরিষদ স্থির করেছিল কাজটা শেষ হলে ঐ জমিটা এবং বাদবাকিটা যেমন চাওয়া হয়েছিল সেইভাবে নগদে দেওয়াই ঠিক।*

মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য করত বোম্বাইয়ের বণিকেরা। আঠার শতকের গোড়ার দিকে পারস্য উপসাগরের বিভিন্ন বন্দরে ভারতের বেনিয়া আর মুসলিম বণিকদের দেখেছিলেন এ. হ্যামিলটন।** এই বাণিজ্যে সবসময়ে উদ্বৃত্ত থাকত ভারতের; আর ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে বৃটেনের বৈদেশিক বিনিময়ে যে-ঘাটতি পড়ত সবসময়ে সেটা মেটাতে ঐ বাণিজ্য সহায়ক ছিল। ১৭১০ থেকে ১৭৫৯ সালের পঞ্চাশ বছরে কোম্পানি ইংলণ্ড থেকে প্রাচ্যে রপ্তানি করেছিল ৯,২৪৮,০০০ পাউণ্ডের মালপত্র, আর মুদ্রা এবং বহুমূল্য ধাতু ২,৬৮,৩৩,০০০ পাউণ্ডের।*** ১৭৪১ সালে তিন জন হিন্দু বণিক কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে যে-আবেদন পেশ করেছিলেন সেটা এই প্রসঙ্গে আগ্রহজনক। তারা অভিযোগ করেছিলেন যে, আরব্য উপকূলে যাত্রী বাণিজ্যপোতগুলির জন্যে যুদ্ধজাহাজের পাহারার যে-ব্যবস্থা ছিল সেটা বাতিল করে দেবে বলে পরিষদ তখন যে-সিদ্ধান্ত করেছিল তার ফলে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্ক গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। 'আপনাদের কাছে আবেদনকারীরা মনে করছেন যে, উত্তরে বাণিজ্য নষ্ট হলে ফল হবে মারাত্মক, কেননা আমরা ব্যবসা চালাতে এবং নিজেদের আর পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ করতে পারি প্রধানত এই অর্থ এবং এই বাণিজ্য থেকে পাওয়া মুনাফা দিয়েই।' তবে তাদের পরিবার-পরিজনের কঠোর নিয়তি দিয়ে নয় ব্যবসাবাণিজ্যের কারণ দেখিয়েই ইংরেজ পরিচালকদের মনে সাড়া জাগানো যেতে পারে, এটা বুঝে ঐ বণিকেরা লিখেছিলেন: 'এই লাভজনক উত্তরে বাণিজ্য নষ্ট হলে মান্য কোম্পানির এমন আমদানি খোয়া যাবে যেটা থেকে কাস্টম্‌সে যা জমা পড়ে সেটা

তুচ্ছ নয়।'* এমনসব যুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পেরে কোম্পানি পাল-টেছিল সিদ্ধান্তটা। এখানে বলা দরকার ঐসব যুদ্ধজাহাজ দরকার ছিল প্রধানত ইংরেজ জলদস্যুদের হাত থেকে বাণিজ্যপোত রক্ষা করার জন্যে। হ্যামিলটন বলেন, বাবেলমাণ্ডেব প্রণালীতে জলদস্যু-সর্দার ছিল ইংরেজ ক্যাপ্টেন অ্যাভরি।

আঠার শতকে গুজরাটী বণিকেরা বিস্তৃত ক্ষেত্রে বাণিজ্য করত বাংলায়। ঐ শতকের চতুর্থ আর পঞ্চম দশকে তাদের প্রধান ছিলেন সুরাটের মোল্লা মহম্মদ আলি, তিনি বাণিজ্য করতেন গঙ্গা নদী বরাবর, তাঁর একটা জাহাজ-মেরামত কেন্দ্র ছিল কলকাতার কাছে। তবে গুজরাটে লোকসানের দরুন তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে যান ষষ্ঠ দশকে। পরে, নবম দশকেও গুজরাটী বণিকেরা (নাম থেকে মনে হয় তারা হিন্দু) বাংলায় রেশম কিনত, আর হুণ্ডি ভাঙিয়ে দিত কাসিমবাজারে।** তবে নবম দশকের শেষাশেষি নাগাদ গুজরাটে চালান-দেওয়া বাংলার রেশমের পরিমাণ কমে যৎসামান্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

চীনের সঙ্গে গুজরাটের বাণিজ্যটা ছিল কোম্পানির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় আপিম আর তুলো রপ্তানি ছিল এই বাণিজ্যের প্রধান দফা। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গুজরাট থেকে মোটা-মোটা পরিমাণ তুলো চালান হত বাংলায়ও। এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত বোম্বাইয়ের ইংরেজ আর গুজরাটী বণিকেরা, এদের চুক্তি হত স্থানীয় ব্যাপারীদের সঙ্গে, যারা গ্রামে-গ্রামে তুলো কিনত পাইকারী হারে।*** এইসব কাজ-কারবার সম্বন্ধে ধারণা করা যায় এই তথ্যটা থেকে: ১৮০১ সালে বোম্বাইয়ের সাত জন বণিক সাড়ে তিন লক্ষ টাকার তুলো কিনেছিল চীনে পাঠাবার জন্যে। এই বণিকদের তিন জন ছিল ইংরেজ, আর চার জন পার্শী।****

উনিশ শতকের গোড়ায় বোম্বাইয়ের মোট যে-পরিমাণ কাজ-কারবার হত সেটার প্রধান দফাটা ছিল চীনের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য। যেমন,

---

১৮০৫ সালে রপ্তানির পরিমাণ চীনের বেলায় চড়ে দাঁড়িয়েছিল ৬৪,৭৩,৬০০ টাকা, আর বৃটেনের বেলায় মাত্র ৫,০৮,৭০০ টাকা।* তবে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যটা আপনাতেই কোন আখেরী ব্যাপার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, চীনে প্রথমে তুলো এবং পরে আপিম রপ্তানি ছিল কোম্পানি যাতে বাংলায় এবং অন্যত্র ভারতীয় রপ্তানী মালপত্র কিনতে পারে সেজন্য রৌপ্যমুদ্রা পাবার প্রধান উৎস।

চীন এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্য বোম্বাইয়ের জাহাজ-চলাচল ব্যবসায়ে উন্নতির সহায়ক হয়। নৌবাহে পার্শীরা আগ্রহ দেখাতে শুরু করে ১৭৩৫ সালে। প্রথম যে-পার্শী ভদ্রলোক ১৭৫৬ সালে চীন পৌছন তাঁর নাম রেদিমণী। ১৭৯২ সাল নাগাদ পার্শীদের বড় জাহাজ ছিল ২০ খানার বেশি (সেগুলি নির্মিত হয়েছিল প্রধানত বোম্বাইয়ে), সেগুলির মধ্যে দু'খানার ডিসপ্লেসমেণ্ট ছিল ১০০০ টনের বেশি। সবচেয়ে বড়-বড় জাহাজের কাপ্তানরা ছিল ছ'খানা জাহাজের মালিক ওয়াদিয়া পরিবারের এবং তিনখানা জাহাজের মালিক রেদিমণী পরিবারের মানুষ। বোম্বাইয়ের সবচেয়ে ধনী কাপ্তানও ছিলেন একজন পার্শী – রুস্তমজী কোবাসজী বাননজী। মনে হয় বোম্বাইয়ের প্রথম মিল-মালিক কে. এন. দাবারের আদি বংশ ছিল দাবার পরিবার – এই পরিবারেরও কেউ-কেউ ছিল বোম্বাইয়ের প্রথম-প্রথম কাপ্তানদের মধ্যে।** আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় বোম্বাইয়ের বণিকেরা যে-সম্পদ রাশীকৃত করছিল সেটা ছিল প্রধানত নৌবাহ ব্যবসা থেকে আয়।

তার সঙ্গে সঙ্গে – যা লক্ষ্য করেছেন ভারতীয় বিজ্ঞানী এ. গুহ – ভারতীয় নৌবাহ ব্যবসার বিরুদ্ধে সরাসরি বৈষম্য খাড়া করেছিল বৃটিশ নৌবাহ আইন আর বাণিজ্যে কোম্পানির একাধিকার, তার ফলে ইউরোপের বন্দরগুলোতে ভারতীয় জাহাজ এবং কাপ্তানদের যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু ১৭৯৪ সালে – যুদ্ধের সময়ে এবং কাঁচামাল বইবার জাহাজের কমি ছিল বলে – কোন বৃটিশ বন্দরে রেজিস্ট্রি করা হয় নি এমন

ভারতে-নির্মিত জাহাজ ব্যবহারের পারমিট দেওয়া হয়েছিল সাময়িকভাবে, আঠার মাসের জন্যে।

কিন্তু লণ্ডনে ভারতীয় জাহাজের অভূতপূর্ব উপস্থিতির দরুন শাসক জাতিটিকে অত্যন্ত বিচলিত করল। আশংকা প্রকাশ করা হতে থাকল যে, 'ভারতীয় নাবিকেরা দেশে ফিরে যেসব অপ্রীতিকর বিবরণ দেবে তার খুবই প্রতিকূল ক্রিয়াফল ঘটতে পারে এশীয় প্রজাদের মনে'।

ভারতে-তৈরি জাহাজগুলির মালিকদের উপর চাপানো বাধা-নিষেধ আর জরিমানাগুলো এড়াবার জন্যে ইংরেজ বণিকেরা পর্যন্ত সেগুলি ব্যবহার করতে নারাজ হতে থাকল। কমন্সসভার একটা কমিটি ১৮১৪ সালে বিচার-বিবেচনা করল এই প্রশ্নটা নিয়ে: রুশী বণিকদের জাহাজগুলিরই মতো সস্তা এইসব জাহাজ সুবিধাজনক হবে নাকি ইংরেজ বণিকদের পক্ষে? তার জবাবে একজন ইংরেজ দেশভক্ত বলেছিলেন, তাঁর মতে 'জাহাজনির্মাণের চেয়ে পশমী জামা-কাপড় তৈরি করাই ভারতে স্থানান্তরিত করা শ্রেয়'। ভারতীয় জাহাজ চলাচলের উপর বাধা-নিষেধ যা শিথিল করা হয়েছিল সেই সবই লোপ করা হয় নেপোলিয়নের ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে। তারপর জারি হয় যে-নৌবাহ আইন (যা বলবৎ ছিল ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত, যখন স্টীম নৌবাহ হয়ে দাঁড়ায় স্পষ্টতই শ্রেষ্ঠতর), ভারতে-তৈরি এবং ভারতীয় কর্মিদলের পরিচালিত জাহাজের ইউরোপীয় জলভাগে প্রবেশ করা রোধ করাই ছিল সেটার উদ্দেশ্য। আর্মানিরা (১৭২২ সালে) আর পার্শীরা চালু করেছিল চীনের সঙ্গে বাণিজ্য, তাতে পর্যন্ত বৃটিশ জাহাজ সেটার এশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটিয়ে দিয়েছিল ১৮৪২ সাল নাগাদ। এ. গুহ শেষে বলেছেন, এক্ষেত্রে বৃটিশ কর্মনীতি – এদিক থেকে দেখলে – যতই অনিচ্ছায় হোক, সুতী কাপড় শিল্পের ভবিষ্য ক্রম-পুনরুদ্ভব হতে দিল, কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে খতম করে দিল জাহাজনির্মাণ।

এই বৈষম্য চালিত হয় ভারতীয় জাহাজ আর সেটার কাপ্তানের বিরুদ্ধেই শুধু নয়, তার উপর ভারতীয় নাবিকদের বিরুদ্ধেও, বিশেষত না-ইউরোপীয় কাপ্তানদের বিরুদ্ধে (প্রধানত মুসলিম আর পার্শী)। যেমন, ১৭৯৭ সালে 'জাহাঙ্গির' নামে জাহাজের কাপ্তান শামসুদ্দিন রাজ্জাক ধার-দেওয়া টাকা চীনা বণিকদের কাছ থেকে আদায় করার জন্যে

ক্যাণ্টনের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন পেশ করতে চাইলে ক্যাণ্টনে কোম্পানির প্রতিনিধিরা সেটার বিরোধিতা করেছিল, এতে ওজর ছিল এই যে, এমন আবেদনের ফলে কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের পক্ষে হানিকর। ইংরেজ ছাড়া অন্য বণিকদের ক্যাণ্টনে দীর্ঘকাল থাকতে দেওয়া হত না, কিন্তু ইংরেজ বণিকদের থাকতে দেওয়া হত। ফলে চীনে নিবাসী আর্মানিদের সংখ্যা ১৭৩৩ সালের ৩০ থেকে কমে ১৮০৯ সালে হয়েছিল ১। ইংরেজ বণিকদের চেয়ে পার্শীদের সংখ্যাপ্রাধান্য ছিল তখনও, কিন্তু বহু কষ্টে। মোটের উপর এ. গুহর মতে, এমনসব প্রতিবন্ধক না থাকলে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের অংশগ্রহণ আরও বেশি হত, আর বৃটিশ এজেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার বিরুদ্ধে ভারতীয়রা পরে আরও বেশি সফল প্রতিরোধ করতে পারত।

বোম্বাইয়ের বণিকেরা আঠার শতকের মাঝামাঝি নাগাদ যতই ধনদৌলত জড়ো করে থাকুক, তবু সেটা তাদের পরবর্তী জাঁকজমকের কাছাকাছিও ছিল না। একজন ইংরেজ প্রত্যক্ষদর্শী ১৭৫০ সালে বলেছিলেন, বহু বণিকের বাড়ি তৈরি হয়েছিল খারাপভাবে, সেগুলো ছিল অসুবিধাজনক, ছোট-ছোট জানলা, স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাদি কম; সবচেয়ে ভাল বাড়িগুলোও দেখতে মলিন বিষণ্ণ।* আগেকার শোষকদের উৎপীড়ন কাটিয়ে উঠে সমারোহশ্রীবৃদ্ধিতে অংশভাগী হতে গুজরাটের বণিকদের লেগেছিল দশকের পর দশক।

এইভাবে, ভারতে আদি সঞ্চয়নের প্রণালীতে ঔপনিবেশিক শোষণের আমলে বোম্বাইয়ের বড়-বড় গুজরাটী বণিকেরা কাজ-কারবার চালাত, টাকা করত বৃটিশ ব্যাপারিক পুঁজির দালাল হিসেবে, নিজেদের মুনাফার প্রধান অংশটা তারা পেত এই উপায়ে। তার সঙ্গে সঙ্গে, প্রথম-প্রথম শিল্পায়তন দেখা দিয়েছিল বোম্বাইয়ে। আঠার শতকের শেষাশেষি অবধি ইংরেজরা বোম্বাইয়ে তাঁত-বোনা চালু করেছিল উদ্যমশীল হয়ে, যেমনটা তারা করেছিল ভারতের সর্বত্র অন্যান্য তাঁতঘরে। ১৬৭৫ সালে নভেম্বর মাসে সুরাটের কর্মশালা থেকে বোম্বাইয়ে পাঠানো একখানা চিঠিতে বলা হয়েছিল ক্যালিকো বোনার জন্যে সুরাট থেকে বোম্বাইয়ে তন্তুবায়দের নেওয়া হোক। এই চিঠিতে নিশ্চয় করে বলা হয়েছিল

যুদ্ধবিগ্রহের পরিণতির দরুন ক্লিষ্ট তন্তুবায়রা যেতে রাজি হবে। বোম্বাইয়ে উপযুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৬৭৬ সাল নাগাদ। কাঁচা রেশম আর তুলো বা'র থেকে আনিয়ে কোম্পানি 'সেগুলো তন্তুবায়দের মধ্যে বেঁটে দিত একজন মুকদ্দমের অধীনে, তন্তুবায়রা পারিশ্রমিক পেত কিছুটা নগদ, আর কিছুটা চাল'।*

সতর আর আঠার শতকে বোম্বাইয়ের হস্তশিল্প সম্বন্ধে তথ্য আছে 'বম্বে গেজেটিয়ার'-এ। মুকদ্দম নামে পরিচিত ভারতীয় আড়কাটি দালালের কাজ কী ছিল সে-সম্বন্ধে ধারণা করা যায় এইসব দলিলের সাহায্যে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোম্বাই পরিষদের দলিলপত্র থেকে দেখা যায় আঠার শতকের চতুর্থ দশকের তন্তুবায়রা বা'র থেকে গিয়ে বসতি করার আগে শর্তাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলত, তাতে তন্তুবায়দের তরফে মুকদ্দম বিভিন্ন দাবি তুলত ঘর-বাড়ি তৈরি করা, কাঁচামালের যোগান, ইত্যাদি সম্বন্ধে। মুকদ্দমের মারফত কোম্পানি তন্তুবায়দের যোগাড় করত, তাদের কাঁচামাল যোগাত, টাকা দাদন দিত, তৈরি মাল তুলে নিত, তাদের নগদ আর খাদ্য-সামগ্রী পারিশ্রমিক দিত। এই প্রতিনিধি ছিল ইংরেজদের বিপুল আস্থাভাজন: কখনও-কখনও তার হাত দিয়ে যেত হাজার-হাজার টাকা, যার জন্যে তাকে কোন হিসাব দিতে হত না; একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শিল্পজাত জিনিস সরবরাহ করতেই সে বাধ্য ছিল শুধু।** তন্তুবায়রা মুকদ্দমের মুখাপেক্ষী ছিল পুরোপুরি, তাই সে তাদের উপর শোষণ চালাতে পারত নিজ স্বার্থে। কোন-কোন দলিলে কয়েক জন মুকদ্দমের নাম আছে। আঠার শতকের গোড়ার দিকে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফে বোম্বাইয়ে তন্তুবায়দের প্রধান সর্দার ছিল মান্না বা মানাক নামে একজন পার্শী।***

বোম্বাইয়ে তাঁত বোনা হত মনে হয় প্রধানত ইউরোপীয় বাজারগুলিতে কাপড় সরবরাহ করার জন্যে। ১৬৭০ সালে কোম্পানি ইংরেজ তন্তুবায়, রঞ্জন কারিগর এবং অন্যান্য কারিগরদের ভারতে পাঠিয়েছিল

পর্যন্ত, তারা ভারতীয়দের দেখিয়ে দিতে গিয়েছিল যেসব জিনিস ইউরোপীয়দের মুনাসিব হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, কাজেই কোম্পানির পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক, সেগুলো তৈরি করতে হয় কেমন করে।* ইউরোপ থেকে নেওয়া কোন-কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল বোম্বাইয়ে। কোবাসজী রুস্তমজী সপরিবারে ইংলণ্ডে ছিলেন ১৭২৪ থেকে ১৭২৫ সালে – তিনি দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন ১২ টিন পাইপ-কয়েল আর মদ প্রস্তুত করার ৩টে পাতনযন্ত্র। মদ প্রস্তুত করার পেষণযন্ত্র সর্বপ্রথমে, আঠার শতকের নবম দশকে ব্যবহার করেছিলেন দু'জন পার্শী – আর. ভি. ওয়াদিয়া এবং ডি. দাদিশেঠ।

তবে পুঁজিতান্ত্রিক ধরনের এই সমস্ত উদ্যোগকে খাটো করে দিয়ে ছাপিয়ে গিয়েছিল বোম্বাইয়ে জাহাজ-নির্মাণের দেদীপ্যমান ইতিহাস। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বোম্বাইয়ে একটা জাহাজ-নির্মাণকেন্দ্র স্থাপন করেছিল ১৭৩০ সালে। যা আগেই জানা আছে – পশ্চিম উপকূলে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম জাহাজ-নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ছিল সুরাটে, সেখানে ১৬৭৩ সাল থেকে কোম্পানির জন্যে জাহাজ নির্মাণ করত পার্শীরা, যাদের চমৎকার জাহাজ-নির্মাতা বলেন এ. হ্যামিলটন।** সুরাটের জাহাজ-নির্মাণকেন্দ্রে তৈরি-করা একখানা জাহাজ গ্রহণ করার সময়ে (১৭৩৫ সালে) একজন ইংরেজ অফিসার জাহাজ-নির্মাতা লোজী নাসসারভানজীর দক্ষতা আর জ্ঞান লক্ষ্য করে চমৎকৃত হয়ে তখন বোম্বাইয়ে নির্মিত হচ্ছিল যে-ডক সেটার কাজের ভার তাঁকে নিতে বলেন।*** তবে বোম্বাইয়ে লোজীর কর্মজীবনের সূচনা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর বিবরণও রয়েছে। লোজীর প্রপৌত্র জামশেদজী বাখমানের সঙ্গে মারিয়া গ্রেহামের দেখা হয়েছিল ১৮০৯ সালে। ইনি লিখেছেন, লোজী 'গুজরাটে যান ডকইয়ার্ডে দিনমজুরের কাজ করতে', আর নিজের বিস্তর কর্মক্ষমতার কল্যাণে পরে তিনি হন জাহাজ-নির্মাতা।

লোজীর দুই প্রপৌত্র মানিকজী আর বাখমানজী মারা যান যথাক্রমে ১৭৯০ আর ১৭৯২ সালে, এঁরা ছেলেদের (ফ্রামজী মানিকজী আর জামশেদজী বাখমানজী) জন্যে বেশি ধনদৌলত রেখে যেতে পারেন

না।* ইঙ্গো-ভারতীয় নৌবাহিনী সম্বন্ধে তিন-খণ্ডে প্রকাশিত রচনায় সি. আর. লো বলেন জে. বাখমানজীর মস্ত অবদানের কথা, ইনি ১৮০২ সালে জলে নামিয়েছিলেন 'কর্নওয়ালিস' নামে ফ্রিগেটখানা, সেই ঘটনাটা অনুসরণ করে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বোম্বাই ডকইয়ার্ড থেকে জলে ভাসানো বড়-বড় যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের কর্মসূচি চালু করে-ছিল উদ্দীপনাসহকারে।

বোম্বাইয়ের জাহাজ-নির্মাণকেন্দ্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া গেছে একখানা সরকারী দলিল থেকে।**

সময়	নির্মিত জাহাজের সংখ্যা	সময়	নির্মিত জাহাজের সংখ্যা
১৭৩৫-১৭৪৪	৭	১৮০৫-১৮১৪	৩৮
১৭৪৫-১৭৫৪	১০	১৮১৫-১৮২৪	২৬
১৭৫৫-১৭৬৪	২	১৮২৫-১৮৩৪	৩৩
১৭৬৫-১৭৭৪	১৭	১৮৩৫-১৮৪৪	৩৫
১৭৭৫-১৭৮৪	১৪	১৮৪৫-১৮৫৪	৩৬
১৭৮৫-১৭৯৪	২২	১৮৫৫	১
১৭৯৫-১৮০৪	২৪	১৮৫৬	২

৮৪ কামানের যুদ্ধজাহাজ 'দি গ্যাঞ্জেস' জলে নামানো হয়েছিল ১৮১০ সালে, আর তারপর একই ডিজাইনের আরও কয়েকখানা জাহাজ – খরচ পড়েছিল ৫০-৬০ হাজার পাউণ্ড। সমুদ্রোপযোগিতা আর মজবুতির জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল বোম্বাইয়ে নির্মিত জাহাজ। বোম্বাইয়ের একখানা ফ্রিগেটের মুখ্য অফিসার জাহাজখানার নির্মাতা জামশেদজী বাখমানজীর কাছে যে-চিঠি লিখেছিলেন সেটা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন লো। তাতে জানানো হয়েছিল যে, ১৭খানা বৃটিশ জাহাজের একটা বহর ১৮০৮-১৮০৯ সালের শীতকালে বলটিক সাগরে ছিল বরফের চূড়ান্ত কঠোর অবস্থার মধ্যে, তখন কোন

গুরুতর ক্ষতি হয় না শুধু বোম্বাইয়ে তৈরি ফ্রিগেটখানার।*

ইংরেজ লেখকেরা সাধারণত বলেন, ভারতে জাহাজ-নির্মাণে এবং অন্যান্য স্থানীয় উদ্যোগে সাফল্যের কারণ ছিল ঠিকাদারদের নৈপুণ্য আর কাঁচামাল এবং অন্যান্য মালমশলার কম দাম। তবে আবদ্ধ মেহনতীজনকে শোষণ করে বিস্তর মুনাফা তোলা হত আঠার শতকে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঠিক বটে, উৎপাদকদের আবদ্ধ অবস্থা বাংলার মালমশলায় যা আছে তার চেয়ে অনেক কম তথ্যাদি পাওয়া যায় বোম্বাই-সংক্রান্ত দলিলপত্রে, তবু কিছু-কিছু সংগ্রহ করা যায় এগুলি থেকেও। যেমন, বোম্বাই দ্বীপের আদিবাসী কোলি মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বেলায়। ১৭১৭ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই পরিষদের কাছে পরিচালকমণ্ডলীর পাঠানো একটা বার্তায় বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, দ্বীপটির সংবিধিতে কোলি-রা 'ইংরেজদের দাস-গোষ্ঠের বলে গণ্য, কাজেই সামান্য পারিশ্রমিক সম্বন্ধে তারা নালিশ জানালে তাদের বলতে হবে তারা দাস, তাই অন্যান্যের বেলায় যা তার চেয়ে কম পারিশ্রমিকে তাদের কাজ করা চাই ইংরেজদের জন্যে'।** অবশ্য কোলি-দের মজুরি বাড়িয়ে মাসে আট আনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ১৭৪০ সালে।

তবে এখানে বলা দরকার, বোম্বাইয়ের সমস্ত বর্গেরই মেহনতী মানুষের মজুরি ইংরেজরা কমিয়ে রাখত সাধারণভাবেই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মজুরদের পারিশ্রমিক কয়েক বছর আগেকার চেয়ে বেশি হয়েছিল বলে বোম্বাই পরিষদ উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল ১৭৬৭ সালে। একটা বিশেষ কমিশনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্থির হয়েছিল একজন শক্তসমর্থ মজুরের দশ-ঘণ্টার কর্ম-দিনের পারিশ্রমিক ১২ পয়সার বেশি হবে না, আর যারা তত শক্তসমর্থ নয় কিংবা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক তাদের মজুরি হবে আরও কম। কোম্পানির কণ্ট্র্যাক্ট আর পৃথক-পৃথক ব্যক্তির কণ্ট্র্যাক্ট উভয়ত এটা প্রযোজ্য ছিল।***

তবে মোটের উপর, আঠার শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইঙ্গো-মারাঠা যুদ্ধ অবধি কোম্পানি কর্তৃপক্ষ অর্থনীতি-বহির্ভূত জবরদস্তি বোম্বাইয়ে আর তার অধীনে কল-কারখানায় চালাতে পারত বাংলার চেয়ে অনেক কম পরিমাণে — বাংলায় ইতোমধ্যে কায়েম হয়ে গিয়েছিল ইংরেজদের রাজনীতিক আধিপত্য। প্রকৃতপক্ষে, (রায়তদের তো কথাই নেই), কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন কারিগরদের সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। স্থানীয় শিল্পগুলি প্রধানত রপ্তানিমুখো ছিল না (যেমনটা ছিল বাংলায়), এইসব শিল্প যোগান দিত প্রধানত নৌবাহিনী, ফৌজ আর কোম্পানির পরিচালকবর্গ এবং সেটার ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত লোকজনের জন্যে।

পশ্চিম ভারতে আদি সঞ্চয়নে প্রবৃত্ত বৃটিশ পুঁজি উনিশ শতকের শুরু অবধি টাকা করত বহির্বাণিজ্যে একাধিকারের সাহায্যে প্রধানত, আর আরও আগে ইংরেজদের গ্রাস-করা বাংলায় এবং বিহারে সতর শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে তাদের প্রধান-প্রধান উপায় ছিল — (বৈদেশিক বণিকদের হস্তগত সর্বোচ্চ ভূমি-মালিকানার ভিত্তিতে) করাধানের সাহায্যে রায়তদের উপর লুণ্ঠন, কারিগরদের উপর বৃটিশ ব্যাপারিক পুঁজির সরাসর শোষণ, আর জনসাধারণের উপর ডাহা লুণ্ঠন। কর্তৃত্বশালী হলে ব্যাপারিক পুঁজি হয় একটা লুণ্ঠনব্যবস্থা — এই সত্যের নিদারুণ নিদর্শন হল আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলায়। এই বিষয়ে মার্কস যা বলেছেন সেটা সর্বোপরি বাংলা এবং অংশত দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে প্রযোজ্য: 'গোটা আঠার শতক জুড়ে ভারত থেকে বৃটেনে যে ধন-সম্পদ নিয়ে যাওয়া হয় সেটা দেশটির উপর সরাসরি শোষণ দিয়ে, বিপুল পরিমাণ সম্পদ কেড়ে নিয়ে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিয়ে যা তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণেই আয়ত্ত করা হয় অপেক্ষাকৃত নগণ্য ব্যবসাবাণিজ্যের সাহায্যে।'*

বাংলা থেকে বৃটেনে নজরানা চালান যেত রপ্তানী মালপত্রের আকারে, যেগুলোর দাম দেওয়া হত কর হিসেবে আদায়-করা টাকায়।**

১৭৯৩ থেকে ১৮১২ সালের ১৯ বছরে করের আকারে আড়াই কোটির বেশি পাউণ্ড জবর-আদায় করে ভারতীয় মালপত্র কিনতে সেটা খরচ করা হয়েছিল ঐ মাল ইউরোপে রপ্তানি করে সেখানে বিক্রির জন্যে, সেই বাণিজ্যে ভারত পায় নি কিছুই। বিহার আর বাংলার বণিক আর ব্যাঙ্কারদের ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির খিদমত করতে বাধ্য করা হয়েছিল (সেটা বোঝাই যায়) গুজরাটী বেনিয়াদের বেলায় যায় তার থেকে ভিন্ন ধরনে এবং অন্যান্য, কম-সুবিধাজনক শর্তে।

কর-আদায় যথাসম্ভব বাড়াতে সচেষ্ট কোম্পানি স্বল্পমেয়াদী কর-ইজারাদারি প্রথাটাকে প্রথমে বজায় রেখেছিল, এমনকি প্রসারিতও করেছিল।* আঠার শতকের বাংলা আঞ্চলিক রেকর্ড থেকে দেখা যায় ভূস্বামীরা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তহসিলদারদের সরাসরি খাজনা দিত না, খাজনাটা আদায় করা হত স্থানীয় ব্যাঙ্কারদের মারফত।** বাংলায় ভূমি-কর আদায় করার অধিকার মোগল কর্তৃপক্ষকে সরকারীভাবে কোম্পানির হাতে তুলে দিতে হয়েছিল ১৭৬৫ সালে, তখন লর্ড ক্লাইভ কোম্পানির পোদ্দার হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন জগৎ শেঠ পরিবারের আঠার-বছর বয়সের একজন বংশধরকে।*** ঐ বছরই ক্লাইভ শেঠদের তিরস্কার করেছিলেন তারা জমিদারদের সর্বনাশ করছিল বলে। তবে লর্ড ক্লাইভ যে জায়গির পেয়েছিলেন – বলা ভাল আত্মসাৎ করেছিলেন – সেই কুখ্যাত ব্যাপারটায় নাটের গুরু ছিল ঐ জগৎ শেঠেরাই, যা বলেছেন বোল্ট্স। ১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস স্থাপন করেন বাংলা আর বিহারের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, সেটার পরিচালক হন জগৎ শেঠ পরিবারের রায় দয়াল চাঁদ আর হুজুরি মল নামে কলকাতার একজন বণিক, কর-রাজস্ব পাঠানো ছিল যাঁর কাজ।****

রায়তদের বিভিন্ন অভ্যুত্থান আর জমিদারদের মধ্যে অসন্তোষের দরুন বাধ্য হয়ে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভূমি-করের ইজারাদারি লোপ করেছিল আঠার শতকে অষ্টম দশকের শেষের দিকে। জমিদারদের

সঙ্গে সরাসরি কাজ চালানোটাকেই কোম্পানি শ্রেয় মনে করেছিল তখন থেকে। কর-আদায় আর সরকারী ঋণের ক্ষেত্র থেকে, যেমন বহির্বাণিজ্য আর অংশত অন্তর্বাণিজ্য থেকেও ব্যাপারিক আর চোটার পুঁজিকে ক্রমে-ক্রমে বের করে দেবার ফলে আঠার শতকের শেষাশেষি বাংলার বড়-বড় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলোর অবনতি ঘটে।* এইচ. সিন্‌হা বলেন, তার কারণটা এই যে, 'বহির্বাণিজ্য বেরিয়ে গিয়েছিল ভারতীয়দের হাত থেকে, আর অন্তর্বাণিজ্যেও বেশ কিছুকাল ধরে কোম্পানির কর্মচারী-দের একাধিকার ছিল। তার ফলে স্থানীয় ব্যাঙকারদের প্রাধান্যের অবস্থান খোয়া গিয়েছিল স্বভাবতই। সর্বাগ্রগণ্য ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান ছিল জগৎ শেঠদের, সেটা তখন আগে যা ছিল তার ছায়া মাত্র, যদিও দাখিল-করা স্থানীয় খাজনা সেটার মারফত কলকাতায় পাঠানো চলেছিল আরও. কিছুকাল ধরে।**

জগৎ শেঠেরা কোম্পানির ব্যাঙকার ছিল ১৭৮২ সাল পর্যন্ত। তারপর তাদের জায়গায় যায় গোপাল দাসের মাড়োয়ারী ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান; ইনি ছিলেন বারাণসীতে আগারওয়ালা সম্প্রদায়ের মাড়োয়ারী ব্যাঙকার-দের একটা বড় ফার্মের একজন। তিনি এবং তাঁর ভাই আঠার শতকের অষ্টম দশকে কলকাতায় গিয়ে বসতি করে সেখানে বিস্তর ধন-সম্পদের মালিক হন। তাঁর ছেলে ভবানীদাস ছিলেন যে-বৃটিশ ফৌজ ১৭৯৯ সালে মৈসুরে আক্রমণ-অভিযান চালিয়েছিল সেটার রসদাদির যোগানদার। আক্রমণকারীদের কত মস্ত খিদমত করেছিলেন ভবানীদাস সেটা দেখা যায় এই তথ্যটা থেকে: ইংরেজরা সেরিঙ্গাপটম দখল করার পরে তাঁকে দিয়েছিল টিপু সুলতানের তরোয়াল।*** তবে এইসব ব্যাঙকার জগৎ শেঠদের মতো অবস্থানে উন্নীত হতে পারি নি কখনও।

আঠার শতকের নবম দশকের শেষের দিকে কর-রাজস্ব পাঠাবার জন্যে পোদ্দারদের আর কাজে লাগানো হত না। জগৎ শেঠদের টাকশাল দখল করে কোম্পানি নিজস্ব মুদ্রা ছাড়তে শুরু করেছিল বলে টাকার

ফাটকাবাজি ক্ষেত্রে মস্ত-মস্ত লোকসান হয় স্থানীয় ব্যাঙকারদের, সর্বাগ্রে জগৎ শেঠদের।* জগৎ শেঠ পরিবারের বংশধরেরা জীবনধারণের জন্যে ইংরেজদের কাছ থেকে ১২,০০০ টাকা ভাতা পেত পরিবারটি আগে যা খিদমত করেছিল সেটা বাবত।** বাঙ্গালী বেনিয়া বি. চন্দ্র উনিশ শতকের সপ্তম দশকে লিখেছিলেন যে, জগৎ শেঠ পরিবারের বংশধরদের মুর্শিদাবাদের পৈত্রিক বাসস্থান বজায় ছিল, কিন্তু তারা একেবারেই নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল – ইংরেজরা ভাতা বরাদ্দ করার আগে অবধি তাদের চলত দামী-দামী পারিবারিক জিনিসপত্র বিক্রি করে।

পূর্ব ভারতে ভারতীয় ব্যাপারিক আর চোটার পুঁজি কাজ-কারবার চালাত বাণিজ্য আর কর-আদায়ের ক্ষেত্রে, এই পুঁজিটাকে লক্ষণীয় পরিমাণে উচ্ছিন্ন ক'রে বৃটিশ পুঁজি সেটাকে ক্ষতিপূরণ গোছের একটাকিছু হিসেবে দিয়েছিল সঞ্চিত সম্পদ দিয়ে ভূসম্পত্তি আয়ত্ত করার সুযোগ। হেস্টিংসই বলেছিলেন, ভূসম্পত্তি করা আর জমি বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়া আঠার শতকের অষ্টম দশকে অবধিও যথেষ্ট সমাদৃত হয় নি, আর শেষে তার চেয়ে বেশি লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল কোম্পানির সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ।*** ভূসম্পত্তিকে বিনিয়োগের নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র করে তুলতে হলে ভূস্বামীর আইনগত স্বত্ব কায়েম করা এবং ভূমি-কর ধার্য করা দরকার ছিল, আর সেটা বস্তুত করা হয়েছিল ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়ে। জমিদার আইনত স্বীকৃত হল ভূমির মালিক হিসেবে, যে একটা নির্দিষ্ট হারে ভূমি-কর দিতে বাধ্য।

দেখা গেল, করের পরিমাণটা যেমন মোটা তাতে সেটা মেটাতে সাবেকী অভিজাতেরা অক্ষম ছিল, তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খোয়া গিয়েছিল তাদের বিষয়সম্পত্তি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার পরে ২০ বছরের মধ্যে জমিদারিগুলোর তৃতীয়াংশ, এমনকি অর্ধেকই চলে গিয়েছিল নতুন-নতুন মালিকদের হাতে, এরা তা কিনে নিয়েছিল

নিলামে।* মার্কস বলেছেন, কর্নওয়ালিস আইনের ফলে বাংলায় জমিদারিগুলোর একটা মোটা অংশ চলে গিয়েছিল 'কয়েক জন শহুরে পুঁজিপতির হাতে, এদের ছিল পড়ে-থাকা পুঁজি, যেটাকে তারা ভূমিতে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক ছিল।'**

বাংলার সবচেয়ে উঁচু বর্ণের – ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ – কর-ইজারাদার আর কোম্পানির কর্মচারীরা ছিল নতুন জমিদারদের বেশির ভাগ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার একটা জেলায় শতকরা ৯০ জন জমিদার ছিল ঐ দুই বর্ণের মানুষ। জমিদারি যারা হস্তগত করেছিল তাদের মধ্যে ব্যাপারী আর মহাজনদের (এদের মধ্যে মাড়োয়ারিদের) সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত নগণ্য, তার কারণ হল খুবই বদ্ধমূল বর্ণগত ঐতিহ্য। সবকিছু থেকে ধারণা করতে হয় যে, অবাঙ্গালী এবং প্রধানত উত্তর ভারত থেকে আগত মাড়োয়ারী এবং অন্যান্য মহাজনেরা আঠার শতকের শেষাশেষি অবধি বাংলার বাণিজ্য আর আর্থিক কাজ-কারবারের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু ছিল। তবে স্বাধীন দালাল হিসেবে কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়-সম্পর্ক দিয়ে শুরু করে তারা ক্রমে-ক্রমে কোম্পানির এজেণ্টে পরিণত হয়েছিল। ডি. আর. গ্যাডগিল লিখেছেন: 'বাংলায় ছিল সুবর্ণ বণিকদের মতো সম্প্রদায়; ব্যবসাবাণিজ্য ছিল এদের চিরাগত বিশেষ কর্মক্ষেত্র, আর এরা ছিল অন্যান্য অঞ্চলের বেনিয়াদের অনুরূপ। তবে ১৭৫০ সালে বাংলায় ব্যাঙ্কিংয়ে কিংবা বাণিজ্যে এদের বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল বলে মনে হয় না। মনে হয়, বাংলার পরিস্থিতিতে ইংরেজ এবং অন্যান্য ইউরোপীয়রা যাবার আংশিক ক্রিয়াফল ইতোমধ্যে ঘটেছিল ১৭৫০ সালেই। ইউরোপীয়দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে ভারতীয় সমাজের কোনকোন অংশের গুরুত্ব লাভ করাটা তার একটা গুরুত্বসম্পন্ন সূচক। ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক হিসেবে ভারতীয়দের সঙ্গে বিদেশীদের সম্পর্ক, আর যারা কাজ করত... বিদেশীদের

এজেন্ট হিসেবে সেইসব ভারতীয়ের সঙ্গে বিদেশীদের সম্পর্ক, এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এখানে লক্ষ্য করা দরকার... কলকাতা পত্তনের সময় থেকে শুরু করে ইংরেজরা বাংলায় চাইত প্রধানত পরিচালনকাজে সহায়তা আর ব্যবসাবাণিজ্যের এজেন্ট। বাংলার ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ সম্প্রদায় আগে কোথাও ছিল না ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রে, তারা ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সহকারী আর এজেন্ট হিসেবে সেক্ষেত্রে ঢোকে তার ফলে।' আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালী নাম তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, আর যেখানে বাঙ্গালীদের দেখা যায় তারা বেশির ভাগই উঠতি পেশাদার এজেন্ট শ্রেণীর – স্থানীয় ব্যবসাবাণিজ্য মহলের নয়।'* এন. কে. সিন্‌হাও বলেন, বাংলা ইংরেজদের দখলে যাবার পরে কোম্পানির দালালদের বেশির ভাগ ছিল বিভিন্ন উঁচু জাতের হিন্দু, যেখানে আগে তারা প্রায় সবাই ছিল বৈশ্য।** দালালদের মধ্যে উঁচু-জাতের মানুষ দেখা দেবার কারণ তো মনে হয় এই যে, বাংলা দখল করার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির দরকার হয়েছিল এমনসব অ-মুসলিম যারা তহসিলদারির কাজ জানত, আর যাদের ছিল যথেষ্ট সামাজিক প্রতিপত্তি।

বাংলায় স্থানীয় ব্যাপারী আর মহাজন সম্প্রদায়ের ক্ষীণতা সম্বন্ধে এন. কে. সিন্‌হা বলেন, কারণটা হল এই যে, বারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যিনি বাংলায় বিভিন্ন জাতের মধ্যে নতুন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন সেই বল্লাল সেন মহাজনদের (সুবর্ণ বণিকদের) স্থান দিয়েছিলেন খুবই নিচে। স্থানীয় মহাজনদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিচু স্তরে ছিল বলে মোগল আমলে বাংলায় নবাগত ব্যাপারী আর মহাজনেরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তারা এই পেশার মানুষ সম্বন্ধে স্থানীয় রেওয়াজের ধার ধারত না। দৃষ্টান্ত হিসেবে সিন্‌হা উল্লেখ করেছেন মুর্শিদাবাদে টাঁকশাল পুনঃস্থাপনের জন্যে আরজির কথা, তাতে সই দিয়েছিল জগৎ শেঠেরা ছাড়াও আরও সতর জন স্থানীয় মহাজন, এদের মধ্যে বাঙ্গালী ছিল মাত্র তিন জন।

তবে বাংলায় ব্যাপারী আর মহাজন সম্প্রদায়ের ক্ষীণতার ব্যাখ্যা কেবল রেওয়াজেরই ভিত্তিতে দেওয়া কঠিন। সিন্‌হাই বলেছেন, কলকা-

তায় মুখার্জি, ব্যানার্জি, শর্মা, ঠাকুর, দত্ত, মিত্র, ঘোষ, সেন ইত্যাদি উঁচু জাতের বাঙ্গালী হিন্দুরা ১৭৫৭ থেকে ১৭৮৫ সালে ছিল ব্যবসাবাণিজ্য-ক্ষেত্রে প্রধান অংশটা, সেটা তো আটকায় নি ঐ একই ঐতিহ্যের ফলে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এরা ব্যবসাবাণিজ্য থেকে কিছুটা সরে গিয়েছিল তার কারণ এই যে, আর্থিক কাজ-কারবারের একাংশ বজায় রেখে এরা অর্থ নিয়োগ করেছিল জমিদারি, ভূমি আর বাড়িতে।* তবে উঁচু জাতের কিছু-কিছু বাঙ্গালী বৃহদায়তনের কারবারে জড়িত ছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি অবধিও।

এইভাবে, বাংলার উঁচু জাতগুলির মানুষের বেলায়ও জাতভেদের নিয়ম-বিধির সঙ্গে কারবারের আপনারই, বিশেষত মহাজনী কারবারের কোন দ্বন্দ্ব ছিল না – অন্তত আঠার শতকে। তাছাড়া, বল্লাল সেন যদি সুবর্ণ বণিকদের নিচে নামিয়ে দিয়ে থাকেন তারা সুদখোরি করত বলে, সেখানে বাংলার বেনিয়াদের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায় গন্ধ বণিকদের তিনি একটা সম্মানের স্থানে রাখেন কৌলিন্য-সোপানতন্ত্রের ছকে, তাতে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, এদের কাজ-কারবার সীমাবদ্ধ থাকবে শস্য নিয়ে 'পরিচ্ছন্ন' ব্যবসায়ে।** তবে বাংলার ব্যবসাবাণিজ্য জগতে সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে সুবর্ণ বণিকদের থেকে গন্ধ বণিকদের পার্থক্য ছিল সামান্যই – যদি তা আদৌ থেকে থাকে। উভয়েরই কাজ-কারবারের পরিধি ছিল মাড়োয়ারী আর গুজরাটীদের চেয়ে অনেক সংকীর্ণ। তার কারণটা তো মনে হয় ছিল বাংলার ভূমি-কর ব্যবস্থার বিশেষত্ব, তাতে বিভিন্ন বর্গের খামারীদের মধ্য থেকে দালালদের একটা বহুবিস্তৃত ব্যবস্থা কৃষির উদ্বৃত্ত-উৎপাদ ক্ষেত্রে ব্যাপারিক পুঁজির পৌঁছবার পথ রোধ করত অনেকাংশে। তাছাড়া, সাম্রাজ্যের মধ্য ভাগগুলি থেকে আগত অপেক্ষাকৃত ধনী মহাজনদের সঙ্গে কাজ-কারবার করাই বাংলার মোগল শাসকদের বেশি মুনাসিব ছিল।

যদিও বৃটিশ শাসনের প্রথম কয়েক দশকেও বাংলার মহাজনরা সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কাজ-কারবারের একটা ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করত সরকারকে (তখন বৈদেশিক) দেওয়া ঋণ হিসেবে, কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষের

সিকিউরিটি কেনার দিকে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিশেষ কোন ঝোঁক ছিল না। ওয়ারেন হেস্টিংস বলেছিলেন, ভারতীয় উত্তমর্ণ বেশি ছিল না, ছিল প্রেসিডেন্সির অল্প কয়েকটি সাবেকী হিন্দু পরিবার (অর্থাৎ ভূস্বামী অভিজাত), – বেশির ভাগ সিকিউরিটির মালিক ছিল ইংরেজরা। বাংলা জয় করার পরে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কবজা করেছিল বাংলার ভিতরকার পাইকারী বাণিজ্য, কিছু পরিমাণে খুচরো বেচা-কেনাও, আর বহির্বাণিজ্যে একাধিকার তো ছিল আগে থেকেই। বাংলায় ১৭৫৭ সালের পরেকার ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন: 'কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের মালপত্র এক-জায়গা থেকে অন্যত্র পাঠাত বিনা-শুল্কে, আর দেশীয় বণিকদের মাল চলাচলের উপর শুল্ক ধার্য হত চড়া হারে। সর্বনাশ হয়েছিল দেশীয় বণিকদের।'* তবে নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল কিছু-কিছু বণিক, তারা বৃটিশ ব্যাপারিক পুঁজির খিদমত করতে শুরু করেছিল, তারা হয়েছিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্ট। বাংলায় খুচরো বাণিজ্যের একটা বড় অংশ ইংরেজরা হস্তগত করেছিল ঐসব দালালের সাহায্যেই। বাংলার নবাব মীর কাসিম ১৭৬২ সালে লাটসাহেবের কাছে লিখেছিলেন: 'প্রত্যেকটা জেলায়, প্রত্যেকটা গঞ্জ পরগনা আর গ্রামে গোমস্তা এবং অন্যান্য কর্মচারীরা তেল, মাছ, খড়, বাঁশ, চাল, ধান, সুপারি এবং অন্যান্য জিনিসের কারবার চালাচ্ছে।'** ভারতীয় এজেণ্টরা, বিশেষত বেনিয়ারা দারুণ চাতুরী চালাত তাদের ইংরেজ মনিবদের সঙ্গে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দলিলপত্রে আছে – ইংরেজদের নিয়োগ-করা বেনিয়ারা তরুণ কর্মকর্তাদের 'কদভ্যাস ধরা তো', দেনায় জড়িয়ে ফেলত তাদের, আর তারাই হয়ে দাঁড়াত অবস্থার নিয়ন্তা।*** কিন্তু আমি এখানে দিচ্ছি তার বিপরীত কিছু-কিছু দৃষ্টান্ত।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দাদন ব্যবস্থা অনুসারে ক্রেডিট দিত ভারতীয় ক্রেতাদের, কিন্তু বেসরকারী ইংরেজ বণিকেরা, বিশেষত কোম্পানির

কর্মচারীরা উলটে ক্রেডিট পেত ভারতীয় বেনিয়াদের কাছ থেকে। এই ঋণের টাকা দিয়েই তারা প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় জিনিসপত্র কিনে ইউরোপে চালান দিতে পারত, আর দেশটি থেকে সারাংশ শুষে নিয়ে তাদের যা মাইনে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি খরচ করে জীবনযাপন করতে পারত। ইংরেজ খাতক আর ভারতীয় মহাজনের মধ্যে সম্পর্কের বিধিবদ্ধ আকারটা ছিল খুবই অদ্ভুত: খাতক তার মহাজনকে নিজস্ব দালাল হিসেবে নিযুক্ত করত, তাকে সেজন্যে যৎকিঞ্চিৎ পারিতোষিকও দিত।* ভারতীয় মহাজনের জন্যে এটা হত যেন 'অভয়-পত্র', বৃটিশ কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থাদি থেকে এটা তাকে রক্ষা করত, আর সে নিজে সেইভাবে আচরণ করত তার সুবিধাবঞ্চিত স্বদেশবাসীদের সঙ্গে।

প্রধান-প্রধান পণ্যগুলোর বহির্বাণিজ্যে একাধিকার কোম্পানি কায়েম করেছিল স্রেফ গায়ের জোরে। আঠার শতকের শেষের দিকে একজন ইংরেজ লিখেছিলেন, 'কাপড়ের থান, রেশম, শোরা, আফিম, চিনি আর নীলের প্রায় সবটারই চলাচল হয় কোম্পানির হাত দিয়ে।'** ১৭৭৩ সালে হেস্টিংস আফিমের বাণিজ্যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটে অধিকার কায়েম করেন। এইভাবে, বিজিত বাংলায় আফিমের ব্যাপারীদের অবস্থাটা খুবই পৃথক ছিল বোম্বাইয়ের ব্যাপারীদের থেকে, এরা সরাসরি চীনে আফিম বিক্রি করত। এ. গুহর হিসাব অনুসারে, আঠার শতকের শেষাশেষি নাগাদ বাংলার বহির্বাণিজ্যের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ মাত্র ছিল অ-ইউরোপীয়দের হাতে, এটা ছিল বোম্বাইয়ে এবং পশ্চিম উপকূলে যা তার চেয়ে অনেক কম। এর কারণটা ছিল ১৮২৮ সালে বাংলায় কোম্পানির কর্মচারীদের সংখ্যাবহুলতা — ১৫৯৫ জন, যখন বোম্বাইয়ে ছিল ২৩৬, আর মাদ্রাজে ১১৬ জন।

বহির্বাণিজ্যে অর্থ যোগাবার ব্যাপারটাকে আঠার শতকের শেষের দিকে পুরোপুরিই হাতে নিয়েছিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর বিভিন্ন বৃটিশ ব্যাঙ্ক। আঠার শতকের নবম দশক থেকে ইংরেজরা বাংলায় নিজেদের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে শুরু করে, তার ফলে বাংলার

মহাজনদের কাজ-কারবার অনেকটা সঙ্কুচিত হয়,* তবে তারা একেবারে বাদ পড়ে যায় না। জে. টেলার বলেন, ঢাকায় দালাল আর পোদ্দাররা ছিল একটা 'ধনবান এবং প্রতিপত্তিশালী অংশ'। কোম্পানি কাপড় কিনত দালালদের মারফত। 'মুদ্রা-বিনিময় আর বিভিন্ন জায়গায় টাকা পাঠাবার ব্যাপারে ব্যাপারী আর জমিদারদের সঙ্গে বিস্তৃত কাজ-কারবার চলত' পোদ্দারদের। 'আরকুট কারেন্সি লোপ করা, আর ১২ শতাংশের বেশি হারে সুদ বেঁধে দেবার নিয়ম জারি হবার' ফলে পোদ্দাররা তাদের কাজ-কারবারের পরিমাণ কমাতে বাধ্য হয়।' **

একটা লক্ষণীয় তথ্য: ১৭৮৬ সালে স্থাপিত জেনারেল ব্যাঙ্কের অংশী হতে পারত যেকেউ, কিন্তু ডিরেক্টর হতে পারত শুধু ইংরেজ। *** অর্থাৎ কিনা, ভারতীয় অংশীদের পুঁজি কবজা ক'রে বিদেশীরা সেটাকে কাজে লাগাত ভারতের রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক অধীনতা ঘটাবার জন্যে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঘনিষ্ঠ ক্রেডিট যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল ইংরেজদের ব্যাঙ্কগুলো আর স্থানীয় মাড়োয়ারী মহাজনদের মধ্যে। স্থানীয় মহাজনেরা বিভিন্ন প্রেসিডেন্সির ব্যাঙ্কগুলো থেকে ঋণ নিত এবং ব্যাঙ্কের ভারতীয় মক্কেলদের জামিনদার হত। আঠার শতকের শেষের দিকে স্থাপিত হয় ইংরেজদের বিভিন্ন বেসরকারী ব্যাঙ্ক, তখন পোদ্দার আর হুণ্ডির দালালেরা জামিনদার হত। **** প্রত্যেকটা ব্যবস্থা ছিল পৃথক-পৃথক হয়ে, কেননা প্রত্যেকটার ছিল নিজস্ব বিশেষ ধরনের কাজ। স্থানীয় মহাজন ক্রেডিট দিত এবং দেশটির অন্তর্বাণিজ্যে অর্থ যোগাত, আর ইউরোপীয় ব্যাঙ্কগুলোর কাজ-কারবার চলত প্রেসিডেন্সি তিনটের রাজধানীগুলিতেই শুধু, সেগুলো প্রধানত ইউরোপীয়দের টাকা জমা নিত, টাকা পাঠাত স্থানান্তরে, বহির্বাণিজ্যে অর্থের যোগান দিত। *****

বাণিজ্যে বিশেষত বহির্বাণিজ্যে ব্রটেনের একাধিকারের অবলম্বন

ছিল বাংলার দাসদশাপন্ন কারিগর আর কৃষকদের উপর শোষণ। ফ্র্যান্সিস লিখেছেন: 'ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বর্ধিত আয়ের সদ্ব্যবহার করতে হলে তাদের বিনিয়োগ বাড়ানো আবশ্যক ছিল... সেটা করা যেত না শিল্পজাতদ্রব্য-সামগ্রীতে একাধিকার ছাড়া, যে-একাধিকারের অবলম্বন ছিল বহুসংখ্যক কর্মচারী আর দালাল, যেটা ছিল কর্তৃত্ব দিয়ে বলীয়ান, যার ফলে তীব্র উৎপীড়ন ঘটেছিল শিল্পে-উৎপাদক-দের উপর।' *

চারদিকে ছড়ানো বহুসংখ্যক গোমস্তাদের সাহায্যে কোম্পানি দাস-দশাপন্ন করেছিল কারিগরদের। বাংলা বিজিত হবার আগে সেখানে ভারতের অন্যান্য জায়গার মতো স্বাধীন কারিগরদের পাশাপাশি ছিল বাড়িতে কাজ-করা হস্তশিল্পীরা, যারা ছিল দালালদের মুখাপেক্ষী। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলার অর্থনীতি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেন জে. সি. সিন্‌হা, তিনি বলেছেন, ইংরেজরা যাবার পরে বেড়ে যায় দালালদের ক্ষমতা। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন কায়েম হবার আগে সেটা বাংলার কারিগরদের শোষণ করত ব্যাপারীদের মারফত, এরা কণ্ট্র্যাক্ট নিত এবং চুক্তির কড়ার অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে বাঁধা দামে জিনিসপত্রের যোগান দিত। বাংলা জয় করার পরে ইংরেজরা তাদের নিজেদের এজেণ্ট গোমস্তাদের মারফত কাজ চালাতেই বেশি পছন্দ করত; কোম্পানি এই গোমস্তাদের টাকা দিত, আর তারা সেটা দাদন দিত তন্তুবায়দের, এদের তারা দাসদশাগ্রস্ত করত চড়া সুদে ধার দিয়ে। **

ডাব্লিউ. বোল্ট্‌স নামে ওলন্দাজ বণিক ১৭৭২ সালে লণ্ডনে এক-খানা পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে। ১৭৬০ থেকে ১৭৬৮ সাল অবধি বাংলায় চাকরি করার সময়ে তিনি জমিয়েছিলেন বেশ মোটা টাকা (২০ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং), শেষে কো-ম্পানির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিবাদ হলে তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইউরোপে। তিনি বলেছিলেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল ধার্য করার সময়ে বাঁধা দামে (অর্থাৎ খুব কম দামে) সররবরাহ করবে বলে তন্তুবায়দের

খতে সই দিতে বাধ্য করত গোমস্তারা; তন্তুবায়দের পারিশ্রমিকের একাংশ দেওয়া হত আগাম।*

দেনার দাসত্ব-বন্ধনের উপর ছিল অর্থনীতি-বহির্ভূত জবরদস্তি। 'গরিব তন্তুবায়দের সম্মতি আবশ্যক বলে গণ্য নয় সাধারণভাবে; কোম্পানির বিনিয়োগের ভিত্তিতে নিযুক্ত গোমস্তাদের যা খুশি তাতেই তারা তন্তুবায়দের সই করিয়ে নেন প্রায়ই।'** ইংরেজদের একটা আদালতের ১৭৭৩ সালের ১২ এপ্রিল তারিখের একটা শুনানির বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন জে. সি. সিন্‌হা। শান্তিপুরের যে-তন্তুবায়দের সততা সম্বন্ধে বিচারকের কোন সংশয়ের কারণ ছিল না তারা সাক্ষ্যে জানিয়েছিল যে, তাদের বেসরকারী ব্যাপারীদের জন্যে কাজ করা এবং কোম্পানির ফরমাশের বাইরে কোন জিনিস তৈরি করা নিষিদ্ধ ছিল, সেটা লঙ্ঘন করলে শারীরিক শাস্তি হত এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হত।***

অর্থনীতি-বহির্ভূত জবরদস্তি আর দেনার দাসত্ব-বন্ধনের সাহায্যে বিপুল পরিমাণ মুনাফা করত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। বোল্‌ট্‌স লিখে-ছেন, 'কোম্পানির গোমস্তারা এবং তাদের সঙ্গে সড় করে যাচেনদাররা (কাপড়ের গুণাগুণ পরীক্ষকেরা) জিনিসের যে-দাম স্থির করে দিত সেটা হত জিনিসটা অবাধে খোলা বাজারে যে-দামে বিক্রি হতে পারত তার চেয়ে ১৫ শতাংশ, এমনকি ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কম। কাজেই শ্রমের ন্যায্য দাম পেতে চেয়ে তন্তুবায়রা অনেক সময়ে অন্যান্যের কাছে কাপড় বিক্রি করতে চেষ্টা করত গোপনে, আর ইংরেজদের কোম্পানির, গোমস্তারা তন্তুবায়দের উপর নজর রাখার জন্যে 'পিওন' (পেয়াদা) লাগাত এবং কখনও-কখনও প্রায়-পরিসমাপ্ত থান কেটে নিয়ে যেত তাঁত থেকে।**** মনে হয়, কারিগরদের শ্রমের পরিমাত্রা বাড়ার ফলে কাপড় উৎপাদন কিছুটা বেড়েছিল কোন-কোন এলাকায়। জেম্‌স টেলার বলেন, ঢাকায় কাপড়ের উৎপাদন সর্বোচ্চ মাত্রায় চড়েছিল ১৯৮৭ সালে।

দালালির কাজে লাগাবার জন্যে ব্যাপারিক পুঁজি বেরিয়ে যেতে শুরু করেছিল উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে, — সতর-আঠার শতকে গড়ে উঠছিল যে সামাজিক শ্রমবিভাগ সেটার ভিত্তিতে অন্তর্বাণিজ্যের প্রসার ব্যাহত হয় তার ফলে। তাছাড়া — এন. কে. সিন্‌হা বলেন — উপর-তলার মোগলদের মধ্যে বিলাসদ্রব্যের চাহিদা কমে গিয়েছিল, — বাংলা হাত-ছাড়া হয়ে যাওয়াই শুধু নয়, সেটার আরও কারণ ছিল আফগানদের অক্রমণ এবং মারাঠাদের কোন-কোন দখল, এদের প্রধানদের প্রয়োজনাদি ছিল অপেক্ষাকৃত সাদাসিধে।

তবে কাপড়ের, বিশেষত সরেস থানগুলোর বিপণনে ইংরেজদের সুপরিকল্পিত এবং কড়া কবজার দরুন ঐসব কাপড়ের উৎপাদকদের অবাধে বাজারে পৌঁছবার কোন পথ ছিল না। তার ফলে সমস্ত রকমের যোগ্যতাসম্পন্ন তন্তুবায়দের রোজগার মাসে ৩ টাকার একটু এদিক-ওদিক হত, তাতে পরিবারের জীবনধারণ চলত, কিন্তু উৎপাদী সঞ্চয়নের পথ বন্ধ থাকত।

ওদিকে, কোম্পানির মুনাফা ছিল বিপুল। এক-থান গুড়া কাপড়ের জন্যে কোম্পানি দিত ৩ টাকা ৯ আনা, সেটা থেকে তন্তুবায় পেত মাত্র ৮ আনা; কিন্তু থানটা লণ্ডনে বিক্রি হত ৪৫ শিলিং ৬ পেনি বা ২২ টাকা ১২ আনায়। অবাধ বাজার থাকলে তন্তুবায় ঐ কাপড় বিক্রি করতে পারত ৭ টাকা ৬ আনায়। ভারতীয় ব্যাপারিক পুঁজি যদি সরাসরি ইউরোপীয় বাজারে পৌঁছতে পারত তাহলে সেটার কী পরিমাণ মুনাফা হত সেটা বোঝা দরকার, তার ফলে পণ্যটার দামে তন্তুবায়ের প্রাপ্য অংশ বাড়াবার বিষয়গত সম্ভাবনা সৃষ্টি হত।

তবে এই আপেক্ষিক ভাল অবস্থাও শেষ হয়ে আসছিল। এন. কে. সিন্‌হা মনে করেন, কৃষি নয়, হস্তশিল্পই ছিল বাংলার সমৃদ্ধির উৎস। কারিগরেরা ক্রমেই বেশি-বেশি পরিমাণে কৃষিকাজ ধরতে বাধ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দক্ষতা খোয়া যাচ্ছিল শুধু তাই নয়, যার ফলে তারা এমনসব অনন্যসাধারণ বস্তু পয়দা করতে পারত সেই শারীরিক ধাতও নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।*

তবে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পেরেছিল কিছু-

কিছু তন্তুবায়। যেমন, ১৭৯৩ সালে ঢাকায় বাণিজ্য তন্তুবায়দের তৈরি জিনিসের দাম কমিয়ে দিলে তারা সেটা প্রতিহত করার চেষ্টায় ব্যবহৃত সুতোর পরিমাণ কিংবা উৎকর্ষ নামিয়ে দিয়ে তৈরি-করা মালটাকে অপেক্ষাকৃত নিরেস করে দিয়েছিল। সাধারণভাবে, আঠার শতকের শেষ দশকে কতকগুলি ক্ষেত্রে তন্তুবায়রা চুক্তি সই করতে অস্বীকার করেছিল, শস্য আর তুলোর দর বাড়ার দরুন কাপড়ের বেশি দাম দাবি করেছিল, দরখাস্ত করেছিল কোম্পানির কাজ থেকে ছাড়া পাবার জন্যে।* বাংলায় কোম্পানির কর্মচারী আর দালালদের জবর-আদায়ের বিরুদ্ধে তন্তুবায়দের প্রতিরোধ এবং কাপড় কেনায় কোম্পানির একাধিকারের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ সম্বন্ধে বহু তথ্যের উল্লেখ করেছেন এন. কে. সিনহা।**

কারিগরদের উপর ইংরেজদের জবরদস্তির ব্যাপারটা সরিয়ে রেখেও ইউরোপীয়দের কণ্ট্র্যাক্টের অধীনে ভারতীয় হস্তশিল্পের মোটামুটি দুই শতাব্দী ধরে কাজের পরিণতি মূল্যায়ন করলে অনুকূল ফল পাওয়া যায় না। প্রথমত, ইউরোপে রপ্তানি হত তাঁতের জিনিস ছাড়া প্রায় কিছুই নয়, এতে অন্যান্য হস্তশিল্প ছিল নগণ্য। কণ্ট্র্যাক্টের পদ্ধতি আর শর্ত যা ছিল তাতে ভারতীয়দের মধ্যে পয়সা করতে পারত শুধু ব্যাপারীরা, কিন্তু শিল্প-উদ্যোগের কোন উপাদান পয়দা হত না আদৌ। টি. রায়চৌধুরী বলেন, এমনটা মনে করার কারণ আছে যে 'আঠার শতকের গোড়ার দিকে রপ্তানিবৃদ্ধি ঘটেছিল উপকূলের দিকে, উৎপাদন-কেন্দ্রগুলো সরে যাবার ফলে অংশত, আর একাধিকারী কোম্পানি উদ্বৃত্ত-টাকে অধিকতর পরিমাণে আত্মসাৎ করেছিল বলে, কিন্তু তাতে 'উৎপাদনের সমানুপাতিক বৃদ্ধি সূচিত হয় নি।'*** এইভাবে, রপ্তানী মালের একটা শিল্প সামগ্রিকভাবে চাঙ্গা হবার ফলে ভারতে এই ধরনের উৎপাদনের সাধারণ প্রসার ঘটল না। প্রকৃতপক্ষে, রপ্তানী মালের এই

শিল্পটার নিজেরও পুঁজিতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটল না, যা হতে পারত খরিদ্দার আর উৎপাদকের মধ্যে ন্যায্য সম্পর্ক থাকলে।

ভারতে বৃটিশ বিজয় আরম্ভ হবার ফলে কারেন্সি আর মালপত্রের পরিচলনে আঞ্চলিক আর ক্ষেত্রগত ধরনের 'যেসব পরিবর্তন ঘটে সেগুলো নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় এই অনুমানে – এদিক থেকে সেটা খুবই ফলপ্রদ। এইসব পরিবর্তন সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বাংলায়। ঐ বিজয়ের আগে মোগল সম্রাটদের রাজকোষে বার্ষিক আয় এক-কোটি টাকার কম না হলেও মুদ্রা কিংবা মূল্যবান জিনিসপত্র বাস্তবিকই বেরিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে কোন তথ্য নেই। কথাটা বিশেষত এই যে, কর পাঠাবার ব্যাপারে জগৎ শেঠদের কাজ-কারবার কিছু পরিমাণে এমনকি হিতকরই ছিল বাংলার পক্ষে, কেননা ১৭২৮ সালের পরে এইসব দাখিল-করা কর দিল্লীতে পাঠানো হত নগদে নয়, হুণ্ডি হিসেবে। এটা করা যেত তার কারণ এই যে, বাংলার বাইরে তাদের যা আয় ছিল সেটা এই প্রদেশে মোগলদের পাওনা কর মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তাই কর পাঠিয়ে দেবার ফলে প্রদেশটির মুদ্রা কারেন্সি কমে যেত না।* তাছাড়া বহির্বাণিজ্যে বাংলার উদ্বৃত্ত থাকত সবসময়েই।

ইংরেজদের বাংলা বিজয়ের পরে নতুন শাসকেরা আদায়-করা করের একটা মোটা অংশ স্থানীয় জিনিসপত্র কিনতে খরচ করলেও এখান থেকে মুদ্রা বেরিয়ে যাওয়া শুরু হয়। রাজকোষ থেকে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন মীর কাসিম (১৭৬৪), আর বাংলা দখলের পরে গোড়ার ক'বছরে ইংরেজ অফিসার আর কর্মচারীরা লুটে নিয়েছিল পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা। আঠার শতকের অষ্টম আর নবম দশকে বাংলার রুপোর কারেন্সি খরচ করা হত চীনা মালপত্রের জন্যে, আর পরে ইউরোপে রপ্তানি করার উদ্দেশ্যে নীল, তুলো এবং কৃষিজাত অন্যান্য কাঁচামাল আমদানির জন্যে ছাড়াও বাংলার বাইরে ভারতের অন্যত্র নতুন-নতুন অঞ্চল জয়ের জন্যেও। তার ফলে আঠার শতকের শেষাশেষি বাংলার লেনদেনে বার্ষিক ঘাটতি দাঁড়িয়েছিল ১৫ লক্ষ টাকা।** নগদ টাকার কমতি ছিল, আর কর-সংস্থা মারফত

সেটা জড়ো হয়েছিল ইংরেজদের হাতে, তাই স্থানীয় ব্যাপারিক আর মহাজনী পুঁজির অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে।

বৃটেনের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের উদ্বৃত্তটা হয়ে দাঁড়ায় আরও বেশি ভুয়ো। কোম্পানির তখনকার নির্বাহকেরা – যেমন সার জন শোর আর কর্নওয়ালিস – ব্যাপারটাকে গোপন করা তো দূরের কথা, বস্তুত সেটার উপর জোর দিতেন বৃটেনে তাঁদের বণিকতান্ত্রিক সম্প্রদায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলোচনায়। শোর বিশেষত বলতেন, বৃটেনের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের উদ্বৃত্ত থাকলে ভারতের রূপো বৃটেনের নিঃশেষ করে টেনে নিয়ে যাওয়াটা আটকায় না।* রূপো আর নগদ অর্থ বেরিয়ে যাওয়া এবং তার আনুষঙ্গিক মূল্যবৃদ্ধি বিশেষভাবে ক্লিষ্ট করেছিল বাংলাকে। রূপো এবং অন্যান্য ধন-সম্পদ সমানে বেরিয়ে যাবার হানিকর ক্রিয়া ঘটেছিল ভারতের সাধারণ সঞ্চয়ন প্রক্রিয়াক্ষেত্রে, এটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে পরিস্থিতিটা সাময়িকভাবে বদলেছিল বটে। ১৮০৬ সালে কমন্সসভায় বিভিন্ন বক্তা বলেছিলেন, ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের এমন উদ্বৃত্ত ছিল যেটাকে কর থেকে আয় দিয়েও আর পূরণ করা যাচ্ছিল না, তার ফলে ভারতে আবার মুদ্রা রপ্তানি করতে হচ্ছিল (বেসরকারী বণিকদের মারফত)।**

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সঞ্চয়নের পরিবেশের অবনতি ঘটার পাশাপাশি হস্তশিল্প উৎপাদের বিপণনে ভারতীয় ব্যাপারিক পুঁজির কাজ-কারবার কমে যাবার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। যেমন, বাংলার ব্যাপারিক পুঁজি শহরগুলি থেকে অনেকাংশে উচ্ছেদ হয়ে প্রচুর পরিমাণে চলে গিয়েছিল ভূসম্পত্তিক্ষেত্রে, যদিও অনুকূল অবস্থা থাকলে সেটা থেকে পয়দা হতে পারত বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান। বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার ফলাফল সম্বন্ধে একটা স্মারকলিপিতে (১৮১৫) বড়লাট মোয়রা সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন, ব্যাপারিক পুঁজি আর উদ্যোগ সরে চলে গিয়েছিল ভূসম্পত্তিক্ষেত্রে।***

যেমন আগে তেমনি এটা চালু হবার পরে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ক্রমেই আরও বেশি-বেশি প্রতিযোগিতা আর বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছিল শিল্পোৎপাদনেই শুধু নয়, তার উপর বাণিজ্য আর ক্রেডিটের প্রধান-প্রধান ক্ষেত্রগুলিতেও। বাংলায় জাহাজ-নির্মাণ আরম্ভ হলে অল্প কয়েক জন বণিকের ইউরোপীয় ধরনের জাহাজ পেতে সুবিধে হয়েছিল, তার ফলে তারা বৈদেশিক কারবারে স্বাধীনতা পেয়েছিল কিছুটা (বোম্বাই-য়ের জাহাজ-মালিকদের চেয়ে কম)। বিশেষত — উনিশ শতকের প্রথম দশকে — বিভিন্ন মার্কিন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান কোন বৃটিশ এজেন্সির বদলে বাংলার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কারবার করতে বেশি পছন্দ করত। এমন একজন ব্যবসায়ী ছিলেন রামদুলাল দে, তাঁর ধন-সম্পদের পরিমাণ ছিল মোটামুটি পাঁচ লক্ষ টাকার কম নয়। আমেরিকানরা তাঁর কাছ থেকে মোটা-মোটা টাকা ধার নিত, যদিও তাঁর সুদ অত্যধিক ছিল বলে তারা অসন্তোষ প্রকাশ করত। কিন্তু ১৮১৫ সালের পরে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য হস্তগত করেছিল বিভিন্ন বৃটিশ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, যেমন প্লামার অ্যাণ্ড আলেকজাণ্ডার। ১৮১৩ সালে রামদুলাল দে-র জাহাজ ছিল মাত্র একখানা, সেটা রেজিস্ট্রি করা ছিল কলকাতা বন্দরে (এ. ত্রিপাঠী বলেন, এটা হল একেবারে মুছে যাবার আগে এই জাহাজ-মালিকের শেষের মর্মান্তিক প্রকাশ)।* এঁর চেয়ে কপাল ভাল ছিল কোন-কোন পার্শী এবং মুসলিম জাহাজ-মালিকদের: জাহাজ ছিল দো-রাবজীর তিনখানা (১৮০৩-১৮০৫ সালে), দোরাবজী বিরামজীর ছ'খানা (১৮০৬), বুরামজী কোভাজীর দু'খানা (১৮১৩), সৈয়দ হোসেন এবং সৈয়দ মহম্মদের একখানা করে (১৮০৩), ইত্যাদি।** আমেরিকার সঙ্গে সরাসর সংযোগ নষ্ট হল, উপকূল-বাণিজ্যের অবনতি ঘটল, কমে গেল কোন-কোন ভারতীয় জিনিসের রপ্তানি — এই সবকিছুর ফলে বাধ্য হয়ে বাংলার বণিকেরা বৃটিশ পণ্যদ্রব্য বিক্রির কাজে নামে, তার দরুন তারা আর্থিক ব্যাপারে উত্তর ভারতের পোদ্দারদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

এখানে বলা দরকার, বাংলার স্থানীয় বণিকদের অবস্থা পশ্চিম উপকূলের বণিকদের মতো ভাল হয় নি কখনও। ত্রিপাঠী বলেন, ১৮৩৩ সালের মধ্যে বাংলায় কোন ব্যবসায়ীদের বহির্বাণিজ্য করতে বড় একটা দেখা যায় নি, আর উপকূল-বাণিজ্য ছিল গণ্ডিবদ্ধ। 'অন্তর্দেশীয় অঞ্চলগুলিতে ইংরেজ বণিকদের প্রতিযোগিতা ছিল মহা-হানিকর, আর অধঃপাতটা শুধু কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছিল ফরাসী বৈপ্লবিক যুদ্ধ এবং নেপোলিয়নীয় যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে বৃটিশ আর মার্কিন বাণিজ্যের প্রসারের ফলে।* এইসব যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বেসরকারী ইংরেজ বণিকেরা ঝাঁকে-ঝাঁকে গিয়ে পড়েছিল ভারতের উপকূলে, তখন অ-লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলার বণিকদের বহির্বাণিজ্য।

বাণিজ্যক্ষেত্র থেকে উৎখাত হয়ে প্রধান-প্রধান ভারতীয় ব্যবসায়ী ধরেছিল মহাজনী কারবার, আর – 'যেটা হল আরও নিকৃষ্ট ব্যাপার – জমির দাম বেড়ে চলতে থাকার ফলে তারা সেখানে বিনিয়োগ করতে ঝোঁকে, তার দরুন আবার আরও বেড়ে যায় জমির দাম। আসল চাষীরা পড়ে যায় পুঁজিপতি-নেহাই আর জমিদার-হাতুড়ির মাঝখানে, – পুঁজিপতি দাদন দিত উৎপাদনের খরচ-খরচার জন্যে'।**

বাংলায় ব্যাপারিক আর মহাজনী পুঁজি লাগানো হত কৃষি-উৎপাদের কারবারে এবং জমি কেনার জন্যে, সেটা শহরগুলিতেও, বিশেষত কলকাতায়; আর তাছাড়া ঐ পুঁজি ইউরোপীয় ব্যবসায়ী আর ঝুঁকিদার কারবারিদের সাহায্য করত, এতে সেটা হত বিভিন্ন বৃটিশ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে ছোট-তরফের অংশীদার; ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিকিউরিটিতেও বিনিয়োজিত হত এই পুঁজি – কিন্তু উৎপাদী প্রয়োজনে স্থানীয় শিল্পে বিনিয়োজিত হত না।

এই পরিস্থিতিতে ভারতে দেখা দেয় ইংরেজ নির্মায়কেরা (ম্যানুফ্যাকচারার) – এটাকে কিছুটা অপ্রত্যাশিত মনে হতে পারে আপাতদৃষ্টিতে। প্রকৃতপক্ষে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কিছু-কিছু ইংরেজ নির্মায়ক বসতি করে ভারতে, প্রধানত কলকাতায় আর বোম্বাইয়ে,[৩] এমনকি মাদ্রাজেও; এইসব জায়গায় তারা বিভিন্ন কর্মশালা খোলে,

---

সেগুলোতে নিয়োগ করে ভারতীয়দের। ১৮১৩ সালে বৃটেনের বিভিন্ন পার্লামেণ্টারি কমিটিতে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ নিয়ে বিতর্কের মধ্যে এই বলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় যে, ইংরেজ মনিবদের পরিচালনাধীনে আধুনিক প্রযুক্তি শিখে নিয়ে ভারতীয়রা সেই জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারবে স্বতন্ত্র উদ্যোগী-কারবারি হিসেবে, কিংবা তারা কাজ করবে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জন্যে। একজন বক্তা বলেছিলেন, 'প্রায় সমস্ত স্থানীয় মজুর দেশীয় মালিকদের চেয়ে ইউরোপীয়দের জন্যে কাজ করতেই বেশি পছন্দ করবে, তার আংশিক কারণ দেখানো হয় দুটো: ইউরোপীয়রা মাইনে দিত বেশি নিয়মিতভাবে, আর এতে তারা আরও দ্রুত বৃত্তিশিক্ষার ভাল সুযোগ পায়।'*

তবে শেষোক্ত যুক্তিটা খুব প্রত্যয়জনক ছিল না, কেননা শিক্ষানবিসী-কাল কম-বেশি সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়ই। প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজরা নিজেরাই স্বীকার করত ভারতীয় শ্রমিকেরা ছিল খুবই দক্ষ এবং উদ্যমশীল। কর্নেল টি. মুন্‌রো বলেছিলেন, 'ভারতীয়রা দক্ষ শ্রমিক, আর যেকোন ইউরোপীয় বৃত্তিতে তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা থাকে, সেটাকে তারা মানিয়ে নিতে পারে, সেটা যে-আকারে তাদের চাহিদা মেটাতে পারে সেইভাবে তারা বিকশিত করতে পারে খুব কম সময়ের মধ্যেই।'** ভারতীয়রা দীর্ঘকাল যাবৎ ইউরোপীয়দের মজুরি-শ্রমিক হয়ে থাকবে, এই মর্মে আশা প্রসঙ্গে একজন সাক্ষী বলেছিলেন, 'যারা মজুরি করবে তারা কালক্রমে চালু করবে নিজেদের কর্মশালা।'***

কিন্তু শিল্পজাত জিনিসপত্র তাদের যা প্রয়োজন সেটা ভারতীয়রা নিজেরা মেটাতে পারে না, এটা প্রমাণ করার জন্যে নাছোড় হয়ে চেষ্টা করে চলেছিলেন কমিটির সদস্যরা। বৃটিশ পণ্যদ্রব্যের জন্যে ভারতীয়দের মধ্যে চাহিদা মিটল না, এমন কোন দৃষ্টান্ত জানা আছে কিনা, এই প্রশ্নে দু'বার না জবাব দিয়েছিলেন কোম্পানির একজন পুরন আমলা সার এস. ডাব্লিউ. ম্যালেট। ভারতীয়দের এমন ব্যবসাবাণিজ্য আর

শিল্প ছিল কিনা যাতে পণ্যদ্রব্য তাদের যা প্রয়োজন সেটা তারা নিজেরাই মেটাতে পারত, এই প্রশ্নের দ্ব্যর্থহীন জবাবে তিনি বলেছিলেন, তাদের জিনিসপত্র যা প্রয়োজন সেটা পুরোপুরি মেটাবার মতো শিল্প তাদের ছিল। কমিটির সদস্যরা কোন-কোন উত্তরসূচক প্রশ্ন করেছিলেন— যেমন, ভারতীয়রা কৃষি আর শিল্প উভয়ত সমৃদ্ধ জাতি কিনা। তাতে উত্তরটা ছিল সংক্ষিপ্ত এবং হাঁ-সূচক।*

বাংলা প্রেসিডেন্সিতে ভারতীয় শিল্প-উদ্যোগে কোম্পানির পৃষ্ঠপোষণের গোড়ার দিককার একটা দৃষ্টান্ত হল বীরভূমে (বাংলায়) একটা লোহা কারখানা। স্থানীয় উৎকৃষ্ট আকরিক থেকে একটা উন্নত প্রণালীতে লোহা উৎপাদনের জন্যে প্রথম দরখাস্ত করেছিলেন ক্ষুদ্র নারায়ণ ১৭৭৪ সালে। কিন্তু কোম্পানির পরিষদ খুবই চড়া কর ধার্য করেছিল (বছরে ৮ হাজার টাকা), তাই সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হল না।

বর্ধমানের পশ্চিমে কোম্পানির অধিকৃত রাজ্যক্ষেত্রে লোহা প্রস্তুত করার একাধিকার এবং লোহার শুল্কমুক্ত বাণিজ্য করার অধিকার প্রার্থনা করে তিন বছর পরে বাংলার কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত পেশ করেছিলেন ফারকুহার নামে একজন ব্যবসায়ী। তাতে বলা হয়েছিল বিতর্কমূলক প্রশ্নগুলো স্থানীয় কর্মকর্তাদের এক্তিয়ারে থাকবে না, তারা আনুষঙ্গিক কাজ হিসেবে বাণিজ্য করত, তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকতে পারত ঐসব প্রশ্নে, সেগুলোর মীমাংসা হওয়া চাই লাটসাহেবের পরিষদে। ফারকুহার বলেছিলেন তিনি কোম্পানিকে গুলি আর গোলা সরবরাহ করবেন ইউরোপীয় গোলা-গুলির যা তার ৮০ শতাংশ দামে। স্থানীয় জায়গিরদার আর রাজারা তাঁর ক্রিয়াকলাপে আপত্তি তুললেও ফারকুহার কোম্পানির সম্মতি পেয়েছিলেন অধিকন্তু চুল্লিগুলোর নির্মাণকাজ শেষ করার জন্যে তাঁকে ১৫ হাজার টাকা আগাম পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল ১৭৭৯ সালে।

পরবর্তী দশ বছরের নথিপত্রে প্রধানত আছে ফারকুহারের কারখানা থেকে কর-আদায়ের ব্যাপারে 'নেটিভদের' অর্থাৎ স্থানীয় জমিদারদের দাবির কথা। তাঁর লোহা কলকাতায়ও বিক্রি হত মন-প্রতি ৫ টাকা দরে, যেখানে বৃটেনের লোহার এক-মনের দাম ছিল ১০ টাকা

———————

১১ আনা (অর্থাৎ আগেরটা টাকায় প্রায় ৭ কিলোগ্রাম, আর পরেরটা তার অর্ধেক)। ১৭৮২ সালে ফারকুহার লোহা উৎপাদনের কারবার ছেড়ে দিয়ে বারুদ উৎপাদনের কণ্ট্র্যাক্ট নেন। ১৭৯৫ সালে জমিদার এই সম্পত্তি দখল করে নেয় (ঐ উৎপাদনের শুল্ক ধার্য করেছিল জমিদার), তখন থেকে চলতে থাকে গুচ্ছ-গুচ্ছ মামলা-মকদ্দমা।

তার পরবর্তী বছর-পঞ্চাশেকে কী ঘটেছিল বীরভূমের কারখানার ব্যাপারে সে-সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত তথ্য আমাদের হাতে নেই। ১৮৪৫ সালের একটা বিবরণী (সে-সম্বন্ধে আরও বলা হবে পরে) থেকে দেখা যায় ধাতু-শিল্পে উৎপাদনের প্রযুক্তিগত ভিত্তি চিরাগত প্রযুক্তির চেয়ে উঁচু স্তরে বজায় ছিল, তবে সেটা ছিল সমসাময়িক মাত্রার চেয়ে অনেক নিচে। বিশেষত জালানি হিসেবে তখনও ব্যবহৃত হচ্ছিল কাঠকয়লা।

ইউরোপীয় নমুনা অনুসারে ভারতে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায় এ. এফ. টাইট্‌লেরের একখানা বইয়ে — ইনি বাংলায় চাকরি করেছিলেন আট বছর। বইখানার সংশ্লিষ্ট অংশে তিনি বেসরকারী ইংরেজ ব্যবসায়ীদের দেখান যে, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে কোম্পানির একাধিকার লোপ হলে তার ফলে তাদের কোন নিশ্চিত কিংবা ঝটিতি সুবিধে হত না। তাদের যেসব বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হত নিশ্চয়ই সেগুলোর মধ্যে টাইট্‌লের সাধারণভাবে উল্লেখ করেন এইগুলো: কোম্পানির জোর আর কর্মশক্তির দরুন স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সেটার প্রতি মর্যাদা, কোম্পানির কর্মচারীদের অনিবার্য প্রতিযোগিতা, কোম্পানির কাজ-কারবার আর দেশটির সম্পদাদি সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি থেকেই প্রাপ্তব্য সুবিধা। আর আর্থনীতিক দুষ্করতার মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন এইগুলো: চাষী আর মজুরদের দশা, যার দরুন ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্যের কাটতি ঢিলে না হয়ে পারে না; তাছাড়া ভারতীয়দের ধর্মীয় কুসংস্কার, রীত-রেওয়াজ এবং আসবাব আর কাপড়-চোপড়ের সাদাসিধে ধরনধারন।

ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্য যেসব অনুরূপ স্থানীয় পণ্যদ্রব্যের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হত নিশ্চয়ই সে-সম্বন্ধে টাইট্‌লের আরও বিস্তারিত বিবরণ দেন। সেইসব স্থানীয় পণ্যদ্রব্য ছিল — কলকাতায় ইউরোপীয় ব্যবস্থাপনে এবং কানপুরে আর দিনাজপুরে স্থানীয় কারিগরদের তৈরি-করা পাদুকা আর ঘোড়ার সাজ; মুঙ্গেরে তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র, ছোরা-ছুরি

আর ছুরি-কাঁটা-চামচ ইত্যাদি; ওড়িষ্যার বালাসোরে তৈরি ছুরি-কাঁটা-চামচ ইত্যাদি আর তালা, চন্দননগরে তৈরি কাপড়-চোপড়; ইউরোপীয় ব্যবস্থাপনে এবং সেটা ছাড়াই তৈরি বাসনকোসন; কলকাতায় এবং অন্যত্র তৈরি বিভিন্ন রকমের গাড়ি, আর তাছাড়া বিভিন্ন ইউরোপীয় নমুনার অনুকরণে তৈরি-করা হরেক রকমের এটা-ওটা জিনিস (সেগুলোর মধ্যে জ্যাম এবং ভেজাল-দেওয়া মদ)। তিনি আরও বলেন, শ্রমশক্তির দাম ছিল এতই কম যাতে সবার সেরা মালমশলা দিয়ে তৈরি-করা পণ্যদ্রব্যও পাইকারী বিক্রি হতে পারত ইউরোপে তৈরি অনুরূপ জিনিসপত্রের সিকি দামে।

ঠিক বটে, এগুলোর সব জিনিসই খুবই সরেস বৃটিশ মালের মানের সমকক্ষ ছিল না, কিন্তু ইংরেজদের অপেক্ষাকৃত বিনত 'জাতভাই' পোর্তুগিজরা, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা, আর ধনী ভারতীয়রা, যারা ইউরোপীয় ধাঁচের পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করতে শুরু করছিল, তাদের পক্ষেও স্থানীয় জিনিসপত্রের গুণ ছিল বেশ সন্তোষজনক। টাইট্লের বলেন, ভারতে তৈরি পাকা চামড়া ইউরোপীয় জিনিসটার মতো তত টেকসই না হলেও অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল অন্যান্য দিক থেকে: এটা ছিল অপেক্ষাকৃত হালকা এবং নরম, আর পাদুকা একেবারে নদনদে হয়ে যাওয়া অবধি তেমনিই থাকত। ভারতীয় পাদুকা যদি ইউরোপীয় পাদুকার তুলনায় অর্ধেক সময় পরা যেত তবু এটাই ছিল বেশি বাঞ্ছনীয়, কেননা — একটা দৃষ্টান্ত — ইউরোপীয় কারিগরের তত্ত্বাবধানে তৈরি একজোড়া জুতোর দাম ছিল ২ থেকে ৩ টাকা, আর দেশীয় কারিগরের তৈরি জুতো-জোড়ার দাম ছিল ৮ আনা থেকে ১ টাকা, অর্থাৎ ইউরোপ থেকে আমদানি-করা জুতোর দামের যথাক্রমে সিকি ভাগ এবং আট-ভাগের একভাগ। অন্য কোন-কোন আকর-দলিলে দেখা যায়, ভারতে তৈরি ইউরোপীয় ধাঁচের জুতো আগে আর্দ্রতা রোধ করতে পারত কম, এই জুতো যে পরত সে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। সেটা চামড়া-পাকানো খারাপ হত বলে, কিন্তু পরে এই জুতো আরও ভাল হয়েছিল। *

কলকাতায় তৈরি বিভিন্ন রকমের গাড়ি আর হরেক রকমের ঘোড়ার

সাজের দাম পড়ত ১৪ থেকে ১৬০ টাকা, দামটা বেশি হত ইউরোপ থেকে আমদানি-করা উপাংশগুলোর চড়া দামের দরুন। সাধারণভাবে সবাই বলত, কলকাতায় তৈরি গাড়ি ছিল ইউরোপ থেকে আনানো গাড়ির চেয়ে সরেস। স্থানীয় কাঠ ছিল স্থানীয় জলবায়ুর পক্ষে বেশি উপযোগী, আর ইউরোপীয়দের তত্ত্বাবধানে কাজ-করা স্থানীয় কারিগর-দের কারিগরী দক্ষতা ছিল উঁচু মানের। কলকাতায় তিন-চারটে প্রতিষ্ঠান গাড়ি তৈরি করত উঁচুদরের মহাশয়দের জন্যে, আর অপেক্ষাকৃত কম সংগতিসম্পন্ন লোকের জন্যে কিছুটা সস্তা অথচ ফ্যাশনদোরস্ত গাড়ি তৈরি করত 'নিচু' ইউরোপীয়রা আর ইউরেশীয়রা। সমস্ত লোহার জিনিস তৈরি-করা, রঙ-করা এবং অন্যান্য ফিনিশিং হত সেখানেই, এসব কাজ হত ইউরোপীয় কারিগরির সমপর্যায়েরই। বিভিন্ন কারি-গরের গড় মাসিক রোজগার হত এইরকম: গাড়ি-নির্মাতা আর কর্ম-কার – ৮ টাকা, রঙমিস্ত্রি – ১০ টাকা, আপহোলস্টারার – ৭ টাকা, ঘোড়ার সাজ প্রস্তুতকারক – ৬-৮ টাকা।*

টাইট্লের বলেন, ইউরোপীয়দের জন্যে কাজ করত যেসব সূত্রধর, আসবাব-নির্মাতা আর সেকরা তাদের দক্ষতা ছিল সেরা-সেরা ইংরেজ কারিগরদের সমান।** একজন অভিজ্ঞ জয়েনারের রোজগার ছিল ৬ থেকে ১০ টাকা, আর সেকরার রোজগার ছিল একটু বেশি। হাতিয়ার ছিল খুবই সাদাসিধে: একটা কেঠো হাতুড়ি, করাত, রেঁদা, তুরপুন, দুমুখো কুড়ুল, সেটাকে ব্যবহার করা হত বাটালি হিসেবেও।

ইউরোপীয় ধরনের জাহাজ বাংলায় নির্মিত হত নিশ্চয়ই অনুরূপ হাতিয়ার দিয়েই। বাংলায় জাহাজ-নির্মাণ শুরু হয়েছিল বোম্বাইয়ের চেয়ে পরে, তবে সেটার সবচেয়ে বেশি শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল (আঠার শত-কের শেষের দিক থেকে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে) নেপোলিয়নীয় যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে। আমাদের সমসাময়িক একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী মনে করেন ইউরোপীয় ধরনের জাহাজ-নির্মাণ বাংলায় শুরু করেছিলেন কর্নেল হেনরি ওয়াট্সন ১৭৮০ সালে; যুদ্ধজাহাজ আর বাণিজ্য-জাহাজ নির্মাণ, মেরামত এবং সজ্জিত করার উপযোগী ডকইয়ার্ড নির্মাণের জন্যে

তিনি কোম্পানির কাছ থেকে একটা জমি খয়রাত পেয়েছিলেন খিদির-পুরে। এই ডকের জন্যে তাঁর খরচ হয়েছিল দশ-লাখ টাকা, কিন্তু ১৭৮১ সালেই তিনি ভাসিয়েছিলেন ৩২টা কামানের একখানা ফ্রিগেট, আর তারপর 'সারপ্রাইজ' নামে আর-একখানা ফ্রিগেট, যা কোম্পানি ১৭৮৩ সালে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মাসিক ১০ হাজার টাকায় ভাড়া নিয়েছিল সরকারী কাগজপত্র বৃটেনে পাঠাবার জন্যে। আগের ফ্রিগেটখানাকে কোম্পানি ব্যবহার করত চীনে আফিম পাঠাবার জন্যেও। ১৭৮০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে এই ডকইয়ার্ডে জাহাজ নির্মাণ করা হয়েছিল মোট অন্তত ৩৫খানা, সেগুলোকে পরে কিনে নিয়েছিলেন জেম্‌স কিড্। ভারতীয় চাল বৃটেনে রপ্তানি শুরু হয়েছিল আঠার শতকের শেষ দশকে, তখন ভারতে নির্মিত জাহাজের জন্যে ফরমাশ বেড়ে যায়। ১৮০০ থেকে ১৮১৩ সালের মধ্যে মোট ৬৫ হাজার ডিসপ্লেসমেণ্টের ১৪৬খানা জাহাজ নি-র্মিত হয়েছিল, আর ১৮১৪ থেকে ১৮২১ সালের মধ্যে ৯৬খানা – মোট ডিসপ্লেসমেণ্ট ৪১ হাজার ৭শ' টন।*

আর একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী বলেন ইউরোপীয় ধরনের জাহাজ-নির্মাণ বাংলায় শুরু হয়েছিল উল্লিখিত সময়ের দশ বছর আগে, আর সেটা হুগলীতে; তিনি বলেন, সেখানকার স্লিপওয়ে দিয়ে জলে নামানো হয়েছিল অন্তত ২৭২খানা জাহাজ, যেগুলোর মোট ডিসপ্লেসমেণ্ট ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার টনের বেশি। প্রাচীনকালে আর মধ্যযুগে ভারতীয় নৌবাহ সম্বন্ধে আর. কে. মুখার্জির আগ্রহজনক বিচার-বিশ্লেষণের শেষাং-শে আরও বিস্তারিত তথ্যাদি রয়েছে কলকাতায় জাহাজ-নির্মাণ সম্বন্ধে। জাহাজ নির্মিত হয় ১৭৮১ থেকে ১৮০০ সালে ৩৫খানা (১৭ হাজার টন), ১৮০১ সালে ১৯খানা (১০ হাজার টন), ১৮১৩ সালে ২১খানা (১০ হাজার ৪শ' টন); ১৮০১ থেকে ১৮২১ সালে হুগলীতে নির্মিত হয় মোট ২৩৭খানা জাহাজ, সেগুলোর ডিসপ্লেসমেণ্ট ১,০৫,৭০০ টন, দাম – ২ কোটি টাকা (টন-প্রতি গড়ে ২০০ টাকা)। এইসব উপাত্ত কাল আর স্থানের দিক থেকে বেখাপ, – বাংলায় জাহাজ-নির্মাণের মোট পরি-মাণের যথাযথ চিত্র পেতে সেগুলো সহায়ক নয়; তবে এই শিল্পের আয়-তন ছিল বিশাল, আর জাহাজগুলো ছিল বেশ বড়-বড় (এক-একখানা

জাহাজ প্রায় ৫০০ টন), সেটা স্পষ্টই। ডকইয়ার্ডে কাজ করত ভারতীয়রা, কিন্তু প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপন বোম্বাইয়ের মতো নয়, এখানে সেটা করত ইংরেজ অধ্যক্ষরা। জাহাজ তৈরি করা হত স্থানীয় দারু দিয়ে, সেটা ছিল বোম্বাইয়ে যেমনটা তেমনিই সরেস।

আবার দেখা যাক আকর-দলিলে কী আছে। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে জাহাজের জন্যে চাহিদা বেড়েছিল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল ইউরোপের দারু থেকে – তখন ভারতীয় জাহাজ-নির্মাণ সম্বন্ধে আগ্রহ হয়েছিল বিশেষত প্রবল। বৃটিশ জাহাজ-নির্মাণের কেন্দ্র সরিয়ে ভারতে নিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে পর্যন্ত কমন্স-সভায় আলোচনা হয়েছিল ১৮০১ সালে নভেম্বর মাসে – ভারতে কম-দামে প্রচুর সরেস দারু পাওয়া যেত বলে সুবিধে ছিল বেশি।

বাংলায় জাহাজ-নির্মাণ সম্বন্ধে এ. ল্যাম্বার্টের একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৮০৩ সালে। তাতে বলা হয়েছিল, ১৭৮১ সাল নাগাদ কলকাতায় নির্মিত হয়েছিল ছোট-ছোট দু'খানা মাত্র জাহাজ, কিন্তু ঐ বছরই কর্নেল ওয়াট্‌সন ভাসিয়েছিলেন একখানা ৫০০-টনা জাহাজ, তাতে চড়ানো যেত ৩২টা কামান (এর থেকে দেখা যায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের হাজির-করা উপাত্তগুলির মধ্যে পার্থক্য নগণ্য)। তার পরের ২০ বছরে চালু করা হয়েছিল হুগলীর ৩৮-খানা জাহাজ আর ৩৯খানা অন্যান্য ছোট-ছোট পোত (তার মধ্যে একখানা নির্মিত হয় পাটনায়) – মোট দাম ৩৬ লক্ষ টাকা, আর বাংলা প্রেসিডেন্সির মধ্যে চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট এবং অন্যান্য জায়গায় যেগুলি নির্মিত হয়েছিল সেগুলো সমেত ছিল ৫৩ খানা জাহাজ আর ৯৩খানা ছোট-ছোট অন্যান্য পোত (মোট ৩৯ হাজার টন), দাম ৫১ লক্ষ টাকা। আর ল্যাম্বার্ট বলেন, কলকাতায় তৈরি জাহাজগুলি ছিল যথার্থই উঁচু মানের।

বাংলার জাহাজের নাব্য-গুণ, মজবুতি আর কম-দামের উচ্চ প্রশংসা করেন ল্যাম্বার্ট, – এইসব জাহাজ বিক্রি হত উৎপাদন-পরিব্যয়ের চেয়ে ৩০-৫০ শতাংশ বেশিতে। 'বড়-বড় জাহাজের জন্যে আবশ্যক দারু ইংলণ্ডে দুষ্প্রাপ্য, এদিকে এদেশের মন্ত্রিসভা নজর দেবেন বলে আশা করা যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের জাহাজের বেলায় যা সেই অনুপাতে অপেক্ষাকৃত সস্তায় সবচেয়ে বড়-বড় মাপের জাহাজ বাংলায় নির্মিত

হতে পারে, কেননা বড় জাহাজের জন্যে প্রয়োজনীয় দারুর দাম এখানে আমাদের দেশের মতো অনুপাতে বেশি হয় না।

ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ বাংলায় নির্মাণ করার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার জন্যে বহু হিসাব হাজির করেন ল্যাম্বার্ট। তবে তিনি আরও বলেন: 'জাহাজ নির্মাণের জন্যে ইংলণ্ড থেকে সংগ্রহ করতে হবে দারু ছাড়া অন্যান্য প্রায় প্রত্যেকটা জিনিস — লোহা আর লোহার জিনিস, নোঙর, দড়িদড়া, পালের কাপড়, টিন, তামা, পেরেক, বোলট্টু, জাহাজের বাতি ইত্যাদি হরেক রকমের জিনিস, খোদকারের তৈরি জিনিসপত্র, কামান, গোলন্দাজের মালপত্র, পাম্পের সরঞ্জাম, ইত্যাদি, এই সবকিছু বাবত এখানে খরচ পড়ে সমুদ্রে ভাসাবার জন্যে সজ্জিত জাহাজের সমস্ত খরচ-খরচার পুরো দুই-পঞ্চমাংশ।'*

এই বিবেচনাধারাটা লক্ষণীয়, কেননা এতে দেখা যাচ্ছে, অবস্থা যখন ছিল ভারতীয় জাহাজ-নির্মাণের পক্ষে খুবই অনুকূল তখনও উপ-নিবেশটিকে প্রযুক্তির দিক থেকে উপনিবেশভোগী দেশটির মুখাপেক্ষী করে রাখার প্রয়োজনটা কখনও ভোলে নি ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকেরা। তবে সরকারী দলিলপত্রের তথ্যাদি থেকে দেখা যায়, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতায় উৎপন্ন হত আসবাবপত্র, লোহা ইস্পাত সোনা আর রুপো দিয়ে তৈরি বহু জিনিস এবং প্রায় সমস্ত রকমের চামড়ার জিনিসই শুধু নয়, অধিকন্তু জাহাজের লোহা দিয়ে তৈরি নানা অংশও। ** বাংলায় জাহাজ-নির্মাণের এই শাখায় পুরোপুরি আনুকূল্য করা হলে বোম্বাইয়ের মতো স্টীমচালিত জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারত।

ইউরোপীয়রা ভারতে যেসব শিল্পোৎপাদন চালু করেছিল সেগুলো সম্বন্ধে তথ্যাদির বিবরণ শেষ করতে গিয়ে মুদ্রণের কথাটাও উল্লেখ করা দরকার। এক্ষেত্রে প্রথম চেষ্টা করেছিলেন বি. পারিখ সতর শত-কের অষ্টম দশকে, কিন্তু তিনি কৃতকার্য হন নি। এ. গুহ বলেছেন, প্রথম ভারতীয় মুদ্রাকর হলেন রুস্তমজী কুরসেতজী। ১৮০০ সালে ডেনমার্ক মিশনারিরা বাংলা মুদ্রাক্ষর তৈরি করার একটা ঢালাইঘর

স্থাপন করেছিলেন শ্রীরামপুরে, তাতে কারিগর ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। ১৮১২ সালে এফ. মার্জাবান নামে একজন পার্শী গুজরাটী মুদ্রাক্ষর ব্যবহার করার প্রথম ছাপাখানা চালু করেছিলেন; ঐ বছরই গুজরাটী মুদ্রাক্ষর নিয়ে আর-একটা ছাপাখানা খোলেন জিজিভাই ছারঘর, তিনিও পার্শী। তাঞ্জোরে স্থানীয় এক রাজা ১৮১৫ সালে নিজ ছাপাখানায় কয়েকখানা বই ছাপিয়েছিলেন মারাঠী আর সংস্কৃত ভাষায়। পার্শীদের দুখানা ধর্মীয় বই বেরিয়েছিল ঐ বছরই। এইসব ছাপাখানায় কাজ সংগঠিত হত কিভাবে সে-সম্বন্ধে কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে সেটা ছিল ম্যানুফ্যাকচারি ধরনের।

টাইট্‌লের মনে করেছিলেন ক্রমেই বেশি-বেশি ইউরোপীয়রা ভারতে গিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করবে, তার ফলে ভারতীয়দের উৎপাদনে উন্নতি ঘটবে, – তাদের যা ধৈর্য আর অধ্যবসায় ছিল তাতে তারা যে-কোন জিনিস পুনরুৎপাদন করতে পারত দক্ষ কারিগরদের সাহায্যে।* সেটা প্রতিপন্ন হল না দুটো দিক থেকে: এক, খুদে ইউরোপীয় শিল্পপতিরা ব্যাপকভাবে ভারতে গেল না, আর বৃটিশ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ভারতে যেতে শুরু করেছিল বড়-বড় মিল্‌-এর আকারে – সেটা শুধু ৪০-৫০ বছর পরে; আর দুই, যেসব ভারতীয় কারিগর ইউরোপীয় ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করত তারা কোন লক্ষণীয় মাত্রায় খুদে পুঁজিপতিতে পরিণত হল না, কেননা তাদের না ছিল আর্থিক ভিত্তি, না ছিল প্রযুক্তিগত ভিত্তি, আর ভারতীয় ব্যাপারিক পুঁজি ইউরোপীয় ধরনের শিল্পোৎপাদনের দিকে ঝুঁকল না, – কিছুটা পরিবর্তিত হলেও চিরাগত কর্মক্ষেত্রেই থেকে গেল এই পুঁজি।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ভারতীয় বণিক এবং কারিগরদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা

আমি আগেই বলেছি, কোম্পানির কাজ-কারবারে ভারতীয় বণিকেরা যে-পরিমাণে আর কড়ারে জড়িত ছিল সেটা বিভিন্ন ছিল বিভিন্ন সময়ে আর জায়গায়, আর তাদের রাজনীতিক সম্পর্ক গড়ে উঠত তদনুসারে।

গুজরাটী মহাজনেরা ইংরেজদের সামরিক-রাজনীতিক খিদমত করত সতর শতকের গোড়ার দিকে পর্যন্ত। রাজপুতদের কোন আক্রমণ আসন্ন হলে তারা হুঁশিয়ারি জানাত সুরাটে ইংরেজ বণিকদের। গুজরাটের উপকূল বরাবর ইউরোপীয় কল-কারখানাগুলো সুরক্ষিত ছিল বলে পরস্পর-ধ্বংসকর বিরোধের সময়ে সেগুলো হত ধনী ভারতীয় বণিকদের আশ্রয়-স্থল। যেমন, ১৬৬৪ সালে সুরাটে শিবাজীর হামলার সময়ে শুধু ব্রিটিশ আর ওলন্দাজ কল-কারখানাগুলো নিজেদের অবস্থান বজায় রাখতে পেরেছিল তাদের কামানের জোরে। সতর শতকের শেষের দিক থেকে বোম্বাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল গুজরাটী বেনিয়া-দের জন্যে।

ইংরেজ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের সংগ্রামের উৎকণ্ঠিত দিনগুলিতে গুজরাটী বণিকেরা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতি পরম বিশ্বস্ত ছিল, তারা কোম্পানিকে সমস্ত রকমের রসদাদি আর ক্রেডিট দিয়ে সাহায্য করত। বিভিন্ন শহরের বড়লোকেরা অনেক সময়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করত তাদের শহরে কোম্পানির ক্ষমতা আর এক্তিয়ার প্রসারিত করার জন্যে। গুজরাটী বেনিয়ারা আর পার্শীরা কোম্পানির প্রশাসনে উপদেষ্টা আর এজেণ্ট হিসেবে খিদমত করত। যেমন, কয়েক পুরুষ ধরে যারা পেশোয়াদের জন্যে কাজ করেছিল এমন দুটো পার্শী আমলা পরিবার মহারাষ্ট্র বিজিত হবার পরে নতুন, ইংরেজ মনিবদের চাকরি নিয়েছিল। ১৮১৮ থেকে ১৮২৭ সালে বোম্বাইয়ের লাট এম. এল্‌ফিন্‌স্টোন পুনা-তে পেশোয়ার দরবারে রেজিডেণ্ট থাকার সময়ে (১৮১১-১৮১৭) মিশনের অন্যতম কর্মচারী কুরশাটজী মোদির সেবাকার্য খুবই মূল্যবান বলে গণ্য করেছিলেন। স্থানীয় বিষয়াবলি সম্বন্ধে খুবই ওয়াকিবহাল এই পার্শী ইংরেজদের খিদমত করেছিল নিষ্ঠাভরে; নিশ্চয়ই সেই কারণেই তাকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল মারা-ঠারা।

যে-জায়গাটা পরে হয়েছিল কলকাতা শহর সেখানে ফোর্ট উইলিয়-মের কামানশ্রেণীর আশ্রয়ে বহু ভারতীয় বণিক বসতি করেছিল আঠার শতকের প্রথমার্ধে। কলকাতায় সবচেয়ে বিখ্যাত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন ছিলেন শিখ উমিচাঁদ (আমিরচাঁদ), যাঁর কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি। তাঁর উদ্ভব আর ক্রিয়াকলাপ আগে রহস্যময় ছিল

অনেকাংশে, পরে এন. কে, সিন্‌হা কোম্পানির নথিপত্রের ভিত্তিতে নির্ণয় করেন তাঁর ব্যবসায়ী কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্ব। তিনি শুরু করেছিলেন সুতানটির শেঠদের এজেণ্ট হিসেবে; জিনিসপত্র কেনার জন্যে শেঠেরা ইংরেজদের দালালি করেছিল দীর্ঘকাল যাবৎ। ১৭৫২ সালে তিনি নিজের মরণাপন্ন মনিবকে ঠকিয়ে তাঁর জমিদারির উত্তরাধিকারী হন। ১৭৫৫ সাল নাগাদ তিনি কলকাতায় মস্ত-মস্ত জমি-বন্দ এবং বহু বাড়ির মালিক হন – সেগুলোকে তিনি এমন দশায় রাখতেন যাতে শুধু ভাড়াটাদের নয়, পথিকদের পক্ষেও সেসব বাড়ি ছিল বিপজ্জনক। শেষ-জীবনে তিনি ধনদৌলত রাশীকৃত করেন প্রচুর; ১৭৫৮ সালে তিনি যে-উইল রেখে যান তদনুসারে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পান তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আর গুরু গোবিন্দ পান ৪২ লাখ টাকা।*

উমিচাঁদ ছিলেন শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ, তাই ডি. আর. গ্যাডগিলের নিম্নলিখিত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: 'শিখ ধর্মের গোড়ার দিককার আমলে দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্ষত্রিয়রা ছিল একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়, আর কথিত আছে, শিখ ধর্ম সংগ্রামশীল হয়ে ওঠার আগে অন্তর্বাণিজ্য আর বহির্বাণিজ্য উভয়ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছিল শিখরা। স্বভাবতই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সেটা ঘটেছিল শিখদের মধ্যে ক্ষত্রিয়দের মতো অংশগুলি থাকার দরুন। শিখ বলে অভিহিত উমিচাঁদের কলকাতায় থাকার ব্যাখ্যা করা চাই সেটা বিবেচনায় রেখে।' **

কোম্পানি গাঙ্গেয় উপত্যকায় খোলাখুলি রাজ্যক্ষেত্র জয় করা শুরু করে আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে – তখন সেটা অজস্র আর্থিক এবং রাজনীতিক সহায়-সমর্থন পেয়েছিল জগৎ শেঠ এবং অন্যান্য মাড়োয়ারী আর বাঙ্গালী মহাজনদের কাছ থেকে। ১৭৪৯ সালে জগৎ শেঠেরা ইংরেজ বিজেতাদের ধার দিয়েছিল ১২ লক্ষ টাকা। ১৭৫৬ সালে নবাবের সৈন্যবাহিনী কলকাতা জিতে নিলে উমিচাঁদ শেষ অবধি অনুগত থেকে গিয়েছিলেন পরাস্ত ইংরেজদের প্রতি। পলাশীর যুদ্ধের পরে বাংলা বৈদেশিক আক্রমণকারীদের কবলিত হয়, এই যুদ্ধের আগে, ১৭৫৭ সালে জগৎ শেঠেরা মোটা-মোটা পরিমাণ টাকা দিয়েছিল কর্নেল

ক্লাইভকে। ইংরেজদের একখানা সরকারী সারগ্রন্থে বলা হয়েছিল, 'ভারতীয় মহাজনদের টাকা ইংরেজ কর্নেলটির তরোয়ালের ধার বাড়িয়ে দিয়েছিল, এই কর্নেল বাংলায় মুসলিম রাজক্ষমতা উচ্ছেদ করে।'* পলাশীর যুদ্ধের পরে জগৎ শেঠেরা, উমিচাঁদ এবং অন্যান্য মহাজনেরা বাংলার নবাবদের বৃটিশ কবলমুক্ত হয়ে সুবাটির স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যাহত করে। ইংরেজদের প্ররোচনায় তারা নবাব সিরাজউদ্দৌ-লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং নবাব মীর জাফরকে ঋণ দিতে অস্বী-কার করে। বিশ্বাসঘাতকতার দরুন ন্যায্য শাস্তি পেয়েছিল জগৎ শেঠে-রা: ইংরেজরা নতুন যুদ্ধ শুরু করেছিল ১৭৬৩ সালে, তখন জগৎ শেঠ পরিবারের কর্তা-দুজনকে অবিলম্বে বধ করার হুকুম দিয়েছিলেন নবাব মীর কাসিম। 'প্রতিবাদপত্র' পাঠিয়েছিল ইংরেজরা, কিন্তু হুকুম তামিল হয়ে গিয়েছিল ইতোমধ্যে। সমানই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল উমিচাঁদ। কলকাতায় বৃটিশ কারখানা আক্রমণ করতে মনস্থ করেছিলেন সিরাজউ-দ্দৌলা – সে-কথা ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের জানিয়ে দিয়েছিল উমিচাঁদ।

আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং উত্তর ভারতের বড়-বড় ব্যাপারিক আর মহাজনী পুঁজির মধ্যে মজবুত আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, – মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের আগরওয়ালাদের মধ্য থেকে বারাণসীর রায় পরি-বারের মহাজনদের ইতিহাস এদিক থেকে লক্ষণাত্মক। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা পরভাব বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন আকবরের দরবারে। তাঁর বংশধরেরা মোগলদের খিদমত করতেন, শেষে তাঁদের একজন – হায়ালিরাম – বিহারের পাটনায় একটা উঁচু পদে নিযুক্ত হন আর সেখানে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুতা করেন এবং কোম্পানির খিদমত করে ক্লাইভের কাছ থেকে (মোগল শাহ্ আলমের তরফে!) বকশিশ পান একটা জায়গির আর 'রাজা বাহাদুর' খেতাব। বিহারে ঔপনিবেশিক কর-ব্যবস্থা পত্তনের ভার পড়ে এই নতুন জায়গিরদারটির উপর। তাঁর ছেলে আরও অনেক জমি পেয়েছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছ থেকে। ১৮০৩ সালে রায় পরিবারের একজন কোম্পানির তরফে আলাপ-

---

আলোচনা চালিয়েছিলেন অযোধ্যার নবাব, গোয়ালিয়রের মহারাজা এবং অন্যান্য সামন্ত রাজন্যদের সঙ্গে, সেজন্যে তিনি বকশিশ পেয়েছিলেন আরও কোন-কোন জায়গির আর রাজা খেতাব। অন্যান্য হিন্দুস্থানী মহাজনেরাও কাজ করেছিল ইংরেজদের জন্যে।

বৃটিশ 'আইন-শৃঙ্খলা' নৈতিক নিয়ম-বিধির অনুযায়ী ছিল শুধু সেই পরিসরে যাতে সেটা ইংরেজ বিজেতাদের স্বার্থান্বেষী অভীষ্টের বিরুদ্ধ হয় নি। এই বিষয়ে রয়েছে রেভারেণ্ড ফিলিপ অ্যাণ্ডার্সনের প্রামাণিক অভিমত, – বিভিন্ন আকর-দলিল এবং নিজস্ব পর্যবেক্ষণ-উপাত্তের ভিত্তিতে লেখা একখানা বই তিনি প্রকাশ করেছিলেন উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, তাতে তিনি ভারতে নিজ স্বদেশবাসীদের আচরণ সম্বন্ধে বিবরণ দেন। এখানে মনে রাখা দরকার, কোম্পানি আর অ্যাংলিকান চার্চের মধ্যে বিরোধ সুদীর্ঘকালের ব্যাপার, সেটা শুরু হয় যখন কমন্স-সভায় পাস-করা একটা বিল-এ কোম্পানির ৫০০ টনের বেশি ডিসপ্লেস-মেণ্টের যেকোন জাহাজে একজন যাজককে নিয়ে যাওয়াটাকে কর্তব্য হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এই ভাবাদর্শগত বিপুল-সওদাটি মান্য কোম্পানি আর তার লোকজনের পক্ষে এতই গুরুভার হয়ে দাঁড়িয়েছিল যাতে আঠার শতকের শেষাশেষি নাগাদ কোম্পানির বেশির ভাগ জাহাজকে ৫০০ টনের কম ডিসপ্লেসমেণ্টের বলে সরকারীভাবে রেজিস্ট্রি করা হত।

এই কারণেই অ্যাণ্ডার্সন তাঁর স্বদেশবাসীদের উপর অ্যাংলিকান যাজকের কল্যাণ-প্রভাব প্রতিপন্ন করার কাজটা হাতে নেন, কেননা তিনি দেখছিলেন যে, ঝাঁকে-ঝাঁকে পৌত্তলিক এবং মুসলিমদের মধ্যে, আর – যা আরও ভয়ানক – স্থানীয় পোপভক্ত, বিশেষত পোপভক্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে প'ড়ে তাঁর স্বদেশবাসীদের নরকভোগের নিয়তি আসন্ন হয়ে পড়েছিল।

তবে অ্যাণ্ডার্সন যা বলেন সেটা থেকে বরং এই আভাসটাই আসে যে, নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বিপদটা আসছিল ইংলণ্ডেশ্বরের খাস বৃটিশ প্রজাদের মধ্য থেকেই, আর তিনি স্বীকার করেন যে, ইউরোপীয়দের কুপ্রভাব পড়ছিল ভারতের মানুষের উপর। মাদ্রাজের কারখানার অধ্যক্ষ পিট্-এর অভিমতের (আঠার শতকের গোড়ার দিকে) কথা উল্লেখ করেছেন অ্যাণ্ডার্সন, – পিট্ বলেছিলেন, স্থানীয় অধিবাসীদের সামনে

ধূর্তামি, সন্দিগ্ধভাব আর বাধিত করতে নারাজি হবার আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল ইউরোপীয়রাই। 'ইউরোপীয়রা ভারতে প্রথম-প্রথম বসতি করার সময়ে নেটিভরা খুবই সশ্রদ্ধ ছিল তাদের প্রতি, তাদের নেটিভরা নিজেদেরই মতো নিরীহ মনে করত; কিন্তু তারপর থেকে ইউরোপীয়দের দৃষ্টান্ত অনুসারে তারা হয়ে উঠেছে খুবই ধূর্ত আর হুঁশিয়ার।'

কোম্পানির কর্মচারীরা ঘুষ নিত হামেশা। অ্যাণ্ডার্সন বলেন, 'হিন্দুদের দেওয়ালি পরবের সময়ে বেনিয়ারা বরাবর ভেট দিত সভাপতিকে, পরিষদ সদস্যদের, যাজককে, সার্জনকে এবং অন্যান্যকে। এইসব ভেট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তরুণ গোমস্তাদের পক্ষে, কেননা সেগুলো বেচে দিয়ে তারা বছর-বছর নতুন কাপড়-চোপড় পাবার ব্যবস্থা করতে পারত।' তবে এইসব 'তরুণ জেণ্টলম্যান' ঐসব রেওয়াজী ভেট পেয়েই নিরস্ত হত না, 'তারা চতুর উপায়ে কার্যত-তামাসা উপভোগ করত, তার সঙ্গে সঙ্গে চরিতার্থ হত তাদের অর্থলিপ্সু আসক্তি' – যেমন, কোন বেনিয়ার বাড়িতে তারা ঢুকে পড়ত বন-পায়রা কিংবা চড়াই শিকারের ভান করে, তখন অহিংসা আর দেহান্তরপ্রাপ্তিতে বিশ্বাসী বেনিয়া মহা আতঙ্কিত হয়ে লোকটাকে চলে যেতে প্রবৃত্ত করত 'তার হাতে দু-একটা টাকা গুঁজে দিয়ে। পাঠক, এই হল একটি উচ্চমনা জাতির প্রতিনিধিদের একখানা প্রতিকৃতি, যা এঁকেছেন তাদেরই একজন'* – এই বলে অ্যাণ্ডার্সন শেষ করেন।

এইসব টোটকা জবর-আদায় সবারই ঘৃণ্য যেমনটা অ্যাণ্ডার্সনের, তবে বিশেষত যুদ্ধের সময়ে যেসব ঢের বেশি ভয়াবহ বর্বর দুষ্কার্য চলত সেগুলোর কথা ভোলা চলে না কিছুতেই: ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের বিবরণীতে একটা বিশেষ পরিচ্ছেদ রয়েছে জলদস্যুতার বৃত্তান্ত দিয়ে ভরা। উল্লিখিত অ্যাভরি এবং তাঁর মতো অন্যান্যের দুঃসাহসিক অপকর্মগুলোর বিবরণ দেওয়া হয়েছে সবিস্তারে, এখানে সেটা আবার বিবৃত করা অনাবশ্যক, তবে কোম্পানির সামুদ্রিক একাধিকার কায়েম করায় জলদস্যুতার পরিণতিটা এখানে উল্লেখযোগ্য। জলদস্যু' জাহাজগুলোকে ঠেকাতে পারত শুধু বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজের শক্তিশালী পাহারা। ভারত মহাসাগরে এমনসব জাহাজ ছিল শুধু ঈস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানির, তাই ভারতীয়দের আর বেসরকারী ইউরোপীয় বণিকদের কোম্পানির সাহায্য নিতে হত জলদস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। নৌবাহ আর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে কোম্পানি অতিরিক্ত সুযোগ পেত তার ফলে।

ভারতে ইংরেজদের চাল-চলন সম্বন্ধে নিজ যাঁচ-বিচারের সংক্ষিপ্ত-সার দিতে গিয়ে অ্যান্ডার্সন লিখেছেন: 'আমি শুধু বলতে পারি, সে-যুগের সেরা-সেরা নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতব্যক্তিরা যা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তারই সত্যানুগ বিবরণ আমি হাজির করলাম... দুর্নীতিপরায়ণ হওয়া আর অন্যান্যকে দুর্নীতিপরায়ণ করাটা ছিল কেতামাফিক... পাঠক, বিচার করুন ধৈর্যসহকারে। মনে করুন ছ'মাসের জন্যে আপনি রয়েছেন বিচারপীঠে; কেমনসব আসামীদের হাজির করি আপনার সামনে সেটা দেখুন, আর তারপর বলুন আঠার শতকের প্রারম্ভে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে অ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের মধ্যে অনাচার আর অপরাধের পরিসংখ্যান সম্বন্ধে ধারণা করতে পারেন কিনা।' * তাঁর মতোই কথা বলেন টি. সাইডেনহ্যাম, ইনি কুড়ি বছর ভারতে কাজ করেছিলেন ফৌজে এবং বিচারক হিসেবে। ১৮১৩ সালে একটা পার্লামেণ্টারী কমিটিতে তিনি বলেছিলেন যে, বিদেশে বলপ্রয়োগ করার প্রবণতা অন্য যেকোন জাতির চেয়ে ইংরেজদেরই বেশি, আর এটা ভারতের বেলায় যথার্থ তাতে তিনি নিশ্চিত — এমন মন্তব্য করার সংগত কারণ ছিল। **

বলপ্রয়োগ আর জবর-আদায় চলত ভারতে ইংরেজদের সরকারী পারিতোষিক কম ছিল বলে, তা মোটেই নয়। যেমন, উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ফৌজে ইংরেজ অফিসারদের বার্ষিক বেতন ছিল এইরকম: কর্নেল — ১২৫০ থেকে ১৪৬৭ টাকা, মেজর — ৬৩৫ থেকে ৭৭৭ টাকা, ক্যাপ্টেন — ৩৭১ থেকে ৫২০ টাকা, লেফটেন্যাণ্ট — ২২৪ থেকে ৩৩৩ টাকা। সিনিয়র কর্মকর্তারা পেত আরও অনেক বেশি: জেলা কলেক্টর পেত বছরে ২০ হাজার টাকা — অর্থাৎ মেহনতী ভারতীয় পরিবারের গড় বার্ষিক বাজেটের চেয়ে মোটামুটি হাজারগুণ বেশি।

'নবাবেরা',* এই বিশিষ্ট শিরনামায় লেখা রচনায় পি. স্পিয়ার আঠার শতকে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতে ইংরেজদের জীবনযাত্রার বিবরণ দেন, এতে তিনি দেখান ভারতে বৃটিশ সমাজের ক্রমবিকাশ: তারা ছিল একদল সদ্বিবেচনাহীন ভাগ্যান্বেষী, যারা বেরোয় পয়সা করা আর ভোগতৃষ্ণার টানে, আর তারা হয়ে দাঁড়াল পূর্ণাঙ্গ শাসক অভিজাতবর্গ, যারা এক হয়ে ছিল জাতিগত শ্রেষ্ঠতা আর কপট নৈতিকতা বোধের সূত্রে। ভারতীয় প্রজাদের প্রতি তাদের মনুষ্যোচিত আচরণের নামগন্ধও লোপ পেয়ে যায় ক্রমে-ক্রমে, সেটার জায়গায় আসে বিজেতার শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা।

বড়-বড় ভারতীয় বণিকদের একাংশ চলে গেল বৃটিশ বিজেতাদের পক্ষে, এর থেকে দেখা যায় সামন্ততান্ত্রিক শাসন তাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুভার হয়ে দাঁড়িয়েছিল শুধু তাই নয়। অল্প কিছু-কিছু ব্যতিক্রম ছিল, কিন্তু সাধারণভাবে ভারতের শহরগুলি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জন-প্রতিরোধের রাজনীতিগতভাবে স্বাধীন ঘাঁটি হয়ে ওঠে নি। বৃটিশ বিজয়ের সময়ে বণিকেরা এবং ভারতীয় শহরগুলির মানুষের অন্যান্য অংশ যে-মনোভাব অবলম্বন করেছিল সেটা হল সামন্ততান্ত্রিক ভারতে শহুরে অর্থনীতি যে-মাত্রায় ছিল সেটার একটা গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ নিদর্শন। বাণিজ্য আর শহরগুলির হস্তশিল্প তখনও সামন্ত মনিবদের প্রতি মুখাপেক্ষিতা থেকে নিষ্কৃতি পায় নি বলে ভারতের প্রধান-প্রধান অঞ্চলগুলিতে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ আর শহরবাসীদের রাজনীতিগতভাবে স্বতন্ত্র প্রতিপক্ষ গড়ে ওঠার সময় মেলে নি। 'ভারতীয় বণিক আর নির্মায়ক শ্রেণীগুলি ধনী এবং দেশের সর্বত্র ছড়ানো ছিল, তারা এমনকি নিয়ন্ত্রণ করত আর্থনীতিক কাঠামটাকে, তবু তাদের ছিল না কোন রাজনীতিক ক্ষমতা। ...তাই কোন-কোন পশ্চিমী দেশে যেমনটা ছিল সেইরকমের কোন মধ্য শ্রেণী ছিল না, যেটা ক্ষমতা দখল করার জন্যে যথেষ্ট শক্তিশালী, কিংবা সে-সম্বন্ধে ভাবছিল সচেতনভাবে।' ** শহরগুলিতে সামন্ত শাসকদের সামরিক আর রাজনীতিক কর্তৃত্বের ফলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যাতে শাসকের সৈন্যদল আক্রমণকারী-

---

দের হাতে পরাস্ত হলে শহর কোন স্বতন্ত্র প্রতিরোধ সংগঠিত করতে অপারক হত।

নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে কোন রকমের স্থানীয় স্বশাসন প্রতিষ্ঠার কোন অভিপ্রায় ছিল না ইংরেজদের, আর আমাদের যতটা জানা আছে তাতে দেখা যায় শহরের উপর-স্তরের মানুষ তেমন কোন দাবি করে নি। মনে হয়, শহরের সামাজিক কাঠামে কিংবা সমাজ-জীবনে আসল শহুরে অংশটার (বণিক, কারিগর এবং অন্যান্য কাজ-করা মানুষের) এমন গুরুত্ব ছিল না যাতে তারা স্বশাসন ব্যবস্থায় নেতৃত্ব হাতে পাবার আশা করতে পারত। শহরবাসী ভূস্বামীরা এবং যারা সরাসরি তাদের মুখাপেক্ষী সেইসব অংশ পৃষ্ঠপোষকতার চিরাগত সূত্র-গুলো আর সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে কর্তৃত্ব করত শহরের জীবনে। অবশ্য, জমি ভোগ-দখলের সাবেকী ব্যবস্থা লোপ করা এবং ভূমিতে জমিদার-দের মালিকানা স্বত্ব মঞ্জুর করার আইন পাস করে বৃটিশ রাজ ভূস্বামী অংশগুলোর পরে দেশ শাসনে, বিশেষত শহরগুলোর পরিচালনে অংশ-গ্রহণের দাবি করার ভিত্তি সৃষ্টি করেছিল।

তবে এইসব দাবিদাওয়ার স্বীকৃত বাস্তবতা হয়ে উঠতে প্রয়োজন হয়েছিল প্রায় এক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা। এই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্বজ্ঞান গোছের একটাকিছু রয়েছে বুকাননের এই আগ্রহজনক পরিচিন্তনে: 'লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনে কোম্পানির সদাশয়তার কল্যাণে জমিদারেরা এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যেটা ইউরোপীয় ভূস্বামীরা পেয়েছিল দশম আর একাদশ শতকে, যখন ভূমিতে স্বত্বপ্রাপ্তি হয়েছিল পুরুষানুক্র-মিক। শহর আর গঞ্জগুলিকে বিশেষাধিকারী স্থানীয় স্বশাসন দেওয়াটা হত উন্নতির পরবর্তী পদক্ষেপ, যা প্রাচ্য রাজতন্ত্রগুলিতে না-থাকাটা মনে হয় প্রধান প্রতিবন্ধক যেটার দরুন এশিয়ার মানুষ এযাবৎ সভ্যতা-ক্ষেত্রে মস্ত-মস্ত অগ্রগতি ঘটাতে পারে নি। বঙ্গদেশ এমন পরিকল্পনার পক্ষে যথেষ্ট পরিণত কিনা সে-সম্বন্ধে কিছু বলে দিতে আমি সাহস করছি নে, তবে এটা স্মরণ করা চাই যে, ইউরোপে শহরগুলিকে স্থানীয় স্বশাসন দেওয়া হয়েছিল ভূমিতে পুরুষানুক্রমিক স্বত্ব মঞ্জুর হবার ঠিক পরেই। লণ্ডন এবং অন্যান্য মস্ত-মস্ত নগরীর যেসব বিশেষা-ধিকার রয়েছে সেইরকমের কিছু এখনই স্থাপনের কথা আমি তুলছি নে নিশ্চয়ই। সেজন্যে অনেক সময় ধরে কাজ চলা চাই; আগের রাজারা

তাঁদের শহর আর নগরীগুলিকে যেসব বিশেষাধিকার দিতেন সেইরকমের কিছুই সূত্রপাত হিসেবে যথেষ্ট।'*

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের জন্যেও বুকাননের কৃতিত্ব স্বীকৃত হওয়া চাই। বুকাননের সমসাময়িক যেসব ইংরেজ বলতেন যে, আঠার শতকের শেষাশেষি বৃটেনে জমিদার আর খামারীদের মধ্যকার সম্পর্ক-তন্ত্রের মতো একটাকিছু স্থাপিত হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে, তাঁদের কথার পুনরাবৃত্তি করেন নি তিনি। ইংলণ্ডে যখন পুরুষানুক্রমিক ভূমি-মালিকানা দানা বেঁধে উঠছিল, আর স্থাপিত হচ্ছিল শহরের স্বশাসন, যাতে অংশগ্রহণ করত, এমনকি কর্তৃত্বই করত বড়-বড় ভূস্বামী অভি-জাতেরা, ইতিহাসের সেই আমলটার কথা মনে করলে কিছু-কিছু ফলপ্রদ সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে। তবে ইংলণ্ডে এই প্রক্রিয়াটা ছিল সামন্ত ব্যারন, নাইট আর কৃষকদের উপর-মহলগুলির মধ্যে সংঘাতের খুবই জটিল ফল – এই সংঘাতে জড়িত ছিল শহরগুলি। তবে বাংলায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় পূর্বাধিকার দেওয়া হয়েছিল একটা উপর-মহলকে – জমিদারদের।

বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ শক্তির মধ্যে স্থিতি যা বিদ্যমান ছিল তাতে (বৈদেশিক আধিপত্যের মতো মহা গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটার কথা বাদ দিলেও) জমিদারী ভূমি-মালিকানা আরও মজবুত হবার একটা সামা-জিক-আর্থনীতিক পরিণতি হিসেবে শহরের স্বশাসন ঘটল না। হল বরং তার উলটোটা। এমনকি স্বাধীনতার অবস্থায়ও বড়-বড় সামন্ত শাসক-দের একতরফা শক্তিবৃদ্ধির ফলে শহরের এবং সেগুলির আর্থনীতিক জীবনের উপর তাদের কবজা আরও জোরদার হত। আর উপনিবেশবা-দের আমলে শহরের স্বশাসন-সংক্রান্ত যেকোন ধারণা ছিল একেবারেই অলীক। এখানে বলা দরকার, হাটে-বাজারে জমিদারদের কর-আদায়ের অধিকার কোম্পানি বাতিল করে দিয়েছিল ১৭৯০ সালে, কিন্তু সেটা নামেমাত্র, তা সত্ত্বেও জমিদারেরা ১৮৩৯ সালে, এমনকি কিছু পরিমাণে অষ্টম দশকের গোড়ার দিকে অবধি অমনসব কর-আদায় করে চলেছিল ভূমি-কর আদায়ের নামে।

ভারতে প্রথম কয়েক দশকের বৃটিশ শাসনের পরিণতির মূল্যায়ন করতে এখন চেষ্টা করছেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। সামাজিক আর আর্থনীতিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটি সেমিনারে (আলিগড়, ১৯৬৮) উপস্থাপিত বিবরণীতে এ. গুহ বলেন, উনিশ শতকের সপ্তম দশক নাগাদ যেমনটা ছিল জাপানে তেমনি ১৮১৫ সালে ভারতে ছিল অভিজ্ঞ বাণিজ্য আর ব্যাঙ্কিং সম্প্রদায় এবং পশ্চিমী জ্ঞানের সংকীর্ণ কিন্তু পাকা-পোক্ত ভিত্তিও। তিনি আরও বলেছিলেন, আঠার শতকের শেষের পাদে কোন-কোন দেশীয় রাজ্যে বিভিন্ন আর্থনীতিক পরীক্ষা চালানো হয়েছিল – যেমন, ত্রিবাঙ্কুড়ে গোলমরিচের বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় একচেটে কায়েম করা হয়েছিল, কিংবা মৈসুরে স্থাপন করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক। তিনি অনুমান করেন ভারতে যদি থাকত জাপানের মেইজি রাজের মতো সরকার তাহলে সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নয়নের ফলে দেশটি এগোতে পারত পুনরুজ্জীবন, পুনর্গঠন আর শিল্প-বিপ্লবের পথে। কিন্তু প্রগতির জাতীয় শক্তিগুলি এতই দুর্বল ছিল যাতে তারা রক্ষণপন্থী-দের হাত থেকে উদ্যোগ কেড়ে নিতে কিংবা ১৮৫৭ সালের মহা-অভ্যুত্থান থেকে সুবিধা পেতে পারে নি।

জাপানের সঙ্গে তুলনাটাকে খুব প্রত্যয়জনক মনে হয় না, কেননা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ জাপানের শহর আর গ্রামগুলিতে বুর্জোয়া অংশগুলো ছিল ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। শিল্পের সংগঠ-নেও জাপান ভারতকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আর্থনীতিক জীবনে জাতীয় রাষ্ট্রের সতেজ এবং গঠনমূলক হস্তক্ষেপ হলে ভারত গোড়ায় অন্তত পুঁজিতান্ত্রিক কর্মশালা পর্বে পৌঁছতে পারত, সেটা স্পষ্টই।

বৃটিশ বিজয়ের পরে ভারতে শিল্প-বিপ্লব কেন ঘটল না, এই প্রশ্ন-টাও এ. গুহ তোলেন তাঁর গবেষণা-প্রবন্ধে। আঠার শতকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ ভারতে এমন বিপ্লবের প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি সাধারণভাবে ছিল না, এই বিষয়ে মন্তব্য করে তিনি ঐ বিজয়ের পরিণতিগুলো নিয়ে বিচার-বিবেচনা করেন। বছরে ২০-৩০ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং ভারত থেকে বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দেশটিতে থেকে যেত প্রচুর পরিমাণ নগদ টাকা। যেমন, একটা বৃটিশ হিসাবে বলা হয়, ১৭৯৭ থেকে ১৮০১ সালে বাংলায় স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে পরিচলনে ছিল প্রায় ১৬ কোটি টাকা। এ. গুহ বলেন, বৃটিশ বিজয়ের ক্রিয়াফল ছিল

জমিদার আর মহাজনদের চেয়ে বণিকদের স্বার্থ ক্ষেত্রেই বেশি।

তিনি বলেন, আঠার শতকের শেষাশেষি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামনে পথ ছিল দুটো: হয় ভারতের টেক্সটাইল উৎপাদনে (সেটা ছিল কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে) নতুন-নতুন কারখানার যন্ত্রপাতি চালু করা এবং সেই উপায়ে কিছু-কিছু বৈদেশিক বাজার হাতে রাখা, নইলে আফিম নীল তুলো কাঁচা রেশম চিনি ইত্যাদি কৃষি-উৎপাদ রপ্তানিতে বিনিয়োগ করা। শিল্পক্ষেত্রের বৃটিশ বুর্জোয়াদের সাধারণী স্বার্থের খাতিরে কোম্পানি বেছে নিয়েছিল দ্বিতীয় পন্থাটা। ১৭৮৬ সাল নাগাদ ভারতীয় সুতো কেনা হত রপ্তানির জন্যে আর নয়। আঠার শতকে শেষ দশকের গোড়ার দিকে গ্ল্যাসগোর একজন বণিক টেক্সটাইল সরঞ্জাম ভারতে রপ্তানি নিষিদ্ধ করার জন্যে আবেদন পেশ করেছিল বৃটিশ সরকারের কাছে। তবে হাতে-তৈরি ভারতীয় কাপড় রপ্তানি কোম্পানি বাড়িয়েই চলেছিল, — ১৭৯৬-১৭৯৯ সালে তার পরিমাণটা চড়ে পৌঁছেছিল ৩০ লক্ষ পাউণ্ডে।

ভারতীয় তাঁত-শিল্পের বৈদেশিক বাজার ১৮০৫ সালের পরে খোয়া গেলেও বজায় ছিল দেশীয় বাজার, সেখানে কাটতি হত — এ. গুহর হিসাব অনুসারে — উৎপাদের মোটামুটি ¾ ভাগ। আমার মনে হয় পরিমাণটাকে কমিয়ে ধরা হয়েছে, কেননা উল্লিখিত অঙ্কটাকে রপ্তানির সর্বোচ্চ পরিমাণ বলে মেনে নিলে দেশীয় চাহিদার পরিমাণটা দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকার, অর্থাৎ মাথাপিছু প্রায় আট আনা, যা পারিবারিক বাজেট-সংক্রান্ত উপাত্ত অনুসারে মাফিকসই ছিল শুধু সবচেয়ে গরিবদের মধ্যে।

এ.গুহ বলেন, একসময়ে কাপড় রপ্তানিকারী ভারত ১৮১৫ সাল থেকে কাপড় আমদানি করতে শুরু করে, আর ঐ সময় নাগাদ দেশটিতে ইতোমধ্যে ছিল উঠতি উদ্যোগী-কারবারি শ্রেণী, ব্যাঙ্কিং আর বিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা ব্যবস্থা, বেড়ে-চলা জাহাজ-নির্মাণ শিল্প, আর তার উপর সঞ্চয়নের বড়রকমের নিহিত সম্ভাবনা। কিন্তু এইসব অনুকূল উপাদান থাকা সত্ত্বেও ভারতে পরে সতেজ আর্থনীতিক ব্যবস্থা স্থাপিত হতে পারল না, তার কারণটা এই যে, অর্থনীতি, সম্পত্তি আর প্রশাসনে বৈদেশিক রাজনীতিক নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে দেশটির সম্পদ বের করে নিয়ে যাবার কর্ম-বন্দেজটা চালু ছিল।

আমাদের খাস বিবেচ্য বিষয়টা আবার তোলা হচ্ছে। ইংরেজরা যেসব বিক্ষিপ্ত টুকরো-টাকরা জায়মান পুঁজিতান্ত্রিক কর্মশালা চালু করেছিল সেগুলো হল স্বল্পজীবী, – পরে কারখানা-উৎপাদন তো দূরের কথা, পুঁজিতান্ত্রিক কর্মশালা ক্ষেত্র গড়ে ওঠার আরম্ভস্থলও হতে পারল না সেগুলো। ভারতে হস্তশিল্পের যেসব শাখায় পরিণত ক্ষুদ্রায়তন-পণ্য সম্পর্ক এবং প্রাথমিক পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক ইতোমধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল সেগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হল প্রথমে। তেমনি, আঞ্চলিক পরিসরে, উপকূলবর্তী যেসব বাণিজ্য আর হস্তশিল্প কেন্দ্র ছিল নতুন সামাজিক সম্পর্কের সম্ভাব্য ছিটক্ষেত্র সেগুলির উপর উপনিবেশবাদের পীড়নকর ক্রিয়াফল সুতীব্র হল সর্বপ্রথমে। এম. ডি. মরিসের সঙ্গে বিতর্কে এই বিষয়টাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা।

ভারতে সামাজিক-আর্থনীতিক, রাজনীতিক, ভাবাদর্শগত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে রূপান্তর প্রক্রিয়াগুলিকে বৃটিশ রাজ বদলে না দিলে কি ঘটতে পারত সে-সম্বন্ধে বিভিন্ন অনুমানের ব্যাপার ধরা যেতে পারে যা ঘটেছিল তার বিবরণ থেকে। এমনসব অনুমান গড়ে তোলার ব্যাপারে কয়েকটা মৌলিক মনোভাব আমার মতে বেঠিক।

এগুলির প্রথমটাতে ধারণা করা হয় যে, সতর শতকের মোগল সমাজের জড়ত্বটাকে স্থানান্তরিত করা হয় আঠার আর উনিশ শতকে। কথাটা এই যে, আঠার শতকের গোড়ার দিকে বিভিন্ন মারাঠা রাজ্য, আর তারপর শিখ রাজ্য, মৈসুর এবং অন্যান্য রাজ্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠার ফলে ভাঙন ঘটেছিল ঐ জড়ত্বে। সেগুলির ঐতিহাসিক পারকতা-সম্ভাবনা নিয়ে আন্দাজই করা যেতে পারে শুধু, কেননা পররাষ্ট্র-নীতির ব্যাপারটার, বৃটিশ আগ্রাসনের ক্রিয়া ঘটতে শুরু হয় প্রথমে বাংলা, মৈসুর, গুজরাট আর মহারাষ্ট্রের এবং তারপর পাঞ্জাব এবং অন্যান্য অধিকতর সতেজ অঞ্চলের ঘটনাধারার উপর, তার ফলে নিঃসন্দেহে শক্তিশালী হয় সেগুলির সামরিক-প্রশাসনিক সামাজিক স্তর-গুলো, আর সেজন্যে দুর্বল হয়ে পড়ে সামাজিক স্তরগুলি। সৈন্যদল পোষার জন্যে সংগতি-সংস্থান জড় করার প্রয়োজনের দরুন বেড়ে যায় করের চাপ, বিশেষত, ভূমি-করের চাপ।

মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে-ওঠা রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক কেমনটা হয়ে দাঁড়াত যদি বৈদেশিক হস্তক্ষেপ না ঘটত, সেটা

বলা কঠিন। তবে একটা জিনিস নিশ্চিত: ঐসব রাজ্যের মধ্যে রক্তাক্ত এবং সর্বনাশা বিরোধ বাধাবার জন্যে যথাশক্তি করেছিল ইউরোপীয় কূটনীতি, সেটা মহা হানিকর হয়েছিল আর্থনীতিক আর সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে। বৈদেশিক আক্রমণকারীদেরই সৃষ্টি-করা সেই পরিস্থিতিতে তাদের ক্ষমতা কায়েম হওয়াটাকে অনেক সময়ে প্রতীয়মান হয়েছিল 'অরাজকতা' থেকে অব্যাহতির মতো অনেকটা।

মোগল সমাজের জড়ত্বটা ছিল এমন যা কাটিয়ে ওঠা যায় না, এই ধারণাটা খুবই সতেজে ব্যক্ত করেন এম. ডি. মরিস। তিনি প্রমাণ করতে চান যে, ভারতে বৃটিশ শাসন খারাপ কিছুই করে নি, কিংবা অবস্থা আরও খারাপ করার মতো কিছু করে নি অন্তত। নিজ ধারণাটাকে প্রতিপন্ন করার জন্যে তিনি কয়েকটা যুক্তি তোলেন। প্রথমটা হল এই যে, ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসটাকে এই সংক্ষিপ্ত সূত্রে পর্যবসিত করা যায়: 'একটা থেকে আর-একটা অরাজকতা তিন পুরুষ-পর্যায়ে।'* এই রকমের দৃঢ়োক্তি হল আপেক্ষিক (কেউ বলতে পারে খামখেয়ালী), হয়ত এটা বুঝে এম. ডি. মরিস অদ্ভুত ধরনে উল্লেখ করেছেন বৃটিশ মার্কসবাদী এ. এল. ব্যাশামের নাম, ইনি মার্কসের মতো লক্ষ্য করেছিলেন ভারতে উপরকাঠামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চতর প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদির অস্থিতির ব্যাপারটা, কিন্তু তিন-পুরুষ অন্তর-অন্তর পর্যাবৃত্ত অরাজকতার কোন ইঙ্গিত তাতে নেই।

মার্কসবাদী ধরন-ধারাটা এম. ডি. মরিসের বিচারধারার চেয়ে বেশি যৌগিক, সেটা অন্তত এদিক থেকে যে, চিরাগত ভারতীয় সমাজে রাজনীতিক বাতাবরণে ঊর্ধ্বে নানাত্বের স্থান তাতে রাখা হয়। মার্ক্স সেটা স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন এইভাবে: 'ভারতের অতীতের রাজনীতিক চেহারাটা যতই পরিবর্তনশীল প্রতীয়মান হোক না কেন, সুদূর সুপ্রাচীন কাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক অবধি অপরিবর্তিত থেকে যায় দেশটির সামাজিক অবস্থা।'** প্রকৃতপক্ষে, মার্কস বলেন, 'একটার পর একটা সাম্রাজ্যের ধ্বংস'*** নির্বিকারচিত্তে লক্ষ্য করাটা গ্রামসমাজের

মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় মূল সামাজিক পরিবেশের সুস্থিতির (অরাজকতার নয়) ফলেই। উপরে রাজনীতিক পরিবর্তন, আর নিচে সামাজিক সুস্থিতির এই সমন্বয় চিন্তার খোরাক যোগায়, কিন্তু সেটা যা-ই হোক, এটা সহজেই বোধগম্য যে, দুই-তিন পুরুষ অন্তর-অন্তর ভারতীয় সমাজে পর্যাবৃত্ত ওলট-পালট সংক্রান্ত ধারণার সঙ্গে কোন্ মিল নেই মার্কসীয় মূল্যায়নের।

এম. ডি. মরিস পরে বলেন, ভারতের ভৌগোলিক আর জলবায়ুর অবস্থা এমন যাতে যোগাযোগ আর নিয়ন্ত্রণের কোন কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে নি – এই প্রসঙ্গে আমি প্রাক্‌বৃটিশ ভারতে উৎপাদন আর বণ্টন ব্যবস্থার সমন্বয় সম্বন্ধে আগে যা বলেছি তার উপর আর কিছু বলার নেই। তবে ভারতীয় কৃষির উৎপাদনশীলতার মাত্রা ছিল নিচু, এই মর্মে মরিসের বক্তব্য, আর তার সঙ্গে ভারতের কৃষি ছিল 'না-পশুচালিত' এই মর্মে তাঁর উদ্ভট ধারণা কিছুতেই গ্রহণীয় নয়।

মরিসের নিম্নোক্ত ধারণাটাও একেবারেই অতি তুচ্ছ: 'সাধারণভাবে আমার নিজের ধারণা এই যে, চিরাগত ভারতীয় সমাজের অবলম্বন ছিল আধুনিক ইউরোপের গোড়ার দিকে, এমনকি টোকুগাবা জাপানেও যা তার চেয়ে নিচু মাত্রায় মাথাপিছু আসল আয়।'* উৎপাদন আর বণ্টন ব্যবস্থার এবং জনসমষ্টির বিভিন্ন অংশের পারিবারিক বাজেটের বিশ্লেষণ ছাড়া, এবং – যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ – অমুক কিংবা অমুক পরিমাণ উদ্বৃত্ত-উৎপাদে পুষ্ট বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থার সুস্থিতি কিংবা বিপরীতক্রমে অস্থিতির সাধারণ কারণগুলোকে স্পষ্ট করে না তুললে কী দাম থাকে উল্লিখিত উক্তির?

ইংরেজেরা ভারত হস্তগত করার সময়ে সেখানে সমাজটি শিল্প-বিপ্লবের সম্ভাবনায় ঠাসা ছিল না – এম. ডি. মরিসের এই উক্তিটা গ্রহণীয়। কিন্তু ভারত ঠিক সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছিল, এই ব্যাপারটা বৃটিশ বিজয়ের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা কিংবা সেটাকে ধিক্কার দেবার কারণ হতে পারে কেমন করে? সামাজিক বিকাশের মাপকাঠি হিসেবে জাতীয় উৎপাদের মাথাপিছু হারটাকে ধরার জন্যে জিদ করেও (যেমনটা মরিস করেছেন) কোন লাভ নেই। যা আমি

দেখাতে চেষ্টা করেছি – চিরাগত ভারতীয় সমাজে আপেক্ষিক আর মোট উভয় হিসাবে বিপুল পরিমাণ উৎপাদরাশি সামাজিক গঠনের রূপান্তরের ভিত্তি না হয়ে বরং সেটার সুস্থিতিরই (এবং বদ্ধতার) কারণ হয়েছিল। এই ধারায় বিবেচনা করলে দেখা যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ এখনকার দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক-শিল্প জোটের সর্দারেরা যে-বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করছে সেটারও ক্রিয়াফল বদ্ধতা ধরনের। অর্থাৎ কিনা, উদ্বৃত্ত-উৎপাদের বাস্তবায়ন সম্বন্ধে মার্কসের ধারণা অতীত কিংবা বর্তমান যেকোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হোক সেটা মহা-গুরুত্বসম্পন্ন।

ব্রটেনের ভারত-জয়টা হল শিল্প-বিপ্লবের জয়-সাফল্য, এই মর্মে ধারণায় আপত্তি তুলে ঠিকই করেন এম. ডি. মরিস। বিভিন্ন মার্কসবাদী রচনায় বাংলা-বিজয়টাকে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে ব্রটেনে শিল্প-বিপ্লবের সূত্রপাতের সঙ্গে, কিন্তু সেটার সঙ্গে এক করে দেখান হয় নি কখনও। তবে বিজেতাদের একটা শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে স্টীম ইঞ্জিনটাকে বাদ দিলে, 'রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের, জাতিরাষ্ট্রের এবং গোড়ার দিককার আধুনিকীকৃত সামরিক বন্দোবস্তের সাংগঠনিক নবপ্রবর্তনগুলো'* গণ্য হবে নাকি সেই শ্রেষ্ঠত্বের উপাদান হিসেবে? ভারত-জয়ের ব্যাপারে ক্যাথলিক-তন্ত্রের নবপ্রবর্তনের কোন গুরুত্ব আমি দেখি নে, সেটাকে সরিয়ে রেখে আমি মরিসের সঙ্গে একমত এই বিষয়টায়: অন্যান্য দেশ আর জাতির উপর ঔপনিবেশিক অধীনতা চাপাবার জন্যে খুবই সহায়ক হয়েছিল ব্রটিশ বুর্জোয়া সমাজের রাষ্ট্রিক আর সামরিক সংগঠন। তবে সংগঠনটা নিজেই পুঁজিতন্ত্র উদ্ভবের দীর্ঘকালজোড়া প্রক্রিয়ার ফল, সেই প্রক্রিয়ায় ব্রটেনে দেখা দিল স্টীম ইঞ্জিন, আর শুধু তাই নয় – ঘটল শিল্প-বিপ্লব। সেই কারণে মার্কসবাদী রচনাগুলিতে ভারতে ব্রটিশ ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের পর্যায়বিভাগটাকে সবসময়ে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে ব্রটেনে পুঁজিতন্ত্রের উৎপত্তি আর বিকাশের বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে। শিল্প-বিপ্লব নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দিয়েছিল ইংরেজদের সামরিক প্রাধান্য, সহায়ক হয়েছিল ভারত-জয় নিষ্পন্ন করতে, আর ১৮৫৭-১৮৫৮ সালের মহা-অভ্যুত্থানের সময়ে উপমহাদেশটিকে কবলিত রাখতে।

টি. রায়চৌধুরী তীব্র রাজনীতিক মন্তব্য করেন না সাধারণত, তিনি

এম. ডি. মরিসের সঙ্গে বিতর্কের উপসংহারে লিখেছেন: 'ইতিহাস নিয়ে মতবিরোধ চলতি রাজনীতিক ভাববেগ দিয়ে রঞ্জিত হবার বিশেষ প্রবণতা আছে। বিভিন্ন সাম্রাজ্য খোয়া যাওয়া এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্রের অতীত ইতিহাসকে সুখ্যাতিকর রূপে চিত্রিত করার চেষ্টার উদ্ভব হয়েছে। ...উপনিবেশগুলি বিভিন্ন মেট্রপলিটান দেশের পক্ষে অলাভজনক, সাম্রাজ্যবাদের কোন আর্থনীতিক উদ্দেশ্য থাকে না, অধীন উপনিবেশগুলিতে স্বশাসন প্রোৎসাহনের দীর্ঘ আর নিরবচ্ছিন্ন কর্মনীতি, ইত্যাদি বক্তব্য হল বিশ্লেষণের এমনসব অলঙ্কার উক্তি যেগুলি রাজনীতিক ভাবাবেগ দিয়ে রঞ্জিত নয়, এমনটা বিবেচনা করা দুষ্কর, – ঠাণ্ডা যুদ্ধের ভাবগত উপচ্ছায়া এবং মার্কসবাদের তত্ত্বীয় ভিত্তির উপর আগেকার আক্রমণগুলোর মধ্যে থেকেছে যাতে এক শ্রেণীর উপর অন্য শ্রেণীর আর এক দেশের উপর *অন্য দেশের শোষণের ব্যাপারটাকে দেখানো হয় এমন সমস্ত উপস্থাপনার*, প্রকৃতপক্ষে শোষণ আর শ্রেণী সংক্রান্ত ধারণারই যাথার্থ্য খণ্ডনের নানা চেষ্টা।'*

উপসংহার

আধুনিক কালে ভারতীয় সমাজের পর্ব-বিন্যাস বৈশিষ্ট্য

কোন আলোচ্য সমাজের একটা থেকে অন্য সামাজিক-আর্থনীতিক বিন্যাসে উত্তরণ অত্যন্ত জটিল এবং অসাধারণ প্রক্রিয়া। ঐসব বিন্যাসের পর্ব-বিন্যাস বৈশিষ্ট্য থেকে (যেহেতু বিষয়টা আধুনিক কালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) অপরিহার্যভাবেই পুঁজিতন্ত্র স্থাপনের পূর্বশর্ত-সংক্রান্ত প্রশ্ন-টাও ওঠে।

রূপান্তরকালীন সমাজ সম্বন্ধে গবেষণার সুবিন্যাসগত মূলনীতি স্থির করেন লেনিন: '...আমাদের চোখের সামনে প্রকাশ পাচ্ছে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা সেগুলোকে বোঝা যায় একমাত্র যদি আমরা একটা থেকে অন্য যুগে উত্তরণের বিষয়গত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করি সর্বপ্রথমে। এটা হল গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যুগের কথা; এগুলোর প্রত্যেকটায় থাকে এবং বরাবর থাকবে বিভিন্ন পৃথক-পৃথক এবং আংশিক গতি, কখনও সামনের দিকে, কখনও পিছনদিকে; গতির গড় ধরনের এবং মধ্যক বেগমাত্রা থেকে বিভিন্ন বিচ্যুতি থাকে এবং বারবার থাকবে... সংশ্লিষ্ট যুগের বুনিয়াদী উপাদানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানই শুধু হতে পারে অমুক কিংবা অমুক দেশের বিভিন্ন বিশেষত্ব বুঝবার ভিত্তি।'* এইভাবে, ঐতিহাসিক প্রণালীর লেনিনীয় নীতি প্রয়োগের পূর্বশর্ত হল সংশ্লিষ্ট দেশের বিশেষ-ত্বগুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণ, তার মধ্যে পড়ে সংশ্লিষ্ট বিশ্ব-ঐতিহাসিক যুগের গতির গড় ধরনের এবং মধ্যক গতিমাত্রার সঙ্গে সেগুলির তুলনা। তৌলনিক-ঐতিহাসিক গবেষণার সুবিন্যাসবিদ্যা এখনও সমস্ত দিক থেকে

বিবৃত হয় নি। আলোচ্য সমাজের আখেরী বিশেষক স্থির করতে গিয়ে ইতিহাসকারেরা অনেক সময়ে বাছনের সমস্যায় পড়ে যান: সমাজ ইতোমধ্যে যে-সামাজিক মাত্রায় পৌঁছেছে, না, সেটার গতির গতিমাত্রা আর অভিমুখ (এমন সমস্যা দেখা দেয় বিশেষত আঠার শতকের বৃটেন আর ফ্রান্সের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে)।

জাতিরূপগত তুলনা ছাড়া কোন প্রক্রিয়ায় ঐতিহাসিক পর্যায়, গতিমাত্রা আর মর্মবস্তু নির্ণয় করা যায় না। এমন তুলনার প্রয়োজন ক্রমেই আরও বেশি করে বোধ করছেন বেশির ভাগ গবেষক। যেমন, সন্নিহিত দেশগুলি সম্বন্ধে এবং যেসব দেশে অনুরূপ মর্মবস্তুর প্রক্রিয়া ঘটেছে সেগুলি সম্বন্ধে, আর সমসাময়িক পর্যায়কাল-বিভাগের অনমনীয় এবং কৃত্রিম কাঠামে যেগুলো খাপ খায় না সেইসব প্রশ্ন নিয়ে আরও গভীরপ্রসারী বিচার-বিশ্লেষণের জন্যে তৌলনিক গবেষণা পদ্ধতি গড়ে তোলার প্রয়োজন সম্বন্ধে সুবিদিত ভারতীয় ইতিহাসকার প্রফেসর সতীশ চন্দ্র লিখেছেন 'History Teaching in India. Perspective and Programme for the Eighties' ('ভারতে ইতিহাস শিক্ষণ। নবম দশকের পরিপ্রেক্ষিত এবং কর্মসূচি') – শীর্ষক রচনার ভূমিকায়।

যথেচ্ছ আর বিবুদ্ধ-ফলপ্রদ অনুরূপতা, কিংবা – তার উলটোটা – পার্থক্যের জন্যে অন্তহীন আর এলোমেলো খোঁজাখুঁজি নয় তৌলনিক-ঐতিহাসিক পদ্ধতি। একই কালপর্যায়ের ভিন্ন-ভিন্ন রকমের সমাজের মধ্যে যখন তুলনা করা হয় সেক্ষেত্রে কালক্রমানুসারী সমকালীন সোজাপথ ধ'রে চলে ঐতিহাসিক তুলনার প্রথম ধারাটা। যেমন, মধ্য-আঠার শতকের বৃটেন আর ভারতের মধ্যে তুলনা করা চলে এবং তা করা চাই, কেননা নইলে বোঝা যায় না বৃটেন ভারতকে অধীন করল কিভাবে। তাছাড়া একধরনের সমাজ (বুর্জোয়া, বৃটেন) অন্য একধরনের সমাজের (সামন্ততান্ত্রিক, ভারত) সম্মুখীন হবার ফলে দেখা দিল তৃতীয় ধরনের সমাজ (বহুগাঠনিক, ঔপনিবেশিক)। জাতিরূপের দিক থেকে ভিন্ন-ভিন্ন রকমের সম্মুখবর্তিতার (মেট্রপলিটান দেশ – উপনিবেশ), আর তাই সেটা থেকে উদ্ভূত ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের ঔপনিবেশিক সমাজের ডজন-ডজন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় উপনিবেশবাদের ইতিহাসে। তবে ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের ঠিক আগে এবং পরে কোন একটা মেট্রপলিটান দেশ ছিল সামন্ততন্ত্র কিংবা পুঁজিতন্ত্রের কোন পর্বে, আর

ঐ সম্প্রসারণের শিকার কোন দেশ ছিল সামন্ততান্ত্রিক কিংবা প্রাক্সামন্ততান্ত্রিক, গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজের কোন্ পর্বে, সে-সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানতে প্রবৃত্ত না হলে উল্লিখিত সুবিদিত ধারণাটা অতি মামুলী উক্তি হয়েই থেকে যায়।

মানবজাতির বিকাশনে প্রতীচ্য কিংবা প্রাচ্যের অগ্রবর্তিতা সংক্রান্ত যে-প্রশ্নটা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান-বহির্ভূত সেটাকে দূর করতেই শুধু নয়, জ্ঞানলাভের পথে বিভিন্ন দুষ্করতা কাটিয়ে ওঠার জন্যেও লেনিনীয় ঐতিহাসিক পদ্ধতি-সংক্রান্ত ধারণাটি সহায়ক। বিশেষত দুটো চরম মতাবস্থান আছে প্রাচ্য-সংক্রান্ত গবেষণাক্ষেত্রে: তার একটাতে প্রাচ্য দেশগুলির ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গতিমাত্রা-সংক্রান্ত মূল্যায়নটাকে কৃত্রিমভাবে অতিরঞ্জিত ক'রে বিশ্ব বিকাশনের, বস্তুত পশ্চিম-ইউরোপীয় বিকাশনের গতিমাত্রার কাছাকাছি বলে দেখান হয়; আর অন্যটায় বদ্ধতাকে করে তোলা হয় প্রগতির মতো সমানই মাফিকসই, 'সমরূপ' ঐতিহাসিক পরিস্থিতি। প্রথম মতাবস্থানটার ভিত্তি হল একটা অতি-সরল দ্বান্দ্বিক অনুমান, যা অনেক সময়ে উপলব্ধ নয়, সেটা এই: শুধু সমুখপানে উন্নতিশীল গতিই ইতিহাসকারের বিচার-বিশ্লেষণের উপযুক্ত বিষয়বস্তু, আর বদ্ধ অবস্থা এতই 'অপকৃষ্ট' এবং ইতিহাস-বহির্ভূত যাতে সেটা বিচার-বিশ্লেষণের উপযুক্ত নয়। যেসব সমাজের বিকাশন ঘটেছে বিলম্বে সেগুলির বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিশেষত্বকে একাকার এবং কার্যত বাতিল করে দেওয়া হয় এমন দৃষ্টিভঙ্গিতে। দ্বিতীয় মতাবস্থানের প্রবক্তারা বিশ্ব-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলাফল সম্বন্ধে নির্বিকার, তার কারণ তাঁরা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাখ্যান করেন এই প্রক্রিয়া মূল্যায়নের মূলনীতি এবং মানদণ্ড, আর তাই তৌলনিক-ঐতিহাসিক পদ্ধতিটাকেই।

সাধারণ ঐতিহাসিক সুবিন্যাসতন্ত্রে মার্কসবাদ জোর দেয় রাজনীতিক-আর্থনীতিক মূল্যায়নের মুখ্যতার উপর (প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদি, ভাবাদর্শ আর সংস্কৃতির মতো উপরকাঠামগত বিভিন্ন সূচক অনুসারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া কখনও-কখনও যতই লোভনীয় হোক না কেন)। পুঁজিতন্ত্র উদ্ভবের পূর্বশর্ত – আমাদের বিষয়বস্তুর এই বিশেষ দিকটার বেলায় রাজনীতিক-আর্থনীতিক বিবেচনাধারার মুখ্যতা অকাট্য। সমাজের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের আদি পূর্বশর্ত স্থির করা যায়, কোন অঞ্চল কিংবা

দেশের পরিসরে সেটার চৌহদ্দি নির্দেশ করা যায় রাজনীতিক-আর্থনীতিক বিশ্লেষণের সাহায্যেই।

যেকোন সমাজ কিংবা অঞ্চল সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে বিবেচনায় থাকা চাই সম্মুখ-অভিমুখী আর পশ্চাৎ-অভিমুখী উভয় ধরনের আংশিক সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টা। উৎপাদন-শক্তির অবনতি, সেচব্যবস্থা আর শহর-নগর ধ্বংস, জনসমষ্টির (বিশেষত সব-চেয়ে উৎপাদী আর মার্জিত-শিক্ষিত অংশের) বিনাশ আর দাসদশা, নিকৃষ্টতম আর অচলিত ধরনের শোষণমূলক করব্যবস্থার পুনঃপ্রচলন, শাসক শ্রেণীগুলোর গঠনের আর সোপানতন্ত্রের বংশ-গোষ্ঠীগত কিংবা আদি-সামন্ততান্ত্রিক নীতির প্রাধান্য, সংস্কৃতির অধঃপতন আর সেকেলে ভাবাদর্শ এবং আচরণবিধির পুনঃপ্রতিষ্ঠা; ইত্যাদি সংক্রান্ত বিপুল পরিমাণ তথ্য রয়েছে ইতিহাসের ভাণ্ডারে। অথচ ইতোমধ্যে পার হয়ে-আসা বিন্যাস-পর্বে (আর হয়ত আগেই বাতিল-করা বিন্যাসে) প্রত্যাবর্তনের চৌহদ্দির ভিতরে পশ্চাদ্‌গতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত একেবারেই এড়িয়ে যাওয়া হয়, কিংবা সিদ্ধান্ত করা হয় সংকীর্ণ (কাজেই যা বড় একটা চূড়ান্ত ধরনের নয় এমনসব) সূচক অনুসারে (যেমন, মঙ্গোলীয় আর মাঞ্চু বিজয় অভিযানের পরে চীনে বিভিন্ন সেকেলে সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান আর প্রশাসনিক কর্ম-বন্দেজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা)।

দেখা যাচ্ছে, শেষকালীন সামন্ততন্ত্র (এবং বিশেষত সেটার বিন্যা-সগত ভাঙন) পর্ব পর্যন্ত যেমন পশ্চিমে তেমনি পুবেও অমুক কিংবা অমুক সমাজে কিংবা যুগপৎ কয়েকটা সমাজে আগেকার বিভিন্ন যুগের মূল উপাদানগুলি লক্ষ্য করা যায়। যা-ই হোক, আমাদের মতে যখন অবধি পশ্চিমে কিংবা পুবে কোন সমাজ শেষকালীন সামন্ততান্ত্রিক পর্বে পৌছয় নি সেই তের শতক পর্যন্ত যে-সমাজ (কিংবা যেসব সমাজ) – পর্ব আর বিন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে – পৃথিবীজোড়া যুগ নির্ধারণ করেছিল তৎসংক্রান্ত প্রশ্নটাই আরও বিচার-বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু।

তবে সেই কালপর্যায় থেকেই ইতিহাসক্রমিক বিকাশের গতিমাত্রা (গতিশক্তি) ক্রমেই বেশি-বেশি পরিমাণে সামনে এসে গেছে যুগের একটা বিনির্ণায়ক হিসাবে, যেটা পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশগুলিতে গড়ে ওঠে প্রধান (সম্মুখ-অভিমুখী) এবং গৌণ (অপ্রধান, এমনকি পশ্চাৎ-অভিমুখী) গতির ক্রিয়াফলে লব্ধ শক্তি হিসেবে। এশিয়ার কৃষিপ্রধান সমাজগুলির উন্নত

সামন্ততন্ত্রের পর্বে যে-উত্তরণ লক্ষিত হয় তের শতকের গোড়ার দিকে সেটা প্রধান-প্রধান দিক থেকে ব্যাহত হয় মঙ্গোলীয় অভিযানের ফলে, তাতে উৎপাদন-শক্তি বিনষ্ট হয়েছিল শুধু তাই নয়, অধিকন্তু বিকৃত হয়েছিল উৎপাদন-সম্পর্ক, শাসক মহলগুলির গঠন, প্রশাসনিক কর্ম-বন্দেজ, কর ব্যবস্থা, সামরিক সংগঠন। সামাজিক মানসতাও সম্ভবত বদলে দিয়েছিল (কেননা মঙ্গোলীয় জোয়ালে নিষ্পিষ্ট হয়েছিল মানুষের অন্তরাত্মাই), আর শিল্পকলার বহু রূপান্তরসাধক কৃত্য নষ্ট হয়েছিল। চীনা, কোরীয়, মধ্য-এশীয় আর পারসিক সমাজই শুধু নয়, (কিছুটা কম পরিসরে) ভারতীয় সমাজকেও পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল বি-কাশনের আগেকার পর্বে, তার মানে যে-সমাজ রক্ষা করছিল সামন্ততা-ন্ত্রিক স্বৈরাচারের সার্বভৌম উপাদানগুলিকে সেখানে পর্যন্ত ঘটেছিল আংশিক অধঃপতন।

তার বিপরীতে, প্রাচ্য স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে স্লাভদের প্রতিরোধ দিয়ে রক্ষিত মধ্যযুগীয় পশ্চিম-ইউরোপীয় সমাজগুলি সবচেয়ে অনুকূল পরি-স্থিতিতে উতরে যেতে পেরেছিল পরিণত সামন্ততান্ত্রিক পর্ব আর সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামরিক আর প্রশাসনিক খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থা এবং স্থানীয় শ্রমবিভাগের কালপর্যায়। এই অনুকূল পরিস্থিতিতেই পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশগুলিতে সামন্ত শ্রেণীর গঠন-প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছিল শুধু তাই নয়, অধিকন্তু গড়ে উঠেছিল প্রাক্‌বুর্জোয়া (বুর্জোয়া-বার্গার) আর প্রাক্‌প্রলেতা-রিয়ান (প্লিবিয়েন) শ্রেণী। শেষকালীন সামন্ততান্ত্রিক পশ্চিম-ইউরোপীয় সমাজগুলিতে শ্রেণী-সংঘাতের ফলে প্রথম-প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল ষোল-সতর শতকেই। বিভিন্ন আঞ্চলিক ঐতিহাসিক গতির রকম আর গতিমাত্রার গুরুত্ব হয়ে ওঠে অবিসংবাদিত, কেননা প্রথমত তাতে প্রকাশ পায় নতুন উঠতি বিন্যাসের – পুঁজিতন্ত্রের – যুগের প্রধান-প্রধান বিশেষক উপাদানগুলো; আর দ্বিতীয়ত, পৃথিবীজোড়া ঔপনি-বেশিক সম্প্রসারণ আর পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব-বাজার গড়ে ওঠার ফলে পশ্চিম ইউরোপের উঠতি বিন্যাসের প্রবল প্রভাব পড়ে প্রাচ্য সমাজ-গুলির উপর। সামরিক সংগঠন আর প্রযুক্তি, প্রশাসন, নৌবাহ, বাণিজ্য আর ক্রেডিট ব্যবস্থা, তথ্য সংগ্রহ আর তথ্যের সদ্ব্যবহার এবং বিভিন্ন ফলিত বিজ্ঞান (নৌবাহ, ভূগোল, চিকিৎসাবিদ্যা) ক্ষেত্রে উঠতি বিন্যাসের 'প্রত্যয়জনক শ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে অবহিত হয় আফ্রিএশীয় দুনিয়া।

কোন আধুনিক সমাজ সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণে ব্যাপৃত ইতিহাসকার তদানীন্তন পশ্চিম ইউরোপের ঐতিহাসিক বিকাশনের বিস্তারিত উপাদান-গুলো বিবেচনায় না রেখে পারেন না ঐ প্রভাবের দরুন, কেননা – বিভিন্ন বৈরগ্রস্ত বিন্যাস সম্বন্ধে বলতে গেলে – প্রত্যেকটি উৎপাদন-প্রণালীর সবচেয়ে উন্নত এবং বিশুদ্ধ ধরনধারনগুলো প্রকৃতপক্ষে দেখা দেয় বিভিন্ন সীমাবদ্ধ অঞ্চলে, যেগুলো ছিল আর্থনীতিক ইতিহাসের 'একে-বারে পুরোভাগে'। তার সঙ্গে আরও বলা দরকার, আমাদের মতে, বিভিন্ন বিন্যাসের পারম্পর্য, আর বিভিন্ন আন্তঃবিন্যাস, আন্তঃপর্ব পরিবর্তনও সবচেয়ে বিশুদ্ধ, স্বাভাবিকভাবে পরিসমাপ্ত আকারে সেরা জাতিরূপ হিসেবে দেখা যায় শুধু কোন-কোন অঞ্চলে। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, পুঁজিতন্ত্রের উৎপত্তিই শুধু নয়, উন্নত সামন্ততান্ত্রিক পর্ব এবং পরিণত পর্বে – রাষ্ট্রিক সংগঠন হিসেবে নিয়ত রাজতন্ত্রে – সেটার উত্তরণও সবচেয়ে বিশুদ্ধ আকারে ঘটেছিল পশ্চিম ইউরোপেই। কাজেই আলোচ্য দেশগুলিতে ঐসব প্রক্রিয়ার জাতিরূপগত বিশেষত্বগুলিকে যেসব প্রাচ্যবিদ্যাবিদ আলাদা করে তুলে ধরতে চান তাঁদের বিশেষভাবে বিবে-চনায় থাকা চাই তের-চোদ্দ শতক থেকে শুরু করে ঐসব দেশের সামাজিক-আর্থনীতিক ইতিহাস।

সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে প্রাচ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তনে আর জন-মানসে তোলাপাড়া চলে আসছে এই প্রশ্নটা নিয়ে: তাদের সমাজগুলি সামন্ততন্ত্রের ভিতর দিয়ে পার হয়ে এসেছে কি? যদি তা পার হয়ে এসে থাকে, তাহলে সেটার কোন্-কোন্ আকার, জাতিরূপ আর পর্ব? তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে অবধিও প্রশ্নটাকে মনে হত নিছক ইতিহাস ঘটিত, কিন্তু এখন ক্রমেই বেশি-বেশি মাত্রায় দেখা দিচ্ছে সেটার রাজনীতিক তাৎপর্য, তাই ভাবাদর্শগত তাৎপর্যও। ভূমি পুনর্বণ্টনের নীতি নির্ধারণ করা এবং তদনুসারে গ্রামাঞ্চলের জনসমষ্টির গঠনের ত্রুটি দূঢ় করা, আর এই জনসমষ্টির বিভিন্ন স্তরের নতুন পরস্পর-সম্পর্ক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা স্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ইতোমধ্যে, – সাধারণভাবে এইসব কারণে প্রশ্নটা হয়ে উঠেছে এত জরুরী। অতিবাম মাওবাদী ধারণা অনুসারে বলা হয় পূর্বিতা পাওয়া চাই 'কৃষককুলের সবচেয়ে গরিব স্তরগুলির', অর্থাৎ গ্রামের ভূমিহীন আর গৃহহীন মানুষের, যদিও ষষ্ঠ দশকের গোড়ার দিকে চীনে ভূমিব্য-

বস্থা সংস্কারের সময়ে ভূমিস্বত্বে বিদ্যমান অসমতা বাতিল করা হয় না, আর 'নতুন ধরনের ধনী কৃষকদের', অর্থাৎ জমিদারদের ভূমি-মালিকানা পর্যন্ত চলতে দেওয়া হয়।

হরবংশ মুখিয়ার 'ভারতীয় ইতিহাসে সামন্ততন্ত্র ছিল কি না?'-শীর্ষক বিস্তারিত রচনাটির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য; এটা ছিল ১৯৭৯ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৪০ম অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে তাঁর ভাষণ। ইউরোপের মধ্যযুগ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিশিষ্ট পণ্ডিতব্যক্তি সামন্ততন্ত্রের যেসব সংজ্ঞার্থ হাজির করেছেন সেগুলির কিছু-কিছু উল্লেখ করা হয় ভারতীয় ইতিহাসকারের এই রচনায়। তবে এই ঐতিহাসিক বিন্যাস সম্বন্ধে কোন ব্যাপক ধারণা জন্মায় না এইসব সংজ্ঞার্থের সাহায্যে। আমার মতে তার কারণ আছে কয়েকটা: এক, যেসব পণ্ডিতব্যক্তির মত তুলে ধরা হয়েছে তাঁদের সুবিন্যাস-প্রণালী ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের, আর তদনুসারে সামন্ততন্ত্রের প্রধান-প্রধান বিশেষত্ব সম্বন্ধে তাঁদের মূল্যায়ন ভিন্ন-ভিন্ন; দুই, সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব, বিকাশন, শ্রীবৃদ্ধি আর অধঃপতনের পৃথক-পৃথক কালপর্যায়ের সঙ্গে তাঁদের মত সংশ্লিষ্ট, তার প্রত্যেকটাতে পূর্বিতা দেওয়া হয়েছে সেটার নিজস্ব পর্ব-সূচকে; তিন, সামন্ততন্ত্র (যেমন অন্য যেকোন বিন্যাস) সম্বন্ধে সবচেয়ে ব্যাপক এবং পর্বগত বিচার-বিশ্লেষণে স্পষ্ট ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেটার স্থানীয় (কিংবা আঞ্চলিক) বিশেষত্বগুলি, তার থেকে এমন সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, সামন্ততন্ত্রের সাধারণভাবে প্রযোজ্য বিশেষক উপাদানগুলোকে বুঝি সূত্রবদ্ধ করা যায় না আদৌ।

কাজেই সামন্ততন্ত্র সম্বন্ধে উপলব্ধি রয়েছে একটা ইতিহাসক্রমিক বিন্যাস হিসেবে খুবই সাধারণ বিমূর্ত সংজ্ঞার্থ থেকে কোন একটা নির্দিষ্ট কাল এবং স্থানের আলোচ্য সমাজের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য এমন অপেক্ষাকৃত মূর্ত-নির্দিষ্ট এবং অর্থবোধক ধারণা। যেমন, 'আর্থনীতিক জ্ঞানকোষ। অর্থশাস্ত্র' (৪ খণ্ড, মস্কো, ১৯৮০, ২৭০ পৃঃ)-এর সোভিয়েত সংস্করণে যে-সংজ্ঞার্থ রয়েছে সেটা বেশি লোকের পক্ষে, বিশেষত প্রাচ্যবিদ্যাবিদদের পক্ষে সন্তোষজনক নয়—সেটা এই: মন্ততন্ত্র একটা শ্রেণীবৈরগ্রস্ত বিন্যাস, যেটার ভিত্তি হল শর্তাধীন ব্যক্তিগত (সামন্ততান্ত্রিক) ধরনের ভূমি-মালিকানা এবং সাক্ষাৎ উৎপাদকদের উপর শোষণ, এই উৎপাদকেরা ব্যক্তিগতভাবে এবং জমির মাধ্যমে শাসক

শ্রেণীর (সামন্তদের) মুখাপেক্ষী।' ঠিক বটে, সামন্ততন্ত্রের গোড়ার দিক-কার পর্বে ভূমি তখনও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয় নি, ভূমি ছিল প্রধানত রাষ্ট্রের সম্পত্তি, আর শেষকালীন পর্বে সেটার শর্তাধীনতা (অর্থাৎ বেগার খাটুনি বাবত) আর ছিল না; আর সামন্ত মনিবের উপর চাষীর মুখাপেক্ষিতার ধরন আর মাত্রা বদলাত সামন্ততন্ত্রের পর্ব আর স্থানীয় পরিস্থিতি অনুসারে। তাই উল্লিখিত সংজ্ঞার্থ সঠিক শুধু বারো-পনর শতকের পশ্চিম ইউরোপের কোন-কোন অঞ্চল, ষোল-সতর শতকের জাপান আর ষোল-সতর শতকের রাশিয়ার ক্ষেত্রে, যখন এইসব অঞ্চল ছিল উন্নত এবং পরিণত সামন্ততন্ত্রের পর্বে।

তাছাড়া, সামন্ততান্ত্রিক (কিংবা পুঁজিতান্ত্রিক) বিন্যাসের পর্ব স্থির করতে হলে প্রত্যেকটা পর্বের জন্যে একটা ঐতিহাসিক মাপকাঠি থাকা চাই। সেজন্যে স্বভাবতই ধরা যায় এমন সমাজ যেটা অমন বিন্যাস পার হয়ে এসেছে, আর যেখানে প্রধান পর্বগুলো স্পষ্টচিহ্নিত। যেমন – আমাদের মতে – সামন্ততন্ত্রের খুবই 'বিশুদ্ধ' ধরনের পর্বগুলো দেখা যায় ফ্রান্সে, আর দৃষ্টান্তস্বরূপ রাশিয়ায় কয়েকটা কারণে (প্রথমত মঙ্গোলীয় জোয়াল) একটার সঙ্গে অন্য পর্ব কিছুটা জড়িয়ে গিয়েছিল, সেগুলোর শ্রেণীগঠনকর আর প্রথা-প্রতিষ্ঠানগত ক্ষমতা পুরোপুরি প্রকাশ পেতে পারে নি (যেমন, করদ-রাজ্য, শহরবাসীদের সামাজিক বর্গ গঠন আর শহুরে স্বশাসনের মতো সূচকগুলো)। তেমনি, ইংলণ্ডে দেখতে পাওয়া যায় পুঁজিতন্ত্রের বিভিন্ন পর্বের জন্যে খুবই উপযুক্ত মাপকাঠি (বিশেষত ম্যানুফ্যাকচারের পর্ব আর শিল্পক্ষেত্রের অর্থাৎ কারখানা-পুঁজিতন্ত্র)।

কোন ইতিহাসকার তৌলনিক-ঐতিহাসিক পদ্ধতি আয়ত্ত করতে অপারক হলে তিনি বিন্যাসের সাধারণ সংজ্ঞার্থের মধ্যে নিশ্চয়ই ঢোকান এমনসব মূর্ত-নির্দিষ্ট উপাদান আর বিশেষত্ব যেগুলো বিশেষ স্পষ্ট এবং সজোরে প্রকাশ পায় আলোচ্য সমাজের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ধারায়। তাছাড়া, ঐ ইতিহাসকার নিজে, অর্থাৎ কোন প্রতীত ব্যাপার এবং সেটার অঙ্গ-উপাদানগুলি সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ প্রভাবিত হয় তাঁর ঐতি-হাসিক পরিবেশের বিভিন্ন ধারণা, প্রশ্ন আর রাজনীতিক আবেগ দিয়ে। তাই সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে বিভিন্ন পশ্চিম-ইউরোপীয় ইতি-হাসকার বিবেচনা করেছেন সেটার বিভিন্ন প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে: রাজনীতিক খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থা, আর সেটার পরিণতি হিসেবে পোপের

যাজকতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রাধান্য (ওয়াল্টার, রবার্টসন, হিউম); সামন্ত মনিবদের ব্যবস্থা আর সামন্তদের সোপানতন্ত্র (মঁতেস্ক্যু, মাব্লি); রাজনীতিক খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থা আর প্যাট্রিয়ার্কাল শাসনতন্ত্র (এল. বোনাল্ড, জে দ্য'মেস্ত্রে, এফ. শ্লেগেল); শর্তাধীন ধরনের ভূমি-মালিকানা, সর্বোচ্চ ক্ষমতার সঙ্গে সেটার একীভূত অবস্থা, ভূস্বামী শ্রেণীর সোপানতান্ত্রিক গঠন (গিজো); সামন্ততন্ত্রের প্রধান আর্থনীতিক ইউনিট হিসেবে বড়-বড় জমিদারি, ভূমিদাসদের বেগার খাটুনির ভিত্তিতে জমিদারি (কে. লেম্প্রেখ্ট, কে. ব্রশের, ফুস্তেল দ্য কুলাঁজ, টি. রজার্স, ম. ম. কভালেভ্স্কি, প. গ. ভিনোগ্রাদভ, দ. ম. পেত্রুশেভ্স্কি এবং অন্যান্য)।

পরে, উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে শুরু করে বুর্জোয়া ইতিহাসকারেরা সামন্ততন্ত্র সম্বন্ধে নিজেদের ধারণা গড়ে তুলতে থাকেন ক্রমেই বেশি-বেশি মাত্রায় সারগ্রাহিতার (এক্লেক্টিসিজমের) ধরনে, আর সারগ্রাহিতার দ্বন্দ্ব-অসংগতি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টায় তাঁরা (বিশেষত এ. দেপ্শ্চ্) আবার বিবেচনা করেন সামন্ততন্ত্রের প্রধান রাজনীতিক বৈশিষ্ট্য হল সর্বোচ্চ ক্ষমতা স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলোর প্রতিনিধিদের ছাড়াছাড়ি, অর্থাৎ রাজনীতিক খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থা। ফ্রান্সের বিশিষ্ট মধ্যযুগীয় ইতিহাসবেত্তা মার্ক ব্লক (১৮৮৬-১৯৪৪) সামন্ততন্ত্র সম্বন্ধে নিছক রাজনীতিক উপলব্ধি কাটিয়ে উঠতে সার্থক চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনিও মনে করতেন সামন্ততন্ত্রের নিষ্পত্তিকর উপাদানটা হল ব্যক্তিগত সম্পর্কতন্ত্র আর সামাজিক-মানসতার প্রেরণা এবং আচরণবিধি দিয়ে সংহত সর্বজনীন নির্ভরতা আর পৃষ্ঠপোষকতা। সমসাময়িক পশ্চিমী মধ্যযুগীয় ইতিহাসবিদ্যায়ও আর্থনীতিক আর সামাজিক ভিত্তির বদলে রাজনীতিক আর আইনগত গঠনের ভূমিকাটাকে চূড়ান্ত, এমনকি কখনও-কখনও একমাত্র কারক-উপাদান হিসেবে গণ্য করার ধারণাটা এখনও প্রাধান্যশালী।

সামন্ততন্ত্র সম্বন্ধে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমঝ বিষয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে, পরে আরও আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু তুলে ধরা হচ্ছে ভূমিদাস-প্রথা বা আরও যথাযথ কথায় ভূমিদাস আর্থনীতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে লেনিনের সংজ্ঞার্থ: ‘ঐ সময়কার আর্থনীতিক ব্যবস্থার সারমর্মটা ছিল এই যে, কৃষি অর্থনীতির কোন একটা ইউনিটের অর্থাৎ কোন একটা জমিদারির সমস্ত জমি মনিবের আর কৃষকদের জমিতে ভাগাভাগি হয়ে থাকত; শেষোক্ত জমি কৃষকদের মধ্যে অংশে-

অংশে আবণ্টিত হত, (তারা দৃষ্টান্তস্বরূপ কাঠ, কখনও-কখনও গবাদি পশু ইত্যাদি ছাড়াও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ পেয়ে) নিজেদের শ্রম আর নিজেদের সরঞ্জাম দিয়ে সেই জমিতে খেতি করে তার থেকে নিজেদের জীবিকানির্বাহ করত। কৃষকদের শ্রমের উৎপাদ ছিল আবশ্যক উৎপাদ; সেটা কৃষকদের পক্ষে আবশ্যক ছিল তাদের জীবনীয় বস্তু সংস্থানের জন্যে, আর ভূস্বামীর পক্ষে আবশ্যক ছিল তার মনিষের যোগানোর জন্যে। পক্ষান্তরে, একই সরঞ্জাম দিয়ে কৃষকেরা যে-খেতি করত ভূস্বামীর জমিতে সেটা ছিল তাদের বাড়তি শ্রম; এই শ্রমের উৎপাদ পেত ভূস্বামী। এইভাবে, বাড়তি শ্রম আর আবশ্যক শ্রমের স্থান ছিল পৃথক-পৃথক: ভূস্বামীর জন্যে তারা খেতি করত তার জমিতে, আর নিজেদের জন্যে খেতি করত নিজেদের আবণ্টিত জমি-বন্দে; তারা কাজ করত ভূস্বামীর জন্যে সপ্তাহের কোন-কোন দিন, আর নিজেদের জন্যে অন্যান্য দিন। এই অর্থনীতিতে কৃষকের আবণ্টিত জমি-বন্দটা ছিল যেন বস্তু-মজুরি (এটা আধুনিক অভিধা অনুসারে), কিংবা ভূস্বামীর জন্যে মনিষ যোগানোর একটা উপায়।'*

দেখা যাচ্ছে, লেনিন ভূমিদাস অর্থনীতির সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন সর্বাগ্রে রাজনীতিক-আর্থনীতিক বর্গ হিসেবে, তবে তাতে রয়েছে আইনগত দিকটাও (ভূমি-মালিকানা, ভূমিস্বত্ব)। রাষ্ট্র (স্বৈরতন্ত্র), সমাজ-মানসতা, সংস্কৃতি আর রাজনীতিক জীবনের উপর ভূমিদাস-প্রথার প্রভাব লেনিন দেখিয়েছেন আরও অনেক রচনায়, এইভাবে পাওয়া যায় এই ব্যাপারটার বিস্তারিত বিশ্লেষণের একটা দৃষ্টান্ত।

ভারতীয় ইতিহাস যার বিশেষ গবেষণার বিষয় এমন ইতিহাসকার দেখতে পান যে, ভূমিদাস ভিত্তিতে অর্থনীতি ভারতে ছিল ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে। তবে তার থেকে মোটেই প্রমাণ হয় না যে, সামন্ততান্ত্রিক আকারের অর্থনীতি ভারতে ছিল না। কথাটা হল এই যে, রাশিয়ায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠা শুরু হয় আট-নয় শতকে, আর ভূমিদাস-প্রথা — ষোল শতকে, তার মানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রুশী সামন্তত-ন্ত্রের চলেছিল ভূমিদাস-প্রথা ছাড়াই। তেমনি পশ্চিম ইউরোপে কৃষক-দের ভূমিদাসত্ব সাত শতকে শুরু হয়ে সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছয় দশ-এগার

* V. I. Lenin, 'Collected Works', ৩ খণ্ড, ১৯১-১৯২ পৃঃ।

শতকে, ..র তাতে ভাঁটা পড়ে পনর শতকেই। কিন্তু পূর্ব জার্মানি, চেকিয়া, হাঙ্গেরি আর পোল্যাণ্ডে ভূমিদাস-প্রথার আবার প্রসার ঘটে ষোল-সতর শতকে, এটাকে বলা হয় ভূমিদাস-প্রথার দ্বিতীয় 'সংস্করণ'। এইভাবে দেখা যায়, ভূমিদাসত্ব নিঃসন্দেহে একটা সামন্ততান্ত্রিক ব্যাপার হলেও এটা সমগ্র সামন্ততন্ত্রের বিশেষক উপাদান নয়, এটা সামন্ততন্ত্রের নির্দিষ্ট পর্বে এবং অনুরূপ কিন্তু না-অভিন্ন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হয়ে ক্রমে-ক্রমে লোপ পেয়ে যায়।

'সংশ্লিষ্ট দেশে সামন্ততন্ত্র ছিল কি না?' – এই প্রশ্নে আবার ফিরে এসে তাই আমাদের ব্যবহার করতে হচ্ছে খুবই সাধারণ, খুবই বিমূর্ত এবং – দুঃখের কথা – খুবই অসন্তোষজনক সংজ্ঞার্থ। বিশ্লেষণ আর সিদ্ধান্ত অপেক্ষাকৃত মূর্ত-নির্দিষ্ট হতে পারে শুধু পর্বগুলোকে আলাদা-আলাদা করে ধ'রে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব, বিকাশন আর অধঃপতন প্রক্রিয়ার বিবরণ দিয়ে (বিন্যাসটার এই তিনটে পর্বকে কখনও-কখনও সেটার পৃথক-পৃথক পর্বের অনুরূপ কালপর্যায়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয় – যেমন, মোগল স্বৈরতন্ত্রের অবনতির মানে মোটেই নয় সমগ্র সামন্ত-তন্ত্রের অবক্ষয়, সেটা হল সামন্ততন্ত্রের শুধু একটা পর্বের সংকট)। ভারতে সামন্ততন্ত্র ছিল কিনা, তা নয় বিবেচ্য বিষয়, সেখানে সামন্ত-তন্ত্রের পর্ব স্থির করা নিয়েই কথাটা। তাই ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সেটার তুলনা করতে হলে সেটা সাধারণভাবে নয়, করতে হবে বাছাইকর উপায়ে, তাতে তুলনার জন্যে বেছে নিতে হবে অমুক কিংবা অমুক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের (ফরাসী, বৃটিশ কিংবা রুশী ইত্যাদি) কোন একটা নির্দিষ্ট পর্ব, আর তেমনি ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কোন একটা কালপর্যায়।

এই বইখানার পাঠকের কাছে হয়ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এর লেখক কট্টর 'সামন্তওয়ালা', আর এই লেখকের মতাবস্থান হল আর. এস. শর্মা, বি. এইচ. এস. যাদব, এস. নুরুল হাসানের মতো বিশিষ্ট ভারতীয় ইতিহাসকার এবং তাঁদের অনুগামীদের কাছাকাছি। আর গুণী গবেষক ইরফান হাবিবের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং সার্থক সিদ্ধান্তের অনেকগুলি আমারও হলেও, একটা বিশেষ সামাজিক-আর্থনীতিক বিন্যা-সের ভিত্তি হিসেবে 'এশীয় উৎপাদন-প্রণালী'র প্রবক্তা হিসেবে তাঁর সাধারণ মতাবস্থান আমি মেনে নিতে পারি নে। আমি মনে করি,

প্রাচ্য সামন্ততন্ত্রের পর্ববিভাগে দুষ্করতা দেখা দেবার কারণ অনেকাংশে এই: সামন্ততান্ত্রিক খণ্ড-বিখণ্ড পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধরে-নেওয়া নেতিবাচক মনোভাব, আর সামন্ততান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ ব্যাপারটা সম্বন্ধে সমানই ধরে-নেওয়া কিন্তু সদর্থক (যদিও সবসময়ে অকুণ্ঠ নয়) মূল্যায়ন। যাতে নিহিত ছিল বর্গ-শ্রেণীগত প্রভেদনের প্রক্রিয়া সেই সামন্ততান্ত্রিক খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থার কালপর্যায় যদিও পুরোপুরি পার হয়ে চলতে পারে নি প্রাচ্য মূলভূমির কোন বড়রকমের সমাজ, তবু পণ্য-বিনিময়ের ভিত্তিতে শহর আর গ্রামের মধ্যে সামাজিক শ্রমবিভাগ আর উৎপাদনের উপকরণের বিভিন্ন স্থানীয় বাজার গড়ে ওঠার ফলে প্রাচ্য সামন্ততন্ত্রের হু বিশেষত্ব পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল নবযুগের সূচনা নাগাদই শুধু নয়, আমাদের একাল অবধিও (স্বভাবতই বিশেষ-বিশেষ অবশেষের আকারে)।

প্রাচ্যে পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভব শুরু হয়েছিল কোন্ মাত্রা থেকে – এই প্রশ্নটার উত্তরের জন্যে সামন্ততন্ত্রের পর্ব স্থির করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়। গোটা সামন্ততান্ত্রিক বিন্যাস, কিংবা সেটার অন্তত কোন-কোন পর্ব এড়িয়ে পুঁজিতন্ত্র আসতে পারে বলে মনে করা যায় তত্ত্বীয় বিচারে (কোন-কোন পর্ব এড়িয়ে সেটা ঘটেছিল এমনকি ইউরোপেও, যেমন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়)। তবে যেকোন অবস্থায় নির্ধারণ করা চাই বিভিন্ন প্রারম্ভিক বিকৃতি, যা ঘটেছিল সমগ্র উঠতি পুঁজিতন্ত্রের ক্ষেত্রে, কিংবা বিশেষত সেটার বিভিন্ন অঙ্গের বেলায়। এইভাবে, আমরা ফিরে আসছি লেনিনের গোড়ার উপস্থাপনায়, যাতে (বিন্যাসের মানদণ্ড স্থির করতে গিয়ে) সংশ্লিষ্ট যুগের গতির গড় জাতিরূপ আর গড় গতিমাত্রা হল বিবেচ্য নবযুগের আফ্রিশীয় সমাজগুলিতে সেই জাতিরূপ আর গতিমাত্রা থেকে বিভিন্ন জাতীয় বিচ্যুতি বিশ্লেষণে প্রারম্ভিক নির্ণায়ক (সূচক)।

ঐতিহাসিক গবেষণায় ব্যবহৃত ধারণাতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুন গবেষকেরা কোন নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ শুরু করার আগে তাঁদের ব্যবহৃত যুক্তি-বিচার প্রণালী আর পরিভাষার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করতে প্রবৃত্ত হন। সম্প্রতি গড়ে-ওঠা এই রেওয়াজটা চালু থাকা দরকার। এখানে বলা চাই, কোন বুনিয়াদী ব্যবস্থা বিচার-বিশ্লেষণের সুবিন্যাসবিদ্যা নির্দিষ্ট আকারে তুলে ধরেন সর্বপ্রথমে মার্কস, আর সংশ্লিষ্ট যুগের

কোন একটা বিন্যাস (কিংবা তার বিভিন্ন পর্ব) সম্বন্ধে নির্দিষ্ট গবেষণার যে-বৈশ্লেষিক প্রণালী ইতিহাসবিদ্যায় বিদিত সেটার সঙ্গে ঐ সুবিন্যাস-বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট।

বনিয়াদের চারটে অঙ্গ-উপাদানকে অখণ্ড সমগ্র সত্তার অংশ (তাতে উৎপাদনের ভূমিকা সর্বপ্রধান) হিসেবে জোর দিয়ে তুলে ধরে মার্কস ঐসব অঙ্গ-উপাদানের প্রত্যেকটার ইতিহাসক্রমে নির্দিষ্ট স্বধর্ম সম্বন্ধে এবং সেগুলির পরস্পর-সম্পর্ক সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করেন: 'কোন উৎপাদন এইভাবে নির্দিষ্ট করে দেয় কোন ভোগ-ব্যবহার, কোন বণ্টন, কোন বিনিময় এবং **এই বিভিন্ন অঙ্গ-উপাদানের মধ্যে কোন সম্পর্ক**।'* এইভাবে, এইসব অঙ্গ-উপাদানের প্রত্যেকটা এবং – যা বিশেষত তাৎপর্যসম্পন্ন – সেগুলোর পরস্পরক্রিয়ার কর্ম-বন্দেজ হল আলোচ্য সমাজের বিন্যাসমাত্রা আর পর্ব-বিন্যাস মাত্রার একটা নির্দেশক। অথচ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পৃথক-পৃথক বিন্যাসগত পর্বে সমগ্র বনিয়াদ-সম্পর্কের উপর অঙ্গ-উপাদান চারটের অমুক কিংবা অমুকটার ক্রিয়াফলাঙ্ক পৃথক-পৃথক। তাই বিশ্ব-ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বিন্যাসের বনিয়াদের সাধারণ পরিবর্তন উৎপাদনক্ষেত্রে পরিবর্তন অনুসারে নির্ধারিত হলেও, কোন একটা নির্দিষ্ট সমাজে বিন্যাস-পর্বগত পরিবর্তনের সাক্ষাৎ তাগিদ অনেক সময়ে আসে বনিয়াদের অন্য কোন অঙ্গ-উপাদান থেকে। বনিয়াদের বিভিন্ন অঙ্গ-উপাদানের এই বিন্যাসগত তেজ থেকেই গড়ে ওঠে কোন বিন্যাসগত (কিংবা পর্বগত) পরস্পর-সম্পর্ক।

উৎপাদনের উপকরণ হল সমাজ বিকাশনের একটা কারক-উপাদান, সেটার তাৎপর্য বদলে যায় মানবসমাজের বিন্যাসগত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। এঙ্গেলস ১৮৮৪ সালে মার্কসবাদী ইতিহাসকারদের সামনে তুলে ধরেন এই কাজটা: 'সরল পণ্য-উৎপাদন সমেত আগেকার সমস্ত আমলে যে-উৎপাদনের উপকরণের আধিপত্য ছিল এখনকার সেইসব উপকরণের তুলনায় যৎসামান্য মাত্রায় সেটার এখনকার নিরঙ্কুশ আধিপত্য হয়ে দাঁড়াল কিভাবে তা দেখাতে হবে।'** কথাটা পুঁজিতন্ত্রের

বিকাশন সম্বন্ধে গবেষণার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই প্রক্রিয়ার ধারায় উৎপাদনের উপকরণ নিরঙ্কুশ আধিপত্যের পর্যায়ে পৌঁছয় শিল্পক্ষেত্রের পুঁজিতন্ত্রের পর্বে। তবে এঙ্গেলসের ঐ কথাটায় অপেক্ষাকৃত সাধারণ ধরনের ঐতিহাসিক নির্দেশ উপাদান রয়েছে সেইসব গবেষকেরও জন্যে যাঁরা বিচার-বিশ্লেষণ করেন বিভিন্ন প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক বিন্যাস সম্বন্ধে, যখন উৎপাদনের উপকরণের আধিপত্য ছিল 'শুধু যৎসামান্য মাত্রায়'। প্রকৃতপক্ষে, ঐতিহাসিক প্রগতি আর বিভিন্ন প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক বিন্যাস এবং সেগুলির বিভিন্ন পর্বের পারম্পর্যের একমাত্র কারক-উপাদান হিসেবে কাজের সরঞ্জামের উন্নতি আর উৎকর্ষকে তুলে ধরে কোন ইতিহাসকার বিচার-বিশ্লেষণ করতে গেলে বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্বীয় উপাত্তের সঙ্গে সেটার অসংগতি অবশ্যম্ভাবী, – ঐসব উপাত্তে দেখা যায়, প্রথম শ্রেণীর সমাজগুলির বিন্যাস আর উন্নত সামন্ততন্ত্রের মধ্যে যে-কাল-ব্যবধান সেই হাজার-হাজার বছরে কৃষিকাজের সরঞ্জামের বড় একটা পরিবর্তন ঘটে নি।

পুঁজিতান্ত্রিক আমলের আগে প্রযুক্তির কোন একটানা উন্নতি ঘটে নি, এই সঠিক সিদ্ধান্ত থেকে স্বভাবতই এমনটা বোঝায় না যে, প্রযুক্তি তখন পড়েছিল বদ্ধ অবস্থায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে 'বিভিন্ন লুপ্ত সামাজিক-আর্থনীতিক বিন্যাস সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্যে কাজের বিভিন্ন সরঞ্জামের অবশেষগুলোর' বিশেষ গুরুত্ব সম্বন্ধে মার্কসের সুবিদিত ধারণাটি। তাতে তিনি আরও বলেন, 'কী উৎপন্ন হল সেটা দিয়ে নয়, কিভাবে, কাজের কোন সরঞ্জাম দিয়ে তা উৎপন্ন হল সেটা দিয়েই সূচিত হয় বিভিন্ন আর্থনীতিক যুগের মধ্যে পার্থক্য'। আর তার উপর পাদটীকায় মার্কস বলেন : 'উৎপাদনের বিভিন্ন যুগের মধ্যে প্রযুক্তিগত তুলনায় বিলাসদ্রব্যের গুরুত্ব সবচেয়ে কম'।* প্রসঙ্গত বলি, এশীয় কারুকলা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যেসব ইতিহাসকার কারুকর্মের কৃতিকে গুলিয়ে ফেলেন সংশ্লিষ্ট বিন্যাসের বিশেষক উপাদানের সঙ্গে তাঁদের প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই শেষের মন্তব্যটি।

প্রাচ্যে হাজার-হাজার বছরের মধ্যে যদিও লাঙলের মতো বিভিন্ন সরঞ্জামে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় না 'কাজের বিভিন্ন সরঞ্জামের

অবশেষগুলিতে', তবু তার থেকে এশীয় হস্তশিল্পের প্রযুক্তিগত বদ্ধ অবস্থার পরমকরণ চলে না। প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনক্ষেত্রের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের বিশেষত্ব হল এই যে, '...আলাদা-আলাদা প্রত্যেকটা শিল্প তার পক্ষে মানানসই প্রযুক্তিব্যবস্থা প্রায়োগিক উপায়ে বের ক'রে ধীরে-ধীরে সেটার উন্নতি ঘটায়, আর যে-ই সেটা কিছু পরিমাণে পরিণত হয়ে ওঠে অমনি চটপট সেটা দানা বেঁধে যায়। বাণিজ্য খাতে পাওয়া কাজের কোন নতুন মালমশলা ছাড়াও কাজের সরঞ্জামের ক্রম-পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটে সময়ে-সময়ে। কিন্তু কোন মানানসই ধরনের হাতিয়ার যে-ই গড়ে ওঠে সেটা আর বদলায় না, তা দেখা যায় হাজার বছর ধরে পুরুষানুক্রমে সেটা চালু থাকার ভিতর দিয়ে।'* দেখা যাচ্ছে, পুরোপুরি উদ্ধৃত এই রচনাংশে (এটার শুধু শেষের বাক্যটাই অনেক সময়ে উদ্ধৃত হয়) মার্কস হাতে-চালানো প্রযুক্তির সাধারণ বদ্ধতার কথা বলেন নি। প্রযুক্তির উৎকর্ষ ঘটত ধীরে, সেটা নিরবচ্ছিন্ন (ধারাবাহিক) ছিল না – এটাই তিনি বলেছেন প্রথমত ; আর দ্বিতীয়ত প্রযুক্তি ব্যবস্থা দানা বেঁধে যাবার কথা তিনি বলেছেন শুধু পৃথক-পৃথক শিল্প প্রসঙ্গে – সমগ্র উৎপাদন প্রসঙ্গে নয়। কোন নতুন মালমশলা দেখা দিলে শুধু তবেই – অর্থাৎ বিনিময়ক্ষেত্রের ক্রিয়াফলে – আবার সেটার উন্নতি ঘটতে পারত।

কোন একটা মাত্রায় পৌঁছে প্রযুক্তির সাধারণভাবে দানা বেঁধে যাবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা খণ্ডন করা যায় পশ্চিম ইউরোপের বৈষয়িক সংস্কৃতির ইতিহাস-সংক্রান্ত উপাত্ত দিয়ে, যেসব উপাত্ত সুবিদিত। গোড়ার দিককার সামন্ততন্ত্রের পর্বে আংশিক অবনতি আর বদ্ধতার পরে ইউরোপীয় প্রযুক্তির বর্ধিত অগ্রগতি ঘটে চোদ্দ-আঠার শতকে – প্রথমে উন্নত সামন্ততন্ত্রের পর্বে, আর পরে পুঁজিতন্ত্রের ম্যানুফ্যাকচারি পর্বে, অর্থাৎ হাতের কাজের কুটিরশিল্পের চৌহদ্দির ভিতরে। চোদ্দ-পনর শতকে ইউরোপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বাতচক্র আর জলচক্র – সেগুলো ব্যবহৃত হত গম-ভাঙানো আর কাপড়-বোনার জন্যে, ধাতু-শিল্পে, খনি-শিল্পে। মানুষের পেশীতন্ত্র আর দৈহিক শক্তির স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা ঘুচে গেল বায়ুশক্তি আর জলশক্তি ব্যবহার করার ফলে। বায়ুচালনার জন্যে জলচক্র ব্যবহৃত

হবার ফলে প্রযুক্তি-বিপ্লব ঘটল ধাতু-শিল্পে – শুরু হল পিগলোহা উৎপাদন। চলিতকর্মে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে মারুতচুল্লি প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনটা হল লৌহযুগের চূড়ান্ত সাফল্য। জল সরাবার পাম্প আর লিফ্‌ট একেবারে বদলে দিল আকরিক তোলার পদ্ধতিটাকে: পাঁচ থেকে দশ মিটার গভীর খাড়া 'গর্তের' জায়গায় এল অনুভূমিক সুড়ঙ্গের গভীর খাদ। ধাতুর দাম অনেক কমে যাবার ফলে সেটার প্রোসেসিংয়ের পরিমাণ বেড়ে গেল, আর সেটার চাড়ে দেখা দিল সবচেয়ে সাদাসিধে লেদ, তুরপুন, পেষকযন্ত্র। পনর শতকে দেখা দেয় সুতাকাটা কল (তাতে দ্বিগুণ হয় শ্রমের উৎপাদনশীলতা) আর প্যাডেলযুক্ত তাঁত। ঐ সময়েই নির্মিত হয় প্রথম স্বতঃক্রিয় যন্ত্রব্যবস্থা – স্প্রিংওয়ালা ঘড়ি, যা লোকে সঙ্গে নিয়ে ব্যবহার করতে পারে, আর যাতে বদলে গেল সময়-সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণা। বই ছাপানো চালু হবার ফলে তেমনি পরিবর্তন ঘটে মনোজগতে।

কৃষিকাজের উৎপাদন শক্তির বিন্যাসগত পর্ব স্থির করা আরও কঠিন। তবে নিঃসংশয়ে বলা যায়, সামন্ততন্ত্র সবচেয়ে পরিণত আর স্পষ্ট আকার ধারণ করেছিল পশ্চিম ইউরোপের যেসব জায়গায় (উত্তর ইতালি, উত্তর ফ্রান্স, ফ্ল্যান্ডার্স, দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানি, বৃটেন) সেখানে-সেখানে কৃষিকাজ আর পশুপালনের উন্নতি ঘটেছিল অসভ্য যুগের তুলনায়। যা-ই হোক, কৃষিকাজে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত উৎপাদ হত যাতে বিপুল পরিমাণে বর্ধিত শহরবাসীদের, সামন্ত মনিব আর তাদের লোকজনের খাদ্য জুটত, আর কোন-কোন অঞ্চলে শুরু হয়েছিল রপ্তানির জন্যে উৎপাদন (ইংলণ্ডের পশম, ফ্রান্সের মদ)। ঐসব অঞ্চলে কৃষির উন্নতিটাকে ভাগ করা যায় দুটো কালপর্যায়ে: একটা হল এগার-তের শতক, তখন ফসলের জমির আয়তন বেড়েছিল, আর অন্যটা শুরু হয় তের শতক থেকে, তখন ঘটে কিছুটা গুণীয় পরিবর্তন (নতুন-নতুন ফসল, সার, ফসল-বদলের তিন-খেতি প্রণালী, লাঙলের উন্নতি, বলদের বদলে ঘোড়া ব্যবহার, ইত্যাদি)।

ইউরোপ আর এশিয়ার কৃষির মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে মনে রাখা দরকার প্রাচ্যের বেশির ভাগ কৃষিক্ষেত্রে টানা আর বওয়ার কাজে ঘোড়া লাগানো হত না। ঐসব কাজ করানো হত বলদ, মোষ, ইত্যাদি দিয়ে, কিংবা লোকে তা করত নিজেরাই (খেত যখন চষা হত কোদাল, গাঁইতি,

ইত্যাদি দিয়ে)। পশ্চিম ইউরোপে কৃষির গোড়ার দিককার সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে উন্নত সামন্ততান্ত্রিক প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাওয়াটা অনেকাংশে সংশ্লিষ্ট ছিল বলদের জায়গায় ঘোড়া ব্যবহার করার সঙ্গে। টানা-বওয়ার পশু-বদলের ফলে দেখা দেয় নতুন-নতুন এবং অপেক্ষাকৃত বেশি উৎপাদী সরঞ্জাম শুধু তাই নয়, অধিকন্তু পশুখাদ্য ফসল সমেত সমস্ত শস্য ফলাবার জমির আয়তন বাড়াবার প্রয়োজন দেখা দেয়। বলদে খেত স্বাভাবিকভাবে জন্মানো ঘাস-লতাপাতা আর ফসলের অবশিষ্টাংশ (খড়, নাড়া, ইত্যাদি), কিন্তু ঘোড়ার জন্যে (বিশেষত খেতি কাজের মরসুমে) দরকার হয় পশুখাদ্য শস্য, যা চাষী আর তার পরিবা-রেরও খাদ্য। অর্থশাস্ত্রের বিবেচনাধারায় তার অর্থ হল স্বভাবজ (শস্য) তহবিল, অর্থাৎ মোট বাড়তি আর আবশ্যক উৎপাদ নতুন করে ভাগা-ভাগি করার প্রয়োজনের উদ্ভব। পুনরুৎপাদনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পশুখাদ্য শস্য ছিল আবশ্যক উৎপাদের একটা অঙ্গ-উপাদান। তবে কোন সামন্ত মনিব এই অবস্থাটার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারত এক-মাত্র, যদি মোট কৃষি-উৎপাদে তার হিসসাটা না কমে সমানে বেড়েই চলে। এই শ্রেণীগত পরিস্থিতির মীমাংসা হতে পারত শক্তির কোন নতুন উৎসের সাহায্যে চাষীর শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ভিত্তিতেই শুধু।

গোরু-বলদ যখন আর শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হত না তখন সেগুলো উৎপাদী পশুপালে পরিণত হয়; তখন ভেড়ার সঙ্গে সেগুলো হল কৃষিক্ষেত্রে উঠতি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে সবচেয়ে বাজার-চল এবং সামাজিক দিক থেকে কার্যকর বস্তু। প্রাচ্যে যাযাবর-বহির্ভূত কৃষিক্ষেত্রে উৎপত্তির একটা ক্ষেত্র হিসেবে উৎপাদী পশুপালন (সেটা সবে আচরিত হচ্ছে ব'লে) এই প্রক্রিয়াটা-সংক্রান্ত সাধারণ তত্ত্বে বড় একটা প্রকাশ পায় নি। দেখা যাচ্ছে, প্রাচ্যে পুঁজিতন্ত্রের উৎপ-ত্তির কারক-উপাদানগুলোর মধ্যে পশুপালন স্থান পায় নি, এই ব্যাপার-টার বিশেষ জাতিরূপগত ব্যাখ্যা আবশ্যক (বিশেষত ফীড্‌ব্যাক (পুনরুদ্ধা-রকর) 'পরিভোগ-উৎপাদন' দৃষ্টিকোণ থেকে)।

প্রাকৃতিক অবস্থার পার্থক্যের দরুন দৃষ্টান্তস্বরূপ দক্ষিণ এশিয়ার কৃষির সঙ্গে পশ্চিম-ইউরোপীয় কৃষির তুলনা করা দুষ্কর। তবে ইউরো-পীয় কৃষি যখন নবযুগের প্রাক্কালে তখন সেখানে সরঞ্জাম এবং কৃষি প্রযুক্তি-প্রণালী বদলে যাচ্ছিল, আর কাজ-করা পশু ছিল অন্য রকমের—

এটা এই কৃষির স্পষ্ট-প্রতীয়মান শ্রেষ্ঠতা। তাই সেখানকার কৃষক উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক সংগঠন মেনে নিতে সামাজিক আর মানসতার দিক থেকে প্রস্তুত ছিল।

উন্নত সামন্ততন্ত্রের আর-একটা বৈশিষ্ট্য হল জাহাজ-চলাচলের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। অধীন মানুষের পেশীর জোরে (দাস-শ্রমের অবশেষ) চালানো পাল-তোলা দাঁড়-টানা জাহাজ (গ্যালি) বাতিল করে দেওয়া হয় ঐ সময়ে – এটা লক্ষণীয়। গ্যালির বদলে চালু হয় ক্যা-রেভেল, এটা সম্ভবত প্রথম তৈরি হয়েছিল পনর শতকে সামন্ততান্ত্রিক পোর্তুগালে। তিন মাস্তুলের এই জাহাজে পাল থাকত সোজাসুজি, আর নাবিক দরকার হত অপেক্ষাকৃত কম, তাই কম লাগত খাদ্য আর জল, নৌবাহের পাল্লা ছিল বেশি। নতুন ধরনের এই পাল-তোলা জাহাজ ছিল দ্রুতগামী, কৌশলী চালনার উপযোগী, তাতে কম্পাস ছিল উন্নত ধরনের, তাই সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে নিয়মিত জলযাত্রা সম্ভব হল। এইভাবে, অত আগে, উন্নত সামন্ততন্ত্রের পর্বে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব বাজার গড়ে ওঠার জন্যে আবশ্যক অবস্থা সৃষ্টি হয় জাহাজ-চলাচলে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে।

অমুক কিংবা অমুক আফ্রিকীয় দেশে এইরকমের কিংবা অনুরূপ প্রযুক্তিগত নবপ্রবর্তন না দেখা গেলে সেটা থেকে সেই দেশের সামন্ততা-ন্ত্রিক সমাজের নিচু মান আর বদ্ধতা সম্বন্ধে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, কিন্তু আগেকার বিন্যাস থেকে পাওয়া প্রযুক্তির উৎকর্ষসাধন সামন্ততন্ত্রের আমলে সম্ভব নয়, এমন সামান্যীকরণ চলে না। তেমনি, আলোচ্য দেশে পুঁজিতন্ত্র না-থাকা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তও করা যেতে পারে পুঁজিতান্ত্রিক কর্মশালার বিস্তারিত বিশেষীকরণ আর শ্রমবিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাতে-চালানো প্রযুক্তির পরবর্তী পর্ব সেদেশের প্রযু-ক্তিব্যবস্থার মধ্যে নেই ব'লে। মার্কস 'পুঁজি'তে নির্দেশ করেছেন এই পর্বটাকে: 'ম্যানুফ্যাকচারের কালপর্যায়ে কাজের বিভিন্ন হাতিয়ার আংশিক শ্রমিকদের খুবই বিশেষ ধরনের কর্মের সঙ্গে উপযোজিত হয়ে অপেক্ষাকৃত সরল, উন্নত এবং বহুমুখী হয়ে ওঠে।'* মার্কস আরও

লিখেছেন: 'কাজের যেসব হাতিয়ার, বিশেষত বিভিন্ন যৌগিক সরঞ্জাম তখন (আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। – ভ. প.) আগে থেকে ব্যবহৃত হচ্ছিল সেগুলোকেই তৈরি করার কর্মশালা হল ম্যানুফ্যাকচারের একটা ষোল-আনা নমুনাসই সৃষ্টি। ...ম্যানুফ্যাকচারের শ্রমবিভাগের সেই উৎপাদ আবার পয়দা করল যন্ত্রপাতি।'* এই পর্বে উৎপাদন-ব্যবহার হস্তশিল্পের সেই উৎপাদটাকেই অপসারিত করে যা গোড়ায় সেটার উদ্ভব ঘটিয়েছিল, আর প্রস্তুত হল কারখানার পথ। এমনসব কর্মশালা হল বিনিময়ক্ষেত্রের মাধ্যমে উৎপাদনের সঙ্গে ব্যবহারের সবচেয়ে বেশি উৎপাদী একীভবন, যখন গড়ে ওঠে কায়িক শ্রমের উন্নত ধরনের বিভিন্ন হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি আর স্টীম ইঞ্জিনের বাজার। অনুরূপ প্রক্রিয়াও প্রাচ্যে দেখা যায় নি নবযুগের শেষাশেষি অবধি।

এইভাবে, হস্তশিল্প আর পরিবহণে যন্ত্র চালু হবার আগেকার হস্ত-প্রযুক্তিতে বেশকিছু স্পষ্ট বিন্যাসগত, এমনকি পর্বগত উপাদানও রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সমাজের ভিতরে সেটার উন্নতিকে বিন্যাসগত আর পর্বগত কালপর্যায়ে ভাগ করা যায়। তবে পর্ব-বিন্যাসগত বিশেষকের একটা চূড়ান্ত বিনির্ণায়ক হিসেবে হস্ত-প্রযুক্তির বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে (বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে) সরাসরি তুলনা করতে গিয়ে খুবই সতর্ক থাকা দরকার। বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থা, জনবহুলতা এবং অন্যান্য দিক থেকে পার্থক্যের প্রভাবে একই প্রযুক্তির পর্ব-বিন্যাসগত ক্রিয়াফল হতে পারে বিভিন্ন। তেমনি উলটে ধরলে, – অনেক সময়ে দেখা যায়, অনুরূপ পর্ব-বিন্যাসগত বিশেষকের বিভিন্ন সমাজের প্রযুক্তি-মাত্রা ভিন্ন-ভিন্ন, বিশেষত কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে।

মধ্য আর উত্তর ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ঘটতে পেরেছিল শুধু খেতি-কৃষির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, আর জাপান সামন্ততন্ত্রের সমস্ত পর্ব পার হয়ে সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের পর্বে পৌঁছেছিল প্রধানত হাতে (কোদাল, গাঁইতি, ইত্যাদি দিয়ে) চাষ করার অবস্থায়। দেখা যাচ্ছে, কোন-কোন প্রাকৃতিক পরিবেশে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল খুবই জনবহুল হলে, জমি চষার অপেক্ষাকৃত সেকেলে প্রণালী যখন সংযুক্ত হয় অন্যান্য হরেক রকমের কৃষি-প্রযুক্তির সঙ্গে (কাজের ধরনধারন,

---

* ঐ. ৩৮১ পৃঃ।

জলসেক, সার, বেশি ফলনের ফসল), আর তার উপর জীবনীয় বস্তু যদি হয় খুবই সীমাবদ্ধ (খোরাক থেকে মাংস, দুধ, ডিম, ইত্যাদি একেবারে কিংবা অংশত বাদ), সেক্ষেত্রে যেখানে পর্ব-বিন্যাসগত বিশেষক উপাদানগুলি উঁচু মাত্রার, সেইসব সমাজের সুস্থিত কর্মনির্বাহের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ আবশ্যক উৎপাদ আর বাড়তি উৎপাদের মান নিশ্চিত হয়। তাছাড়া, কোন-কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় পিছিয়ে যাওয়া গোছের ব্যাপার, যখন ব্যবহৃত হয় অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদী শ্রম-সরঞ্জাম: মধ্যযুগীয় চীনে ভূমিতে লোকের চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খুদে খামারীরা লাঙলের বদলে কোদাল-গাঁইতি দিয়ে জমি চষতে বাধ্য হয়েছিল। তবে সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপে ছোট-ছোট জমি-বন্দের যেসব কৃষক শস্য-ফলানো ছেড়ে সবজি-খেতি, দ্রাক্ষা-চাষ আর মদ্য উৎপাদন ধরেছিল তারাও ফিরে গিয়েছিল হাতে-চাষে।

এইভাবে, শ্রম-সংগঠনের উৎকর্ষ আর সামাজিক পরিবেশের বিশ্লেষণের সঙ্গে মিলিয়ে প্রযুক্তিকে, বিশেষত হাত দিয়ে প্রয়োগের শ্রম-সরঞ্জামকে ধরা যেতে পারে একটা পর্ব-বিন্যাসগত সূচক হিসেবে। এটার উন্নতিই শেষে গিয়ে সংশ্লিষ্ট সমাজের চৌহদ্দির ভিতরে বিভিন্ন পর্ব আর সেগুলোর বিভিন্ন পর্বের ধারাবাহিকতার একটা অপরিহার্য শর্ত। তবে, প্রথমত, কোন সমাজের বিভিন্ন ইতিহাসক্রমিক উন্নততর পর্যায়ে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজের পর্ব-বিন্যাসগত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রযুক্তির প্রভাব বেড়ে-বেড়ে সেটার নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপিত হয় শুধু যন্ত্রে-উৎপাদনের আমলে; দ্বিতীয়ত, শ্রমের সরঞ্জাম আর প্রযুক্তির উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে মানুষ, মানুষের শ্রম-সংগঠন আর প্রাকৃতিক পরিবেশ সমেত উৎপাদন-শক্তির সর্বসাকল্যের উপর; তৃতীয়ত, শোষক আর শোষিতদের আগেই গড়ে-ওঠা অপরিহার্য স্বত্ব অনুসারে বাড়তি উৎপাদ পয়দা-হওয়া এবং ভোগ-দখলের সম্ভাবনা নিয়মিত হয়।

প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক সমাজগুলির ইতিহাসক্রমিক বিকাশনের একটা কারক-উপাদান হিসেবে প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। প্রশ্নটার নিষ্পত্তি এখনও হয় নি, কেননা অনুরূপ প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক পরিবেশের বিভিন্ন বিন্যাস-সংক্রান্ত উপাত্তগুলোর মধ্যে তুলনা করে আরও গভীরপ্রসারী বিচার-বিশ্লেষণ

সেজন্যে দরকার। ভারতীয় তথ্যাদির ভিত্তিতে হাজির করা যেতে পারে শুধু দুটো অনুমান: এক, প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক পরিবেশ এমন নিয়ত কারক-উপাদান* নয় যেটা ইতিহাসক্রমিক অগ্রগতির মাত্রানির্বিশেষে সেটাকে ত্বরিত কিংবা ব্যাহত করে; এই পরিবেশ বরং সেখানকার জনসমষ্টিকে উন্নয়নের কোন একটা মাত্রায় (স্বভাবতই প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক) পৌঁছতে প্রবৃত্ত করায়, সেই মাত্রায় এই সমাজ 'থাকে খুবই দীর্ঘকাল'; দুই, সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক পরিবেশে সংহত সামাজিক-আর্থনীতিক গঠনের উৎপাদন-শক্তির নির্দিষ্ট মাত্রায় মুখ্য অনুপাতগুলি বজায় রাখার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে 'সমাজ – প্রকৃতি' পরস্পর-ক্রিয়ার গতীয় কিংবা বদ্ধ প্রকৃতি। তাই কোন-কোন প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক পরিবেশে কোন-কোন জনসমষ্টি ইতিহাসক্রমিক বিকাশনের কোন-কোন পর্ব পার হয়ে যায় (এমনকি এড়িয়েও যায়) অপেক্ষাকৃত দ্রুত, কিন্তু খুবই দীর্ঘকাল থেকে যায় অন্য কোন-কোন পর্বে, যেগুলি সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টি, প্রাকৃতিক পরিবেশ আর নির্দিষ্ট অঞ্চলের পক্ষে হয়ে ওঠে যেন স্বকীয়, উপযোগী। সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে শাসক শ্রেণীগুলো তখনকার উৎপাদন-প্রণালী আর বণ্টন-ব্যবস্থার সাহায্যে যে-পরিমাণ বাড়তি উৎপাদ পায় সেটার বিপুল প্রভাব পড়ে সমগ্র গঠনের স্থিতির উপর।

আমাদের মতে, কাজের সরঞ্জাম আর প্রণালীতে সামান্য পরিবর্তনের সাধারণ কারণটা পাওয়া যেতে পারে এখানে: কোন-কোন উৎপাদনে, যেমন কৃষিতে, সেগুলো একত্রে মিলে হয়ে দাঁড়ায় একটা বহুযৌগিক সমগ্র ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার একটা গ্রন্থিতে উন্নতির ফলে গোটা প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ায় অসামঞ্জস্য আর গোলযোগ ঘটে, আর তার প্রভাব পড়ে উৎপাদের গুণাগুণের উপর। লোহা বিগলন, চামড়া পাকা করা আর রঞ্জক প্রস্তুত এবং প্রয়োগের বেলায় সেটা ঘটেছিল। স্পষ্টতই, প্রক্রিয়াটার

* প্রাকৃতিক পরিবেশকে এখানে নিয়ত কারক-উপাদান হিসেবে ধরা হচ্ছে শর্তাধীনে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেই প্রাচ্যেই হাজার-হাজার বছরের মধ্যে সেটার বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছিল (প্রধানত প্রাণী-পরিবেশ সম্পর্ক লঙ্ঘনের দরুন), বিশেষত যাযাবরদের পশুপালন অঞ্চলগুলিতে; এমনসব ক্ষেত্রে 'সমাজ – প্রকৃতি' পরস্পর-ক্রিয়াটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুটো চল-উপাদানের পরস্পর-সম্পর্ক, যার ফলে বিশ্লেষণে জটিলতা দেখা দেয় স্বভাবতই; তবে নবযুগের অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত কালপর্যায়ে প্রাচ্যে প্রধান-প্রধান অঞ্চলগুলির প্রকৃতি কার্যত বদলায় নি। তাই এটাকে ধরে নেওয়া হল নিয়ত কারক-উপাদান হিসেবে।

স্থান আর ভূমিকা এবং বিভিন্ন অঙ্গ-উপাদান সম্বন্ধে নিছক প্রায়োগিক ধারণার ফলেও সেটার সাধারণ সর্বোপযোগী রূপান্তর ঘটতে পারত (ক্রমে-ক্রমে হলেও)। তবে ভারতীয় কারিগরদের পুরুষানুক্রমে পাওয়া বিভিন্ন প্রণালীতে ভেবে-চিন্তে পরীক্ষামূলক উন্নতি ঘটাবার সম্ভাবনা ছিল সামান্যই (বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক রূপান্তরসাধন তো নয়ই)। দীর্ঘকাল আগে গড়ে-ওঠা এবং সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে পরীক্ষিত প্রযুক্তি তাই হয়ে দাঁড়ায় উৎপাদনের শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান গোছের ব্যাপার, তাতে সমস্ত খুঁটিনাটি আর ক্রিয়াপ্রণালী পবিত্র-অলঙ্ঘনীয়, তার মানে অপরিবর্তনীয়।

সরঞ্জাম আর প্রযুক্তি সম্বন্ধে সচেতন অর্থাৎ সক্রিয় মনোভাবের পথে প্রতিবন্ধকটা ছিল এই: সেগুলো সম্বন্ধে তথ্যাদি ('উৎপাদন-কৌশলগুপ্তি') থাকত কারিগরদের মনে-মনে আর প্রণালীর মধ্যে, সেটা পুরুষানুক্রমে জানিয়ে দেওয়া হত মুখে-মুখে। প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা যখন লিখিত আকারে (বোধগম্য ভাষায় এবং উপযুক্ত সংখ্যায়) রক্ষিত হয়, শুধু তখনই সচেতনভাবে সেটার উৎকর্ষসাধনের ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, কেননা শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত করে সেটাকে করে তোলা হয় যুক্তিসম্মত। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ষোল শতকের গোড়ার দিক থেকে ইউরোপীয় কারুশিল্পের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিতে বিভিন্ন জনবোধ্য ছাপানো সারগ্রন্থ প্রকাশিত হত: রসায়ন, ধাতুবিদ্যা, খনির কাজ, কোহল চোলাই, কাপড় বোনা, ভূমি উন্নয়ন। এইভাবে বিভিন্ন হস্তশিল্পের গোপনীয়তার রেওয়াজী ধরন আর একক-স্বাতন্ত্র্য আর রইল না, সেগুলো হয়ে উঠল *বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়। প্রায়োগিক উপায়ে চালানো ক্রিয়া-*প্রণালীর সারমর্ম বুঝতে অক্ষমতার দরুন দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত প্রক্রিয়াগুলোকে পাকা-পোক্ত করে তোলা যেত না। অনিবার্যভাবেই এই সবকিছুর হানিকর প্রভাব পড়ত শ্রমের উৎপাদনশীলতার উপর, আর উৎপাদের দাম বেড়ে যেত, পক্ষান্তরে কারিগরদের পারিশ্রমিকও প্রভাবিত হত।

ভারতে কৃষিজীবী আর কারুকলাজীবীদের মধ্যে বাজার মরফত ব্যাপক পণ্য-বিনিময়ের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রমবিভাগ গভীরপ্রসারী না হবার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে রাখা দরকার শ্রমের

উৎপাদনশীলতার দিক থেকে কারুকলা ছিল কৃষির পিছনে। এ ব্যাপারে ভারত ব্যতিক্রম নয়, তার কারণ প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সাধারণভাবেই শ্রমের উৎপাদনশীলতা শিল্পের চেয়ে কৃষিতে বেশি। এই প্রসঙ্গে মার্কস লিখেছেন: 'এটা সাধারণভাবেই স্বীকার্য যে, আদিম, প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর ক্ষেত্রে শিল্পের চেয়ে কৃষি বেশি উৎপাদী, কেননা কৃষিতে মানুষের কাজে প্রকৃতি অংশগ্রাহী হয় যন্ত্র কিংবা জীবের মতো, আর শিল্পে মনুষ্য-শক্তি প্রাকৃতিক শক্তির জায়গায় আসে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই (যেমন, হস্তশিল্প ইত্যাদিতে)।'*

ইতিহাসক্রমিক উন্নয়নের মাত্রার সূচক হিসেবে বণ্টন আর বিনিময় আলাদা-আলাদা ভাবেও আর বিশেষত পরস্পর-ক্রিয়ার দিক থেকে উৎপাদনের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই গুরুত্বটাকে মার্কস নির্দেশ করেছেন এইভাবে: 'তাই উৎপাদন কাজ করে আরম্ভস্থল হিসেবে, ভোগ-ব্যবহার হল গন্তব্যস্থান, আর বণ্টন এবং বিনিময় হল মাঝখান, সেটার আবার থাকে দুটো অঙ্গ-উপাদান, কেননা বণ্টনকে বলা হয় সমাজ থেকে উদ্ভূত অঙ্গ-উপাদান, আর বিনিময়কে বলা হয় ব্যক্তি থেকে উদ্ভূত অঙ্গ-উপাদান।'** এইভাবে, প্রাকৃতিক পরিবেশের শুধু মধ্যস্থতার ক্রিয়াফল ঘটে বণ্টন আর বিনিময়ের ক্ষেত্রে, তাতে স্বভাবজ দ্রব্যের প্রোসেসিং হয় প্রতিসরণের সাহায্যে। তাই এক্ষেত্রে সরাসরি প্রতিফলিত এবং প্রকটিত হয় সমাজ আর ব্যক্তির ঐতিহাসিক মাত্রা।

প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের বণ্টন আর বিনিময়ের পুনর্বিভাগ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক প্রণালীর মূলনীতি প্রয়োগ করা দরকার যথাযথভাবে। এটা হওয়া চাইই, কেননা প্রাচ্যবিদ্যাক্ষেত্রে এখনও ভুল সংজ্ঞার্থ দিয়ে বণ্টনকে ফেলা হয় প্রকৃতি-ব্যক্তি সম্পর্কক্ষেত্রে, আর পণ্য-অর্থ সম্পর্কক্ষেত্রে ফেলা হয় বিনিময়কে। অনেক সময়ে বাদ দেওয়া হয় বণ্টন আর বিনিময়ের মধ্যে সবচেয়ে সারবান পার্থক্যটাকে: ব্যক্তি আর বর্গের সামাজিক উৎপাদের চিরাগত হিসসা দিয়ে বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয়, আর – যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ – বণ্টন হয় প্রচলিত নিয়ম, রীত-রেওয়াজ কিংবা

সংযমনের (প্রথা কিংবা আইনের) অধীনে, যেখানে বিনিময় ঘটে পৃথক-পৃথক আপতনের অবস্থায়। এখানে এটা উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম, মার্ক-সের ভাষায় 'ভাসা-ভাসা' ধারণা অনুসারে 'উৎপাদে প্রত্যেকটি ব্যক্তির হিসসা ধার্য করে বণ্টন'। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথাটা এই যে, 'বণ্টন-ব্যবস্থায় সেগুলো (উৎপন্ন জিনিসপত্র যা প্রয়োজনের অনুযায়ী। – ভ. প.) বণ্টিত হয় সামাজিক নিয়ম অনুসারে; ...বণ্টনের বেলায় – প্রচলিত সাধারণ সংজ্ঞার্থ অনুসারে – উৎপাদন আর ভোগ-ব্যবহারের মধ্যে মধ্য-স্থতার ভারটা নেয় সমাজ; বিনিময়ের বেলায় মধ্যস্থতা হয় ব্যক্তির আপতিক বিচার-বিবেচনা অনুসারে।'*

বণ্টন আর বিনিময়ের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করতে হলে চাই বাড়তি উৎপাদ ভোগ-দখল প্রণালীর বিশ্লেষণই শুধু নয়, উৎপাদ-পণ্য রূপান্তরের ধারাটাকে তুলে ধরে প্রতিপন্ন করাই শুধু নয়, অধিকন্তু বণ্টন কর্ম-বন্দেজের ভাবাদর্শগত প্রতিপাদন সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণও আবশ্যক। বিভিন্ন প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বণ্টন-ব্যবস্থাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, উদ্ঘাটনস্থল, বিভিন্ন ভাবাদর্শগত অবশ্যকর্তব্য আর সংযমন, সামাজিক নিয়মাবলি আর প্রচলিত সাধারণ সংজ্ঞার্থগুলির বাস্তব রূপদান। কোন স্বৈরতা-ন্ত্রিক প্রাচ্য রাষ্ট্রে একদিকে নৈর্ব্যক্তিক, ঊন-বিশেষিত বাড়তি উৎপা-দরাশি, আর অন্য দিকে যা ব্যক্তিগত ভোগ-ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত অবস্থায় নয় এমন বাড়তি উৎপাদরাশি, যেটাকে ভোগ-দখল করা হত প্রধানত শস্য হিসেবে এবং বিশেষত সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের নির্দিষ্ট বর্গগত প্রয়োজন অনুসারে – এই দুয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যটাকে লাঘব করত বিনিময়ক্ষেত্র। প্রাচ্যের স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে বণ্টনক্ষেত্রে যেত কী পরিমাণ বাড়তি উৎপাদ সেটা নির্ধারিত হত সামাজিক নিয়ম অনুসারে, অর্থাৎ 'বিধানিক উপায়ে', আর সেই উৎপাদের আরও গুণীয় বাস্তব রূপদান হত বিনিময়ক্ষেত্রের (এবং সেটার অধীন বিভিন্ন শিল্পের) মাধ্যমে, তাতে উৎপাদন আর ভোগ-ব্যবহারের মধ্যে মধ্যস্থতা হত ব্যক্তির বিভিন্ন আপতিক প্রয়োজন অনুসারে।

যতকাল সাধারণ বণ্টনব্যবস্থা ছিল প্রাধান্যশালী, আর বিনিময়

ছিল আংশিক এবং গৌণ, তখন প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ (আরও সঠিক ভাষায় – সেটার শাসক শ্রেণীগুলো) অঙ্গ-উপাদান চারটেরই প্রধান কর্ম করে তুলতে পারত সম্পদের পুনরুৎপাদন নয়, কিন্তু পূর্বনির্দিষ্ট সামাজিক গুণের অধিকারী মানুষের জনন, যেসব মানুষ 'সেরা-সেরা নাগরিক' বা প্রজা। এই লক্ষ্য হাসিল হবার নিশ্চয়তা ছিল এই: প্রাধান্যশালী প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক বণ্টন ছিল একদিকে কড়াকড় সামাজিক নিয়মের অধীন, আর অন্য দিকে সেটার ভিত্তি ছিল জমি আর সেটার জাতদ্রব্য, কর (তার মধ্যে বিনিময়ক্ষেত্র থেকে আদায়-করা কর), মন্দির আর পুরোহিতদের আয়, যুদ্ধে লুটে-নেওয়া মালের বিলি-বন্দেজের মতো সামাজিক-আর্থনীতিক জীবনের নিয়ামকগুলো এবং জনসমষ্টির শ্রমবাধ্যতা। অপরিবর্তনীয়, সামাজিক বিচারে সর্বোপযোগী ব্যক্তি'র (শোষিত আর শোষক দুইই) জননেরই শুধু নয়, তার উপর উৎপাদনের একই প্রযুক্তিগত আর সাংগঠনিক মাত্রা এবং জনসমষ্টির গঠনের অনুপাত বজায় রাখারও ভিত্তি ছিল সেটা।

বুর্জোয়া বিপ্লবে ঠাসা শেষকালীন সামন্ততন্ত্রের একটা বিশেষক ছিল এই অবস্থাটা: সামন্ততান্ত্রিক বণ্টন-ব্যবস্থা, আর জায়মান বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানে দখল করছিল মধ্যযুগীয় বণিকদের জায়গাটা সেই বিনিময়ক্ষেত্রের মধ্যে বদ্ধমূল বিরোধ। তখনও প্রাধান্যশালী সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী আর উঠতি পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর মধ্যে আন্তর্বিন্যাসগত দ্বন্দ্ব-অসংগতি প্রকাশ পাচ্ছিল ঐ বিরোধেরই মাধ্যমে (সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি আর পুঁজিতান্ত্রিক কর্মশালার মালিকদের মধ্যে সরাসর সংঘাতগুলো ছিল স্থানীয় এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত)। দ্বন্দ্ব-অসংগতির প্রকোপনের প্রক্রিয়ার মধ্যে পরস্পরের সম্মুখীন সামাজিক শক্তিদুটো ছিল মারমুখো, তাদের ছিল সংগ্রামের বিশেষ-বিশেষ প্রণালী। বণ্টনের স্বৈরতান্ত্রিক প্রণালীর পতাকীরা জমি আর সেটার উৎপাদের উপর জমিদারী, সামন্ততান্ত্রিক আর যাজকতান্ত্রিক একাধিকার আরও মজবুত করে তুলত, আর কর-ব্যবস্থা আরও পাকা-পোক্ত করত বিনিময়-ম্যানুফ্যাকচার আর জাহাজ-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে। বিনিময়ক্ষেত্রের নতুন-নতুন সামাজিক বর্গের প্রতিনিধিরা সামন্ততান্ত্রিক বণ্টন-ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়তে এবং সর্বপ্রথমে ভূমিতে সামন্ত ভূস্বামী আর গির্জার একাধিকার খর্ব ক'রে বণ্টন-ব্যবস্থাটাকে বানচাল করতে চেষ্টা করত (বণ্টন আর

বিনিময়ের অদ্ভুত একটা সংকর কর-ইজারাদারিকে তারা বিশেষত ব্যবহার করত সেজন্যে)।

নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রগুলিতে ফৌজী অফিসার, সরকারী কর্মকর্তা আর অংশত যাজকদের পারিতোষিক সময়ের হিসাবে টাকায় দেবার ব্যবস্থা চালু হবার ফলে বাজারী চাহিদা অনেকাংশে সুস্থিত হয়েছিল, আর ভোগ-ব্যবহার কিছুটা মাফিকসই হয়েছিল সমাজের উপর-স্তরগুলোয়। স্বৈরতান্ত্রিক প্রাচ্য রাষ্ট্রগুলিতে জেনারেল, সরকারী কর্মকর্তা আর পাদরিদের পারিতোষিকের রকম আর পরিমাণ বেগোছ থেকে গিয়েছিল, সেটা নির্ভর করত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর: শাসকের খেয়ালখুশি, সামরিক লুটের মাল, জনসাধারণের কাছ থেকে জবর-আদায়, ধর্মমতে বিশ্বাসীদের দান এবং অন্যান্য আপতিক অবস্থা, তার ভিত্তিতে নিয়মিত পারিবারিক বাজেট আর তদনুযায়ী বাজারী চাহিদা বজায় থাকা কঠিন ছিল। কোন ব্যক্তির আসল অত্যাবশ্যক দাবি নির্ধারিত হত বরাতের জোরে, আর সেটা মেটাবার প্রণালী নির্ভর করত উৎপাদ কিংবা অর্থ আকারের পারিতোষিকের উপর।*

স্বভাবতই, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের সঙ্গে প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের এই তুলনাটা আগের মতোই বিশেষত্বগুলোকে স্পষ্ট করে তোলায় সীমাবদ্ধ থেকেছে, কাজেই মোটের উপর সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিমূর্তভাবে গড়ে-তোলা বিভিন্ন সূচকের মধ্যে তুলনা। বাস্তব ইতিহাসে, আঠার শতকের গোড়ার দিককার নিরঙ্কুশ ফরাসী রাজতন্ত্র আর তুর্কী অটোমান-সাম্রাজ্যের এমন কোন-কোন বিশেষক ছিল যাতে মনে হত এই দুটো

---

* হস্তশিল্পজাত জিনিসের জন্যে ক্রয়ক্ষম চাহিদার অনিশ্চয়তা আর অস্থিরতার একটা কারণ ছিল এটা, তাতে পুঁজিতান্ত্রিক উপায়ে উৎপন্ন জিনিসের বাজার-চল হওয়া ব্যাহত হত, আর গোটা বছরে সেটার সরঞ্জাম এবং মনুষ্যশক্তির সদ্ব্যবহার আরও দুঃসাধ্য হয়ে উঠত। এমন পরিস্থিতিতে কর্মে-নিয়োগের ক্ষেত্রে খুদে কারবারির চেয়ে কারিগরের এদিক-ওদিক চেষ্টা করার সুযোগ ছিল বেশি, কেননা দুই মরসুমের মধ্যবর্তী সময়ে কারিগর আংশিক সময়ের জন্যে ঠিকা কাজে রোজগার করতে পারত, আর পারিতোষিক নিয়ে শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করত (শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানে মেহনতী স্তরগুলির প্রবৃত্ত হওয়াটা ছিল তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার একটা গুরুত্বপূর্ণ সূচক, আর তাতে তাদের বর্গগত বিশ্ববীক্ষা সুস্থিত হত, কেননা চিরাগত সমাজে ব্যক্তির উৎপাদন-ক্রিয়াকলাপের চেয়ে তার শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানে শরিক হওয়াটা লোকত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হত)।

যেন কাছাকাছি আর সেই কারণে ভাসা-ভাসা পর্যবেক্ষকেরা ফরাসী নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের মনগড়া প্রাচ্য প্রলক্ষণ সম্বন্ধে নিরর্থক জল্পনা-কল্পনা করত। তবে যাঁদের ছিল আরও বেশি দূরদৃষ্টি, যাঁরা ছিলেন আরও বেশি ওয়াকিবহাল, এমনসব সমসাময়িক দেখিয়েছিলেন প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র আর ইউরোপীয় নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের মধ্যে সারবান পার্থক্যগুলো, বিশেষত বণ্টন-ব্যবস্থায় পার্থক্য।

আকারে নিয়মতান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক আর মর্মবস্তুর দিক থেকে বুর্জোয়া ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের নিরঙ্কুশ প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতিনিধিস্থানীয় একটা বণিক কোম্পানি ভারতে দখল-করা অঞ্চলগুলিতে ভূমি থেকে আদায়-করা একক করের উপর রাষ্ট্রিক ধরনের অধিকার হস্তগত করে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভূমি-খাজনা আর করের উপর স্বত্ব জবর-দখল করল, আর বিশেষত কঠোরভাবে এবং অটল থেকে বলবৎ করল সেই অধিকার, তাতে শাসকেরা 'মরুভূমি, ভিখারি আর অসভ্যদের রাজা' হয়ে দাঁড়ানো সম্বন্ধে এফ. বার্নিয়ে-র ঘোর আশঙ্কা যথার্থ প্রতিপন্ন হল। 'বণ্টন-ব্যবস্থা – বিনিময়ক্ষেত্র'-সম্পর্কটার আমূল বিকৃতি ঘটার ফলে পরিস্থিতিটা প্রকোপিত হয়ে ওঠে। চিরাগত সম্পর্কের অবস্থায় যা ব্যক্তিগত বণ্টনের মধ্যস্থ হত এবং সেটাতে অভাবপূরণ করত সেই বিনিময় ক্রমেই অধিকতর মাত্রায় হয়ে উঠছিল এমন একটা ক্ষেত্র যেটার মাধ্যমে বৈদেশিক ব্যাপারিক পুঁজি এবং পরে শিল্পক্ষেত্রের পুঁজি নষ্ট করে চিরাগত 'উৎপাদন-বণ্টন-বিনিময়-ব্যবহার' সমন্বয়টাকে। সেটা ছিল না একটা সেকেলে সমন্বয় থেকে বিন্যাসগত নতুন বহুযৌগিক সংস্থায় বৈপ্লবিক রূপান্তর, সেটা হল চিরাগত সমন্বয়ের চারটে অঙ্গ-উপাদানের প্রত্যেকটায় বৈদেশিক পুঁজির আংশিক, ব্যবস্থা-বহির্ভূত অনুপ্রবেশের ফলে অভ্যন্তরীণ কর্মগত পরস্পর-সম্পর্ক আর অনুপাতের বিকৃতি, অঙ্গহানি।

ঔপনিবেশিক শোষণের কর্ম-বন্দেজ হিসেবে যা প্রণালীবদ্ধ হতে পারে এমন প্রধানত নতুন পুনর্বণ্টন-ব্যবস্থাও চিরাগত সমাজগুলিতে গড়ে তুলতে পারে নি বিভিন্ন ঔপনিবেশিক রাজ। উপনিবেশভোগী দেশে পুঁজিতন্ত্রের পর্ব অনুসারে সেটা আপনা থেকে গড়ে ওঠে ক্রমে-ক্রমে, সেটার ভারকেন্দ্র সরে যায় একটা থেকে অন্য ক্ষেত্রে (অঙ্গ-উপাদানে): বিনিময় ('গ্রীষ্মমণ্ডলীয়' জিনিসপত্র কেনা) মারফত কাজ শুরু ক'রে

ব্যাপারিক পুঁজি হস্তগত করে বণ্টন-ব্যবস্থা (কর আদায়)। তারপর শিল্পে-প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্যে চাহিদা সুস্থিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর উৎপাদন সংগঠিত করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, আর কারখানাজাত জিনিসপত্রের কাটতি বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহ সৃষ্টি হয় উপনিবেশগুলিতে সেগুলোর ভোগ-ব্যবহার সম্বন্ধে। শেষে, পৃথক-পৃথক রকমের শিল্পোৎপাদনে আর পরিবহণে আগ্রহ দেখা দেয় পুঁজি রপ্তানির ফলে।

উপনিবেশবাদীদের পৃথক-পৃথক গ্রুপের পরিবর্তনশীল বিভিন্ন আগ্রহের মধ্যে সবসময়ে ঠোকাঠুকি লাগতে থাকে, আর কখনও-কখনও ঐসব আগ্রহ হয়ে দাঁড়ায় পরস্পর-অন্যত্যাগী (যেমন, উপনিবেশবাদীরা নতুন করে গড়ে তুলেছিল যে খাজনা-কর ব্যবস্থা সেটা আমদানি-করা বৃটিশ দ্রব্য-সামগ্রীর জন্যে ক্রয়ক্ষম চাহিদার পরিপন্থী ছিল)। অধীন-করা সমাজের প্রয়োজনের তো কথাই ওঠে না, বৃটিশ শিল্পক্ষেত্রের পুঁজিতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকেও চারটে অঙ্গ-উপাদানের কোন ব্যবস্থাগত সম্পর্ক গড়ে ওঠাও ব্যাহত হয় তার ফলে। এই সূচক থেকে দেখা যাচ্ছে, (আদি সঞ্চয়নের যুগের তো কথাই ওঠে না) শিল্পগত পুঁজিতন্ত্রের ঔপনিবেশিক আমলেও 'বণ্টন – বিনিময়' সম্পর্কটাকে নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রের আমলের, অর্থাৎ সাধারণত পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভবের যুগের প্রতিষঙ্গী যুগের সম্পর্কতন্ত্রের অনুরূপ বলে গণ্য করা চলে না। উপনিবেশগুলিতে এই সম্পর্ক নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের আমলের বণ্টন – বিনিময়ের প্রধান দ্বিবিধ কৃত্য আর শেষে গিয়ে পরস্পর-অন্যত্যাগী শ্রেণীগত কৃত্য নির্বাহ করে নি; সেই কৃত্যটা ছিল দু'রকমের: সামরিক অফিসার আর সরকারী কর্মকর্তাদের অভিজাতকুলের সংহতিসাধন, আর যেমন কিনা, ফৌজ আর নৌবাহিনীর সামরিক আর টেকনিকাল পরাক্রম, রাষ্ট্রের লাভজনক লেনদেন স্থিতি আর সুস্থিত কারেন্সি বজায় রাখার জন্যে, আর অফিসারকুল, আমলাবর্গ, যাজকমণ্ডলী এবং উঠতি বুর্জোয়াদের দাবি মেটাবার জন্যে পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগী কারবারের (ম্যানুফ্যাকচারের) সর্বোপযোগী সদ্ব্যবহারের সংরক্ষণকর বণিকতান্ত্রিক ধারা।

ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকেরা বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন বণ্টন আর বিনিময়ের ক্ষেত্রে (তাঁদের তত্ত্বীয় ধারণা আর ব্যবহারিক কর্মের চৌহদ্দির ভিতরে স্বভাবতই)। ভূমি-মালিকানা, করাধান, ব্যাপারিক পুঁজির কাজ-কার-

বার, আর পরে, আঠার শতকের শেষাশেষি থেকে গ্রাম-সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁদের যেসব বিবরণ রয়েছে সেগুলোর সাহায্যে প্রাচ্যের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পর্ব-বিন্যাসগত মাত্রা-সংক্রান্ত সূচকগুলোয় বণ্টন আর বিনিময় সম্পর্কে উপাত্ত প্রয়োগ করা যায়। এফ. বার্নিয়ে-র মতো অন্যান্য সরাসর পর্য-বেক্ষকেরা সবসময়ে জোর দিয়ে বলেছেন, বণ্টন আর বিনিময়ের যেসব কর্ম-বন্দেজ তাঁরা বিবৃত করেছেন সেগুলো ইউরোপীয় মানদণ্ড অনুসারে ছিল সেকেলে, 'অসভ্য', আর ইতোমধ্যে তখনই অচলিত। তাই প্রাচ্যের সামাজিক সংগঠনকে আদর্শস্থানীয় বলে যেসব সপ্রশংস উক্তি করা হয় তাতে সেই ব্যবস্থাটার যথার্থ মূল্যায়ন হয় না।

ইতিহাসক্রমে বিশেষ ধরনের প্রত্যেকটা উৎপাদন-প্রণালীর থাকে তদনুযায়ী নিজস্ব জনসংখ্যাবৃদ্ধির নিয়ম, এই মর্মে মার্কসের উপস্থা-পনাটিকে বিস্তারিত করে লেনিন বলেছেন, মানুষ 'যাকে ইতিহাসক্রমে পরম্পরাগত বিভিন্ন সামাজিক সংস্থায় বাস করে যেগুলো নির্দিষ্ট হয়ে যায় সামাজিক উৎপাদনের, আর তাই বণ্টনের প্রণালী অনুসারে। মানুষের জননের পরিবেশ সরাসরি নির্ভর করে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার গঠনের উপর...'* জনসংখ্যা-সংক্রান্ত নিয়ম স্থির করতে ইতিহাস-বহির্ভূত বিমূর্তন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সুবিন্যাসবিদ্যায় অগ্রাহ্য; তেমনি, এই নিয়মটা হল প্রাধান্যশালী উৎপাদন-প্রণালীর সরাসর ফল, এমন অতিসরলীকৃত ধারণাও অগ্রাহ্য। দেখা যাচ্ছে, জনসংখ্যার প্রত্যক্ষ গতি-বেগ নির্ভর করে সামাজিক সংস্থার সংগঠনের উপর, আর এটা নির্ধারিত হয় উৎপাদন আর বণ্টনের ব্যবস্থা এবং বিনিময় আর ভোগ-ব্যবহার ক্ষেত্র দিয়ে।

শ্রেণী-বৈরগ্রস্ত সমাজের গঠন বিশ্লেষণের আরম্ভস্থল হল উৎপাদী আর অনুৎপাদী শ্রেণীগুলির পরস্পর-সম্পর্কের উদ্দেশ, কেননা মধ্যবর্তী স্তরগুলি শেষে কোন একটা শ্রেণীতে শামিল হয়ে যায়। এই পরস্পর-সম্পর্ক নির্ভর করে কার্যত ধ্রুবক (কাজের প্রাকৃতিক পরিবেশ) আর পরিবর্তনীয় উপাদানের উপর। মার্কস কর্ভে খাটুনির পূর্বশর্তের যে-বিশ্লেষণ করেছেন সেটা হল এমনসব কারক-উপাদানের সাকল্যটাকে বিবেচনায় রাখার সুবিন্যাসগত দৃষ্টান্তস্থল। এইসব উপাদানের নিম্নোক্ত

সমন্বয় তাঁর বিবেচনায় ছিল: 'শ্রমশক্তি যদি নগণ্য হয় আর শ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেশ যদি হয় কমজোর, তাহলে বাড়তি শ্রমও হয় নগণ্য, কিন্তু এক্ষেত্রে, একদিকে, উৎপাদকদের প্রয়োজন হয় নগণ্য, আর অন্য দিকে, বাড়তি শ্রমের শোষকদের সংখ্যা হয় অপেক্ষাকৃত কম, আর শেষে গিয়ে বাড়তি উৎপাদ হয় কম, তাতে এই কম-উৎপাদী শ্রম আদায় হয় এই অপেক্ষাকৃত নগণ্যসংখ্যক শোষক মালিকদের জন্যে।'*

মার্কসের বিবেচিত অবস্থাটা দৃষ্টান্তস্বরূপ উত্তর-ইউরোপীয় সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের পরিস্থিতিটির কাছাকাছি। দেখা যাচ্ছে, উৎপাদকদের সমষ্টিগত প্রয়োজন নগণ্য, তার কারণ নয় জলবায়ুর অনুকূল অবস্থা কিংবা ভোগ-ব্যবহারের কোন নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা, কারণটা হল তাদের সংখ্যাল্পতা। প্রাচ্যে মধ্যযুগীয় শেষকালীন ব্যবস্থাপিত সমাজগুলিতে প্রাধান্যশালী পরিস্থিতিটা অনেকাংশে ছিল একেবারে অন্য রকম: সেখানে শ্রমশক্তি ছিল দেদার, আর কাজের অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল। বিশেষত সেচসেবিত কৃষিক্ষেত্রে বাড়তি শ্রমের পরিধি ছিল আবশ্যক শ্রমের কাছাকাছি, আর পৃথক-পৃথক উৎপাদক এবং তাদের পরিবার-গুলির প্রয়োজন নগণ্য বলে অনেকটা বেড়ে যেত বাড়তি উৎপাদ এবং শোষকদের আর তাদের খিদমতগার স্তরগুলির আপেক্ষিক হিসসা আর মোট সংখ্যা; কৃষকের অপেক্ষাকৃত উৎপাদী যে বাড়তি শ্রম আত্মসাৎ করত হরেক রকমের খাজনা-করভোগীরা সেটা আদায় হত প্রচুর বাড়তি উৎপাদ হিসেবে – প্রধানত ভোগ-ব্যবহার, আভিজাত্য কিংবা সামরিক প্রয়োজনে।

দীর্ঘ ইতিহাসক্রমিক কালপর্যায়ে প্রাক্‌বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীগুলোর আত্মসাৎ-করা বাড়তি উৎপাদটা ভোগ-ব্যবহারের অংশ আর সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনে লাগানো অংশে যেভাবে ভাগাভাগি হত সেটার একটা অসংগতি দেখা দেয় শোষক শ্রেণীর নিজেদেরই জনন-সংক্রান্ত ব্যাপারটার সঙ্গে। শোষক শ্রেণী বাড়তি উৎপাদের যত বেশি হিসসা ভোগ-ব্যবহার করে ততই বাড়ে এই শ্রেণীর সংখ্যাশক্তি। কিন্তু আবশ্যক হিসসা সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন খাতে চালিয়ে না দিলে এই শ্রেণীটা 'খেয়ে

ফেলে' নিজ ভবিষ্যৎটাকে, তাতে সেটার নিচু স্তরগুলির বিষয়-সম্পত্তির অবনতি ঘটে (যদিও বিভিন্ন চিরাগত সমাজে তার ফলে সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক বিশেষাধিকার খোয়া যেত না)।

বাড়তি উৎপাদের সবটা কিংবা প্রায় সবটা শাসক শ্রেণীর অপরিমিত অনুৎপাদী ভোগ-ব্যবহারে নিঃশেষ হলে পরে এই শ্রেণীতে জনসংখ্যা-বিস্ফোরণ গোছের ব্যাপার ঘটত (যদি কোন অসাধারণ সামরিক কিংবা অন্য কারণে সংযমন না ঘটত)। আর দেখা দিত ঝাঁক-ঝাঁক গরিব মানুষ, যারা তখনও জীবনযাত্রার উপযুক্ত অবস্থার চিরাগত পরিমাণ দাবি করত। তবে এই পরিমাণ অনেকটা কমে যেত যখন শাসক শ্রেণীর কেউ ইহসংসার ছেড়ে দিয়ে হত মঠবাসী, মুসাফির, ফকির, সন্ন্যাসী কিংবা রাহাজান, ইত্যাদি। বিষয়গতভাবে, এমন সংসারত্যাগ ছিল শোষক স্তরগুলোর জনসংখ্যা স্বয়ংনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটা অঙ্গ, কেননা যারা সংসারত্যাগ করত তারা আগের মতোই পরজীবী থেকে গেলেও ভোগ-ব্যবহার করত অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ উৎপাদ, আর সন্তান, অন্তত আইনসম্মত উত্তরাধিকারী তারা জন্মাত না।

প্রাচ্যে বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অনুৎপাদী বাড়তি মানুষ সম্ভবত বেশি ছিল পশ্চিমের (বিশেষত প্রটেস্ট্যাণ্ট দেশগুলির) চেয়ে। এই বৃদ্ধিটা ঘটত হয় একগামী পরিবার-সংক্রান্ত নীতি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার ফলে (বিভিন্ন মুসলিম সমাজে), নইলে এই নীতি লঙ্ঘন করে উপপত্নীপ্রথা প্রচলনের ফলে (যেমন চীনে)। যা-ই হোক, সামাজিক পরিণতিটা হত একই: জন্মাত 'বাড়তি মানুষের সেই অংশটা যারা শুধুই ব্যবহারক, যারা অপরের উৎপাদের ব্যবহারক সেই নিষ্কর্মারা, আর যেহেতু সরাসর ভোগ-ব্যবহারের সীমা থাকে, তাই তাদের উৎপাদ পেতে হত মার্জিত আকারে – বিলাসদ্রব্য হিসেবে'।*

দেখা যাচ্ছে, ব্যবহারক জনসমষ্টির এমন পরস্পর-সম্পর্ক বজায় থাকতে পারত শুধু এমন সমাজে যেখানে, প্রথমত, আবশ্যক পরিমাণ বাড়তি উৎপাদ পয়দা হতে পারত, আর দ্বিতীয়ত, যেখানে বণ্টন আর বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে 'নিষ্কর্মাদের' জন্যে যোগান সরাসরি ব্যবহারের

দ্রব্য-সামগ্রী, আর মর্যাদাসূচক এবং আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত বিলাসদ্রব্য, তাছাড়া, লড়াইয়ে ব্যবহার করার জন্যে নয়, কিন্তু প্রদর্শনের জন্যে অলঙ্কৃত অস্ত্রশস্ত্র (এইরকমের প্রদর্শনের প্রয়োজনে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় হত দরবারের রক্ষীদের ঘোড়া, উট আর হাতি কেনার জন্যে)। প্রাচ্যে বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ব্যবহারক সামাজিক স্তরগুলির মধ্যে উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় আর ভোগ-ব্যবহারের এমন কর্ম-বন্দেজ গড়ে উঠেছিল ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের অনেক আগে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এমন কর্ম-বন্দেজের নিজ ব্যাপক পুনরুৎপাদন চলেছিল, কিন্তু ঔপনিবেশিক অনধিকারপ্রবেশের বিরুদ্ধে যা কার্যকর সামরিক আর রাজনীতিক প্রতিরোধ খাড়া করতে পারে এমন সক্রিয় সামাজিক শক্তি গড়ে তুলতে সেটা অপারক ছিল (তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গণ-গোষ্ঠীগত সামরিক সংগঠনে সংহত হয়ে এমনসব শক্তি দেখা দিয়েছিল মাগ্রেব, ককেশাস, আফগানিস্তান, নেপাল, সুদান আর সুমাত্রার বিভিন্ন ছোট-ছোট জাতির মধ্যে)।

এইভাবে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজগুলির ইতিহাসক্রমিক উন্নয়নের গতিবেগ, অভিমুখ আর মাত্রা বের করতে হলে ঐসব সমাজের সামাজিক-শ্রেণীগত জননের ধরনধারনটা বের করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা বিশেষত সেইসব সামাজিক স্তরের ক্ষেত্রে যেগুলি বাড়তি কৃষি-উৎপাদ পয়দা করা আর ভোগ-দখলের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। ঐতিহাসিক গতির বেগ-মাত্রা, অভিমুখ, ঐ গতি থাকা কিংবা না-থাকা, ঐ গতির অভিমুখ — সমুখপানে কিংবা পিছনদিকে — এই সবকিছু অনেকাংশে নির্ভর করত এই জনসমষ্টির জননের সামাজিক-শ্রেণীগত অনুপাতের উপর।

প্রাচ্যে প্রত্যেকটা বড়রকমের ব্যবস্থিত সমাজে সামাজিক জননের ছিল বিভিন্ন জাতিরূপগত বিশেষত্ব, যেগুলো ছিল প্রাকৃতিক পরিবেশ, উৎপাদন-শক্তি, বণ্টন, বিনিময়, ভোগ-ব্যবহার, শহর আর গ্রামের মধ্যে সামাজিক শ্রমবিভাগ এবং অন্যান্য মূল সূচকের বিশেষত্বগুলোর অনুবৃত্তি আর অভিব্যক্তি। এইসব সূচকের কোন-একটা পরস্পর-সম্পর্কের অবস্থায় কৃষিজীবী জনসমষ্টির সামাজিক-শ্রেণীগত গঠন কিভাবে দানা বেঁধে ওঠে এবং বিধিবদ্ধ হয়, সেটা বিশ্লেষণ করা যাক ভারতকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরে।

মধ্যযুগীয় ভারতে সমভূমি অঞ্চলগুলিতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল

খাদ্যসামগ্রী আর কাঁচামালের জন্যে জনসমষ্টি আর উৎপাদনের সমস্ত মূল প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী। বাড়তি উৎপাদ পয়দা করা আর ভোগ-দখলের চড়া মান ছিল কৃষির বিশেষক। উৎপাদী পশুপালনে আয় থেকে প্রায় কিছুই আদায় করা হত না সামন্ত ভূস্বামীদের খাজনা হিসেবে। কতকগুলি অঞ্চলে কৃষিকাজের সরঞ্জাম ছিল খুবই সরেস; যারা সেগুলো তৈরি করত সেইসব কারিগর ছিল গ্রাম-সম্প্রদায়ের সদস্য, তারা ফসলের একটা অংশ পেত পারিতোষিক হিসেবে।

দোয়াব অঞ্চলে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামরিক-প্রশাসনিক কেন্দ্র-গুলোয় কর হিসেবে বিভিন্ন উৎপাদ (প্রথমত শস্য) কম খরচে জলপথে চালান দেওয়া যেত সিন্ধু-গাঙ্গেয় অঞ্চলে বহু নদী থাকার ফলে।* দাক্ষি-ণাত্যে স্থলপথে মাল চলাচলে খরচ পড়ত আরও বেশি, তাই সেখানে আদায়-করা উৎপাদ অঞ্চলটার ভিতরেই ব্যবহৃত হত প্রধানত। ষোল-সতর শতকে সাগরগুলোতে ইউরোপীয় আধিপত্য কায়েম হবার ফলে উপকূলবর্তী এলাকাগুলির আর্থনীতিক আর রাজনীতিক সম্মিলনের জন্যে বাণিজ্যিক আর সামরিক নৌবাহ ব্যাহত হয়; বন্দরগুলো ছিল বৈদেশিক ব্যাপারিক পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন। এইভাবে সামন্ততান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক কেন্দ্রের ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধেটা বেড়ে যায় (তাই সেটা সবসময়ে আকৃষ্ট হয় দোয়াবে)।

সামন্ততন্ত্র বিকাশনের গতিমাত্রা ছিল ধীরই, সেটা প্রকাশ পায় বিভিন্ন প্রাক্‌সামন্ততান্ত্রিক কিংবা গোড়ার-সামন্ততান্ত্রিক আর্থনীতিক, সামা-জিক, আইনগত আর ধর্মীয় প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদির দীর্ঘ, সুস্থিত অস্তিত্বের মাঝে। বড়-বড় ব্যক্তিগত খামারগুলো ছিল ব্যতিক্রম। বিভিন্ন নিচু জাতের ভূমিহীন কৃষকেরা ভূমি-মালিকদের খামারে কাজ করে পেত বস্তু-পারিশ্রমিক, অর্থাৎ কিনা, প্যাট্রিয়ার্কাল দাসত্বপ্রথার বহু উপাদান থেকে গিয়েছিল আর্থনীতিক সম্পর্কক্ষেত্রে। ভারতে কৃষিক্ষেত্রের জনসমষ্টি মালিকানা-আর্থনীতিক প্রতিষ্ঠা আর সামাজিক (জাত-বর্ণগত) অবস্থা

উভয়ত প্রগাঢ়ভাবে স্তরবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপের মতো একক কৃষক শ্রেণী হিসেবে সেটা ছিল না।

বদ্ধতার অবস্থাটা লক্ষ্য করতে পারলেই আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায় না, সেটা এই: আঠার শতক অবধি ছিল যে বদ্ধতা সেটা দেখা দিয়েছিল কোন্ ইতিহাসক্রমিক মাত্রায়? ঐ কালপর্যায়ের ভারতীয় গ্রামাঞ্চলের সামাজিক গঠনে উন্নত, এমনকি পরিণত সামন্ততন্ত্রেই উত্তরণের কোন-কোন প্রলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল ইতোমধ্যে। এই অবস্থাটা নিয়ে আলোচনা করার আগে উল্লেখ করতে চাইছি সোভিয়েত-ভারত আলোচনা-সভায় টি. রায়চৌধুরীর বিবরণীর কোন-কোন উপস্থাপনার কথা, সেগুলি আমাদের মূল্যায়নের কাছাকাছি। এই ভারতীয় গবেষক সংগত কারণেই জোর দিয়ে বলেন, 'মালিকানা—শোষণ' সম্পর্ক, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে বৈরী-অবস্থানের মতো যেসব সূচক উন্নত (আরও বেশি পরিমাণে—পরিণত) সামন্ততান্ত্রিক সমাজে দৃঢ়সংলগ্ন সেগুলো ভারতের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। সম্পর্কের প্রথম বর্গটাকে টি. রায়-চৌধুরী বিভক্ত করেন এইভাবে: 'ভারতীয় রকমফেরে শোষণের সম্পর্ক আছে দুই কিংবা হয়ত তিন রকমের: ১) বাড়তি উৎপাদের বেশির ভাগে রাষ্ট্রিক ভোগ-দখল — উৎপাদনের উপকরণের উপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই; ২) আর-একরকমের ভূমিস্বত্বে ছিল চাষী রায়তেরা,—গ্রামের জমিতে এবং এই জমির উৎপাদে এঁদের স্বত্বের পরিমাণ আর প্রতিষ্ঠা ছিল প্রজা আর ভূমিহীন জাতের মতো অন্যান্য গ্রামীণ বর্গের চেয়ে বেশি; ৩) গ্রামীণ 'ভূমিওয়ালা' বা মালিক, যে নিজে চাষ করত না, কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে ছিল জমি-চষা রায়তের সমান। দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় আর তৃতীয় রকম ছিল 'বিভিন্ন রকমের ব্যক্তিগত মালিকানা', আর প্রথমটা নিশ্চয়ই তা নয়। তবে মালিকানাকে পুরোপুরি পৃথক করে তুলে ধরা হয় নি, কেননা মালিক হবার অধিকারের মতো নয়, মালি-কানা স্বত্ব বলতে বোঝায় হস্তান্তরণের অধিকার, যেটা নির্ভর করে বাজারে মধ্যস্থ কাজ-কারবারের প্রসারের উপর। উৎপাদের কাটতির সীমাবদ্ধতা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার দিকে ঝোঁকার প্রবল প্রবর্তনা। তাই—মালিকানা স্বত্ব আলাদা করে তুলে ধরা হয় না বড় একটা। উৎপা-দনের এই ব্যবস্থাটার ভিতরে শোষণের সম্পর্কটা ছিল উৎপাদনের উপ-করণে স্বত্বের পরিধির অনুযায়ী। মালিকানা স্বত্ব স্বল্প বিভক্ত হবার

ফলে উৎপাদনের উপকরণে স্বত্ব লেপটে যেত। এমন সমাজে বিরোধের বিশেষত্ব এই যে, সেটা ঘটে রাষ্ট্র আর কৃষক-উৎপাদকের মধ্যে, যে-উৎপাদক প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই জমির মালিক। 'মালিক' আর 'না-মালিকের' মধ্যে, কিংবা একই উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিতরে বিভিন্ন মাত্রার স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে বিরোধ সম্বন্ধে উপাত্ত আমরা এখন অবধি পাই নি। সেই কারণেই মোগল সাম্রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন আলোড়ন-উপদ্রব দানা বেঁধে গড়ে-ওঠা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক বিরোধ থেকে খুবই ভিন্ন ধরনের।' আরও স্পষ্ট করে বলি: পরিণত সামন্ত-তন্ত্রের এবং আরও বেশি পরিমাণে শেষকালীন সামন্ততন্ত্রের আমলে যখন 'সামন্ত ভূস্বামী — মুখাপেক্ষী কৃষকের' দ্বন্দ্ব-অসংগতি হয়ে উঠেছিল শ্রেণী-সংগ্রামের একটা সুস্পষ্ট উপাদান তখনকার থেকে পৃথক ছিল উল্লিখিত বিরোধ। গোড়ার দিককার সামন্ততন্ত্র এবং অসম্পূর্ণ শ্রেণী-বিভাগের পর্বে বিভিন্ন শ্রেণী গড়ে উঠতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণত চলত তখনও মুক্ত কৃষকদের প্রতিরোধ, আর সমাজের তখনও টুকরো-টুকরো হয়ে বিভক্ত শোষক শ্রেণীগুলোর মধ্যে চলত তীব্র দ্বন্দ্ব-বিরোধ।

ভারতে এমনসব দ্বন্দ্ব-বিরোধ ঘটত তার কারণ এই যে, ভূমিতে আর খাজনায় স্বত্বের ব্যাপারে হরেক রকমের পার্থক্যের ফলে জমির মালিকদের ঐক্য ছিল না। সম্প্রদায়ের উপর-স্তরের খামারী খুদে আর মাঝারী জমি-মলিকদের স্বত্ব ছিল সাধারণত পুরুষানুক্রমিক, আর (জায়গিরদার ধরনের) বড়-বড় ভূস্বামীদের স্বত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে শর্তাধীন বলে গণ্য হত; এরা নিজেরা কৃষিকাজ করত না বড় একটা। একই অঞ্চলের ভিতরেও ভূমি-মালিকেরা ছিল বিভিন্ন জাত-বর্ণ, ধর্ম-সম্প্রদায় আর জাতিসত্তার মানুষ। সামন্ততান্ত্রিক সোপানতন্ত্র স্পষ্ট প্রকাশ পায় নি, তাতে পুরুষানুক্রমিক সামন্ত ঐতিহ্যের সমর্থন যথেষ্ট ছিল না, আর সেটা সাধারণত গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন সামরিক শক্তির বিদ্যমান পরস্পর-সম্পর্কের ভিত্তিতে। নিচু স্তরের খাজনাপ্রাপ্তা আর উৎপাদক জমিওয়ালাদের* মধ্যে সীমারেখাটার সামাজিক আর মালিকানাগত

* সামন্ততান্ত্রিক ভারতে 'যেটা খুদে জমি-মালিক আর কৃষকের অবস্থানের মাঝামাঝি সবসময়ে ভারসাম্য বজায় রেখে চলত এমন শ্রেণীর' অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন ল. ব. আলায়েভ ('Essays on Economic History of India')। মূলত কথাটা ঠিক, কিন্তু যেভাবে বলা হয়েছে সেটা তেমন উপযোগী নয়, কেননা হাজার-হাজার বছর ধরে 'সবসময়ে' ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন।

অস্পষ্টতা আর নমনীয়তার কথা বিবেচনায় রাখলে ভারতে 'অভিজাত-কুল – কৃষককুল' ধরনের বর্গ-শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের অস্পষ্ট অভিব্যক্তির ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শ্রেণীগত সীমারেখার অস্পষ্টতা (যা ইউরোপীয় মানদণ্ড অনুসারে খুবই লক্ষণীয় মাত্রায় সুস্থিত) আর কৃষক ও সামন্তদের মধ্যে বহু 'সীমান্তবর্তী' স্তর থাকার ফলে বিভিন্ন ব্যাপক মোগলবিরোধী আন্দোলন এবং সেগুলির কর্মসূচিতে (বিশেষত কৃষি-সংক্রান্ত কর্মসূচিতে) শ্রেণী-বিভাগ যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নি। সামন্ততান্ত্রিক খাজনার পুনর্বণ্টন, রূপান্তর আর ভোগব্যবহারের সাহায্যে বিদ্যমান শহরগুলি সামাজিক আন্দোলনের সংগঠক আর পরিচালক কেন্দ্রের আকারে সামাজিক শক্তি হয়ে ওঠে নি। স্বৈরতান্ত্রিক মোগল রাষ্ট্রের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে-ওঠা রাজ্যগুলিতে ঐ সবকিছুর ফলে বেড়ে ওঠে বিভিন্ন পিছনমুখো প্রবণতা, মোগল সামরিকপ্রশাসনিক কর্মীদের সঙ্গে আপসের ভিত্তিতে মোগল রাষ্ট্রের রাজস্ব-সংক্রান্ত আর সামাজিক কর্মনীতি অনুসারে চলতে থাকার ঝোঁক (বিশেষত বাংলায়)।

তার সঙ্গে সঙ্গে, রাজনৈতিক সংগঠনের স্বৈরতান্ত্রিক আকার বর্জিত হবার ফলে একই জাতিগত ভিত্তির নতুন রাজ্যগুলিতে বিকাশনের কিছু-কিছু সুযোগ-সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সামন্ত ভূস্বামী আর কৃষকদের (বিশেষত 'সীমান্তবর্তী' স্তরের) মধ্যে বিভাগের সম্পূর্ণতা এবং একেবারে পৃথক-পৃথক সামাজিক-বর্গগত সম্প্রদায় হিসেবে ঐ দুয়ের পাকা-পোক্ত হয়ে ওঠাটা হতে পারত এইসব রাজ্য স্থাপনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি। এইভাবে, শহরের রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে প্রস্তুত হত সামাজিক-বর্গগত প্রতিনিধিত্বমূলক রাজতন্ত্রের পথ, সেটার অপরিহার্য অঙ্গ-উপাদান হত শহর, যেখানে ছিল বণিক আর কারিগরেরা। ভারতীয় শহরে ইতোমধ্যে গড়ে-ওঠা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের পৃথক-পৃথক কেন্দ্র-গুলি সেক্ষেত্রে ক্রমে গঠনকালীন বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করতে পারত, আর বিন্যাস-সংগঠক গঠনের স্বধর্ম আয়ত্ত করতে পারত রাষ্ট্রিক আর সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি এবং ভাবাদর্শের পুনর্গঠন ক্ষেত্রেও।

প্রধান-প্রধান শ্রেণী আর সামাজিক বর্গ যখনও গড়ে ওঠে নি, যদিও সেদিকে গতির লক্ষণ দেখা দিয়েছিল ইতোমধ্যে (যেমন, রাজ-স্থানে), সেই পর্বে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বিকাশন ব্যাঘাত করে ঔপনি-

বৈশিক বিজয়। আর জাতভেদ-প্রথার জায়গায় সামাজিক-বর্গগত গঠন আসতে পারে নি, ঐ প্রথা সেটার অন্তরায় হয় ইতিহাসক্রমে (জাতভেদ-প্রথা লোপ পায় না বলে, আর হিন্দুদের ধর্মীয় চৈতন্যে জাত-বর্ণের নানাত্ব অতিক্রম করা হল না বলে গড়ে উঠতে পারল না পরিণত সামন্ত-তন্ত্রের সামাজিক-বর্গগত সমাজ)।

প্রাচ্য সামন্ততন্ত্র খুবই দীর্ঘকাল যাবৎ থেকে গিয়েছিল সেটার গড়ে ওঠার প্রথম-প্রথম পর্বগুলিতে, তাই সাধারণের জোতজমার (আগেকার 'এজমালি অবাধ') অধিকারীদের বহু শতাব্দী ধরে স্বৈরতন্ত্রের ভাবাদর্শ-গত, সামরিক আর আর্থিক জোয়ালে জোতা বিড়ম্বিত জীবন অবধারিত হয়ে গিয়েছিল; এই স্বৈরতন্ত্র তাদের সামাজিক স্বার্থকে গণ্ডিবদ্ধ করে দিয়েছিল গ্রাম-সম্প্রদায়ের চৌহদ্দির ভিতরে, কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার অভাবপূরণের জন্যে এমনকি তাদের গ্রাম কিংবা এলাকার সমস্ত কৃষিজীবী মানুষের সঙ্গেও বর্গ-শ্রেণীগত কৃষকের সম্মিলনী স্থাপন করে নি। সমস্ত রকম সামাজিক বর্ণ আর জাতিসত্তার খাজনা-প্রাপ্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে কৃষিক্ষেত্রের সমস্ত মেহনতী মানুষের ঐক্যের পরিপন্থী হয়েছে বর্ণগত বিচ্ছিন্নতা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের কালপর্যায়ের ফরাসী, স্লাভ কিংবা অন্যান্য সম্প্রদায়ের যথার্থ স্বাধীন মানুষের সঙ্গে সতর শতকের এশীয় সম্প্রদায়ের ভুয়ো স্বাধীন মানুষের তুলনা করা যায় না।

প্রক্রিয়াটার গতিমাত্রা দিয়ে নির্ধারিত হয় সেটার অসংগতিপূর্ণ ঐতি-হাসিক মর্মবস্তু: সম্প্রদায়ের স্বাধীন সদস্য হল স্বৈরতন্ত্রের মেহনতী 'রায়ত', কিন্তু তার বিশেষাধিকারী অবস্থা বজায় থাকল সম্প্রদায়ের ভিতরে। এমন হল জাঠরা: মধ্যযুগের শেষের দিকে ভারতে একটা প্রধানত কৃষক সামাজিক বর্গ। পুরুষানুক্রমে এককক-স্বতন্ত্র একটা বর্ণগত বর্গের মানুষ হিসেবে জাঠরা সংগ্রাম চালিয়েছিল। জাঠদের নিজেদেরই মজবুত সম্মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল শুধু এটাই, কেননা তারা আবার বহু উপ-বর্ণে বিভক্ত ছিল; তাছাড়া, গ্রামের হরিজনদের তো কথাই ওঠে না, বাদবাকি কৃষকদের সঙ্গেও জাঠদের সম্মিলন ব্যাহত হয়েছিল বিশেষত সেটাই। তবে বর্ণভেদ জাঠদের বাদবাকি কৃষকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও, মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের নিজেদের সম্মিলনের পথে সেটা অন্তরায় হলেও, ঐ সম্প্রদায়ের সাধারণ সদস্য আর সামন্ত

বনে-যাওয়া উপর-স্তরের মধ্যে ঐক্যের বিভ্রম সৃষ্টি করেছিল ঐ একই বর্ণভেদই।

প্রাচ্যে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র বিভিন্ন বর্গে বিভক্ত করেছিল খাজনা-প্রাপ্তাদেরও, – একই সোপানতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং পারিশ্রমিক, বর্গগত অধিকার আর কর্তব্যের তদনুযায়ী ব্যবস্থার চৌহদ্দির ভিতরে ঐসব বর্গ ছিল বেখাপ। স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে ধর্মসমন্বয়ের সাহায্যে (আকবর), কিংবা উলটে, ইসলামী ধর্মোন্মাদনার পথে এবং রাজক্ষমতার কর্ম-বন্দেজ থেকে ভিন্ন ধর্মমতের সংখ্যাগুরু অংশকে অপসারিত ক'রে (আউ-রঙ্গজেব) ভারতে সামন্ত স্তরগুলির বিভাগ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টায় সামন্ত-দের মাঝারী আর নিচু স্তরের (প্রধানত হিন্দু) তো কথাই নেই, স্বৈরতা-ন্ত্রিক মোগল রাষ্ট্রের শাসক মুসলিম উপর-স্তরগুলির সোপানতান্ত্রিক সংহতি ঘটাবার বাঞ্ছিত ফল পয়দা হতে পারে নি। ভারততত্ত্ব-সংক্রান্ত সাহিত্যে বিবৃত বিভিন্ন প্রক্রিয়া এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, কিন্তু বর্গ-সংগঠক প্রক্রিয়া হিসেবে সেগুলির উপযুক্ত মূল্যায়ন হয় নি।

ঐসব প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় হল দোয়াবে জাঠ-শিখ, মারাঠা-কুনবি আর জাঠ-হিন্দু বর্ণগুলির সমস্ত সদস্যের অবস্থার পরিবর্তন। স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তারা ছিল প্রধান মেহনতী বর্গ, আর শিখ, মারাঠা আর জাঠদের নবগঠিত রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলিতে তারা শামিল হয়ে গেল কর্তৃত্বশালী বর্গে। ঐই উত্তরণের ফলে সামাজিক বর্গ-সংগঠক কারক-উপাদানগুলি ত্বরিত হয়, কেননা সামন্ত বনে-যাওয়া উপর-স্তরগুলো খাজনা-বাধ্যতার প্রধান বোঝাটা চাপাতে থাকে নিচু জাত-গুলির উপর তো বটেই, তার উপর নিজেদের জাতের জোত-জমার মালিকদের উপরও। অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট বর্গভেদ দেখা যায় শিখ রাজ্যে, তবে মারাঠা আর জাঠ-হিন্দুদের মধ্যেও তার লক্ষণ দেখা দেয়।

নবযুগের প্রাক্কালে প্রাচ্যে পৌরকরণের ধারা আর মাত্রা সম্বন্ধেও উপযুক্ত ইতিহাসক্রমিক মূল্যায়ন করা দরকার। শহর ছিল বহু, সেগুলিতে জনসংখ্যাও ছিল মস্ত-মস্ত, এটাকে কখনও-কখনও তুলে ধরা হয় নিম্নোক্ত বক্তব্যের সপক্ষে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ যুক্তি হিসেবে: ছিল চড়া মাত্রায় পণ্যউৎপাদন, কাজেই ছিল বুর্জোয়া সম্পর্কের ভবিষ্য ধারক সামাজিক স্তর। কিন্তু ঐতিহাসিক কূটাভাসে প্রতীয়মান হয় তার উলটোটা: চড়া মাত্রায় পৌরকরণের ফল হল নিচু স্তরের

সামাজিক-শ্রেণীগত উৎকর্ষ। ‘উৎপাদন – বণ্টন – বিনিময় – ব্যবহার’ সম্পর্কটার বিশ্লেষণ করলে এই আপাত-কূটাভাসের সারমর্মটা বুঝতে পারা যায়। তবে ‘শহর’-সংক্রান্ত ধারণাটা সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে আগে; তাছাড়া, কয়েকটা সাম্প্রতিক আলোচনায় প্রাচ্যের মধ্যযুগীয় শহর-সংক্রান্ত প্রশ্নটাকে বিশ্লেষণ করা হয়।

সমাজের পর্বগত-জাতীয় মাত্রার একটা নির্দেশক হল পৌরবসতির রকম-ধরন। সামন্ততন্ত্রের আমলের নিম্নোক্ত মূল পর্ব-নির্ণায়কগুলিকে ধরে নেওয়া যেতে পারে: অসভ্য রাজার (রাজন্য, স্বৈরশাসক) সদরঘাঁটি এবং তার প্রতিনিধিদের কেন্দ্র; সামন্ততান্ত্রিক খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থায় দুর্গের নিকটবর্তী শহর; বর্গগত-রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমলে স্বয়ংশাসিত শহর (কমিউন, রাজ্য-নগর, সাম্রাজ্যিক আধিপত্যের শহর)*; স্বৈরশাসনের রাজধানী এবং প্রাদেশিক কেন্দ্র। সামন্ততন্ত্রের আমলে নগরী বিকাশনের এইসব ইতিহাসক্রমে অস্থায়ী পর্বের পাশাপাশি ছিল দু’রকমের ‘চিরন্তন’ নগরী, যেগুলিতে প্রতীয়মান অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটত সামান্যই: বি-ভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যম নগরী, আর যাজকতান্ত্রিক শাসন-কেন্দ্র নগরী। ইতিহাসক্রমে বাস্তবে বিভিন্ন ধরনের নগরী একই সময়ে বিদ্যমান ছিল স্বভাবতই, তবু সামন্ততন্ত্রের প্রত্যেকটা পর্বের পক্ষে উপযোগী নমুনাসই পৌর গঠন এবং সেটার সাধারণ কার্মিক নিয়ম আর ‘গ্রামের’ সঙ্গে সম্পর্ক স্থির করা যায়।

* মধ্যযুগে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে শহর গড়ে ওঠার বিষয়ে সমসাময়িক ইংরেজ লেখকেরা হাজির করেন এইরকমের চিত্র: জনসমষ্টিকে নর্থম্যানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে নবম শতাব্দীর পরে গোড়ার দিককার সামন্ততান্ত্রিক শহরগুলো গড়েছিল কর্তৃপক্ষের স্থানীয় প্রতিনিধিরা, কাউণ্টরা; এইসব নগর-সদরঘাঁটির আয়তন ছিল ক্ষুদ্র (কয়েক হেক্টর), – বাজারখোলার চারপাশে কাউণ্টের প্রশাসনিক ঘর-বাড়ি, আদালত, মন্দির আর নানা ডিপো নিয়ে হত এইসব শহর; মঠগুলোও গড়ত সুরক্ষিত বসতি; বণিক আর কারিগরদের বসতি মহল্লা ঘিরে পাঁচিল তোলা শুরু হয় শুধু বারো শতক থেকে; যারা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রয়োজন মেটাত, প্রধানত সেই কারিগরদের বসতি শহর দেখা দেয় তেরো শতক থেকে। মধ্যযুগে ইউরোপীয় শহরগুলির জনসংখ্যা: পনর শতকে রোম, জেনোয়া আর মিলানের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ হাজার;

'নগরী'-সংক্রান্ত ধারণাটা কঠিন এবং জটিল, কেননা তাতে সংশ্লিষ্ট রয়েছে উৎপাদন, বণ্টন-বিনিময়, সমাজ-শ্রেণী, আইন, সংস্কৃতি, ভাবাদর্শ আর প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত উপাদানগুলোর সাকল্য। কোন একটা বসতি কেন্দ্রকে 'শহর' কিংবা 'গ্রাম' বলে গণ্য করার চূড়ান্ত যুক্তি হতে পারে না আপনাতে এগুলোর কোনটা। যেমন, প্রাচ্যে ছিল 'কারিগরদের গ্রাম' আর বিস্তর কৃষিজীবীদের বসতি শহর। বহু ব্যাপারি আর মহাজন বাস করত গ্রামাঞ্চলে। সামন্তরা আর তাদের কর্মচারীরা থাকত গ্রামেও আর শহরেও। শহরেও আর গ্রামেও ছিল মন্দির, তীর্থক্ষেত্র আর যাজকীয় বিদ্যালয়। প্রাচ্যে পৌর নিয়ম-কানুন ছিল না বলে সেখানে শহরের প্রশাসনিক আর আইনগত সীমান্ত ছিল প্রতীচ্যের চেয়ে বেশি অস্পষ্ট।

কোন-কোন দেশে শহরের দৃষ্টিগোচর লক্ষণও ছিল না। গ্রামাঞ্চলে ঘনবসতি ছিল, আর শহরে ঘর-বাড়ি ছিল ছড়ানো (সেগুলির একটার পর একটার মধ্যে থাকত চাষের জমি), তাই বসতি মহল্লাগুলির মধ্যে সীমারেখা লেপটে যেত। শহুরে আর গ্রামীণ বসতবাড়ির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। শেষে, কোন-কোন প্রাচ্য রাষ্ট্রে শহরের পাঁচিল (শহরের এই সীমারেখা) নিয়ম হয়ে ওঠে নি, আর সামন্তের দুর্গে স্থান পেত শুধু তার লোক-লশকর।* এই কারণে কোন একটা বসতিকে নিশ্চিত হয়ে শহর বলা যায় শুধু অঙ্গ-উপাদানগুলোর গোটা প্রস্তের ভিত্তিতে, যদিও পর্ব-বিন্যাস অনুসারে দু'-একটা উপাদানকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

প্রাচ্যে গড়ে উঠেছিল কি শেষকালীন-সামন্ততান্ত্রিক, প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক শহর? এর চূড়ান্ত উত্তর দিতে হলে সমাজ-শ্রেণী, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্ন-সাকল্যের বিশ্লেষণ আবশ্যক। তবে তার ভিত্তিটা থেকেই যায় 'উৎপাদন – বণ্টন – বিনিময় – ব্যবহার'

সম্পর্ক, সেটা যেভাবে প্রযোজ্য বিশেষিত কার্মিকতা, সামাজিক গঠন আর 'গ্রাম' থেকে শহরের পৃথকীকরণ ক্ষেত্রে। প্রত্যেকটা নতুন রাষ্ট্র-বিন্যাসে (পেশোয়া আর শিখদের, মৈসুর আর বাংলার রাজশক্তিতে) এমনসব আঞ্চলিক কারক-উপাদান থাকত যেগুলো উন্নত সমাজতন্ত্রের বর্গগত সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ-উপাদান গড়ে-ওঠা ব্যাহত করত। পেশোয়াদের হিন্দুপ্রধান রাজ্য মহারাষ্ট্র ছাড়া, শিখদের এবং বাংলা আর মৈসুরের রাজ্যগুলিতে গড়ে উঠেছিল সেগুলির নিজ-নিজ উর্ধ্বাধ বিভাগ-রেখা, – সেগুলো লঙ্ঘন করত প্রাথমিক সামাজিক বর্গগত সমান্তরাল উপাদান-গুলোকে এবং জায়মান জাতিগত সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আর ভাবাদর্শগত ঐক্য। ধর্মীয় বিভেদের ফলে জাতীয় আর রাষ্ট্রিক ঐক্য নষ্ট হয়েছিল – বিশেষত পাঞ্জাবে, বাংলায়, অযোধ্যায় আর মৈসুরে।

এইভাবে, ভারতীয় এবং আরও কোন-কোন প্রাচ্য সমাজে বর্গ-শ্রেণীগত সীমানির্দেশ নবকালে সূচিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ধর্মীয়, সম্প্রদায়গত, বর্ণগত, জাতিগত এবং অন্যান্য সেকেলে প্রতিবন্ধক অতিক্রম করতে পারে নি এই ধারাটা। স্বৈরতান্ত্রিক এশীয় রাষ্ট্রের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হিসেবে বর্গ-শ্রেণীগত সীমানির্দেশের অসম্পূর্ণতা লেনিন লক্ষ্য করেছিলেন: 'যখনই কোনো দেশের অর্থনীতিতে প্রাধান্যশালী থাকে পুরোপুরি প্যাট্রিয়ার্কাল আর প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানগুলো, আর যখন পণ্যউৎপাদন এবং শ্রেণীগত প্রভেদনের উদ্ভব ঘটে না বড় একটা, সেসব ক্ষেত্রে এইরকমের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা হয় খুবই সুস্থিত, এটা তো সবারই জানার কথা।'* পরিণত এবং – আরও বেশি পরিমাণে – শেষকালীন নিরঙ্কুশ সামন্ততন্ত্রের মাত্রায় উত্তরণের চেষ্টার সময়ে শাসক সামাজিক স্তরগুলোর রাষ্ট্রিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদি আর সোপানতন্ত্রের রূপান্তরের মাঝে প্রকাশ পায় প্রাচ্যে বর্গ-শ্রেণীগত গঠনের অপক্বতা।

'আমলাতন্ত্র' আর 'স্থায়ী ফৌজ', এই কথা-দুটোর অনৈতিহাসিক প্রয়োগের ফলে প্রাচ্যের শাসক মহলগুলোর গঠন সম্বন্ধে উপলব্ধি ব্যাহত হয়। কথা-দুটোয় ব্যক্ত হয় কোন-কোন নির্দিষ্ট ইতিহাসক্রমিক সামা-

---

জিক ব্যাপার, যার উদ্ভব ঘটেছিল সামন্ততন্ত্রের শেষের দিককার, নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী পর্বে, আর — যা আগেই বলা হয়েছে — সেটা উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় আর ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্রের উৎপত্তির সহায়ক হয়েছিল। তবে এই প্রক্রিয়ার ঐ দুটো আরও বড় ভূমিকায় আসে সক্রিয় সামাজিক সংস্থা হিসেবে, তাতে অভীপ্সানুযায়ী অভ্যন্তরীণ আর বহিস্থ কর্মনীতির সাহায্যে নতুন বিন্যাসের পথ প্রস্তুত হয়।

রাষ্ট্র হল একটাকিছু 'শৃঙ্খলার সংগঠন', এই মর্মে অনৈতিহাসিক ধারণাটাকে খণ্ডন করে লেনিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, 'আমলা-তন্ত্র হল সামন্ত ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে এবং সাধারণভাবে "সাবেকী-অভিজাততন্ত্রের" বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রথম রাজনীতিক হাতিয়ার, আর সেটা হল যারা অভিজাতবংশীয় ভূস্বামী নয়, সাধারণ মানুষ, "মধ্য শ্রেণীর" মানুষ, তাদের রাজনীতিক শাসনের রঙ্গভূমিতে প্রথম অবতীর্ণ হবার নিদর্শন'।* জানাই আছে, অভিজাতকুল ছিল আমলা-তন্ত্রের একটা অঙ্গ, আর স্বৈরতন্ত্রের আমলে সাধারণত সেটার পরি-চালক। তবে এরা ছিল সেইসব অভিজাত যারা উঠতি বুর্জোয়াদের সঙ্গে, 'নিম্ন মধ্য-শ্রেণীর' সঙ্গে জোট বেঁধে রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক সংগঠন স্থাপন করেছিল উচ্চবংশীয় অভিজাতকুলের 'সাবেকী আভিজাত্য' দাবির বিরুদ্ধে সংগ্রামে। সামাজিক-বর্গ উপাদানটার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা এবং অভিজাতকুলের কাতারে অন্যান্য বর্গের মানুষ ঢোকানো — নতুন শক্তি সঞ্চারণ — ছিল স্বৈরতন্ত্রের একটা বিশেষত্ব।

স্বৈরতান্ত্রিক ধরনের স্থায়ী ফৌজ সংগঠিত করার চেষ্টার মধ্যেও প্রকাশ পায় প্রাচ্যে স্বৈরতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক-বর্গগত অপক্কতা। সাধারণ পদাতিক আর গোলন্দাজেরা লড়াইয়ের ইউরোপীয় প্রণালীতে তালিম পেত, কিন্তু পরিচালক কর্মীরা বৃত্তি, দৃষ্টিভঙ্গি আর রাজনীতির দিক থেকে সামন্ত-গোষ্ঠীগত অস্থায়ী বাহিনীর নায়কের পর্যায়েই থেকে গিয়েছিল। বর্গগত আর জাতিগত ঐক্যের মূলভাব দিয়ে সম্মিলিত অফিসারদল (যেমনটা ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ রুশ কিংবা প্রুশীয় বাহিনীর অফিসারদল, যেসব বাহিনী শেষে স্থায়ী ফৌজ হয়ে গড়ে উঠেছিল আঠার শতকে) গড়ে ওঠার উপযোগী (ইউরোপীয় অভিজাতকুল ধরনের) সামাজিক পরিবেশ প্রাচ্যে ছিল না।

স্বৈরতন্ত্রের আমলে চূড়ান্ত আকারে গড়ে ওঠে পদ-পদবির যে-সোপান-তন্ত্র, তাতে বোঝায় লোকের ক্রমে-ক্রমে পদোন্নতি আর পদের সঙ্গে পদবির মোটামুটি অনুযায়িতা, আর পদাবনতি, তাছাড়া, পদচ্যুতি, যা ছিল ব্যতিক্রম, সেজন্যে প্রয়োজন হত বিশেষ হেতু। স্বৈরতন্ত্রের আমলেও পদ-পদবির সোপানতন্ত্র কিছু পরিমাণে ছিল অন্যান্য সোপান-তান্ত্রিক নির্ণায়কের অনুযায়ী: প্রতিষ্ঠা, আভিজাত্য, জমির পরিমাণ আর কৃষকদের সংখ্যা, সম্পদ। এর ফলে কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে সাধারণ সোপানতান্ত্রিক মূল্যায়নটা ছিল জটিল ব্যাপার, কিন্তু আমলারা আর অফিসারেরা বেশি পছন্দ করত পদবির অনুযারী সোপানতন্ত্র, তারা সরাসরি সেটার সাপেক্ষ করাতে চাইত পদের সোপানতন্ত্র এবং সম্ভব হলে অন্যান্য সমস্ত সোপানতন্ত্র। পূর্ববর্তী বিভিন্ন ধরনের সামন্ত-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতো স্বৈরতন্ত্রের আমলেও অমুক কিংবা অমুক সোপানতান্ত্রিক নীতির পূর্বিতা স্থির করার প্রশ্নে প্রচণ্ড বিরোধ ঘটত সমাজের উপর-স্তরগুলোয়।

প্রাচ্যের সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এলাকাগুলোয় প্রশাসন, কর আর রক্ষণ সংক্রান্ত কাজ করত গ্রাম-সম্প্রদায়ের কর্মচারীরা কিংবা সরাসরি বৃহৎ ভূস্বামীর অধীন লোকজন। এইসব কাজ বিভিন্ন গ্রন্থির মধ্যে স্পষ্ট ভাগাভাগি করা থাকত না, অনেক সময়ে সেগুলো করত একই লোকে, কিংবা তার উলটোটাও হত: একই কাজ (যেমন, খাজনা-আদায় কিংবা বিভিন্ন গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে বিরোধে আদালতী বিচার-মীমাংসা) সম্পাদনের দাবিদার হত কয়েক জন, তারা বংশ আর সোপানতান্ত্রিক নীতির অনুযায়ী বিভিন্ন অধিকার অনুসারে ঐ দাবি বলবৎ করাতে চেষ্টা করত।

কর্মবিভাগের অসম্পূর্ণতা চলতে থাকে পুনর্বণ্টন-ব্যবস্থায়, আর এই ব্যবস্থা সেটাকে টিকিয়ে রাখে। বাড়তি উৎপাদে শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন স্তর আর মহলের দাবি যারপরনেই বিবিধ ছিল আকার আর প্রবর্তনার দিক থেকে। যেমন, ভারতে পুনর্বণ্টন-ব্যবস্থার মধ্যে ছিল উৎপাদে নিম্নোক্ত মহলগুলোর ভোগ-দখলের বিভিন্ন নীতি আর প্রণালীর বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী সমন্বয়: কুল-গোষ্ঠীগত অভিজাতকুল, গ্রাম-সম্প্রদায়ের উপর-স্তর, মাঝারী আর বড় পুরুষানুক্রমিক ভূস্বামীরা, স্থানীয় আর কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন সামরিক আর প্রশাসনিক কর্মকর্তারা,

আর তাছাড়া, হিন্দু আর ইসলামী এবং ভারতের অন্যান্য ধর্মের যাজকেরা। হরেক রকমের প্রাপ্তির মধ্যে ছিল – গোষ্ঠীপতিকে দেয় নজরানা, বস্তু-কর কিংবা নগদ-কর (প্রথমত ভূমির জন্যে) থেকে কেটে-নেওয়া, প্রশাসনিক কিংবা বিচার-সংক্রান্ত কাজ চালাবার সময়ে জনসাধারণের কাছ থেকে হুকুম-আদায়, বর্ণগত কিংবা অন্যান্য ব্যবস্থা লঙ্ঘনের দায়ে জরিমানা, নিষ্কর ভূমি থেকে আয়, যুদ্ধে লোটা মাল, বাণিজ্যে একাধিকার থেকে মুনাফা, ইত্যাদি। কার্যকাল অনুসারে নগদে-প্রাপ্তি ছিল ব্যতিক্রম; যা-ই হোক, সেটা প্রাপ্তার পদ-পদবির সঠিকভাবে অনুযায়ী প্রাপ্তিব্যবস্থা হয়ে উঠতে পারে নি। শাসক শ্রেণীর প্রাপ্তি-ব্যবস্থাটা মিশ্র হয়ে থেকে গিয়েছিল, সেটা চলত সামাজিক অধিকার অনুসারে, তাতে ভোগ-দখলের কর্ম-বন্দেজটা ছিল পাঁচমিশালী আর ভোগ-ব্যবহারের জন্যে বাড়তি উৎপাদ আদায়ের ধরন ছিল বিবিধ। সেটা নিরঙ্কুশতাবাদের ব্যবস্থার (পদ-পদবি অনুসারে নগদ দেওনের) কাছাকাছিও ছিল না শুধু তাই নয়, অধিকন্তু পরিণত বর্গগত রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা (আভিজাত্য কিংবা পদ অনুসারে দেওন) থেকে সেটা ছিল অপকৃষ্ট।

সামাজিক-গাঠনিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে আঠার শতকের অটোমান, পারসিক, ভারতীয় আর চীনা সমাজ সবে ঢুকছিল বর্গগত-সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পর্বে। সামন্ততন্ত্রের অনুরূপ (ইতোমধ্যে পার-হয়ে-আসা) পর্বের ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে উল্লিখিত সমাজগুলির সাধারণ জাতিরূপগত তুলনা করতে হলে মনে থাকা চাই নিম্নোক্ত বিষয়টা: বৈষয়িক সম্পদের অপেক্ষাকৃত উঁচু মাত্রায় উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলা উৎপাদন, মনোজগৎ, শিক্ষা আর বিজ্ঞান ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সাধন-সাফল্য ঘটে না সবসময়ে। প্রগতি সম্বন্ধে অতিসরলীকৃত সমঝের বিরুদ্ধে মার্কস হুঁশিয়ারি জানিয়েছেন: '**দৃষ্টান্তস্বরূপ শিল্পকলা উৎপাদনের সঙ্গে বৈষয়িক উৎপাদন উন্নয়নের অসম সম্পর্ক**। সাধারণভাবে, "প্রগতি"-সংক্রান্ত ধারণাটাকে প্রচলিত বিমূর্ত আকারে ধরা চলতে পারে না। আধুনিক শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ে এই অসামঞ্জস্যটা তত গুরুত্বপূর্ণ এবং তত দুর্বোধ্য নয় যতটা কিনা ব্যবহারিক সামাজিক সম্পর্কক্ষেত্রে।'*

জাতিরূপগত বিশ্লেষণের প্রণালী স্থির করতে গিয়ে এই কথাটা বিবেচনায় থাকা দরকার।

এতে কোন একটা সমাজের (যেটা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত পর্যাপ্ত গবেষণা করা হয়েছে) বৈষয়িক, সামাজিক আর মনোজাগতিক উপাদান-গুলির অনুবন্ধটাকে অন্য একটা সমাজের ঐ অনুবন্ধের উপর চাপিয়ে দেওয়া চলে না। অমুক কিংবা অমুক সমাজে ঐসব উপাদানের একটা-কিছু অসামঞ্জস্যের সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখেছিলেন মার্কস। এইভাবে, সামন্ততান্ত্রিক প্রাচ্যের চিরাগত সভ্যতার বিভিন্ন বিশেষক উপাদান হল – সমাজ-মানসতা আর সামাজিক আচরণবিধি প্রণয়ন এবং সেটার সুস্থি-তি, বিভিন্ন নৈতিক এবং কান্তিবিদ্যাগত ধ্যান-ধারণা, সৃজনী শিল্পকর্মের উৎকর্ষ, শিক্ষিত মহলগুলিতে বিমূর্ত চিন্তনের ঐতিহ্য, আর ধর্মসমন্বয় (যেটা ইউরোপের পক্ষে অসাধারণ)। সতর-আঠার শতকে প্রাচ্যে সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজে মনোজগতের এই দিকগুলি ঐ কালপর্যায়ের ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজগুলি সামন্ততন্ত্রের তুলনীয় পর্ব পার হয়ে চলার সময়ে সেগুলি যা ছিল সেটা থেকে পৃথক। প্রাচ্যের সমাজগুলি খুবই দীর্ঘকাল যাবৎ সামন্ততন্ত্রের প্রাথমিক পর্বগুলিতে থেকে গিয়েছিল বলেই ঐসব পর্বের ভবিষ্য সংস্কৃতি-সাধনা প্রথমে প্রকটিত, আর পরে সংহত এবং বিধিবদ্ধ হতে পেরেছিল।

সামাজিক কর্ম-বন্দেজের ধরন আর নিয়ম-বিধির সুশৃঙ্খল ধারা, সর্বাগ্রে ব্যক্তি আর সমাজের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া আলোচ্য কালপর্যায়ের মধ্যে প্রধান-প্রধান প্রাচ্য দেশগুলির চৈতন্যে নিয়ামন, সম্পূর্ণতা আর প্রভাব-বিস্তারের উঁচু মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। এখানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা দরকার – ব্যক্তি-মানুষের শ্রম-তৎপরতার সম্যক-বিস্তারিত প্রণালী আর অভ্যাস, ব্যষ্টিগত আর সামাজিক শ্রমবিভাগের সামাজিক নীতি, সেটা বাবত পারিশ্রমিকের পরিমাণ আর পরিমাপ ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত সুশৃঙ্খলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আর নির্দেশক হয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে, ঐসব নিয়ম-বিধি মজবুত (তার সঙ্গে ধর্মীয়-নৈতিক আর ধর্মীয়-আইনগত চৈতন্যে বদ্ধমূল) হবার ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতার উপর কর্মপ্রণালীর চাগানোর ক্রিয়াফল সীমাবদ্ধ এবং ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে, ইউরোপে পরিস্থিতিটা ছিল একেবারেই অন্য রকম। সেখানে পর্যাপ্ত সামাজিক উপাদান জড় হয়েছিল বলে পুঁজিতান্ত্রিক সম্প-

র্কের দোষ-ত্রুটি আপনা থেকে দূর হতে পেরেছিল, আর সেটার সাহায্যে মোটের উপর ঘটেছিল অপরিবর্তনীয় অগ্রগতি, যেটার ধারায় মানুষ 'পরিসমাপ্ত আকারে প্রতিষ্ঠিত একটাকিছু হয়ে থেকে যেতে চায় না, মানুষ থাকে গড়ে ওঠার অনপেক্ষ গতির প্রক্রিয়ায়'। সতর শতক নাগাদ প্রাচ্য দেশগুলিতে এমন কোন ব্যক্তি কিংবা সামাজিক বর্গ ছিল না যেটা অসম্পূর্ণতার, অতৃপ্ত অবস্থার, এককথায়, গড়ে ওঠার অনপেক্ষ গতির প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট থেকে যেত।

সতর শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এশিয়ার সমাজগুলিতে এমন কোন ইতিহাসক্রমিক কালপর্যায় ছিল না যখন দুই-তিন পুরুষের জীবনকালে বহুযৌগিক সমগ্র সমাজ-জীবনে রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল। এশীয় চিন্তনে উপলব্ধ বিভিন্ন পরিবর্তনের অভিব্যক্তি ঘটেছিল ব্যক্তি আর বর্গ সত্তার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অনড়-অপরিবর্তনীয় জগতে বয়ে-যাওয়া সামরিক-প্রশাসনিক ঝঞ্ঝার আকারে। এমনসব পরিবর্তনের ফলে ঘটেছিল বিপুল বিপর্যয়, সেটা সবচেয়ে অপকৃষ্ট ক্ষেত্রে, আর নইলে বড়জোর অনর্থক অভিঘাত। শোচনীয় ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে সমাজ-চৈতন্যে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, গতি বিভ্রান্তিকর, কোন প্রচেষ্টা নিরর্থক, বৃথাই আত্মশ্লাঘা, আর এই ধারণাটাকে পরে বদ্ধমূল করেছিল ধর্মীয় গোঁড়ামি। প্রাচ্যে নবকালের সূচনা হবার মধ্যে গতি অনুশাসন হয়ে ওঠে নি সত্তা আর চৈতন্যের পক্ষে। এটা বিশেষত প্রকাশ পায় কাল-বোধের ক্ষেত্রে।

মধ্যযুগীয় খৃস্টধর্মে ছিল যে-কাল-বোধ, আর রেনেসাঁস সেটায় যে-পরিবর্তন ঘটায়, তার থেকে কাল-বোধ-সংক্রান্ত প্রশ্নটাকে তুলে ধরা যায় মানুষের (এবং সমগ্রভাবে সমাজের) ইতিহাসক্রমিক দিকস্থিতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হিসেবে। মধ্যযুগের মানুষের কাল-বোধ ছিল 'দ্বিমাত্র – প্রাকৃতিক আর ঐতিহাসিক, অর্থাৎ বৃত্তাকার (আবর্ত) এবং রেখাকার (প্রসার) প্রবাহ হিসেবে'। প্রথম ক্ষেত্রে কাল-বোধে প্রকাশ পায় গোষ্ঠীগত আর সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আর রেখাকার কালের পিছনে আবার দেখা দেয় বৃত্তাকার কাল। মধ্যযুগে মানুষের কাল-বোধ যা ছিল তাতে সে 'সময় নষ্ট করার' সমস্যা সম্বন্ধে একেবারেই নির্বিকার হয়ে থাকত, কিন্তু সমস্যাটা জরুরী হয়ে ওঠে নবকালে। আঠার শতক নাগাদ ইউরোপের শহরে যন্ত্রচালিত ঘড়ির সাহায্যে

যথাযথভাবে কালগণন শুরু হয়, এই উদ্ভাবনটাকে এঙ্গেলস বলেছেন আধুনিক সভ্যতার পথে একটা মাইলস্টোন। প্রথমে বর্গগত এবং পরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রকাশ হিসেবে কাল-সংক্রান্ত ধারণার পরিবর্তনটা হল ইতিহাসক্রমে নতুন ধরনের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার একটা অপরিহার্য কারক-উপাদান। কুল-গোষ্ঠী ব্যবস্থা থেকে শুরু করে প্রাক্‌বুর্জোয়া সমাজের মানুষ তার পরবর্তী বয়ঃক্রমে, আর তার সঙ্গে পরবর্তী সামাজিক অবস্থায় উত্তরণটা বেশ স্পষ্ট বোধ করত। ব্যক্তির সামাজিক মূল্যায়নটাকে তার জীবসত্তা প্রক্রিয়ার সাপেক্ষ করাটা সর্বত স্বাভাবিক এবং সপ্রমাণ বলে মনে করা হত। এতে তার জীবনচক্রটাকে ধরে নেওয়া হত ধাপে-ধাপে — জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি।

চিরাগত ব্যক্তির এমন ধাপে-ধাপে সামাজিক ক্রমোন্নতির ফলে অপরিবর্তনীয় জগতে তার নিজ মূল্যায়নের পরিবর্তনীয়তা-সংক্রান্ত বিভ্রান্তিকর ধারণা সৃষ্টি হত। সর্বত নির্ভরযোগ্য কিংবদন্তীর উল্লেখ করে বংশধরেরা দেখতে পেত অপরিবর্তনীয় জগৎ নিয়ে পরিতৃপ্তির ফলে (অধিকন্তু, সেটার সক্রিয় সমর্থনের ফলে) নিশ্চিত হয় কোন-কোন উপযোগী সামাজিক পরিবর্তন (বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার উন্নতি)। সেটার প্রতিষঙ্গী সামাজিক-জীবধর্মগত পরিবেশ (বিস্তৃত রক্তের সম্পর্ক, বহুগামিতা, বহু সন্তানসন্ততি) থাকত। আকাঙ্ক্ষিত গোষ্ঠীপতি প্রতিষ্ঠা হাসিল এবং কায়েম হত এই পরিবেশে।

তবে প্রত্যেকটা বয়ঃক্রমে ব্যক্তির জীবনে বাঁধাধরা চক্রের অনড় চৌহদ্দির ভিতরে পুনরাবৃত্ত হত বাবা (মা), ঠাকুরদা (ঠাকুরমা), ইত্যাদি পূর্বপুরুষের জীবনচক্রের প্রতিষঙ্গী ধাপ। তাই মানুষের পরিসমাপ্ত জীবনচক্র (অকালমৃত্যুর দরুন সত্তা-সংক্রান্ত মূল উপাদানটা বদলাত না) পুরুষানুক্রমে পুনরাবৃত্ত হতে পারত বিশেষ কোন পরিবর্তন ছাড়াই। বাঁধাধরা ছকটাকে টিকিয়ে রাখত ধর্মীয় নীতিবোধ, তার থেকে গড়ে উঠত প্রত্যেকটা বয়ঃক্রমের জন্যে নৈতিক আর কার্মিক নিয়ম-বিধি, আর বিভিন্ন পুরুষ-পর্যায়ের মধ্যে সম্পর্ক।

উত্তরণকালীন ধরনের ইতিহাসক্রমে তেজীয়ান ব্যক্তির উদ্ভবের জন্যে মানুষের বয়ঃক্রম অনুযায়ী কর্ম আর প্রতিষ্ঠার যে-বাঁধাধরা পরিবর্তনীয়তা ঐতিহ্যক্রমে মজবুত হয়ে উঠেছিল সেটাকে অগ্রাহ্য করা, আর পূর্বপুরুষের জীবনচক্র হল মানুষের অলঙ্ঘনীয় মানদণ্ড এই মর্মে

ধারণা থেকে তার উদ্ধার পাওয়া আবশ্যক ছিল। সমাজ-মানসগত পুনর্মূল্যায়ন ঘটে একটা থেকে অন্য বিন্যাসে (এমনকি একটা থেকে অন্য পর্বে) উত্তরণের সময়ে, যখন ইতিহাসক্রমে অপরিবর্তনীয় ব্যক্তি'র সামাজিক উন্নতির বাঁধাধরা স্বতঃক্রিয়তা ক্রমে-ক্রমে অচল হয়ে পড়ে। পূর্বপুরুষের সামাজিক উন্নতির ধারার পুনরাবৃত্তি যে কমবেশি সচেতনভাবে এড়িয়ে চলে এমন মানুষ সামাজিক স্বীকৃতিভাজন হয় ক্রমে-ক্রমে। রক্ষণপন্থী সমসাময়িকেরা এমন মতাবস্থানকে নীতিবিগর্হিত, এমনকি নিষ্ক্রিয় বলে বিবেচনা করেছেন অনেক সময়ে। নতুন ধরনের ব্যক্তি'র জীবন চিরাগত বয়ঃ-ছকের চক্র আর ছিল না। সেটা অসংগতিপূর্ণ ধারায় গড়ে ওঠে তখনও বিষয়ীগতভাবে অজ্ঞাত মূল্যবোধ থেকে, যেটা থেকে মুছে যায় কার্মিক ধরনধারন আর আচরণবিধি।

নতুন কাল-বোধ আর নতুন ধরনের সময়ের ব্যবহারের (কাজেও, অবসরেও) মাধ্যমে উৎপাদনের প্রভাব পড়ে সমস্ত রকমের ভোগ-ব্যবহারের উপর, বিশেষত উৎপাদ ব্যবহারের উপর। বিশেষত, কর্মকাল আর উৎপাদনকালের স্পষ্ট বিভাগ আর হিসাবের ফলেই শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং শ্রমের নতুন-নতুন সরঞ্জাম আর উন্নত ধরনের প্রযুক্তি'র ব্যবহারের আবশ্যকতা-সংক্রান্ত বুর্জোয়া ধারণা বলবৎ হয়। প্রাচ্যে নয়, কিন্তু ইউরোপে প্রযুক্তি হয়ে ওঠে ব্যাপক বাণিজ্য-সম্পর্কের বস্তু। ইউরোপীয়দের সঙ্গে স্থায়ী যোগাযোগ স্থাপিত হবার তিন শতাব্দী পরে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও ধনী ভারতীয়রা ইউরোপে অনেক কাল আগে উদ্ভাবিত বিভিন্ন জিনিস – যেমন, ঘড়ি – ব্যবহার করত সামান্যই। আঠার-উনিশ শতক অবধি এশীয় সমাজে ধনীদের মধ্যে সময়ের নিয়মিত এবং যথাযথ পরিমাপের প্রয়োজন ছিল না।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন আর পরিচলন সংগঠনের জন্যে, আর ব্যাপকতর অর্থে, পরিবর্তনীয় ব্যক্তি, পরিবর্তনীয় সমাজ গড়ে ওঠার জন্যে অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত হল সময় সম্বন্ধে মনোগত ধারণা থেকে নিয়মিত ধারণায় উত্তরণ। মানুষ আর সমাজের চৈতন্য বিভিন্ন অণু-চক্র আর মহা-চক্রের বদ্ধ সংস্থা হয়ে থেকে গিয়েছিল, যেটা ছিল ধর্ম দিয়ে মজবুত-করা ব্যষ্টিগত আর সামাজিক অভিজ্ঞতা। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ধারার উপর সেটার উলটো, পিছনমুখো প্রভাব পড়ত, ফলে অনেক ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়াত বদ্ধাবর্ত।

চিরাগত প্রাচ্য সমাজে পশ্চাদ্‌গতির ব্যবস্থাটা অনেকাংশে নিয়মিত হত ইতিহাসক্রমে নতুন কোন ব্যাপার সম্বন্ধে রক্ষণশীল সম্প্রদায়গত প্রতিক্রিয়া দিয়ে। স্থানগত দিক থেকে সেই প্রতিক্রিয়াটাকে মনে হতে পারত অনুন্নত আর উন্নত সমাজের অঞ্চলমধ্যস্থ কিংবা আন্তঃ-আঞ্চলিক বিরুদ্ধ-অবস্থান। এই দুয়ের মিথস্ক্রিয়া-ব্যবস্থাটাকে এঙ্গেলস মার্কস-বাদী ইতিহাসবিদ্যায় বিবৃত করেছেন আরব সমাজে শহর আর যাযাবরদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে। ইউরোপে 'মধ্যযুগের সমস্ত ব্যাপক আন্দোলনের মতো বিভিন্ন অভ্যুত্থান ধর্মীয় ভেখ ধারণ করত, এটা ছিল অবধারিত, এইসব অভ্যুত্থান হত ক্রমবর্ধমান অবনতিগ্রস্ত, আদি খৃস্টধর্ম পুনরুদ্ধারের জন্যে সংগ্রামের আকারে', কিন্তু খৃস্টধর্ম সামাজিক রূপান্তর সাধন করতে চাইত ইহলোকে নয়, পরলোকে, স্বর্গ-ধামে, মৃত্যুর পরবর্তী অমর জীবনে',* এটা লক্ষ্য করে এঙ্গেলস তুলে ধরেন একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: 'এমনটা কি সম্ভব যে, মাহ্‌দিবাদী বিদ্রোহের পরে প্রাচ্যে ইতিহাসের নাট্যাভিনয় আবার শুরু হতে পারত গোড়া থেকে, কেননা ধর্মের আদি সামাজিক আদর্শ একটা ব্যবহারিক প্যাটার্ন ছিল সাবেকী আর্থনীতিক পরিস্থিতি আর সামাজিক নিয়ম-বিধি পুনর্গঠনের জন্যে, অর্থাৎ পশ্চাদ্‌গতির জন্যে।'** খৃস্টধর্মে আদর্শের পর-লোকগত ধরনের ফলে এই কথাটা আসে যে, সেটা যদি মনে হয় যেন হাসিল হল তাহলে তা ঘটে শুধু জগতের সমুখপানে গতির ধারায়, কাজেই ঐতিহ্যের বিজয় এবং তাতে প্রত্যাবর্তন এক্ষেত্রে বাস্তব নয় — অধ্যাসজনক।

সমাজের উপর-মহল আর জনসাধারণ্যে ভাবাদর্শের আকারের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা দরকার। অনেককিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে এঙ্গেলসের নিম্নোক্ত ধারণা থেকে: 'যারা ধর্মের প্রয়োজন বোধ করে এবং জন-সাধারণের ধর্মীয় চাহিদা বোঝে এমনসব লোকে ধর্ম সৃষ্টি করে, আর এটাই সাধারণত থাকে না বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের।' এঙ্গেলস আরও বলেন, নির্বিকারচিত্ততার দর্শন (স্টোইসিজম) কিংবা

এপিকিউরিয়াসের দার্শনিক সম্প্রদায়ের কোনটাই জনসাধারণকে সান্ত্বনা দিতে পারে নি, 'তার কারণ, প্রথমত, তা ছিল দর্শনতন্ত্র, তাই সাধারণের চৈতন্যের জন্যে নয়, আর দ্বিতীয়ত, এই দুই সম্প্রদায়ের অনুগামীদের জীবনযাত্রা প্রণালী তাদের মতবাদ সম্বন্ধে অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল। হারানো দর্শন নয়, হারানো ধর্মের জায়গায় কিছু স্থাপন করা আবশ্যক ছিল সান্ত্বনা দেবার জন্যে। জনসাধারণকে যা নাড়া দিতে পারে এমন সবকিছুর মতো ধর্মীয় আকারে সান্ত্বনার প্রভাববিস্তার আবশ্যক ছিল। অবস্থাটা এমনই ছিল ঐ সময়ে আর সেটা টিকে ছিল সতর শতক অবধি'।*

একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচরণবিধি (নতুন চার্চের বুর্জোয়া প্রকৃতির সংশোধক সহ) হিসেবে ইউরোপে ষোল শতকের ধর্মীয় আন্দোলন রিফর্মেশনকে এইসব বৈজ্ঞানিক নিয়ম-বিধির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল। কোন ধর্মের স্রষ্টার সামাজিক-মানসিক বিশেষত্ব সম্বন্ধে এবং কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা থেকে তার পার্থক্য সম্বন্ধে এঙ্গেলস যে মূল্যায়ন করেছেন সেটাও খুবই আগ্রহজনক। জনসাধারণের ধর্মীয় প্রয়োজন এবং (আরও বেশি পরিমাণে) ঈশ্বরের জন্যে কারও নিজ প্রয়োজন বোঝার জন্যে দরকার হয় না সর্বাঙ্গীণ ঈশ্বরতত্ত্বীয় প্রতিপাদন, ধর্মীয় পরমতসহিষ্ণুতা, কিংবা বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা, ইউরোপীয় শিক্ষার মূল উপাদানগুলি আর ইউরোপীয় অভিজাত কিংবা বুর্জোয়াদের সম্ভ্রান্ত চাল-চলন সম্বন্ধে জ্ঞান। এই কারণেই ভারতে রাজা রামমোহন রায়, সৈয়দ আহমেদ খান এবং তাঁদের অনুগামীরা, নামিক কেমাল এবং অন্যান্য 'নতুন অটোমানরা', ইরানে বেহাইটরা তাঁদের স্বদেশবাসী জনসাধারণের মনজয় করতে পারেন নি, কিংবা তাদের মধ্যে নিজেদের জীবনযাত্রাপ্রণালীকে আস্থাভাজন করতে পারেন নি। তাঁরা ধর্মীয় অথবা দার্শনিক মত-সম্প্রদায় কিংবা শিক্ষাধারা প্রবর্তন করেছিলেন সমাজের উপর-স্তরের মানুষের জন্যে, সেটা সাধারণ মানুষের চৈতন্যে সাড়া জাগায় নি। অথচ তাঁদের মতবাদ ছিল নিঃসন্দেহে বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী ধরনের। সংগত কারণেই

মার্কস বলেছেন, 'নতুন অটোমানরা' হল কোরানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পিউরিট্যানিস্ট পার্টি।

বাবিদের আর বিশেষত শিখদের আন্দোলনে দেখা যায় কোন-কোন প্রাক্‌রিফর্মেশন উপাদান। তবে এই দুই আন্দোলনকে রিফর্মেশ-নের সঙ্গে একেবারে এক করে দেখা চলে না, কেননা তাতে ছিল না সমঞ্জস সামন্ততন্ত্রবিরোধী কর্মসূচি; আর পরিসরের দিক থেকে দেখলে, বাবি আন্দোলন সারা ইরানে এবং শিখ আন্দোলন সারা উত্তর ভারতে ছড়ায় নি। তাছাড়া, বাবিবাদ এতই অল্পকালস্থায়ী হয়েছিল যাতে সেটা নিজস্ব 'বাইবেল' রচনা করার সময় পায় নি; আর শিখদের ধর্ম সা-মরিক আর রাজনীতিক দিক থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে চালিত ছিল বলে তাতে হিন্দুধর্মের কোন-কোন প্রভাব না পড়ে পারে নি। তবু শিখ আর বাবিদের প্রচণ্ড দৃঢ়তা থেকে, আর তাদের মতবাদের সাধারণ মানুষের চৈতন্যে প্রবেশ করে সেটা জয় করার সামর্থ্য থেকে মনে করা যায় এই দুটি ছিল ধর্ম-সংস্কারের সাধারণ্যে বোধগম্য প্রচেষ্টা, যা বাস্তবে পরিণত হল না।

রমন্যাস থেকে ইতিহাসক্ষেত্রে এসেছে যে-বিজ্ঞ পরমতসহিষ্ণু স্বেচ্ছা-চারী শাসকের ভাবমূর্তি – চেঙ্গিস খান, সালাহ্-এদ-দিন কিংবা আকবর – যিনি বিরুদ্ধ-অবস্থানের বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে অধীর হয়ে প্রগাঢ় আলোচনা করেন, সে-প্রসঙ্গে আরও বিচার-বিশ্লেষণ আবশ্যক। আমি মনে করি, এই স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ধর্ম-সমন্বয়ের নির্বিকারচিত্ততার কোন মিল নেই ধর্মে-স্বচ্ছন্দমন কিংবা এনলাইটেনমেণ্টের ধর্মে পরমতসহিষ্ণুতার সঙ্গে। ধর্ম-সমন্বয়ের চীনা রকমফেরের সাহায্যে কোন ধনী ব্যক্তি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্মিক নিয়মন (কনফিউশিয়াসবাদ) থেকে চলে যেতে পারত দার্শনিক অক্রিয়তায় (বৌদ্ধধর্ম), এবং সত্তা আর না-সত্তা সংক্রান্ত অতীন্দ্রিয় তমসবাদে (টাওবাদ)। দেখা যাচ্ছে, কোন ধর্মীয় কিংবা ভাবাদর্শগত বিরোধ সংশ্লিষ্ট ছিল না ঐসব পরিবর্তনে; তাতে শুধু প্রকাশ পেত সনাতনী ব্যক্তির নিয়মিত জীবন আর সামাজিক চক্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ব্যাপার, তাতে থাকত ভাবাদর্শগত আর আচরণ-সংক্রান্ত নিয়ম-বিধির তদনুযায়ী পরিবর্তন।

ভারতে বিভিন্ন ধর্মে এমনসব পরিবর্তনের কিছু-কিছু সুযোগ ছিল হিন্দুধর্মের ভিতরেও, আর ইসলাম, শিখধর্ম কিংবা অন্য কোন ধর্ম গ্রহ-

ণের ফলেও। তবে যেকোন রকমের ধর্ম-সমন্বয়ের ফলে ভাবাদর্শক্ষেত্রে উত্তেজনার পরিস্থিতি এবং প্রাধান্যশালী ভাবাদর্শটাকে ভেঙে ফেলে সেই উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টাটা দূর না হলেও অন্তত লাঘব হত। তাই ধর্ম-সমন্বয়গত উত্তরণটা বিশ্ববীক্ষার দিক থেকে সমুখপানে গতি নয়, সেটা বরং পাশের দিকে গতি, এমনকি পশ্চাদ্‌গতি বলেই গণ্য।

প্রাচ্যে প্রধান-প্রধান ধর্মের সংস্কার হয় শুরুই হল না, নইলে শুরু হলেও সমাপ্ত হল না, তার ফল হল বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পিছনমুখো, তাই রক্ষণশীল ধর্মীয়-সংস্কারবাদী মতধারা। ভারতে উপর-স্তরের ধর্মীয় সংস্কারবাদ সাধারণ্যে প্রবর্তিত হলে বহুদেববাদ, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পূজাদি পরিচালনার একাধিকার, বর্ণভেদপ্রথা, নারীর পক্ষে অবমাননাকর রীত-রেওয়াজ, ইত্যাদি প্রশ্ন তাতে গোড়ায় যেটুকু আমূল-সংস্কারকামী উপাদান ছিল তাও আর থাকে না।

ভারতের ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন মূল রচনা অধ্যয়নের ফলে গোঁড়া মতেই প্রতিপন্ন হয় যে, বর্ণভেদপ্রথা, বহুদেববাদ, আচার-অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের একাধিকার, নারীর অবনত অবস্থা, ইত্যাদির বিরোধিতা যুক্তিসম্মত, শুধু তাই নয়, বিশাল দেশটির সমস্ত জাতির হিন্দুদের শিক্ষিত উপর-স্তরগুলি সম্মিলিত হয়। তবে একথাও বলা চাই যে, অহিন্দুদের,- প্রথমত মুসলমানদের ভাবাদর্শগত বিচ্ছিন্নতা তাদের মেনে নিতে হয়, যদিও রামমোহন রায় এবং তাঁর পরমেশ্বর আর একেশ্বরবাদের প্রচার করেছিলেন, যা নাকি গ্রহণীয় হত ভারতের প্রধান ধর্মগুলির পক্ষে, কিন্তু তাঁরা কৃতকার্য হন না।

বহু ভারতীয় ইতিহাসকার আর সমাজবিজ্ঞানী, বিশেষত যাঁরা মার্কসবাদী ভাব-ধারণার প্রভাব বোধ করেছেন তাঁরা ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক আর জাতীয় চৈতন্যের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখিয়ে বলেন, এই দুটো হল ইতিহাসক্রমে ভিন্ন-ভিন্ন পর্বের ধারণামৌল। এ. আর. দেশাইয়ের মতে, বৌদ্ধধর্ম, কিংবা হিন্দুধর্ম পুনঃস্থাপনের বিভিন্ন লড়ায়ে আন্দোলন, কিংবা ভক্তি আন্দোলন, কিংবা যেসব আন্দোলন পরিচালনা করেন গুরু নানক কিংবা কবির (যিনি হিন্দুধর্ম আর ইসলামের সমন্বয় ঘটা-তে চেয়েছিলেন), এগুলির কোনটাই 'ভারতীয় জনগণের মধ্যে কোন এক-অভিন্ন জাতীয় অনুভব কিংবা চৈতন্যের উদ্ভব ঘটাতে পারে নি। ঐসব "অতীন্দ্রিয় আন্দোলন" ভারতীয়দের ধর্মীয় আর ভাবাদর্শগত

মতাবস্থানে পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে। কিন্তু সেগুলি তাদের মধ্যে জাতীয় চৈতন্যের বিকাশনে প্রেরণা যোগায় নি, সেজন্যে বিষয়গত ভিত্তি হিসেবে আবশ্যক ছিল একক জাতীয় অর্থনীতি, প্রবল আর্থনীতিক আর সামাজিক বিনিময়ের জন্যে দ্রুত যোগাযোগের বহুবিস্তৃত ব্যবস্থা, আর একই রাষ্ট্রের চৌহদ্দির ভিতরে জীবন, যা চাপিয়ে দিল বৃটিশ বিজয়।'*

নিজ ধারণাটিকে প্রতিপন্ন করতে এই ভারতীয় পণ্ডিত বলেন: 'এমনকি না-ধর্মীয়, জাগতিক শিল্পকর্মও মর্মবস্তুতে এবং আকারে জাতীয় ছিল না। তাতে সম্রাটদের মহিমা কীর্তিত হয় (কুতব মিনার, নানা রাজপ্রাসাদ, বিপুল স্থাপত্য নিদর্শনে সমৃদ্ধ কত সমাধি), কিংবা কীর্তিত হয় পত্নীর প্রতি সম্রাটের অগাধ অবিনশ্বর প্রেম (তাজমহল)। এসব হল অভিজাতকুলের কিংবা কোন (হিন্দু কিংবা মুসলিম) ধর্মসম্প্রদায়ের আর্ট, জাতির আর্ট নয়, কিংবা যেসব নতুন সামাজিক শ্রেণী নিয়ে হয় আধুনিক জাতি তাদের আর্ট (আকারে জাতিগত আর মর্মবস্তুতে শ্রেণীগত আর্ট) নয়। শহরবাসী, অভিজাত, রাজা, বণিক আর কারুশিল্পীদের চেতনা জাতিগত ছিল না।' এই ভারতীয় পণ্ডিতের সাধারণ ভাবধারার সঙ্গে একমত হয়ে এখানে বলা দরকার বিষয়টা যেন আর্টের মর্মবস্তু কিংবা শৈলীর ব্যাপারে পর্যবসিত হবার নয়: অভিজাতকুলের জন্যে মন্দির আর সমাধি গড়তে গিয়ে তাদের উপযোগবাদী চাহিদা ছাপিয়ে উঠতে পেরেছিলেন ইতালীয় রেনেসান্সের শিল্পীরা।

ধর্ম-সংস্কারের মুখ্য কর্মসূচিগুলির যেকোনটাতে ঐতিহ্যের শরণ নিতে হয়েছিল, সেটা সাবেকী সমাজের ভেঙে পড়তে-থাকা সংস্থায় আরও এক-মাত্রা সংশোধক ঢোকাবার সংস্কারবাদী প্রয়োজন অনুসারে নয়, সেটা ছিল তার গোটা সামাজিক সোপানতন্ত্র চূর্ণ করার সংকল্প অনুসারে। সম্ভবত এদিক থেকেও সাচ্চা রিফর্মেশনের 'বৈপ্লবিক ধর্মীয় অভিমত' (এঙ্গেলস) রক্ষণশীল রিফর্মেশন আর সেটার ঐতিহ্যের শরণ নেওয়া থেকে পৃথক।

আইন-সংক্রান্ত চেতনা আর আদালতী কার্যধারার লোকায়তকরণ আর একীকরণ – বুর্জোয়া ব্যবস্থার একটা পূর্বশর্ত

ব্যবহারশাস্ত্র, দর্শন আর রাজনীতির মতো যেসব ভাবাদর্শগত তন্ত্রকে ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় সামন্ততন্ত্রের গোড়ার দিককার পর্বে (ইউরোপে), কিংবা সেটা থেকে আদৌ পৃথক করা হয় না (এশিয়ায়), সেগুলিকে সেটা থেকে পৃথক করে নেওয়াটা হল সমাজ-চৈতন্যের ক্ষেত্রে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আদালতে অভিযুক্ত না করে 'ঈশ্বরের বিচার'-সংক্রান্ত যে-ধারণা অনুসারে বিচার চলত বিশেষ, অযৌক্তিক নিয়ম অনুসারে সেটা হল সাধারণ ফাইডিস্ট চৈতন্যের সবচেয়ে সুস্থিত ধারণাগুলোর একটা। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান গোছের ব্যাপার হিসেবে বিচার কার্যধারা চালানোটা ছিল ঐসব ধারণার অনুযায়ী। কোন চিরাগত, সাধারণ পরিস্থিতিতে কোন বণিক কিংবা উদ্যোগী কারবারিকে এবং তাদের সম্পত্তি তুলে দেওয়া হত ঐ আচার-অনুষ্ঠানের পরিচালক – জাগতিক শাসক, যাজক কিংবা দিব্য শাসকের হাতে।

যেকোন রকমের বিচারধারায় থাকত কোন একটা শ্রেণীগত মর্ম। তবে সেটার পর্ব-বিন্যাসগত কর্মটা আসে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় উত্তরণের প্রস্তুতি হিসেবে। এশিয়ার আইন আর বিচার কার্যধারা-সংক্রান্ত তত্ত্ব আর চলিতকর্ম সম্বন্ধে বিবেচনা-বিশ্লেষণ হওয়া চাই সমাজের পর্ব-বিন্যাসগত বিশেষত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক হিসেবে। ব্যবহার-শাস্ত্রকে একটা স্বতন্ত্র ইহলৌকিক বিজ্ঞান হিসেবে পৃথক করে নেওয়া হল ঈশ্বরতত্ত্ব থেকে, তাতে সমাজের উপর-স্তর আর সাধারণ মানুষ উভয়ই প্রভাবিত হল – এদিক থেকেও সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেওয়ানী বিচার কার্যধারার ফলে বিস্তর পরিবর্তন ঘটল আচরণবিধি আর মূল্য-বোধ ব্যবস্থায়: এমন ব্যবস্থা দেখা দিল যেটা গুরুত্বে ধর্মীয়-নৈতিক ব্যবস্থার অনুরূপ। ইউরোপে প্রক্রিয়াটা নিষ্পন্ন হয়ে গিয়েছিল এনলাইটেন-মেণ্টের কালপর্যায়ে; তবে এতে মস্ত প্রেরণা যোগায় রিফর্মেশন। এমন কিছুই ঘটে নি প্রাগৌপনিবেশিক প্রাচ্যে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হবার পরে সেখানে ক্রমে-ক্রমে প্রযুক্ত হতে থাকে ব্রিটিশ আইন আর বিচার কার্যধারার নিয়ম-বিধি। কিন্তু

বৃটিশ শাসন খতম হওয়া নাগাদ সেগুলো সর্বজনীন কিংবা প্রণালীবদ্ধ হতে পারে নি, সেটা চলিতকর্মক্ষেত্রেও না, আর – যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ – সমাজ-চৈতন্যেও না, এক্ষেত্রে তখনও গড়ে ওঠে নি সংস্কৃত-ধর্মীয় কিংবা লোকায়ত বিশ্ববীক্ষা। সাধারণ ভারতীয়ের আইনগত সত্তায় আর চৈতন্যে গড়ে উঠেছিল একরকমের দ্বৈতভাব: একদিকে পরিবার, বর্ণ, বংশ, গ্রামীণ কিংবা বৃত্তিগত সম্প্রদায় সংক্রান্ত প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদি, সেগুলির ছিল ধর্মীয় অলঙ্ঘনীয়তা; আর অন্য দিকে লোকায়ত বুর্জোয়া আইন-কানুন ছিল বিষয়-সম্পত্তি আর ব্যবসা-বাণিজ্যিক কাজ-কারবারে, গুরুত্ব-পূর্ণ ফৌজদারী এবং স্বভাবতই রাজনীতিক অপরাধে, কারখানা আইনে এবং প্রশাসন ফৌজ আর পুলিসের শাস্তিমূলক নিয়ম-কানুনে। শহর – গ্রাম, কারখানা – কৃষি প্রতিষ্ঠান, সরকারী দপ্তর – ধর্ম প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় – ধর্মীয় বিদ্যালয়, কোন পুঁজিপতি কিংবা শ্রমিকের পরি-বার – কোন ভূস্বামী কিংবা চাষীর পরিবার, ইত্যাদি স্থান অনুসারে বুর্জোয়া আর প্রাক্‌বুর্জোয়া বিচারসংহিতার প্রাধান্যের ক্ষেত্র নির্ণয় করাটা হবে নিরর্থক অতিসরলীকরণ। পরিস্থিতির জটিলতাটা এখানে: উৎপাদন-সংক্রান্ত, সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক কার্যনির্বাহ করতে গিয়ে লোকে আচরণবিধির আইনগত পরিবেশের ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্রে গিয়ে পড়ে; আর এইসব স্থানান্তরণের মধ্যে একই কার্যকরণের জন্যে ব্যক্তি সম্বন্ধে সামাজিক এবং আইনগত মূল্যায়ন আর ব্যবস্থাদি হয় অতি বিভিন্ন।

উপনিবেশবাদ আর ঐতিহ্যে চিন্তাচ্ছন্নতা

আফ্রিকা আর এশিয়ার দেশে-দেশে মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশনের ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদের নেতিবাচক পরিণতিগুলোর মূল্যায়ন করতে গিয়ে জোর দিয়ে কিছু দেখাবার সময়ে শুধু উৎপাদন-শক্তির হানি সংক্রান্ত তথ্যাদির উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা চলে না, আরও মনে রাখা দর-কার নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে পরিণতিগুলোর কথা, যা হয়ত আরও বেশি সর্বনাশা এবং দীর্ঘস্থায়ী: মনোজগৎ, আচরণবিধি, সাবেকী প্রথা-প্রতি-ষ্ঠান আর অচলিত সোপানতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখার ব্যাপার। অন্য যেকোন ঐতিহাসিক ব্যাপারের মতো উপনিবেশবাদের বেলায়ও চাই বিজ্ঞানসম্মত বিষয়গত মূল্যায়ন, যা বদ্ধধারণামুক্ত, সেটা খুবই উন্নত

ধরনের বদ্ধধারণা হলেও। বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন হল দুটো প্রশ্ন : ১) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ঠিক কী 'দেখতে পেয়েছিল' উপনিবেশবাদ, আর ২) নবযুগে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কোন্-কোন্ পরিণতির কারণ হিসেবে সরাসরি কিংবা পরোক্ষে ধরা যেতে পারে উপনিবেশবাদকে, আর আগেই দেখা দিয়েছিল যে অভ্যন্তরীণ স্বতঃস্ফূর্ত জাড্য সেটার সাক্ষাৎ অনুবৃত্তি হল কোন্-কোন্ পরিণতি।

সার্বভৌমত্ব হারাবার আগে কোন একটা দেশে বিকাশনের মাত্রা কী ছিল সেটা নির্ণয় করতে হলে, আর পরবর্তী বিকাশনের বিষয়গত মূল্যায়ন করতে হলে নিম্নোক্ত সূচকগুলোর অন্তত এক-প্রস্তের বিশ্লেষণ করা চাই : টেকনিকাল সরঞ্জাম, শ্রমের সংগঠন আর উৎপাদনশীলতা; বাড়তি উৎপাদের প্রধান অংশটা উৎপাদনের পরিমাণ, হার আর ক্ষেত্র; এই উৎপাদের বণ্টন, হস্তগতকরণ আর ভোগ-ব্যবহারের নিয়ামক মালিকানার বিভিন্ন রকম; জাতীয় উৎপাদের বিভাগ ঘটে কোন্-কোন্ ভোগ্যপণ্যে এবং (যা আরও গুরুত্বপূর্ণ) কোন্-কোন্ উৎপাদনের উপকরণে; উৎপাদের যে-অংশটা ব্যবহৃত হয় শাসক মহলগুলো (ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কর্মী-কর্মচারীরা সমেত) আর জবরদস্তি এবং রাজনীতিক প্রভাবের যন্ত্র-সংস্থার ভরণপোষণের জন্যে সেটা উৎপন্ন হয় কোন্ উৎপাদন-প্রণালীক্ষেত্রে; যে প্রাধান্যশালী ভাবাদর্শ (সর্বপ্রথমে ধর্মীয় ভাবাদর্শ) নির্দিষ্ট করে দেয় জনসাধারণের বিশ্ববীক্ষা, সামাজিক নৈতিকতা আর শ্রম নিয়ম-বিধি, জীবনযাত্রার উপযুক্ত জিনিসগুলোর জন্যে চাহিদা, আর আর্টের নন্দন-তাত্ত্বিক আদর্শ, সেটার ইতিহাসক্রমিক উৎকর্ষ; সামাজিক-শ্রেণীগত গঠন এবং সেটার পর্ব-বিন্যাসগত গুণাগুণ; সম্পত্তি-বিত্তবান স্তর আর শাসক উপর-স্তরের সোপানতন্ত্র; সামরিক সংগঠন আর দমনযন্ত্র (তার মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রশাসনযন্ত্র — ফৌজ আর পুলিস); আইনগত চৈতন্য এবং আইনগত চলিতকর্ম; সাধারণ মানুষের আর উপর-স্তরের মানুষের সমাজ-মানসতা।

ভিন্ন-ভিন্ন ঐতিহাসিক বিশেষত্বসম্পন্ন বিভিন্ন সমাজের মধ্যে যোগাযোগের ঔপনিবেশিক ধরন

তৌলনিক-ঐতিহাসিক প্রণালী বলতে স্বভাবতই বোঝায় না খেয়াল-খুশিমাফিক অনুরূপতা কিংবা উলটে পার্থক্য বের করার জন্যে অন্তহীন

এবং এলোমেলো অনুসন্ধান। পাশাপাশি বর্তমান কিন্তু ভিন্নরূপের পৃথক-পৃথক সমাজের মধ্যে সমকালীন পর্যায়ে তুলনা করতে গেলে প্রকাশ পায় বিভিন্ন আঞ্চলিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অসমকালীন প্রকৃতি। যেমন, আঠার শতকের গ্রেট বৃটেন আর ভারতের মধ্যে তুলনা চলতে পারে এবং তা করা চাইই, নইলে বোঝা যায় না বৃটেন কিভাবে ভারত-কে অধীন করল। তাছাড়া, একধরনের (বুর্জোয়া, বৃটিশ) সমাজ এবং আর একধরনের (সামন্ততান্ত্রিক, ভারতীয়) সমাজের বিরুদ্ধ-অবস্থানের ফলে উদ্ভূত হয় তৃতীয় ধরনের সমাজ (ঔপনিবেশিক, বহুগাঠনিক)। জাতিরূপগতভাবে পৃথক-পৃথক বিভিন্ন বিরুদ্ধ-অবস্থানের ('মেট্রপলিটান' দেশ – উপনিবেশ) এবং তেমনি সেগুলো থেকে উদ্ভূত ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের ঔপনিবেশিক সমাজের ডজন-ডজন দৃষ্টান্ত মেলে উপনিবেশবাদের ইতি-হাসে। তবে ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের প্রাক্কালে কোন মেট্রপলিটান দেশ সামন্ততন্ত্র কিংবা পুঁজিতন্ত্রের কোন্ পর্বে ছিল, আর ঐ সম্প্রসারণের শিকার দেশটি তখন ছিল সামন্ততান্ত্রিক কিংবা গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজের কোন পর্বে, সেটা যথাযথভাবে এবং স্পষ্ট জানা না হলে উল্লিখিত উপস্থাপনাটা মামুলী কথার-কথা হয়েই থেকে যায়। অর্থাৎ কিনা, কর্তৃত্ব-শালী বিন্যাসটাকে (সামন্ততন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র, ইত্যাদি) বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত না করলে মেট্রপলিটান দেশ কিংবা উপনিবেশ কোনটার ক্ষেত্রে উপনিবেশ-বাদের পূর্বশর্ত কিংবা চলিতকর্ম কিংবা পরিণতি কোনটাই বোঝা যায় না, আর জাতিরূপতন্ত্র সেটার ইতিহাসনির্দিষ্ট স্বধর্ম ধারণ করতে পারে না।

ভারতে ঔপনিবেশিক সমাজের রকম নির্ণয় করতে পর্ব-বিন্যাসগত সুবিন্যাস-প্রণালী প্রয়োগ করলে, 'বুর্জোয়া ইংলণ্ড – সামন্ততান্ত্রিক (কিংবা আধা-সামন্ততান্ত্রিক) ভারত' বিরুদ্ধ-অবস্থান সংক্রান্ত সাধারণ ধারণার বদলে পাওয়া যায় ঐ সম্পর্কের অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্ট রকম: 'ম্যানু-ফ্যাকচারিং ইংলণ্ড – গোড়ার দিককার কিংবা উন্নত-সামন্ততান্ত্রিক ভারত (সতর শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে উনিশ শতকের গোড়ার দিক অবধি)', 'শিল্প-পুঁজিতান্ত্রিক ইংলণ্ড – ভারত'। স্পষ্টপ্রতীয়মান অতি-সরলীকরণ সত্ত্বেও এই জাতিরূপগত নকশা থেকে পাওয়া যায় তিন শতাব্দী ধরে ভারতীয় ঔপনিবেশিক সমাজ সম্বন্ধে আরও নির্দিষ্ট এবং প্রগাঢ় গবেষণার ইতিহাসক্রমে সক্রিয় নকশা।

এই বিশেষ (যদিও গবেষণার পরিমাণ বিবেচনায় থাকলে খুবই যথেষ্ট) দৃষ্টান্তটা স্পষ্ট করে তুলছে দুটো বুনিয়াদী ধারণার সুবিন্যাস-গত সমন্বয় — ধারণা-দুটো হল: বিভিন্ন অঞ্চলে (দেশ, সমাজ, জাতীয় এলাকায়) পর্ব-বিন্যাস প্রক্রিয়ার ইতিহাসক্রমিক অসমকালীন প্রকৃতি, আর পৃথক-পৃথক পর্ব-বিন্যাস বিশেষত্বসম্পন্ন বিভিন্ন অঞ্চলের (দেশ, ইত্যাদির) মধ্যে সমকালীন যোগাযোগসাধ্যতা। এই তৌলনিক-ঐতিহাসিক সুবিন্যাস-প্রণালীর অনুযায়ী বিবেচনাধারা থাকলে শুধু তবেই বিষয়-গতভাবে নির্ণয় করা যায় আলোচ্য আফ্রিশীয় সমাজ ইতিহাসক্রমে যতটা পিছিয়ে পড়ছে* সেটার মাত্রা, আর অতীতে এবং বর্তমান পর্বে বিভিন্ন আমূল পরিবর্তনের জন্যে এই সমাজ পরিমাণ আর গতিমাত্রার দিক থেকে কতটা প্রস্তুত।

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার
বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিত হল

মার্কস, ক.। মজুরি, দাম, মুনাফা।

এই রচনাটি হচ্ছে ১৮৬৫ সালের জুন মাসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের দুটি অধিবেশনে ক. মার্কস পঠিত একটি প্রতিবেদন। পরিষ্কার ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় ক. মার্কস সেই সর্বপ্রথম তাঁর উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বটির মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা করেন।

মার্কসের রচনাটি প্রুধোঁপন্থী ও লাসালপন্থীদের তত্ত্বগুলোর উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বিনাশের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা প্রমাণিত করে।

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

উলিয়ানভস্কি, র.। ও এশিয়া আফ্রিকা: সমকালীন সমস্যা (তত্ত্ব। রাজনীতি। নেতৃবৃন্দ)।

বইটির আলোচ্য বিষয় হচ্ছে — এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহের — জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন এবং বিকাশের আধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাবলি। বইটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে লেখক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিষয়ে, জাতীয় বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের ভূমিকা ও স্থান সম্পর্কে, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহের জাতীয়-গণতান্ত্রিক শাসনগুলোর বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে বলছেন। দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত হয়েছে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য কয়েকজন মুখ্য সংগ্রামীর ক্রিয়াকলাপ।

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

সেরায়েভ, স.। ভ. ই. লেনিন। 'সমবায় প্রসঙ্গে'।

যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে লেনিন এই রচনাটি লিখেছিলেন সের্গেই সেরায়েভ তার বর্ণনা দেন বইখানিতে। লেখক সংক্ষেপে লেনিনের রচনার সারকথাটি বলেন এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের পক্ষে এই রচনার তাৎপর্য দেখিয়ে দেন।